বড়বাজার

মাণিক চট্টরাজ

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৬

মুদ্রাকর ঃ
তাপস কুমার হাটাই
নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬, বিধান সরণী

বড়বাজার

বর্দ্ধমান জেলার মেমারী-দাঁইহাট রোডের মেমারী রেলষ্টেশন হ'তে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে বহমান খড়ি নদী। এই নদী উৎস হতে শেষ পর্য্যন্ত বহু মহকুমা, বহু গ্রামগঞ্জ দু'পাশে রেখে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে আপন চলার আবেগে। খড়ি নদীরই উত্তর তীরে অবস্থিত মন্তেশ্বর গ্রাম হতে তিন কিলোমিটার দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে ও খড়ি নদীর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় অর্দ্ধ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি নগণ্য গ্রাম বাঘাসন। অবশ্য মন্তেশ্বর আজ আর গ্রাম নয়, প্রায় আধা শহর আর বাঘাসনও অজ-পল্লী নয়, তারও অঙ্গে-অঙ্গে নগরজীবনের ছোঁয়া লেগেছে। তাই সেও নানা প্রসাধনে অর্থাৎ পিচ রাস্তা, বিজলী আলো, কাঁচা নর্দ্দমা, টেলিফোন, ডিপ টিউব-ওয়েল ইত্যাদি নিয়ে কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে নিজের রূপ-যৌবন ধরে রাখবার চেষ্টায় তৎপর। বাঘাসনের দক্ষিণে 'মালডাঙ্গা', পূর্ব্বে 'বাবুনপুর', উত্তরে 'পাকুড়মুড়ি', আর পশ্চিমে 'ফুলগ্রাম' ; পশ্চিম ও উত্তরটা জুড়ে রয়েছে দেবখাল কাঁদর ! এই খাল বড়বেলুন গ্রাম হতে বের হয়ে বাঘাসনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে খড়ি নদীতে এসে মিশেছে। আমাদের কাহিনী যদিও কিছুটা বাঘাসনকেন্দ্রিক তবুও এই গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত 'মালডাঙ্গা' সম্বন্ধে কিছু বলে রাখা প্রয়োজন। আসলে আজ যেখানে 'মালডাঙ্গা' এককালে খড়ি নদীর তীরে ঐ স্থানটি ছিল শুধু ডাঙ্গা অর্থাৎ ঐ স্থানের চার পাশে ছিল শুধু ধানজমি, ছোট-ছোট পুকুর, ডোবা আর নীচু জলা জায়গা। এতদঞ্চলে যখন পিচ রাস্তা ছিল না তখন খড়ি নদীর বুক বেয়ে ছোট-ছোট ডিঙ্গি বা বড়-বড় নৌকা ক'রে আশপাশের অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা হাটবারে অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতি-বারে তাঁদের মালপত্র এনে বোঝাই-খালাস ও কেনাবেচা করতেন ঐ উঁচু ডাঙ্গা জায়গাটায়। যেহেতু মালপত্র বোঝাই-খালাসে ও কেনাবেচার ব্যাপারে ডাঙ্গাটুকু ব্যবহার করা হ'ত সেহেতু কবে যেন আপনা-আপনিই লোকের মুখে-মুখে জায়গাটার নাম হয়ে গেল "মালডাঙ্গা" আর ঐ মালপত্র ওঠা-নামা ও ক্রয়-বিক্রয় হতে-হতেই শুরু হয়ে গেল ছোট-বড় নানা আকারের চালাঘর ও বড় ঘর তৈয়ার। তৈরী হয়ে গেল দুটো গঞ্জ, উপর-গঞ্জ ও নীচু-গঞ্জ। এতদঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী রাজুবাবু অর্থাৎ বাবুনপুর গ্রামের রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি।

তিনি দাঁইহাট, নাদনঘাট, কাটোয়া, কালনা প্রভৃতি বড়-বড় মোকামে ব্যবসায়-কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি মালডাঙ্গার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর ছেলেদের দিয়ে মালডাঙ্গাতেও পাকাপাকি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলবার প্রয়াস পেলেন আর তাঁরই সুনিশ্চিত দূরদৃষ্টির সার্থক ফল হল মালডাঙ্গার ব্যবসায়ের অধিকাংশটাই আজ তাঁর ছেলেদের ও নাতিদের হাতে। রাজবাবুরই ছেলেদের অনলস প্রয়াসে ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মানুষজনের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় মালডাঙ্গায় গড়ে উঠল এতদঞ্চলের বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটি উচ্চ বিদ্যালয় যার নাম "মালডাঙ্গা রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়"। গড়ে উঠল পোষ্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ইত্যাদি। তখনকার প্রয়োজনে যা-যা তৈরী হয়েছিল আজকের প্রয়োজন অনুযায়ী সেইগুলোই আবার রূপ ও নাম পরিবর্ত্তন করে আজকের মানুষ যা-যা দেখছেন সেইগুলোতে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, এই-ই নিয়ম, প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ পরিবেশ প্রস্তুত করে পুরাতন সম্পদকে ভাঙ্গচুর করে নতুন করে গড়ে নেয়; পুরাতন জিনিষের নাম পরিবর্ত্তন করে নতুন নামকরণ করে, তাই 'রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়' আজ 'মালডাঙ্গা রাজেন্দ্র স্মৃতি সর্ব্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়,' বাঘাসন ইউনিয়ন বোর্ড' আজ 'বাঘাসন অঞ্চল পঞ্চায়েৎ'।

ইতিমধ্যে আমরা আসল ঘটনা হতে কিঞ্চিৎ দূরে সরে গিয়েছি অর্থাৎ গল্প বলব বাঘাসন ও বাঘাসনের অধিবাসীদের নিয়ে অথচ শুরু করলাম মালডাঙ্গা দিয়ে। এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

বাঘাসন গ্রামের দত্ত পরিবারের পাঁচ শরিকের সকলেই সচ্ছল নয়, বড় তরফ ও মেজ তরফ বেশ সচ্ছল, সেজ তরফ আর্থিক দিক দিয়ে খুবই দুর্ব্বল এবং তার পরের দুজন অর্থাৎ ন-তরফ ও ছোট তরফ সেজ কর্ত্তার মত অতটা দুর্ব্বল না হলেও তাদের অবস্থা আদৌ ভাল নয়। এককালে পরিবারটি বিরাট একটি যৌথ পরিবার ছিল এবং কিছু জমিজমা, পুকুর, বাগানও ছিল। ভাইদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা দু-চার পয়সা রোজগার করে ঘরে আনতেন। যেহেতু সংসার যৌথ এবং বড় কর্ত্তাই সংসারের সিংহাসনে, সেহেতু সব ভাইদের আয়ের হিসাব-নিকাশ নেবার অধিকার তাঁর ছিল অর্থাৎ আয় যে যাই-ই করুন না কেন আয়ের সিংহভাগই জমা পড়ত বড় ভাইয়ের হাতে। মধ্যম ভ্রাতা ওরই মধ্যে ছিলেন কিছুটা চতুর, তাই তিনি রোজগার যা করতেন তার সবটাই দাদার কাছে প্রকাশ না করে নিজের আখেরের কথা ভেবে কিছুটা পৃথকভাবে সঞ্চয় করতেন। ফলে দেখা গেল— ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হওয়ার সময় বড়বাবু আর মেজবাবুর বিত্ত বাকী তিন ভাইয়ের চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী। যাই হোক, এ-নিয়ে অপর তিন ভাইয়ের মনে সন্দেহ ও

বিক্ষোভ থাকলেও তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী কেউই বিশেষ বিদ্রোহী হলেন না এবং বড়দা, মেজদা ও গ্রামের আরও দু-একজন মিলে সালিশী করে যেভাবে সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে দিলেন তাতেই সন্তুষ্ট হলেন।

দাদাদের ব্যবহারে দুঃখিত হলেন সেজ ভাই রামচাঁদ। তিনি মনে-মনে হিসাব করে দেখলেন ভূ-সম্পত্তি যা তাঁর অংশে পড়েছে তাতে পাঁচ ছেলেকে নিয়ে তাঁর বিরাট সংসার চলবে না, তাই স্ত্রীর গহনা সম্বল করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যের অন্বেষণে এবং ঘুরতে-ঘুরতে হুগলী জেলার শেওড়াফুলিতে এসে একটি ধানভাঙ্গা মেসিন বসালেন। রামচাঁদ দত্ত মহাশয়ের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে সেই ধানকল থেকে ধীরে-ধীরে গড়ে উঠল একটি মাঝারি ধরনের রাইস-মিল। স্বাভাবিকভাবেই তখন মিলের কাজ-কর্ম্ম আর তাঁর একার পক্ষে দেখাশুনা করা সম্ভব হ'ল না, তাই কাজের সুবিধার জন্য বড় ছেলে ক্ষেত্রমোহন, মেজ ছেলে ব্রজমোহন ও সেজ ছেলে যতীন্দ্রমোহনকে বসালেন মিলের কাজকর্ম্ম দেখাশোনার জন্য। রামচাঁদ দত্ত মহাশয় গঙ্গা যাত্রা করার পর তিন ছেলে হ'ল মিলের কর্ত্তা এবং তারা ভিতরে-ভিতরে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ক'রে আখের গোছাবার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠার জন্য শেষ পর্য্যন্ত মিলের অবস্থা খারাপ হতে লাগল, কিন্তু তার বদলে গ্রামে বাড়তে লাগল কারও ভূ-সম্পত্তি, কারও তৈরী হল নতুন বাড়ী, কেউ কিনল দু-চারটে পুকুরের অংশ। এইভাবে অবশেষে দেখা গেল, রাইস-মিলের আর কিছুই নেই, আছে শুধু চালাঘর আর ময়দান।

রাইস-মিলটা হাত-ছাড়া হয়ে যেতেই সকলে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে এলেন পাকাপাকিভাবে এবং পাঁচ ভাইয়ের পরিবারে গজিয়ে উঠতে লাগল নানা অশান্তি-উপদ্রব ; ক্রমে একদিন দেখা গেল—পাঁচ ভাইয়ের পাঁচ জায়গায় পাঁচটি হাঁড়িতে চাল ফুটছে।

অন্য তিন ভাইয়ের মতই ছোট ভাই নিত্যগোপালেরও বিশেষ কোন অসুবিধা হ'ল না, কারণ সে নিঃসন্তান এবং কাজকর্ম্ম যা করে তা থেকে মোটামুটি সচ্ছন্দেই তার দিন চলে যায়, কিন্তু সব থেকে মুস্কিল হ'ল ন-কর্ত্তা সতীন্দ্রমোহনের। সেদিন তাই সকাল বেলাতেই দাওয়ায় বসে ভাবছেন সতীন্দ্রবাবু। তিন ছেলে তিন মেয়ে নিয়ে তাঁর বৃহৎ সংসার, তার উপর দুই ছেলে স্কুলে পড়ে, বড় মেয়ে কমলারও বয়স হ'ল বার, দু-এক বছরের মধ্যেই তার বিয়ে দিতে হবে, অথচ তাঁর আয় মাত্র মাসে পচিশটি টাকা। সতীন্দ্রমোহন তো ভেবে কূলকিনারা পান না এ-অবস্থায় তাঁর কি করা উচিত! স্ত্রী সুচন্দ্রাকে বলেন, "আর তো চলে না ; রাজুবাবুর জুনিয়ার হাইস্কুলের বেতন পনের টাকা আর সকাল-সন্ধ্যা টিউসানির দশ টাকা এই দিয়ে

কি করে চলবে বলত চন্দ্রা ?” সুচন্দ্রা দেবীও একথা মর্ম্মে-মর্ম্মে জানেন, কারণ মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন তো প্রায় দুটি বেলাই তিনি আর বড় মেয়ে কমলা শুধু এক ঘটি ক'রে জল খেয়েই দিন কাটিয়ে দেন। কেউ না জানলেও দিন যে চলে না একথা তাঁর মত আর কেউই বোধ হয় জানেন না।

সুচন্দ্রা দাওয়ায় বসে সতীন্দ্রবাবুকে বলেন, “একবার ফুলগাঁয়ে দাদার কাছে যাও না, যদি দাদা তোমার জন্য বর্দ্ধমানে কোথাও একটা ভাল চাকরী দেখে দেন তো সংসারের কষ্ট খানিকটা কমে।” সুচন্দ্রার এ-কথায় সতীন্দ্রবাবু কোন জবাব দেন না, শুধু মুখটা নীচু করে উঠোনের দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি ভালই জানেন যে, বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের নাম-করা উকিল শ্যালক মনমোহনের কাছে চাকরীর জন্য আর্জ্জি পেশ করতে গেলে অহেতুক কতকগুলো অপমানকর কথা ও শ্লেষাত্মক বাক্য ছাড়া আর কিছু উপকার পাবার আশা খুবই কম। কথার উত্তর না পেয়ে সুচন্দ্রা একবার সতীন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারেন, কারণ তিনিও তাঁর ভাইকে ভালই জানেন। সুতরাং আপাততঃ তিনি স্বামীকে আর কিছু না ব'লে সংসারের কাজকর্ম্মের দিকে মন দেন। কত বেলা হয়ে গেছে, এখনও উঠোনে ঝাঁটপাট পড়ে নি। ওঁর আবার বেলা এগারটায় স্কুল, তার আগেই ভাতে-ভাত দুটি ফুটিয়ে দিতে হবে ; ভাতের কথা মনে পড়তেই সুচন্দ্রা দেবী উঠোনের আমতলার দিকে তাকিয়ে দেখেন জালন বলতে কিছুই নেই। ভাগ্যিস খেয়াল পড়েছে, তাই তাড়াতাড়ি তিনি “কমল।” “কমলা” “প্রদীপ প্রদীপ,” করে হাঁক দেন। বাইরে সদর দরজায় বসে বাঘবন্দী খেলছিল কমলা আর প্রদীপ দুই ভাই-বোনে। সাত সকালে মায়ের ডাক শুনে একছুটে হাঁফাতে-হাঁফাতে তারা দুই ভাই-বোনে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির। তাদের দিকে চেয়ে সুচন্দ্রা বলেন, “যা তো মা, যা তো বাবা, দুটো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে আয় তো চট্ করে।” তাঁর কথায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে কমলা বলে, “জালন কুড়োতে কোথায় যাব মা, ভট্চাজ পুকুরের পাড়ে গেলে ওদের মালী মারে, সামন্ত-পুকুরের পাড়ে গিয়েছিলাম সেদিন, সেখানে সুরো বাগ্দী আমার ঝুড়িটা কেড়ে নিয়েছে, ভয়ে তোমাকে বলতে পারি নি।” কমলার কথা শুনে প্রদীপ বলে, “চল দিদি, আজকে মাঠে গিয়ে ‘নেড়া’ কেটে নিয়ে আসি ; বাঁশতলার আউশ মাঠে অনেক বড় বড় নেড়া আছে।” ওদের কথাবার্ত্তা শুনে সুচন্দ্রার বুক ফেটে যায়, তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। কমলা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কি রকম ভয় পেয়ে যায়। তারও বুকটা কি রকম করে ওঠে ; মাত্র বার বছর বয়স হলেও মানুষ যে কষ্টের সময়েই কাঁদে এটা সে বেশ বুঝতে পারে, তাই মায়ের শতচ্ছিন্ন তালি-দেওয়া কাপড়ের

ঝুলন্ত আঁচলটায় মুখ ঢেকে সেও ফুঁপিয়ে ওঠে। প্রদীপের বয়স সবে সাড়ে নয়, সে অত‍শত না বুঝে "মা একটা ঝুড়ি দাও না" বলে আমতলায় গিয়ে একটা বাঁট-ভাঙ্গা ভোঁতা কাস্তে তুলে নেয়। সুচন্দ্রা কমলার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে প্রদীপকে বলেন, "আর তো ঝুড়ি নেই বাবা, তুই আমার গামছাটা নিয়ে যা, ওতেই নেড়া বেঁধে আনিস। এই বলে কমলার মুখটা তুলে ধরে বলেন, "যা, ভাইয়ের সংগে যা।" দুই ভাই-বোনে মায়ের কথায় নেড়া কাটতে চলে যায় আর সুচন্দ্রা এই সাত সকালেই চোখের জল ফেলতে-ফেলতে গৃহস্থালীর কাজ করতে যান। ঘর, দোর, উঠোন, দাওয়া সব ঝাঁটপাট দিয়ে 'জল-গোবর' ছড়িয়ে বাড়ীর লাগোয়া খিড়কী পুকুরের ঘাটে যান ঝাঁটা-বালতি ও হাত-পা ধোবার জন্যে। হাত-পা ধোয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন সুচন্দ্রা হঠাৎ শুনতে পান কে যেন "ন বৌ" ও "ন বৌ" বলে তাঁকে ডাকছে। খেয়াল করে শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে, আহ্বানকারিণী তাঁর বড 'জা' প্রভাতী দেবী। তিনি তাড়াতাড়ি পুকুরঘাট থেকে উঠে আসেন এবং খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকেন। বাড়ীতে ঢুকে সুচন্দ্রা দেখেন প্রভাতী তখন উঠোনে পূব-পশ্চিমে লম্বা করে টাঙ্গানো একটা দড়ির উপর ভিজে কাপড়চোপড় মেলে দিচ্ছেন। সুচন্দ্রা উঠোনের এক কোণে বালতি-ঝাঁটা নামিয়ে রেখে ধীর পায়ে প্রভাতীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন, "তুমি আমায় ডাকছিলে বড়দি?" বড়দি অর্থাৎ প্রভাতী তখন একটা সেমিজ মেলে দিচ্ছিলেন; সুচন্দ্রার এ-কথায় তাঁর হাতের সেমিজ হাতেই থেকে যায়। তিনি দড়ির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সোজাসুজি সুচন্দ্রার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বলে ওঠেন, "হ্যা লা, তোর ব্যাপারটা কি? এই সাত সকালে দুধের ছেলে দুটোকে পাঠিয়েছিস্ মাঠে নেডা কাটতে! ঘরে জালন নেই, তা আমার রান্নাচালায় ঘুঁটে-কয়লা কি সব ফুরিয়ে গেছে? আমার কি এমন পেটের জালা?"

বড়দির এ-কথায় সুচন্দ্রা সব ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। বড়দি তিকুলীতে গা ধুতে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখে এসেছেন কমলা আর প্রদীপ নেড়া কাটছে, তাই তাঁর এই অনুযোগ; তাছাড়া এক উঠোনেই তাঁদের বাড়ী। ভাগাভাগি সব হয়েছে বটে, কিন্তু উঠোনে পাঁচিল দেওয়ার আগে বড় ভাশুর দেহ রাখলেন। তারপর কিছুদিন পর পাঁচিল দেওয়ার কথা উঠতেই বড়দি সতীন্দ্রকে বললেন, "ঠাকুরপো, আমার মেয়েদের তো বিয়ে-থা হয়ে গেছে, তোমার দাদাও আজ নেই, উঠোনে পাঁচিল দিয়ে আমাকে একেবারে একলা করে দেবে ভাই?" বড় বৌদির এই কথা শোনার পর সতীন্দ্র আর উঠোনে পাঁচিল দেওয়ার কথা কোনদিন তোলেন নি,

তাছাড়া বড় বৌঠানের উঠোন মাড়িয়ে বাইরে যাবার সদর দরজা। সুতরাং পাঁচিল দিতে গেলে আবার অন্য দিকে দরজা বসাতেও হবে, সেও অনেক হাঙ্গামা, এই সব সাত-পাঁচ ভেবে দুটো বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল আর কোনদিন পড়ে না, তাই দুটি পরিবারে দুটি হাঁড়ি হ'লেও বাইরের লোকের পক্ষে একনজরে দেখে তা বোঝবার উপায় ছিল না।

প্রভাতী দেবী আর কিছু না ব'লে হাতের ভিজে সেমিজটা কাঁধে ফেলে রান্না চালায় গিয়ে এক ঝুড়ি ঘুঁটে ও এক ঝুড়ি কয়লা এনে ধপাস করে উঠোনের মাঝখানে নামিয়ে দিয়ে ছোট জায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? যা এগুলো নিয়ে যা, শীগ্‌গির উনুনে 'উতো দেগা'। দেখছিস্ না কত বেলা হল, ঠাকুরপোর ইস্কুলের ভাত, যা আর দেরী করিস না।"

বড় জায়ের প্রীতিমিশ্রিত অনুযোগের সুরে বলা কথা শুনে, সুচন্দ্রার চোখ ফেটে আরও একবার জল গড়িয়ে পড়ে, প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, "এগুলো কি রোজ-রোজ ভাল, বড়দি? আমার অভাবের সংসারে টানাটানি তো লেগেই আছে, কিন্তু তাই বলে তুমি রোজ-রোজ আমার জন্য কত করবে?" প্রভাতী জানেন সুচন্দ্রা ফুলগ্রামের সোমেদের মেয়ে। ধনে-মানে-আভিজাত্যে ফুলগাঁয়ের সোমবংশের খ্যাতি কার না জানা। প্রভাতী নিজেও বড় বংশের মেয়ে, তাই এ অবস্থায় সুচন্দ্রার মনের ভাব বুঝতে পেরে প্রভাতী নিজেই ঘুঁটে-কয়লার ঝুড়ি দুটো আমতলার ঘরের দাওয়ার উনুনশালে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে একটা উনুনে আগুন দিয়ে উঠে এসে সুচন্দ্রার কাঁধে একটা হাত রেখে ধীরে-ধীরে তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে বলেন, "যা ন-বৌ, গা-হাতটা ধুয়ে একটা ডুব দিয়ে আয়, এসে রান্না চাপিয়ে দে, দেখছিস্ না কত বেলা হ'ল?" প্রভাতীর এ-কথার পর আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় বুঝেই সুচন্দ্রা ধীরে-ধীরে সামদ পুকুরের উদ্দেশে বাড়ীর বাইরে পা বাড়ান। উঠোন পেরিয়ে সদর রাস্তায় পড়তেই সুচন্দ্রার নজরে পড়ে কমলা আর প্রদীপ দুজনে গামছার চারটে কোণ চার হাতে ধরে বিস্তর নেড়া নিয়ে আসছে। মাকে দেখতে পেয়েই তারা উৎফুল্লচিত্তে সমস্বরে বলে ওঠে, "মা দেখ দেখ, কত নেড়া কেটে এনেছি।" সুচন্দ্রা বৌ-মানুষ, তাই তাদের মত চিৎকার করে কিছু জবাব দিতে পারেন না, ধীরে-ধীরে তাদের কাছে এসে, কমলাকে বলেন, "নেড়াগুলো আমতলায় রেখে গামছাটা আমায় সামদ পুকুরের ঘাটে দিয়ে যাবি। আমি গা ধুতে যাচ্ছি।" পাড়ার বেশীর ভাগ বৌ-ঝি স্নানের জন্য যায় তিরুলী পুকুরে, কিন্তু সুচন্দ্রা যান সামদ পুকুরে, কারণ তিনি পুকুরঘাটে বসে এর-ওর-তার বাড়ীর কথা, বিশেষ করে গুরুজনদের সমালোচনা-কুৎসা, ছোটদের প্রতি

অপমানকর বা শ্লেষাত্মক কথাবার্ত্তা পছন্দ করতেন না, তাই পারতপক্ষে যে-সব স্থানে ঐ সমস্ত আলোচনা হ'ত সেই সব স্থান তিনি এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতে চাইলেই তো আর গোটা বিশ্বের লোক তাঁকে এড়িয়ে যাবে না, আর যায় না বলেই ভট্‌চাজদের ছোট গিন্নী অর্থাৎ গ্রামের লোকে ভয়ে হোক বা ভক্তিতে হোক যাঁকে ছোট মা বলে ডাকে তিনি পুকুরঘাটে এসেই সুচন্দ্রাকে দেখতে পেয়ে বেশ ঝাঁঝের স্বরে বলে ওঠেন, "ঘরে ভাত নেই আবার ঝাঁঝ; বলি ও-বৌ, ছেলেমেয়েগুলোকে কি একটু ভাল শিক্ষাও দিতে নেই?" ছোট মায়ের একথা যে তাঁকে উদ্দেশ করেই, তা বুঝতে পেরে সুচন্দ্রা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, কারণ ছোট গিন্নী একে তো এ গাঁয়ের জমিদারগৃহিণী, তাতে আবার এই সাতসকালেই তাঁর মেজাজটা বিগড়ে গেছে আর এই মেজাজ বিগড়াবার কারণটা যে তাঁরই ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ না কেউ, একথা বুঝতে সুচন্দ্রার নিমেষমাত্র দেরী হয় না। সুচন্দ্রা ইতিমধ্যে ঘাট থেকে ভিজে কাপড়েই উঠে পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ —এই-ই এ গাঁয়ের নিয়ম, জমিদার বাড়ীর কেউ স্নানঘাটে এলে গ্রামের অন্য কেউ তখন ঘাটে নামতে পারবে না, তা সে গ্রামের যে-কোন পুকুরে যে-কোম ঋতুতে যে-কোন সময়েই হোক না কেন; এমন কি, স্নান অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেও পাড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। সুচন্দ্রাও সেই নিয়ম মানতেই ঘাট ছেড়ে পাড়ে উঠে এসেছিলেন এমন সময় কমলা হাঁফাতে-হাঁফাতে মায়ের গামছাটা নিয়ে ঘাটে এসে হাজির। কমলাকে দেখেই ছোট মা যেন দ্বিগুণ জ্বলে উঠলেন। তিনি বলে উঠলেন, "এই যে, এই যে, এই ছুঁড়িটা গামছায় করে নেড়া বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—নেড়া কি হবে লা? আমাকে কিনা বললে, ভাত ফোটাব, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমায় কিনা দেয় ভাতের খোঁটা? নেড়া দিয়ে ভাত ফোটাবে?"

সুচন্দ্রা বুঝতে পারেন কমলা সত্যি কথাই বলেছে, কিন্তু যেহেতু ছোটমাকে কোনদিন নেড়ার জ্বালনে ভাত রাঁধতে হয়নি সেহেতু তিনি ব্যাপারটাকে উপহাস বলে মনে ভেবে নিয়েছেন আর অহেতুক কমলার উপর রাগ করে ঝালটা তাঁর উপরেও ঝাড়ছেন, তাই কমলার হাত হ'তে গামছাটা নিয়ে কমলাকে বলেন, "ছিঃ কমলা, তুই ছোটমার কথায় জবাব দিয়েছিস? আর কোনদিন ও-ভাবে ওঁকে কিছু বলিস না, উনি আমাদের সকলের গুরুজন, ওঁকে যা-তা বললে পাপ হয়।" সুচন্দ্রার এ-কথায় ছোট মায়ের রাগ হয়ত কিছুটা পড়ল। তিনি একবার সুচন্দ্রার মুখপানে চেয়ে সে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাড়াতাড়ি স্নানে মনোনিবেশ করলেন আর কমলা মনে-মনে ভাবল, সত্যিই হয়ত সে কিছু অন্যায় করে ফেলেছে, তাই আর সেখানে না দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে বাড়ী চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোট মা স্নান শেষ করে উঠে গেলে সুচন্দ্রাও স্নান সেরে ঘরে ফিরে দেখে উনুনে হাঁড়ি চড়ানো এবং তাতে জল ফুটছে, তিনি বুঝতে পারেন তাঁর দেরী হচ্ছে দেখে বড়দি নিশ্চয়ই হাঁড়ি চড়িয়ে দিয়েছেন। সুচন্দ্রা ভিজে কাপড়েই কিছু চাল ধুয়ে তাতে ঢেলে দেন এবং চালের সঙ্গেই সিদ্ধ করতে দেবেন ব'লে দুটো আলু ও একটা ঢ্যাঁড়সও ধুয়ে রাখেন। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে উঠোনের দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ছেন, এমন সময় দেখেন কমলা কোথা থেকে এক গাদা কলমী শাক তুলে এনে হাজির। কলমী শাক দেখে সুচন্দ্রা প্রশ্ন করেন, "কোথা থেকে আনলি?" উত্তরে কমলা বলে, "বড়ি-গড়েতে হয়েছিল।" বড়িগড়ের কথা শুনে সুচন্দ্রার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে; কারণ বিষাক্ত সাপের ভয়ে কোন সমর্থ পুরুষ মানুষও যে-বড়িগড়ের পাড়ে সহজে যেতে চায় না সেই বড়িগড়ের জল থেকে কমলা শাক এনেছে। সুচন্দ্রা তাড়াতাড়ি কমলার কাছে এসে তার মাথায় ডান হাতটা দিয়ে মুখটা নিজের দিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, "আর কোনদিন ও-কাজ করিস না, মা, ওখানে যে মা-মনসার বাসা তুই কি জানিস না?" কমলা মায়ের মনের ভাব বুঝতে পেরে ফিক করে একটু হেসে ফেলে এবং বলে, "আচ্ছা, আর যাব না।"

মা-মেয়েতে যখন এই কথা হচ্ছিল ঠিক তখনই দরজায় মা, মা, চিৎকার শুনে মা-মেয়ে অবাক চোখে চেয়ে দেখে দরজায় সুদীপ। কমলা তাড়াতাড়ি "দাদা এসেছে, দাদা এসেছে", ব'লে দু-হাতে তালি বাজিয়ে গোটা-চারেক ঘুরপাক খেয়ে নিয়ে অন্য ভাই-বোনেদের খবর দিতে চলে যায়। সুদীপ মাকে প্রণাম করে মায়ের বুকে মাথাটা রাখে আর সুচন্দ্রাও তার মাথাটা বুকে চেপে মাথায় ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ছেলেকে আদর করেন এবং আস্তে-আস্তে প্রশ্ন করেন, "তুই তো বাড়ী এলে শনিবার বিকেলে আসিস, আজ সকালে এসে পড়লি যে?" সুদীপ বলে, "আমাদের স্কুল কমিটির একজন মেম্বার মারা গেছেন গতকাল, সেজন্য আজ স্কুল ছুটি। তাই সকালে বাড়ী চলে এলাম। তাছাড়া সামনের অগ্রাণ মাসে টেষ্ট আর তারপর ফাল্গুন মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। তার আগে ত আর বাড়ী আসতে পারব না।" সুদীপের কথায় সুচন্দ্রা আশ্বস্ত হন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অন্য এক ভাবনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে ভাবনা হ'ল সুদীপের পরীক্ষার ভাবনা। কে জানে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন কিনা। আজ পর্য্যন্ত তো তাঁর এই ছেলেটি কোন পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় হয় নি। স্কুলের সব পরীক্ষাতেই বরাবর প্রথম স্থানই অধিকার করে এসেছে। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই দু-বেলা টিউশানি করে, ছোট বাচ্চাদের পড়িয়ে যা পায় তাই দিয়ে সে নিজের বোর্ডিং-এর খরচ চালায় আর

স্কুলে মাইনে তো লাগে না, কারণ ফার্ষ্ট হওয়ার জন্য সে ফ্রী স্টুডেন্টশিপ পায়। যাঁদের বাড়ীতে বাচ্চাদের পড়ায় অর্থাৎ নাসিগ্রামের রায়দের বাড়ী তাঁদের বড় গিন্নী সুদীপকে খুব ভালবাসেন, তাই বৎসরান্তে দু-একখানা প্যান্ট-জামাও তাকে দেন। এইভাবে সুদীপ তার নিজের খরচ নিজেই চালায়, তার বাবার মাইনের টাকা থেকে কিছুই নেয় না ; বাবার মাইনের টাকার উপর ভরসা করে পড়তে গেলে কবেই তার পড়া বন্ধ হয়ে যেত।

সুদীপ মায়ের বুক থেকে মাথাটা তুলে জিজ্ঞাসা করে, "মা, কমলিটা গেল কোথায় ? প্রদীপ অধীপ এরাই বা কই ?"

সুচন্দ্রা বলেন, "আর কোথায় ? তুই বাড়ী এসেছিস, কমলি কি আর বাড়ীতে থাকে ? দেখ্‌গে যা, হয়তো সে পাড়ার লোককে খবর দিতে গেছে, নয়তো কোন পুকুরে নেমে দাদার জন্য গুগ্‌লি-শামুক যোগাড় করতে গেছে।" মায়ের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই সুদীপ দেখে হৈ হৈ করতে-করতে কমলার সঙ্গে প্রদীপ অধীপ নির্ম্মলা ও বিমলা বাড়ী ঢুকছে। সুদীপ একবার তাদের দিকে চেয়ে দেখে কারও মাথা পর্য্যন্ত ধূলো, কারও পায়ে কাদা, কারও হাতে দুটো আকন্দ পাতা। সুদীপ একনজরেই বুঝতে পারে তাদের অবস্থাটা। সে প্রদীপ ও অধীপের দিকে চেয়ে ঈষৎ কোপান্বিত স্বরে বলে, "এই সাত সকালে খেলতে গিয়ে মাথা পর্য্যন্ত ধূলো মেখে বসে আছিস সব ? সকালে একটু পড়তে বসতে পারিস না ! কমলার দিকে চেয়ে সুদীপ বলে, "তুই তো বড় হয়েছিস, ভাইদের একটু পড়াতে পারিস না ?" কমলা দাদার কথায় ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় এবং খুব ভয়ে ভয়ে বলে, "ওরা আমার কথা শুনলে তো ?" প্রদীপ কমলার সামনেই দাঁড়িয়েছিল তাই কমলার কথায় সে কমলার দিকে ড্যাবড্যাব ক'রে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জিভটা একটু বের ক'রে তাকে ভেংচি কাটে, সঙ্গে-সঙ্গে কমলাও দাদা অর্থাৎ সুদীপকে বলে, "দেখছ দাদা, দেখছ, প্রদীপটা আমায় কেমন ভেঙ্গাচ্ছে ?" সুদীপ একটু হেসে ফেলে এবং প্রদীপকে লক্ষ্য করে বলে, "এই, ভেঙ্গাচ্ছিস কেন রে ? জানিস না দিদি এবার প্রাইমারী পাশ দিয়েছে ?" এই বলে সুদীপ সবাইকে পুকুর-ঘাটে গিয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়ে আসতে নির্দ্দেশ দেয় এবং তার কথামত সবাই পুকুর-ঘাট হতে ফিরলে সে সবাইকে হাত পাততে বলে, সবাই একে একে হাত পাতলে সুদীপ তার কাঁধে ঝোলানো একটা কাপড়ের ব্যাগ হ'তে কলাপাতার একটা মোড়ক খুলে সবারই হাতে-হাতে একখানা করে পরোটা ও একটু করে গুড়ের পাটালী দেয়। সুচন্দ্রা উনুনশাল থেকে সবই লক্ষ্য করেন এবং সবাই চলে গেলে সুদীপকে লক্ষ্য করে বলেন, তুই নিজে একখানা রাখলি না যে ?"

মায়ের কথায় সুদীপ মাকে একরকম সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলে ওঠে, "আমাকে তো রায়জেঠীমা প্রায়ই পরোটা খেতে দেন, এগুলো ওদের জন্য নিয়ে এসেছি।" আসলে গতকাল রায়বাড়ীর বড়জামাই এসেছিল, তাই গতরাত্রে ও-বাড়ীতে পরোটা হয়েছিল। সকালে যখন বাড়ী আসবার জন্য দু'-দিনের ছুটি চাইতে গিয়েছিল সুদীপ, তখনই রায়জেঠীমা বাসী পরোটা পাঁচখানা ও একটু খেজুর গুড়ের পাটালী দিয়েছিল রাস্তায় খাবার জন্য। নিজে না খেয়ে সেইটাই সুদীপ ভাই-বোনেদের জন্য বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে। সুদীপের কথায় সুচন্দ্রা আর কিছু না বলে নিজের কাজে মন দেন এবং সুদীপ কাঁধের ঝোলাটা খুঁটির কাছে দাওয়ার উপর নামিয়ে রেখে বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। বাড়ী থেকে বের হতেই শ্রীধরমন্দিরের কাছে বাবার সঙ্গে সুদীপের দেখা হয়ে যায়। বাবার পা ছুঁয়ে সুদীপ পদধূলি নেয় এবং সতীন্দ্রবাবু সুদীপকে প্রশ্ন করেন, "এই যে বাবা, কখন এলে?" বাবার কথার উত্তরে সুদীপ "এইমাত্র, তোমার শরীর ভাল তো বাবা?" বলে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বাবা বলেন, "শরীরটা তো ভালই"—কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই তিনি বাড়ীর দিকে চলতে থাকেন। সুদীপ আর একবার বাবার মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে, বাবা যেন আরও কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু সঙ্কোচে বলতে পারলেন না, তাই বাবার গমনপথের দিকে চেয়ে সুদীপ চিন্তান্বিত মনে পথে বের হয়। পথে বের হতেই দেখে মামা মনমোহন হন্‌হন্ করে তাদের বাড়ীর দিকেই আসছেন। মামাকে এই অ-দিনে অ-সময়ে তাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখে সুদীপের বুকটা ধড়াস করে ওঠে, সে এক ছুটে বাড়ী এসে মাকে খবর দেয়। দাদা আসছেন শুনে সুচন্দ্রা দেবী শশব্যস্ত হয়ে সতীন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করে বলেন, "শীগ্‌গির যাও, এক বালতি জল পুকুর থেকে নিয়ে এস।" আর সুদীপকে বলেন, "বাবা, তাড়াতাড়ি একখানা আসন তোর বড়মার কাছ থেকে নিয়ে এসে দাওয়ায় পেতে দে তো।"

জল ও আসনের ব্যবস্থা শেষ হতে-না-হতেই সুচন্দ্রার দাদা মনমোহনবাবু গুরুগম্ভীর গলায় "চন্দ্রা" "চন্দ্রা" বলতে বলতে দরজায় এসে হাজির হন। সুচন্দ্রা তাড়াতাড়ি গলায় আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে দাদাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে; সুদীপও মাথা নীচু করে তাঁর পায়ের ধূলো নেয়। সুদীপকে প্রণাম করতে দেখে মনমোহনবাবু বলে ওঠেন, "কি রে হতভাগা, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছিস নাকি? স্কুল নাই তোর? এই শনিবার সাতসকালেই বাড়ীতে বসে আছিস যে?" মনমোহনবাবুর এ কথার জবাব সুদীপকে দিতে হয় না। জবাব দেন সুচন্দ্রা নিজেই, তিনি বলেন, "ওর আজ ছুটি আছে, তাছাড়া কয়েকদিন আগে

আমিই ওকে চিঠি দিয়েছিলাম একবার বাড়ি আসবার জন্য; সামনে পরীক্ষা, তিন-চার মাসের মধ্যে আর তো বাড়ী আসতে পারবে না, তাই।" সুচন্দ্রার কথা শেষ হতে-না-হতেই সতীন্দ্র এক বালতি জল হাতে দাওয়ার কাছে উপস্থিত হন এবং সুচন্দ্রা একটা ঘটি করে জল নিয়ে দাদার পা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন। সতীন্দ্র মনমোহনবাবুকে হাত তুলে নমস্কার করেন এবং কুশলবার্ত্তা বিনিময় করেন। মনমোহনবাবুর বুক-পকেটে ঘড়ি রয়েছে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কটা বাজে?" মনমোহনবাবু পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে উত্তর দেন, "দশটা।" দশটা শুনে সতীন্দ্র লাফ দিয়ে উঠোনের দড়িতে ঝুলন্তপ্রায় শুষ্ক একটা গামছা কাঁধে ফেলে স্নানের জন্য পুকুরের উদ্দেশে বাড়ীর বাইরে পা দেন।

সতীন্দ্র চলে যেতেই মনমোহনবাবু সুচন্দ্রাকে লক্ষ্য করে বলেন, "খবর খুব খারাপ রে চন্দ্রা, নবস্থার জামাইয়ের শরীরটা খুব খারাপ। উঠতে হাঁটতে আর প্রায় পারেই না; তাই তার সব সময়ে সেবার জন্য একজন লোক চাই, চারু তো একলা, তার উপর আবার তার দু'দুটো ছোট ছেলে। ছেলে সামলাতেই তার দিন চলে যায়, তাই আমি বলছিলাম কি, কমলা তো বাড়ীতে বসেই রয়েছে। যতদিন বিয়ে-থা না দিতে পারছিস ততদিন যদি ও নবস্থা গিয়ে সামন্তমশায়ের সেবা করত তাহলে তোর ঘাড় থেকে অন্ততঃ একটা লোকের খোরাকির ঝক্কিটা কমত।" দাদার কথায় সুচন্দ্রা একবার আপত্তি জানিয়ে বলে, "কমলার বয়স বার হ'ল। একলা এত বড় মেয়েকে ওখানে যেতে দেওয়া কি ঠিক হবে দাদা? তাছাড়া আমারও তো হাতনুরকুত বলতে কমলাই। অর্দ্ধেক কাজ তো ওই-ই করে। ও চলে গেলে আমারও তো অসুবিধা হবে।" সুচন্দ্রা মুখে আপত্তি করলেও মনে-মনে ভাবে, দাদা ঠিকই বলেছেন। চারুর বাড়ী গিয়ে থাকলে মেয়েটা পেট পুরে ভাত-মুড়ি খেতে পাবে, মাসের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক দিন না খেয়ে থাকতে হবে না। সুচন্দ্রাকে চিন্তিত দেখে মনমোহনবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, "তোর যদি আপত্তি থাকে তবে থাক, আমি ওদের জন্য না হয় অন্য লোক দেখে দেব।" বলতে-বলতেই সতীন্দ্র এসে বাড়ী ঢোকেন। তাকে দেখে মনমোহনবাবু সমস্ত ব্যাপারটা খুলে ব'লে তাকেও প্রশ্ন করে জানতে চান, যে, কমলাকে নবস্থা পাঠানো সম্পর্কে তার আপত্তি আছে কিনা। সতীন্দ্র বলেন, "না, না, আপনি যখন বলেছেন তখন এতে আর আপত্তি কি? তাছাড়া কমলা ওর ছোট মাসীর কাছে ভালই থাকবে, কি বল চন্দ্রা?" কি বল চন্দ্রা ব'লে পরোক্ষে সতীন্দ্র চন্দ্রার সায় নিতে চাইলে সুচন্দ্রা বলেন, "তা তোমার যখন আপত্তি নেই আর দাদা যখন বলছেন তখন থাক কমলা, গিয়ে ছোট মাসীর কাছে থাকুক।"

সুচন্দ্রা ও সতীন্দ্রের সম্মতি পেয়ে মনমোহনবাবু যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং সতীন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, "তাহলে বিকেলে কমলাকে ফুলগাঁয়ে পাঠিয়ে দিও, কাল ভোরে ওকে নিয়ে আমি নবস্থা পৌঁছে দিয়ে আসব। আচ্ছা এখন তাহলে আসি রে চন্দ্রা।" এরপর সতীন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, "চন্দ্রাকে নিয়ে একদিন ফুলগাঁ যেও, অনেকদিন তো যাও নি।" একথার জবাবে সতীন্দ্র হাসতে-হাসতে বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো, ফুলগাঁ আর ক-পায়ের রাস্তা, যে-কোনদিন গেলেই হ'ল।" সতীন্দ্রের এ-কথায় মনমোহনবাবু বার-দুয়েক তার কাঁধে প্রীতিসূচক চাপড় মারেন এবং ধীরে ধীরে বাড়ীর বাইরে চ'লে যান।

মনমোহনবাবু চলে যাওয়ার পর সতীন্দ্রকে ভাত দিয়ে সুচন্দ্রা বলেন, "শোক-নাথের এত বাড়াবাড়ি, তুমি একদিন দেখতে গেলে তো পারতে। সবই তো শুনলে দাদার মুখে।" সুচন্দ্রার এ-কথার উত্তরে সতীন্দ্র বলেন, "তুমি ঠিক বলেছ, সেই ভাল, কাল রবিবার স্কুলের ছুটি, সোমবারটাও ছুটি নিয়ে নেব। আমি নিজেই কমলাকে দিয়ে আসব আর অমনি শোকনাথ ও চারুকে দেখেও আসব, বরং বিকেলে সুদীপকে একবার ফুলগাঁয়ে পাঠিয়ে খবরটা তোমার দাদাকে দিয়ে দিও।"

মনমোহনবাবু এ-বাড়ীতে আসার সময় থেকেই সুদীপ চুপ করে দাওয়ায় বসেছিল এবং তাঁর সঙ্গে তার বাবা-মায়ের সমস্ত কথোপকথন শুনছিল। কথাবার্ত্তা শোনার ফাঁকে সুদীপ মনমোহনের মুখের দিকে ও সমস্ত শরীরের দিকে বার বার চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। তার মনে হচ্ছিল মামার সমস্ত অবয়বের মধ্যে যেন একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাপ। মনমোহনবাবু তখনকার দিনের বি. এল-পাশ, তার উপর বর্দ্ধমান কোর্টের খ্যাতনামা উকিল। লোকে বলে—মোহন সোমের কথায় নাকি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। মোহনবাবুর দিকে চেয়ে-চেয়ে সুদীপের মনের প্রান্তে একটা কঠিন শপথ বাক্যের উদয় হচ্ছিল, সেটা হ'ল—হ্যাঁ লেখাপড়া শিখে মানুষ যদি হতে হয় তো মামার মত বলিষ্ঠ, নির্ভীক, রাশভারী, দৃঢ়চেতা মানুষই হ'ব। আসলে মামা মনমোহনের সুন্দর পৌরুষমণ্ডিত স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল বর্ণ, বলিষ্ঠ চরিত্র, শিক্ষা, সুনাম সব কিছু মিলিয়ে সুদীপের মনে একটা গভীর প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে দিল। কিশোর সুদীপের কাছে মনমোহন আজ এক নূতন আবিষ্কার। কই এর আগে তো সুদীপ তার মামাকে কোনদিন এমনভাবে দেখেনি। বস্তুতঃ, বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের দেখার ধারা এবং দর্শনজাত বিচারবোধের ধারাটাও পরিবর্ত্তিত হতে থাকে, তাই এর আগে যখন গত আশ্বিন মাসে পূজার সময় সে তার মামাকে দেখেছিল তখন পর্য্যন্ত ঐ মনমোহনবাবু তার কাছে শুধু মামাই ছিলেন, কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে মনমোহনবাবু সুদীপের কাছে শুধু মামাই নন, মামা ছাড়াও

তিনি যেন অনেক বেশী ; এই বেশীটা কি, নিজেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে সুদীপ দেখে আজ তার মামা তার কাছে এক বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের মত পুরুষ, তার কাছে তিনি এক আদর্শচরিত্র মানুষ। সুদীপ যখন এই সমস্ত ভাবছিল ঠিক তখনই সে দেখল সতীন্দ্রবাবু তার চোখের সামনে দিয়ে মালডাঙ্গা স্কুলের উদ্দেশে চলে গেলেন। বাবার গমনপথের দিকে চেয়ে এতক্ষণে সুদীপের চমক ভাঙ্গে ; সেও দাওয়া থেকে উঠে ধীর পায়ে রান্নাশালে মায়ের কাছে গিয়ে বসে।

সুচন্দ্রা সুদীপকে ঐভাবে চালায় এসে বসতে দেখে বলেন, "এখানে এই আগুন-তাতে এসে কেন বসলি বাবা, ধোঁয়া লেগে চোখ জলবে যে, কষ্ট হবে বাবা, একটু দূরে বস্।" সুদীপ বলল, "কেন, তুমিও তো রয়েছ আগুন-তাতে ধোঁয়ায় ; তোমার যদি কষ্ট না হয়, আমারও হবে না।" চন্দ্রা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহ হাসির সঙ্গে জবাব দেন, "দূর বোকা, আমি যে মেয়েমানুষ, আমাদের যে এই করতেই জন্ম, আমাদের কি এইটুকুতে কষ্ট হয় ? ভগবান যে আমাদের এই করতেই পাঠিয়েছেন বাবা।"

মায়ের কথা শুনে সুদীপ তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দেয় না, কয়েক মিনিট চুপচাপ ব'সে মায়ের রন্ধনকার্য্য খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে, রান্নাশাল বলতে আমতলা ঘরের বাইরের দাওয়ার পশ্চিম প্রান্তের হাত কয়েক জায়গা, যার পশ্চিম আর উত্তরটা ঘিরে ঘরের দেওয়াল, কিন্তু দক্ষিণে ও পূর্বে পাঁচিল নেই বলে' সব সময় কাক ও বিড়াল-কুকুরের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য দড়ি দিয়ে গোটা কয়েক ছেঁড়া চট টাঙ্গানো আছে যেগুলো প্রয়োজন-মত খুলে সরিয়ে দেওয়া যায় আবার গুটিয়েও রাখা যায়। রান্নার আসবাব বলতে দুটো মাটির হাঁড়ি, একটা তেউলো ও একটা চেটো আর উনুন থেকে একটু উপরে পশ্চিমদিকের দেওয়ালে গোটা তিনেক খাঁজ কেটে গর্ত্ত করে কুলুঙ্গি তৈয়ারী করে তার মধ্যে রাখা আছে বিভিন্ন রকম মশলা-পাতি রাখবার জন্য গোটা কয়েক নারকেলমালা ও টিনের কৌটা। মশলা বলতে একটা নারকেলমালায় খানিকটা নুন ও তার উপর গোটাকয়েক শুকনো লঙ্কা, একটা নারকেলমালায় কাঁই-কয়েক হলুদ, একটা টিনের কৌটায় একটু সরষের তেল, একটা টিনের কৌটায় গোটাকয়েক ধনে ও জিরে এবং আর একটা টিনের কৌটায় পোয়াটাক অড়হর ডাল। সুদীপ বসে-বসে সব দেখতে থাকে এবং নিজের অজান্তেই কেমন যেন আত্মগতভাবে মাকে বলে ওঠে, "মা তোমার খুব কষ্ট, না ?"

সুদীপের এ-কথায় সুচন্দ্রা ছেলের মনের ভাব বুঝতে পারেন, কিন্তু সুদীপকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই সহাস্যে বলেন, "কষ্ট কিসের ?" সুদীপ বলে, "আমাদের রান্না করবার একটা আলাদা ঘর পর্য্যন্ত নেই।" সুচন্দ্রা জানেন, তাঁর বড় ছেলেটি বড্ড

একরোখা, তাই এ-সম্বন্ধে আর কিছু না বলে চুপচাপ রান্না করতে থাকেন। সুদীপ এতক্ষণ মায়ের দিকে মুখ করে বসেছিল, এবার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে হাত-দুটোকে মাথার উপরে পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে খুঁটিটা ধরে পা-দুটোকে পশ্চিম দিক বরাবর ছড়িয়ে দিয়ে একটু আয়াসের ভঙ্গীতে বসতে গিয়ে হঠাৎ পশ্চিম দিকে আমতলায় তার নজরে পড়ে অনেকগুলো ঘুঁটে, কয়লা আর বস্তাখানেক কাটা নেড়া জড় করা রয়েছে। সেদিকে চেয়ে সুদীপ মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে সব জানতে পারে। জানতে পারে যে, আজকে রান্নার কোন জ্বালনই ছিল না; বড়মা ঐ ঘুঁটে-কয়লাগুলো দিয়েছেন আর কমলা ও প্রদীপ ঐ নেড়াগুলো কেটে এনেছে; আরও জানতে পারে যে, সুরেন্দ্র বাগদী কমলার ঝুড়ি কেড়ে নিয়েছে। ঝুড়ি কেড়ে নিয়েছে শুনে সুদীপ এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে সিধে সুরেন্দ্র বাগদীর বাড়ী যায় এবং "সুরো" "সুরো" বলে হাঁক দেয়। সুরেন্দ্র বাগদীর স্ত্রী মাথায় আধ-হাত কাপড় টেনে বাইরে এসে বলে, "ও, দত্তদের ঠাকুর পো? ঝুড়ি নিতে এয়েচ বুঝি? তা ঝুড়ি আমি দিয়ে দিচ্ছি এবারকার মত, কিন্তু তোমার বুনকে বলে দিও পুকুরপাড়ে আবার উঠলে তখন শুধু ঝুড়ি লয়, তাকে শুদ্ধু আটকে রাখব, ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব, বুঝলে?" সুরেন্দ্র বাগদীর স্ত্রীর কথায় সুদীপ কোন উত্তর করে না, মনে-মনে রাগে গজগজ করতে-করতে ঝুড়িটা নিয়ে বাড়ী চলে আসে। বাড়ীতে আমতলায় ঝুড়িটা রেখে গায়ের জামা-গেঞ্জী খুলে স্নানের জন্য পুকুরঘাটের দিকে পা বাড়ায়।

পরদিন সকালে সতীন্দ্রবাবু কমলাকে নিয়ে প্রথমে ফুলগাঁয়ে মনমোহন বাবুর কাছে যান এবং সেখান থেকে তিনজনে একসঙ্গে নবস্থার উদ্দেশে রওনা হন। বাঘাসন থেকে নবস্থা দূরত্বের হিসাবে বিশ মাইল, কিন্তু হাঁটা পথ ভিন্ন অন্য পথে অর্থাৎ নিগন রেলষ্টেশনে বি. কে. আরের রেলগাড়ীতে চড়ে' বর্দ্ধমানে এসে, বর্দ্ধমান-কালনা বাসে চড়ে নবস্থা পৌঁছতে ঘুরতে হয় প্রায় আরো আঠার মাইল।

মাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে প্রথমটা খুব কষ্ট হলেও বাড়ী থেকে বের হয়ে অবধি কমলার মনে খুশী আর ধরে না। বার বছরের কিশোরী হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। চারদিকে যা দেখে সবই যেন তার ভাল লাগে। জীবনে আজ এই প্রথম সে রেলে চাপবে। রেল ষ্টেশনে এসে অবধি চারদিকের সমস্ত কিছু দেখে কমলার কিশোরী মনের অনুসন্ধিৎসার স্বাভাবিক গতি যেন চার গুণ হয়ে গেল। প্রত্যেকটি জিনিষ সম্বন্ধে সে বাবাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে এবং সতীন্দ্রবাবুও যথেষ্ট ধৈর্য্য সহকারে সব কিছুই তাকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন। মনমোহনবাবু টিকিট নিয়ে এসে ঘড়ি দেখে বললেন, "ট্রেনের এখনও দেরী আছে। এখন বেলা সাড়ে আটটা, চল কিছু খাওয়া যাক,"—এই বলে মনমোহনবাবু সতীন্দ্র ও কমলাকে সঙ্গে নিয়ে

ষ্টেশনের পাশেই রাস্তার ধারে অবস্থিত কতকগুলো ঝুপড়ি ঘরে বিভিন্ন ধরনের দোকানের মধ্যে একটায় ঢুকলেন এবং জলযোগান্তে নিষ্ক্রান্ত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনের ঘণ্টা হলে সকলে ষ্টেশনের মধ্যে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালেন। প্ল্যাটফর্ম বলতে মাটির উপরে লাল কাঁকর বিছানো খানিকটা জায়গা আশপাশের জায়গা থেকে একটু পৃথক করা। তারই উপর কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই বি. কে. আর-এর চেন দেওয়া এঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছোট-ছোট কয়েকটা কামরা সমেত সামনে এসে দাঁড়ায় আর কমলা সেই গাড়ী দেখে সতীন্দ্রবাবুর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বলে, "দেখ দেখ বাবা, রেলগাড়ীটা ঠিক সেই বইয়ে দেখা রেলগাড়ীর ছবিটার মতই।" গ্রাম্য সারল্যভরা কিশোরী কন্যার সহাস্য মুখের দিকে চেয়ে সতীন্দ্র বলেন, "হ্যাঁ মা, এই রেলগাড়ী দেখেই তো বইতে ছবি ছেপেছে, তাই একই রকম দেখতে।" সতীন্দ্রবাবুর এ কথায় কমলার মুখ দিয়ে কেমন যেন আত্মগত ভাবেই বেরিয়ে আসে, "কি সুন্দর, না বাবা!" সতীন্দ্র এ কথার জবাব না দিয়ে মেয়েকে "নে ওঠ", ব'লে হাত ধ'রে গাড়ীতে তোলেন। মনমোহনবাবু তার আগেই গাড়ীতে উঠে তিন জনের ঠাঁই করে নিজে একটিতে বসে ওদের জায়গা দুটো আগলাচ্ছিলেন। সকলে উঠে বসলে মিনিট কয়েক পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঘণ্টা-দুয়েক পর বর্দ্ধমান ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামলে কমলা একেবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। ট্রেনে উঠবার সময় রেলষ্টেশনে যে-রকম প্ল্যাটফরম দেখে এসেছে এর সঙ্গে তার কোন মিল নেই, এখানে বড় বড় বাঁধানো উঁচু উঁচু প্ল্যাটফরম; ডান দিকে চেয়ে দেখে পাশের রেললাইনগুলো যেন আরও বড়-বড় আরও-ফাঁক ফাঁক আর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা ট্রেনগুলোও যেন অনেক বেশী বড়, অনেক বেশী লম্বা। কমলা যখন কামরার জানালা দিয়ে অবাক হয়ে সবকিছু দেখছিল তখন মামা মনমোহনবাবুর ডাকে তার চমক ভাঙ্গে এবং ব্যস্তসমস্ত হয়ে ট্রেন থেকে নেমে, বাবা ও মামার সংগে হাঁটতে থাকে। প্ল্যাটফরমটুকু হেঁটে এসে ওভারব্রীজ পার হয়ে সকলে বর্দ্ধমান শহরে পৌছায়। কমলার শহরে আসা এই প্রথম, তাই যা দেখে তাতেই তার বিস্ময়, তাতেই তার জিজ্ঞাসা। কমলার শত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন তার বাবা ও মামা। এমনি করে কালনা রুটের একটা বাসে উঠে আবার চলতে শুরু ক'রে সতীন্দ্র, কমলা ও মনমোহন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে এসে পৌছান নবস্থায়।

নবস্থায় পৌছে শোকনাথকে দেখে সতীন্দ্রের খুব খারাপ লাগে। সতীন্দ্র বেশ বুঝতে পারেন শোকনাথ আর খুব বেশী দিন নেই, তাঁর পরমায়ু গোনা দিনে পড়েছে। তার দুটি ছোট ছেলে ও একেবারে শিশু দুটি মেয়ে। এই অবস্থায়

যদি শোকনাথের কিছু একটা হয়ে যায় তো চারুর যে কি অবস্থা হবে তা ভেবে সতীন্দ্র কূলকিনারা পান না। অবশ্য শোকনাথের ভূ-সম্পত্তি আছে প্রচুর, কিন্তু তার অবর্ত্তমানে সেই সম্পত্তি থেকে আয় করে সংসার চালানো—ভাবতেই সতীন্দ্রের মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। সব শুনে সতীন্দ্র শোকনাথের রোগটা যে কি তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। শোকনাথ ও চারু যা বলল তাতে লক্ষণ তো শুধু জ্বর হয় মাঝে-মাঝে আর খুব কাশি হয়; এক-এক সময় কাশতে-কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে, মুখ-চোখ লাল হয়ে যায়। শুধু মাত্র এই। আর এইটুকুতেই শোকনাথের মত অমন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী সুপুরুষ একজন যুবকের যে এমন অবস্থা হতে পারে সতীন্দ্র তা ভাবতেই পারেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে দেখা লৌহকঠিন শরীরের অধিকারী সেই শোকনাথ আর নেই, তার বদলে সতীন্দ্রের চোখের সামনে বিছানায় শুয়ে আছে কঙ্কালসার রোগক্লিষ্ট নাচার এক যুবক। সতীন্দ্র যখন শোকনাথের মুখের দিকে চেয়ে গভীর চিন্তামগ্ন, ঠিক সেই সময় শোকনাথ কোনরকমে দুটি দুর্ব্বল হাত তুলে এক হাতে মনমোহনবাবুর একটা হাত আর এক হাতে সতীন্দ্রের একখানা হাত ধরে কাতর অনুনয়ের সুরে তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে বলে, "আমি তো আর বেশীদিন নেই, চারু আর ছেলে মেয়েগুলোকে দেখো। তোমরা দুজনেই আমার দাদার তুল্য, আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছো, বল দাদা, চারুকে তোমরা দেখবে?" বলে জিজ্ঞাসুনেত্রে একবার সতীন্দ্রের মুখের দিকে আর একবার মনমোহনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শোকনাথের এ-কথায় মনমোহনবাবুর মত স্বভাবগম্ভীর মানুষেরও চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করে উঠে, কি রকম যেন ভাঙা-ভাঙা স্বরে কোন রকমে তিনি বলেন, "তুমি সেরে উঠবে, তোমাকে ওসব ভাবতে হবে না। শোকনাথ, তুমি বিশ্রাম কর ভাই, ও-সব চিন্তা কোরো না।" কোনরকমে কথা কটা বলেই তিনি ঘরের বাইরে চলে যান সম্ভবতঃ উদ্‌গত অশ্রুকে সামলাবার জন্যই, কারণ বাইরেটা যত কঠিনই হোক, মানুষ তো মানুষই, তাই সব রকম সেবাশুশ্রূষা সত্বেও চোখের সামনে জলজ্যান্ত বলিষ্ঠ একজন ছত্রিশ বছরের জোয়ান পুরুষকে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে শেষ হয়ে যেতে দেখলে কঠিন মানুষেরও কঠিন থাকা মুস্কিল হয়ে ওঠে। তাছাড়া গত ছ' ছটা মাস প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে কোর্টের সব কাজ ফেলে দু-একদিন করে বর্দ্ধমান থেকে এসে মনমোহনবাবু শোকনাথকে দেখে যাচ্ছেন। বর্দ্ধমান থেকে বড় ডাক্তার এনেও কয়েকবার দেখানো হয়েছে, কিন্তু রোগীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নি, দিনে-দিনে মানুষটা যেন ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ল সকলের চোখের সামনে।

মনমোহন-বাবু বাইরে যাওয়ার পর সতীন্দ্র শোকনাথের শিয়রে বসে তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে থাকেন, শোকনাথও স্নেহের স্পর্শে কেমন যেন হয়ে যান, তাঁর যেন মনে হয়, অনেক কথাই বলার আছে। তাই সতীন্দ্রের ডান হাতখানা দু'হাতে ধরে টেনে বুকের উপর নিয়ে এসে আবেগের বশে বলতে থাকেন, "সব তো শেষ হয়ে গেল দাদা, ঘরে যা পুঁজিপাটা ছিল চারু-তো আমার জন্য সবই শেষ ক'রে ফেলল, বুঝতে পারছি না এর পর চারু সংসার কি করে চালাবে। সম্পত্তি বিক্রী ছাড়া তার আর কোন উপায়ই থাকবে না দাদা।" শোকনাথের এ-কথার উত্তরে সতীন্দ্র সান্ত্বনার সুরে বলেন, "কেন ভাবছ ভাই, মাথার উপরে একজন রয়েছেন, তিনি চারুকে চালিয়ে নেবেন। তা ছাড়া চারুর মত মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। সব দিক দিয়েই চারু তোমার সুযোগ্য গৃহিণী, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি ভাল হয়ে উঠবে।" "তুমি ভাল হয়ে উঠবে" মুখে বললেও এ যে কত বড় মিথ্যা সান্ত্বনা—সতীন্দ্র নিজে তা ভালই বুঝতে পারেন, কিন্তু তাঁর করবারও কিছু নেই, কারণ শোকনাথের মত এরকম রোগজর্জ্জর অবস্থায় সতীন্দ্রের মত সুস্থ মানুষদের মিথ্যা সান্ত্বনা ব্যতীত দেওয়ার আর কিছুই থাকে না। সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও দিতে হয়ই, কারণ এই-ই নিয়ম ; নিয়তির নিষ্ঠুর বিধি এড়িয়ে যাওয়া যায় না বলেই হয়তো মানুষ মিথ্যার জাল রচনা করে অদূরবর্ত্তী সত্যটাকে চোখের সামনে ঝাপসা করে রাখতে চায়। মনে-মনে জানে ভাল আর কোন দিনই হবে না, তাই মনের জোরের অভাবটা মুখের জোরে পূরণ করে পারিপার্শ্বিক সমাগত নি.র সত্যটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। হায় রে মানুষ!

চোখের সামনে শোকনাথের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে এবং অদূরবর্ত্তী অনিবার্য্য একটা পরিণতির কথা ভেবে সতীন্দ্রের চোখ জলে ভরে ওঠে, কাপড়ের কোঁচার প্রান্তে তিনি চোখ মুছে স্বাভাবিক হ'তে চেষ্টা করেন। এর পরও সাংসারিক বিষয়ে ও সম্পত্তিগত ব্যাপারে অনেক কথা সতীন্দ্র শোকনাথের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এক সময় ক্লান্ত হয়ে নিজেই নীরব হয়ে যান।

কমলাকে নবস্থায় রেখে পরদিন রবিবার সকালে মনমোহনবাবু ও সতীন্দ্র নবস্থা থেকে রওনা হয়ে মনমোহনবাবু বর্দ্ধমানে এবং সতীন্দ্র বাঘাসনে ফিরে আসেন। সতীন্দ্র বাঘাসনে ফিরে এসে দেখেন সুদীপ তাঁর ফিরবার আগেই নাসিগ্রামে বোর্ডিং-এ চলে গেছে। সুচন্দ্রাকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারেন পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে সুদীপ আর থাকতে চায় নি, তাই তিনি বাড়ী ফিরবার আগেই সে চলে গেছে। সতীন্দ্র-বাবু এ-কথা শুনে মনে-মনে বেশ খুশীই হন, কারণ সুদীপই তাঁর একমাত্র ভরসা। সুদীপ যদি পরীক্ষার ফল একটু ভাল ক'রে একটা চাকরি-বাকরি

পায় তবেই এই গড়িয়ে চলা সংসারটাকে সামান্য একটু গতি দেওয়া যায়, না হলে যে আর চলে না।

এইভাবে যথানিয়মে সতীন্দ্রের সংসার চলছিল; হঠাৎ ডাকে তাঁর নামে মনমোহনবাবুর লেখা একটা চিঠি এল। চিঠির সারমর্ম হ'ল, মনমোহনবাবু তাঁর এক পুরাতন মক্কেলকে ধরে সতীন্দ্রের জন্য কলকাতার বড়বাজারের ঘি পটিতে ঐ মক্কেলের ঘরে চাকরী ঠিক করেছেন, কাজ হ'ল হিসাব রাখা ও পাওনা টাকার তাগাদা করা। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই কাজে যোগ দিতে হবে, বেতন আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা।

মনমোহন-বাবুর পত্র পেয়ে সতীন্দ্র ও সুচন্দ্রা তো আনন্দে আত্মহারা, সুচন্দ্রা ভগবানের উদ্দেশে বারকয়েক কপালে হাত ঠেকালেন। আনন্দের প্রথম কারণটা হলো, যে-কথা তাঁরা বলি-বলি করেও রাশভারী মানুষ মনমোহন-বাবুকে বলতে পারেন নি সে-কথা অর্থাৎ তাঁদের অভাবের কথা ভেবে নিজে থেকেই তিনি এ-কাজটা করে দিয়েছেন, এর দ্বিতীয় কারণ হলো সতীন্দ্রের বেতনের পরিমাণটা এখানকার স্কুলের বেতনের দ্বিগুণ। মাসে পঞ্চাশ টাকা পেলে সংসারের অনেক দুঃখ ঘুচবে এই ভেবে দু-জনে নিরতিশয় আনন্দিত হলেন। সতীন্দ্র হিসাব ক'রে দেখলেন দিন পাচেক পরেই পয়লা অগ্রহায়ণ। মনে-মনে তিনি স্থির ক'রে নিলেন এ সুযোগ কিছুতেই হাত-ছাড়া করা চলবে না; সুতরাং পরদিন স্কুলে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে সবকিছু ব'লে পদত্যাগের ব্যবস্থা ক'রে নিলেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক অনাদি মণ্ডল মশায় জানতেন সতীন্দ্রের মত বিচক্ষণ ও সৎ শিক্ষক সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই তিনি সতীন্দ্রকে স্কুলে থাকতে বহু অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু সতীন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। কারণ তার চোখের সামনে তখন একটা দুঃস্থ অর্দ্ধভুক্ত পরিবারে সামান্য সাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন আর এই দুঃস্থ ও দুঃখক্লিষ্ট পরিবারটি যে তাঁরই পরিবার, তাই অনাদি-বাবুর কোন অনুরোধই সতীন্দ্রকে টলাতে পারল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সতীন্দ্র কলকাতায় মনমোহন-বাবুরই ঠিক-করে-রাখা এক নম্বর পাথুরিয়াঘাটার দোতলার একটি মেসে এসে উঠলেন, সম্পদ বলতে দুখানি কাপড় ও দুখানি মোটা লংক্লথের পাঞ্জাবী সঙ্গে নিয়ে। মেসের পরিচালকের নাম হীরেন মুখার্জ্জী, বয়সে সতীন্দ্রের চেয়ে অনেক ছোট, প্রায় সুদীপের মত, কিন্তু তার প্রতি সকলের ব্যবহার দেখে কয়েক দিনের মধ্যেই সতীন্দ্র বুঝলেন মেসের সকলেই তাকে যথেষ্ট ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। সতীন্দ্র মনে-মনে ভাবলেন, ছেলেটির নিশ্চয়ই বিশেষ কোন গুণ আছে। ক্রমে পরিচয় হতে জানতে

পারলেন—বাঁকুড়া জেলার ছাতার কানালীতে ছেলেটির বাড়ী, পিতৃহীন, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। এক বছর আগে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে এখানে এসে গোবিন্দ লাহা নামে কোন ধনী ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে। এক বেলা লাহাদেরই ওখানে খায় ও এক বেলা মেসে। আর এই মেসের খরচটা সে রোজগার করে দু-চারটে টিউশানী করে। সতীন্দ্র হীরেনের বড় হওয়ার এই দুঃখকর প্রয়াসকে মনে-মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারেন না। হীরেনের সমস্ত কাহিনী শুনে তার এই কষ্টসাধ্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকে সফল করার মানসে সতীন্দ্র মেসের তদ্বির-তদারকীর যাবতীয় কাজ নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং কোন রকমেই যাতে হীরেনের পড়াশুনার সময় নষ্ট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন। ক্রমে সতীন্দ্র সততা ও কর্মক্ষমতার গুণে নিজের কর্মস্থলে ও মেসে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

ওদিকে কমলার সেবা-যত্নে শোকনাথ ও চারু মুগ্ধ। তাই শোকনাথ ঐ রোগ-শয্যায় পড়ে থেকেও সতীন্দ্রের এই কন্যাটিকে নিজ ব্যয়ে পাত্রস্থ করবার মানসে লোক মারফত নানা জায়গায় পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। ক্রমে শোকনাথ ও চারুর সহযোগিতায় বর্দ্ধমান জেলারই যবগ্রামে যশ-পরিবারে নামমাত্র খরচে কমলার বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। কমলার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে নিবারণ যশ মশায় তাঁর প্রথম সন্তান সমরেশের জন্য কমলাকে বধূ হিসাবে নির্ব্বাচিত ক'রে ঘরে নিয়ে গেলেন। কমলার পিতার অবস্থা জেনে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি না করে তিনি নিজেই কমলাকে প্রায় বিশ ভরি সোনার গহনা দিয়ে সাজিয়ে বধূ ক'রে ঘরে তুললেন। কমলার এই সৌভাগ্যে বিশ্বের মালামিয় সর্ব্বনিয়ন্তা আড়ালে বসে বোধ হয় হেসেছিলেন। তাই কম্মস্থলে বসেই সতীন্দ্র একদিন পত্র মারফত জানতে পারলেন যে, তাঁর জামাতা সমরেশ আর ইহলোকে নেই। কন্যার বিবাহের পর মাস কয়েক না যেতেই এই নিষ্ঠুর বিধিলিপি কমলার ভাগ্যে নেমে আসায় সতীন্দ্রের পরিবার ও পরিচিত পরিজন সকলেই শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি এই বিশ্বসংসার থেকে একটি প্রাণ কেড়ে নিয়ে গেলেও বাকী জীবন্ত মানুষ-গুলি যেমন কয়েকদিনের মধ্যে যথারীতি আবার কলের পুতুলের মতই চলতে শুরু করে, তেমনি সতীন্দ্রের পরিবারেও সবাই যথানিয়মে চলতে আরম্ভ করলেন। ব্যতিক্রম শুধু সুচন্দ্রা দেবী। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাটির বৈধব্য তিনি মেনে নিতে পারেননি, তাই ঘন-ঘন মূর্চ্ছা ও নানা উপসর্গ তাঁর শরীরে দেখা দিল।

ইতিমধ্যে সুদীপ পরীক্ষা দিয়ে তার মুমূর্ষু মেসো শোকনাথের চেষ্টায় নবস্থা ইউনিয়ন অফিসে তিন মাসের জন্য একটি অস্থায়ী চাকরী পেল। চাকরীটা হ'ল

সাইকেলে করে নবস্থা ইউনিয়নের অধীন সমস্ত গ্রামে ঘুরে-ঘুরে সাধারণ লোককে বসন্তের টীকা দেওয়া। বেতন মাসিক দশ টাকা। মেসো-মশায়ের ইচ্ছানুযায়ী তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মেসোমশায়ের বাড়ীতেই হ'ল বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ লোককে টীকা দেওয়ার আগে এর উপকারিতা সম্বন্ধে বোঝাতে-বোঝাতে এত বেশী সময় নষ্ট হ'ত যে, তার ফলেও কাজের চাপে সুদীপের বেশীর ভাগ দিনই দুপুরে মেসোমশায়ের বাড়ীতে খাওয়া হত না। এজন্য মাসীমা চারুবালা প্রত্যেক দিন সকালে খানকয়েক রুটি ও একটু আখের গুড় একটা টিনের কৌটায় ভরে সুদীপের সঙ্গে দিয়ে দিতেন।

স্নান-খাওয়া বলতে যা বোঝায় তা সুদীপের হতো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে। এই সময়টা মাসীমা তার পাশে ব'সে অত্যন্ত যত্নের সাথে, স্নেহের সাথে সুদীপকে নিজের হাতে ভাত বেড়ে খাওয়াতেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে সুদীপ যেটুকু সময় পেত এবং রাত্রিতে যতটুকু সুযোগ পেত তা সবই সে মেসোমশায়ের সেবায় নিয়োগ করত এবং তাঁর গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। আসলে মেসোমশায় না ঘুমান পর্য্যন্ত সুদীপ কোনদিনই ঘুমাতো না। তা ছাড়া সুদীপের ব্যবহারে এমনই একটি ছন্দস্নিগ্ধ সশ্রদ্ধ ভাব ছিল যা ঐ মাস তিনেকের মধ্যেই তাকে তার মাসী-মেসোর অনেক নিকটে পৌছে দিল। মাসী এখন সুদীপ বলতে অজ্ঞান এবং সুদীপও মাসীমাকে মায়ের মতই শ্রদ্ধা করে ও সম্মান দেয়। এ ছাড়া সুদীপের স্বভাবও খুব হাসি-খুশী এবং মিশুকে। তাই মাসীর ছেলে ভোলানাথ ও শিবনাথ এবং মেয়ে সরস্বতী ও পার্ব্বতী "সুদীপদা সুদীপদা" বলতে অজ্ঞান। সুদীপও অবসর সময়ে তাদের কোলে-পিঠে করে, তাদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে। ধীরে-ধীরে দেখা গেল সুদীপ তার মাসীর পরিবারের এক অপরিহার্য্য সভ্য। সুদীপকে কাছে পেয়ে চারু যেন একটা কূল পেলেন, কারণ তিনি একা স্ত্রীলোক, ঐ মুমূর্ষু স্বামী শোকনাথ একদিকে আর তাঁর সংসার একদিকে। তাঁর নিজস্ব সাংসারিক বুদ্ধি যথেষ্ট থাকলেও সুদীপ আসার পর প্রত্যেক কাজেই তিনি সুদীপের সঙ্গে যুক্তি করতেন, কারণ চারু লক্ষ্য করতেন সুদীপের বয়স অল্প হলেও তার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একজন পরিণত বয়সের যোগ্য লোকের বুদ্ধিমত্তা আছে। তাই তিনি তাঁর দিদির এই সন্তানটিকে আপন সন্তানেরও অধিক স্নেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

দিন এইভাবেই এগিয়ে চলছিল, সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও চারু যেন বেশ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে; কিন্তু তখন কি চারু জানতেন সুদীপ পূর্ণিমার চাঁদের মত তাঁর অন্তরের আকাশকে উজ্জ্বল করে রাখলেও কৃষ্ণপক্ষও সন্নিকট।

সেদিন বিকেল থেকে আষাঢ়ের মেঘে সমস্ত আকাশটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল, কোথাও সামান্যতম নীলের চিহ্নও ছিল না। গাছের পাতাগুলোও যেন নড়তে ভুলে গেছে, কোন পাখী ডাকে না, বিশ্বজগত যেন অদ্ভুত আশ্চর্য্যজনক এক নীরব গম্ভীর্য্যে নিমগ্ন। কয়েকদিন থেকেই শোকনাথের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে কাশির সঙ্গে ঝলকে-ঝলকে রক্ত উঠছে, শ্বাস নিতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে, কথাবার্ত্তা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছে। এখন বর্ষার সময়, টিকা দেওয়ার চাকরিও সুদীপের নেই, তাই সে ও মাসীমা শোকনাথের পদতলে গত তিন দিন তিন রাত্রি প্রায় অভুক্ত অবস্থায় বসে আছে; সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর শেষ মুহূর্ত্তগুলো ভরিয়ে দেবার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে, হায় রে মানুষ! মেসোমশায়ের পদতলে ব'সে সুদীপ তাঁর পায়ে হাত বুলোচ্ছিল, এমন সময় শোকনাথ অত্যন্ত ক্ষীণ দুটি বাহু তুলে সুদীপ ও চারুকে তাঁর মাথার কাছে আসতে নির্দ্দেশ দিলেন। দুজনেই তাঁর কথামতো দু-পাশে বসলে কম্পিত হাতে সুদীপের মাথাটা ধ'রে টেনে বুকের কাছে নামিয়ে এনে তার কানে-কানে ফিসফিস করে বললেন, "কথা দে সুদীপ, তোর মাসীকে আর ভাই-বোনদের দেখাশুনা করবি। তোর উপর আমার অনেক ভরসা। তোর মাসীর খোঁজখবর রাখিস এই আমার শেষ অনুরোধ সুদীপ।" মেসোমশায়ের এই কথায় তাঁর শেষ সময় উপস্থিত বুঝতে পেরে, সুদীপ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে ধীরে-ধীরে ছোট্ট জবাব দিল, "কথা দিলাম মেসোমশায়।" কথা বলতে-বলতেই সুদীপের দু-চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এল। এরপর শোকনাথ স্ত্রী চারুর দুটো হাত নিয়ে তাঁর বুকের উপর চেপে ধ'রে ধীরে-ধীরে বললেন, "চারু, তোমার আর কোন চিন্তা নেই, সুদীপ আমায় কথা দিয়েছে। তুমি আর কিছু ভেবো না।" বলতে-বলতেই শোকনাথের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হ'ল আর চারু ও সুদীপ নিরুপায়ের মত বিছানায় বসে তাঁর সেই কষ্ট দেখে অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগল। একটি মহৎ প্রাণকে পৃথিবীর এই সুন্দর পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মৃত্যুদূত অত্যন্ত অসময়ে হানা দিচ্ছে এবং তা দেখে ঐ মহৎ প্রাণের প্রতি প্রেমে ও শ্রদ্ধায় উৎসর্গীকৃত দুটি প্রাণের অঝোর-অশ্রু লক্ষ্য ক'রে প্রকৃতিও বোধ হয় স্থির থাকতে পারছিলেন না, তাই ঠিক ঐ সন্ধ্যাকালে আকাশ ভেঙ্গে প্রকৃতিরও অশ্রু বর্ষিত হতে লাগল। প্রচণ্ড ঝড়ে গাছপালা যেন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়বে মনে হ'ল। শোকনাথের শ্বাসকষ্টের বেদনাজনক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে এতক্ষণের স্তব্ধ বিশ্বপ্রকৃতিও যেন হতাশ্বাসে শ্বসতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ অসহ্য কষ্টের পর এক সময় মনে হ'ল শোকনাথের চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সুদীপ শোকনাথের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা

স্বরে একবার প্রশ্ন করল, "মেসোমশায়, মেসোমশায়, খুব কষ্ট হচ্ছে?" উত্তরে শোকনাথ আর জবাব দিলেন না, হিক্কার শব্দের মত শুধু মাত্র ছুটো আওয়াজ শোকনাথের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল আর তারপরেই শোকনাথের মাথাটা বালিশের একপাশে গড়িয়ে পড়ল। সুদীপ তাড়াতাড়ি শোকনাথের একটা হাতের কব্জি নিজের হাতে নিয়ে নাড়ী অনুভব করে বুঝতে পারল সব শেষ। মাসীর দিকে ঘুরে সুদীপ দেখতে পেল মাসী নীরবে কখন অচেতন হয়ে পড়েছেন। "মাসী-মাসী" ক'রে চারুকে ডেকেও কোন উত্তর না পেয়ে আপাত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন সুদীপ ধীরে-ধীরে ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

শোকনাথের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর দিন-কয়েকের মধ্যেই সুদীপের ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হ'ল। কলকাতায় সুদীপের রোল নম্বরের সঙ্গে সংবাদপত্রের ফল মিলিয়ে দেখে সতীন্দ্রবাবু আনন্দে অধীর হয়ে সোজা একেবারে নবস্থা গিয়ে হাজির হলেন। সুদীপকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তিনি যখন বললেন, "তুমি প্রথম বিভাগে পাশ করেছ" তখনও পর্য্যন্ত সুদীপ জানেই না যে, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বাবার মুখে সে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে শুনে নতজানু হয়ে বাবাকে প্রণাম করেই চারুর উদ্দেশে "মাসী-মাসী" বলে বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল। মাসী তখন রন্ধন-কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াতেই সুদীপ মাসীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে তার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলের কথা বললে মাসী চারুও আনন্দে অধীর হয়ে সুদীপের কপালে চুম্বন করলেন। যে-চারু গত কয়েকদিন স্বামীর শোকে অভিভূত ছিলেন এবং হাসতে ভুলে গিয়েছিলেন সেই তিনিই আবার প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠলেন। এতক্ষণ তাঁর জামাইবাবু সতীন্দ্রের দিকে নজরই পড়ে নি। উঠোনের মাঝখানে সতীন্দ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চারু তাড়াতাড়ি একটা আসন নিয়ে দাওয়ায় পেতে দিয়ে প্রণাম করে কুশল প্রশ্ন করলেন। এরপর সতীন্দ্র তখনই সুদীপকে নিয়ে একবার বাঘাসনে ওর মার কাছে খবরটা জানাতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে চারু তীব্র আপত্তি জানালেন। তাঁর অনুরোধে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনান্তে পিতা-পুত্রে বাঘাসনের উদ্দেশে রওনা হল। বর্দ্ধমানে এসে ছেলেদের জন্য সতীন্দ্র কিছু সীতাভোগ-মিহিদানা ক্রয় করেন এবং সুদীপ বাবার অনুমতি নিয়ে তার টিকাদারী চাকরীর সামান্য বেতন থেকে মায়ের জন্য দু-টাকা দামের একখানা লালপাড় শাড়ী কেনে। অনেক দিন থেকেই তার মনের ইচ্ছা, স্বোপার্জ্জিত পয়সা থেকে সর্ব্বপ্রথম মায়ের জন্য সে কিছু কিনবে। সতীন্দ্রের সংসারে দুটো টাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও আজকের এই খুশীর দিনে সতীন্দ্র পুত্র সুদীপকে মায়ের জন্য কাপড়

কিনতে অনায়াসেই অনুমতি দিলেন এবং মনে-মনে বেশ কিছুটা খুশীও হলেন, কারণ তিনি জানেন মাকে সুদীপ অত্যন্ত ভক্তি করে।

অসুস্থ মাকেই যে সর্ব্বপ্রথম তার মনে পড়েছে এজন্যেই তিনি মনে-মনে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করলেন। এর পর ছোট লাইনের ট্রেনে উঠে পিতা-পুত্র যখন বাড়ী এসে পৌছুলেন তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অসুস্থ শরীরে চন্দ্রা তখন সবে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলেছেন। এক হাতে প্রদীপের শিখাকে বাতাস থেকে আড়াল করে আর এক হাতে প্রদীপ নিয়ে আমতলার ঘর হতে মাকে বের হতে দেখে সুদীপ ছুটে গিয়ে হাতে ধরা কাগজের মোড়ক খুলে শাড়ীটা মায়ের চোখের সামনে মেলে ধরে বলে "আগে এটা পরে এস, তারপর প্রদীপ নিয়ে তুলসীতলায় যাবে।" হঠাৎ সুদীপকে দেখে চন্দ্রা তো হতভম্ব, তার উপর আবার নতুন একটা টকটকে লালপাড়ের শাড়ী। প্রথমটা হতভম্ব হলেও সে-ভাবটা কাটিয়ে চন্দ্রা ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেন, "ব্যাপারটা কি বল্‌ত, একে তো কোন খবর না দিয়ে, চিঠিপত্র না লিখে ভর সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ঢুক্‌লি, তার উপর আবার একেবারে নতুন শাড়ী!" সুদীপ বলে, "শুধু আমি আর শাড়ী নয়, সঙ্গে বাবাও আছেন, তিনি একটু পিছিয়ে পড়েছেন, নাও তুমি শাড়ীটা পরে এস, আমি প্রদীপটা একটু ধরছি।" সুদীপের নাছোড়বান্দা ভাব দেখে চন্দ্রা বাধ্য হয়ে শাড়ীটা পরে ঘর হ'তে বের হয়ে এলে প্রদীপটা মায়ের হাতে দিয়ে সুদীপ ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে একটা প্রণাম করে। চন্দ্রার হাতের প্রদীপ হাতেই ধরা থাকে, তিনি সুদীপের মুখের দিকে স-প্রশ্ন নয়নে চেয়ে থাকেন আর সুদীপ শুধু মার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে থাকে। এমন সময় সতীন্দ্র "কই, কই গো" বলে বাড়ী ঢোকেন। চন্দ্রা দেখে সতীন্দ্রের হাতে একটা কিসের ছোট চুপড়ি। একনজর দেখে চন্দ্রা বুঝতে পারেন এ চুপড়ি সেই রকম চুপড়ি, ফুলগাঁয়ে থাকার সময় যা তার দাদা বর্দ্ধমান হতে প্রায়ই আনতেন। কিন্তু এ-বাড়ীতে আজ এতদিন পরে সীতাভোগ-মিহিদানা! চন্দ্রা খুব অবাক হয়ে যান। মনে-মনে তিনি ভাবেন এদের বাপ-ব্যাটার দেখাই বা হলো কি করে, শাড়ীই বা কোত্থেকে এল আর হঠাৎ এত খরচ করে মিষ্টিই বা আনার কি প্রয়োজন পড়ল! চন্দ্রা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। সতীন্দ্র তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, নাও আগে সন্ধ্যেটা দিয়ে এস তুলসীতলায়, তারপর সব বলছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দেখে আর কোন কথা না বলে চন্দ্রা ধীরে-ধীরে তুলসীতলার দিকে অগ্রসর হন। সতীন্দ্র ও সুদীপ নীরবে অপলকে তাঁর সেই গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে। ডান হাতের তালুতে প্রদীপটা রেখে বাম হাতের তালু দিয়ে বাতাস থেকে প্রদীপের শিখাকে বাঁচিয়ে চন্দ্রা তুলসীমঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন আর তাঁর বাম হাতের তালুতে প্রদীপের শিখার দ্যুতি প্রতিফলিত হয়ে টকটকে

লালপাড় আনকোরা নতুন শাড়ীটায় ও চন্দ্রার সর্ব্বদেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রা এমনিতেই অত্যন্ত সুরূপা, তাই তাঁর গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে ও সর্ব্বদেহে প্রদীপের আলো প্রতিফলিত হয়ে এমনই শোভার সৃষ্টি করেছিল যে, দাওয়ায় বসে-থাকা পিতা-পুত্রের সেই মুহূর্ত্তে মনে হল এ যেন মানবী নন, কোন দেবী। প্রদীপ দেখানো হয়ে গেলে সুদীপ আর একটা প্রণাম করল মাকে, তারপর তুলসীতলায় এবং পরে বাবাকে। সতীন্দ্রবাবু দাওয়ায় একই ভাবে বসে চন্দ্রাকে লক্ষ্য করছিলেন। সত্যিই, আজকের এই সন্ধ্যায় সুদীপের দেওয়া শাড়ীটায় অপূর্ব্ব মনে হচ্ছে চন্দ্রাকে। আজ যেন হঠাৎ নতুন করে সতীন্দ্রের বোধ হ'ল চন্দ্রা সত্যিই রূপসী। তাঁর অভাবের সংসারে দুঃখের চাপে দৈন্যের নিষ্পেষণে চন্দ্রা যেন সবই হারিয়ে ফেলেছে। চন্দ্রা যে বংশের মেয়ে তাতে এত দুঃখের মধ্যে যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও তার বংশগৌরব, অভিজাত্যবোধ সংযত ব্যবহার কোনদিন এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি। মনে-মনে সেই মুহূর্ত্তে চন্দ্রার প্রতি শ্রদ্ধায় প্রীতিতে সতীন্দ্রের মন পূর্ণ হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সংসারকে যে তিনি কিছুই দিতে পারেন নি বা এখনও পারছেন না এই অক্ষমতার কথা ভেবে সতীন্দ্রর অন্তর লজ্জায় কিছুটা যেন আনতও হয়ে গেল। ঠিক এই সময় চন্দ্রা এসে সতীন্দ্রের পাশে দাওয়ায় বসলে সতীন্দ্রের আচ্ছন্নের মত ভাবটা কেটে গেল এবং তিনি ধীরে-ধীরে চন্দ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "সুদীপ প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।" এই কথা শুনেই "ওরে দুষ্টু ছেলে" বলে উঠোনে দণ্ডায়মান সুদীপের কাছে উঠে গিয়ে চন্দ্রা তাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে তার শিরশ্চুম্বন করলেন। এই মুহূর্ত্তে তাঁর মনে হ'ল তাঁর যেন আর কোন দুঃখ, কোন কষ্ট, কোন যন্ত্রণা নেই। আজ এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় একটি কথায় এক মুহূর্ত্তে সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা যেন কোথায় চলে গিয়েছে।

চন্দ্রা তাঁর এতদিনের নিরুদ্ধ বাসনা আজ সার্থক হয়েছে ভেবে তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় গিয়ে আবার প্রণাম করে এলেন। আর তারপর হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে অন্যান্য ছেলেমেয়েকে জড় করে সতীন্দ্রের আনা সীতাভোগ-মিহিদানা বিতরণ করতে লেগে গেলেন। কথাটা এ-কান সে-কান হ'তে হ'তে গ্রামের সকলেই জানতে পারলেন এবং ঐ সন্ধ্যাবেলাতেই অনেকে সতীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সুদীপ তাদের বংশের প্রথম বিভাগের প্রথম ম্যাট্রিকুলেট, তাই সবাই খুব খুশী। তা ছাড়া সুদীপ যে কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে তা কারও অজানা নয়। সুতরাং সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছার কথায় সতীন্দ্রের মনটা আনন্দে ভরে গেল। সতীন্দ্রের ছোট্ট বাড়ীর তদধিক ছোট্ট উঠোনে যখন সুদীপের পরীক্ষার ফল নিয়ে আনন্দোৎসব চলছে তখন হঠাৎ কে একজন "সুদীপ" "সুদীপ" ব'লে বাইরে থেকে ডাকল। ডাক শুনে সুদীপ বাড়ীর বাইরে এসে দেখে

গ্রামের জমিদার রমেন ভট্টাচার্য মশায়ের বড় ছেলে অনিমেষ। অনিমেষ সুদীপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর্থিক অবস্থার তারতম্য থাকলেও দু-জনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কবে যে কেমন ভাবে গড়ে উঠেছিল তা ওরা দুজনের কেউই কোনদিন টের পায় নি। জমিদারের ছেলে ব'লে ইচ্ছা থাকলেও সব সময় অনিমেষ চার দেওয়ালের গণ্ডীর বাইরে এসে সাধারণ ভাবে মেলামেশা করতে পারতো না। তা ছাড়া বছরের মধ্যে কটা দিনই বা তারা গ্রামে থাকতো। অধিকাংশ সময়ই তারা সপরিবারে কলকাতায় থাকতো। অনিমেষকে দেখে সুদীপ প্রথমটা থতমত খেয়ে যায়, তারপর বলে, "কিছু বলছিলে অনিমেষ?" অনিমেষ খপ করে সুদীপের ডানহাতখানা ধরে টানতে-টানতে তাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যেতে চায় দেখে সুদীপ বলে "ব্যাপারটা কি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমায়?" অনিমেষ বাধা দিয়ে বলে, "চলই না, গিয়ে দেখবে।" বলতে-বলতে অনিমেষ সুদীপকে নিয়ে যে জায়গায় হাজির হয় সেটা সাধারণ লোকের পক্ষে খুব একটা সুবিধের নয়, কারণ সে স্থান হ'ল ভট্টাচার্য্যদের বৈঠকখানা বাড়ীর সদর দরজা। চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য্য করা মেহগনী কাঠের বিরাট দরজাটা সুদীপের চোখে পড়তেই তার বুকের ভিতরটা কি রকম ছ্যাঁৎ করে ওঠে। হঠাৎ তার মনে হয় নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছে সে, যেজন্য জমিদারের ছেলে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার বিচারের জন্য। সুদীপের মনটা এতক্ষণ খুশীতে ভরপূর ছিল, কিন্তু সদর-দরজার গায়ের কারুকার্য্যের দিকে লক্ষ্য পড়তেই মনে হল ঐ নকসার জীবজন্তুগুলো যেন বড্ড বড় হয়ে গেছে হঠাৎ, আর সব কটা একসঙ্গে তার দিকে তেড়ে আসছে। সুদীপের মাথাটা কি রকম ঘুরে যায়। সে একবার পিছন পানে টান দেয় তার হাতটায়, কিন্তু অনিমেষ নাছোড়বান্দা। তাকে ধরে নিয়ে যাবেই। এই সময় একে-একে কত কথা সুদীপের মনে পড়ে যা[illegible]

এই বৈঠকখানা বাড়ী[illegible] [illegible]বণ ভাবে প্রবেশ তো দূরের কথা, সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে গেলেও গ্রামের সকলকে মাথা হেট করে যেতে হয় আর জুতো পরে যদি কেউ কখনও গিয়েছে তো তার আর রক্ষে নেই। এই তো সেদিন ইন্দ্রপুরের শীতল ঘোষকে জুতো পায়ে দিয়ে বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যাওয়ার অপরাধে পঁচিশ-ঘা বেত মারা হ'ল। সুদীপও অনেকের মত সেদিন বৈঠকখানার বাইরে থেকে অসহায়ের মত ঘোষমশায়ের প্রতি প্রদত্ত সাজা দেখেছিল। একথা মনে পড়তেই সুদীপ হঠাৎ এক ঝটকায় অনিমেষের হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তীব্র স্বরে প্রশ্ন করে উঠল, "বল অনিমেষ, আমার অপরাধটা কি, আমি? আবার কি এমন অপরাধ করলাম যার জন্য এই ভর সন্ধ্যেবেলাতেই বৈঠকখানায় ধরে নিয়ে

গিয়ে সাজা দিতে চাও?" এতক্ষণে অনিমেষ বুঝতে পারে সুদীপ কেন বার-বার পিছুটান দিতে চাইছিল। সে মজা করবার জন্য আরো জোরে দু-হাত দিয়ে সুদীপের হাতটা ধরে টানতে-টানতে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যায়। সদর দরজা পার হতেই সুদীপের নজরে পরে ভট্চাজদের বড় কর্ত্তার অর্থাৎ অনিমেষের বাবার হাতে তখন একখানা সংবাদপত্র আর পাশের বিরাট রূপার গড়গড়ার নল থেকে তিনি তামাক খেয়ে একমনে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন। বাঘের মত মুখে ঠোঁটের উপরে কাঁচা-পাকায় মেশানো ঘন একজোড়া গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভুর-ভুর করে সুবাসিত অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া বের হয়ে গোটা বৈঠকখানা বাড়ী আমোদিত করে তুলেছে। নাচার সুদীপ দরজা পার হয়েই যে এভাবে একেবারে রমেনবাবু যাঁর প্রচলিত নাম হারুবাবু তাঁর সামনে পড়ে যাবে তা ভাবতে পারে নি। হারুবাবুকে দেখে সে ইচ্ছা করেই ঈষৎ দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। হারুবাবু সুদীপকে ইশারায় তাঁর কাছে যেতে নির্দেশ দিলে দুরু-দুরু বক্ষে কম্পমান দেহে সুদীপ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্য থেকে একটা নতুন কলম ও একখানা 'সঞ্চয়িতা' এনে সুদীপের হাতে দিয়ে বলেন, "তোমার পরীক্ষার ফল শুনে আমি খুশী হয়েছি আর এগুলো তোমায় পুরস্কার দিচ্ছি নিয়ে যাও", ব'লে তিনি একবার সুদীপের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এই গ্রামের প্রত্যেকের ঘরে যেন তোমার মত ছেলে জন্মায়।" অনিমেষ এবং হারুবাবুর রকম-সকম দেখে সুদীপ এতক্ষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। যেন হঠাৎ তার সম্বিত ফিরে আসে, আবেগের বশে "জ্যাঠামশাই বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে হারুবাবুর চরণে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে। আর অনিমেষের দিকে ফিরে চেয়ে দেখে তার মুখটা তখন দুষ্টুমিভরা হাসিতে ভরে আছে। সুদীপের 'জ্যাঠামশাই' সম্বোধনে হারুবাবু একবার সস্নেহ তির্য্যক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন এবং ছেলেটির অদ্ভুত সৌজন্য ও সাহসের কথা ভাবতে থাকেন। এই গ্রামের, এমন কি, আশপাশের অন্ততঃ বিশখানা গ্রামের কোন ছেলে, শুধু ছেলেই বা কেন, কোন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকও এমন আচম্বিতে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করে আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকতে সাহস করে না। ছেলেটির কথাকে একবার দুঃসাহস বলে মনে হলেও তাঁর ভালই লাগল, কারণ তাঁর যেন মনে হ'ল "জমিদারবাবু, বড়বাবু" এসব শুনতে-শুনতে তাঁর কান দুটো পচে গেছে। তিনি আর একবার সুদীপের মাথাটা ধরে সস্নেহে নেড়ে দিয়ে সুদীপকে মিষ্টিমুখ করাতে অনিমেষকে বললেন। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। একে জমিদারবাড়ি, তার উপর উপহার, তার উপরে মিষ্টি। সুদীপ আর একবার তার নতুন জ্যাঠামশায়কে প্রণাম করে অনিমেষের সঙ্গে অন্দরমহলের দিকে চলে যায়।

মিষ্টিমুখ অন্তে বাড়ী ফিরবার সময় সুদীপ ভাবতে থাকে হারুবাবুর নামে শুধু নানা সমালোচনা তাঁর রূঢ়তার সম্বন্ধে নানা ভীতির কথাই শুনে এসেছে। আজকে এই মুহূর্ত্তে তার হঠাৎ যেন মনে হয় কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্যই তাঁকে মাঝে-মাঝে কঠোর বা রূঢ় হতে হয়, না হলে তাঁর মধ্যেও এক সুদর্শন, উদারহৃদয়, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অস্তিত্ব বর্ত্তমান। মোটের উপর, এই মুহূর্ত্তে হারুবাবুকে সুদীপের ভালই লেগে যায় এবং মনে-মনে তাঁর প্রতি তার অন্তর শ্রদ্ধায় নত হয়।

বাড়ী ফিরতেই সুদীপের হাতে বই আর কলম দেখে সতীন্দ্র আর চন্দ্রা প্রায় একসঙ্গে তার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে আছেন বুঝে সুদীপ বাবা ও মাকে সব কথা খুলে বলে। তা শুনে সমস্ত ব্যাপারটাকে তাঁদের অভাবনীয় মনে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পরদিন ভোরে সতীন্দ্রবাবু পুনরায় কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন এবং যাবার সময় সুদীপকে বলে গেলেন, "কলকাতায় গিয়ে চেষ্টা করে যদি তোমার পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা করতে পারি তো পোষ্ট কার্ড দিয়ে জানাব এবং যথাসময়ে আমি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।" বাবার কথায় সুদীপ তাঁর মুখের দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে, কারণ সুদীপ ভালই জানে বাবা যতই চেষ্টা করুন না কেন, কলকাতায় গিয়ে তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভব নয়. কারণ এখনও পর্য্যন্ত যে-বাড়ীর লোকেরা দু-বেলা পেট ভরে ভাত পায় না, যে-বাড়ীতে অপরের পুকুরপাড় থেকে গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে, অন্য লোকের জমি থেকে নেড়া কেটে এনে জ্বালানী হয় এবং হাঁড়ি চড়ে, সে-বাড়ীর ছেলের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করা স্বপ্ন ছাড়া আর কি হতে পারে। আর শুধু কি স্বপ্ন, এ যেন এক দুঃস্বপ্ন, তাই সতীন্দ্রবাবু বললেও সুদীপ কথাটা তেমন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারল না এবং পরদিন সকালে নবস্থায় মাসীর বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। মনে-মনে ভাবল, 'মাসীর বাড়ী থাকলে দু-বেলা অন্ততঃ পেট ভরে খেতে তো পাব।' সুদীপ তার কিশোর বয়সের বুদ্ধিতে যাই-ই ভাবুক সতীন্দ্রবাবু কিন্তু চুপ ক'রে বসে থাকেন নি। সুদীপের মার্কশীট আসতেই তিনি দেখলেন সুদীপ তিনটে বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করেছে এবং হীরেনের সঙ্গে পূর্ব্ব কথামত মার্কশীট নিয়ে গোবিন্দ লাহা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলে লাহা মহাশয় সমাদর সহকারে সতীন্দ্রের আপ্যায়ন করলেন এবং হীরেনের মতই সুদীপেরও পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিলেন। যথাসময়ে সতীন্দ্র নবস্থা গিয়ে সুদীপকে এনে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন এবং ছেলেকে নিজের কাছে মেসেতেই রাখলেন।

কিছুদিনের মধ্যে হীরেনের সঙ্গে সুদীপের ভীষণ অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হল এবং হীরেন ও সুদীপ দুটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিভৃতে পড়াশুনা ও পড়াশুনার বাইরের বিষয়েও অনেক আলাপ-আলোচনা চলতে থাকল। কথায়-কথায় সুদীপ জানতে পারল লাহারা কলকাতার এক বিখ্যাত ধনী পরিবার। বিভিন্ন ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নী করে লাহা পরিবার প্রচুর বিত্তের মালিক। হীরেনের কথায় এবং পিতা সতীন্দ্রবাবু যেখানে কাজ করেন তাঁদের সম্বন্ধে বাবার কাছ থেকে বিভিন্ন কথা শুনে সুদীপের মাথায় ঢুকল ব্যবসা ভিন্ন অধিক অর্থ উপার্জ্জন কোন রকমেই সম্ভব নয়, কিন্তু ব্যবসা সে করবে কি করে? হীরেনের কাছে বা বাবার কাছে যা শুনেছে তা থেকে তো মনে হয় ব্যবসা করতে গেলে যে-জিনিষের ব্যবসা করবে তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, প্রয়োজন অর্থের, কিন্তু তার নিজের তো কোনটাই নেই আর বাবার কাছ থেকে কোনদিন যে-কিছু পাওয়া যাবে সে আশাও নেই। সুতরাং সুদীপ মনে-মনে বেশ বুঝতে পারে যে, ব্যবসা করতে গেলে নিজের চেষ্টাতেই যা-হোক কিছু করতে হবে।

ব্যবসার চিন্তা মাথায় থাকার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হ'ল তাকে যা-হোক-কোন দোকানে বা যে-কোন ছোট কলকারখানায় সর্ব্বাগ্রে একটা চাকরী নিতে হবে। এই ভেবে সুদীপ পড়াশুনার ফাঁকে-ফাঁকে ছোটখাট চাকরীর সন্ধানে ব্যাপৃত হল। কয়েকদিন এ-দোকান সে-দোকানে উমেদারী করে যখন বিশেষ সুবিধা করতে পারল না তখন একদিন চাকরীর উমেদারীর শেষে ক্লান্ত পায়ে ধীরে-ধীরে বাবার চাকুরীস্থল "ভালোটিয়া রতনলাল এণ্ড সন্স"-এ এসে হাজির হ'ল। সুদীপ এসে দেখল, ভালোটিয়া রতনলালের বিরাট দোকান ঘরে রাশি-রাশি রকমারী আকারের ঘিয়ের টিন ও কাচের জারে বহু রকম ঘিয়ের নমুনা। সে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে যখন চারদিক দেখছে তখন কে একজন যেন ভিতর থেকে আধভাঙ্গা বাংলায় প্রশ্ন করে উঠল, "তুম্‌হার কি চাই খোকা, এস, অন্দর এস।" কথাগুলি শুনে সুদীপের যেন চমক ভাঙ্গল, সে তাড়াতাড়ি তার বাবার নাম করে প্রশ্ন করল তিনি আছেন কিনা। উত্তরে ভদ্রলোক অর্থাৎ ঐ দোকানের মালিক কেশবলাল ভালোটিয়া যা বললেন তাতে সুদীপ আরও বিস্মিত হ'ল। কেশবলাল বললেন, "আরে অন্দর তো এস পহলে, তবে তো তুম্‌হার সাথে বাত করব।" সুদীপ ভয়ে-ভয়ে ভিতরে ঢুকে আরও বিস্মিত হ'ল। দোকানের দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে সে দেখল দরজার ঠিক বাম পাশে উঁচু দাওয়ার মতন বেশ কিছুটা সিমেণ্টবাঁধান জায়গায় গদী পাতা ও গোটা কয়েক বড়-বড় তাকিয়া। তার উপরে হেলান দিয়ে বসে আছেন বেশ গোলগাল টকটকে ফর্সা এক ভদ্রলোক। বয়স প্রায় পঞ্চাশ।

গায়ে দামী সিল্কের পাঞ্জাবী, তাতে সোনার বোতাম, গলায় সরু চেনের একটা হার, ডান হাতের তুটি আঙ্গুলে গোটা তিনেক আংটি। সুদীপ এক নজরেই বুঝল ইনিই "কেশবলাল" অর্থাৎ তার পিতা সতীন্দ্রের অন্নদাতা। সে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার করতেই কেশবলাল সুদীপকে সামনে একটা গদী-আঁটা বেঞ্চ দেখিয়ে বসতে নির্দেশ দিলেন এবং ধীরে-ধীরে আলাপ ক'রে যখন বুঝলেন সুদীপ সতীন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান তখন তাড়াতাড়ি সামনের ক্যাশ বাক্স থেকে কি যেন একটা বের করে এক কর্ম্মচারীকে তাঁর নিজের ভাষায় কি নির্দ্দেশ দিলে কর্ম্মচারীটি "জী হাঁ" বলে বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্ম্মচারীটি একটি শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে ফিরে এল এবং ঠোঙ্গাটি সুদীপের হাতে দিলে সুদীপ বুঝল তার জন্য কেশবলাল খাবার আনিয়েছেন। তার যেন কি রকম সঙ্কোচ বোধ হ'ল, তাই সলজ্জ মুখে কেশবলালের দিকে চেয়ে সে বলল, "এ-সব আবার করতে গেলেন কেন?" উত্তরে কেশবলাল বললেন, "তুমৃহি তো মেরা দোকানে আজ পহলে দফে এসেছ, তাই আর কি, লেও খা লেও বেটা।" পকেটের ঘড়িটা একবার বের করে দেখে বললেন,"এখন তো প্রায় ছটা বাজে, তুম থোড়া বৈঠ, তোম্হারা বাবা আভি এসে যাবে।" বলতে বলতেই সতীন্দ্রবাবু তাগাদা সেরে এসে দোকানে ঢুকলেন। তিনি সুদীপকে দেখে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কখন এলে?" সুদীপ বলল, "এই কিছুক্ষণ।" এরপর সতীন্দ্রবাবু মালিকের দিকে ঘুরে সুদীপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে কেশবলাল বললেন, "সতীন্দ্রবাবু, আপনার লেড়কার সঙ্গে হামার পরিচয় বহুৎ আগেই হইয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনি তো কখনো বলেন নি যে, আপনার ছেলে লিখাপড়ায় এত ভাল। বাপ্‌রে বাপ্‌রে তিন তিনঠো সাবজেক্টে লেটার নম্বর পেল আর আপনি বুললেন না। ভাগ্যিস খোকাটা এল, তবে তো হামি জানতে পারলাম।" উত্তরে সতীন্দ্রবাবু মাথা নীচু করে শুধু একটু মৃদু হাসলেন। এরপর মালিকের সঙ্গে ব্যবসার ও তাগাদা সংক্রান্ত কিছু কথাবার্ত্তা বলে হাতের থলি থেকে কয়েকটা চেক ও কিছু ক্যাশ টাকা মালিকের হাতে দিয়ে হিসাব বুঝিয়ে দিলেন এবং খাতা সারবার জন্য গদীর উপরে উঠলেন। গদীর উপরে কেশবলালের পাশে বসে আরও তিনজন লোক খাতাপত্র নিয়ে হিসাব-নিকাশ করছিল। সতীন্দ্র সেখানে বসতে যান দেখে কেশবলাল সতীন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, "থাক্ সতীন্দ্রবাবু আজকে ছেড়ে দেন, আজ লেড়কাকে নিয়ে একসাথে ঘর চলিয়ে যান।" কেশব-লালের কথায় সতীন্দ্রবাবু খাতা বন্ধ করে উঠতে যাবেন, এমন সময় কেশবলাল আবার বললেন, "আরে হ্যাঁ, হাম ভুল গিয়া থা, উয়ো নেতাজী সুভাষ রোডের নন্দীবাবু আছেন, ওনার ছোটবাবু পূজার জন্য ঘিউ লিতে এসেছিলেন, উনি বোলছিলেন

উনার দোকানকে লিয়ে একটা বাঙালী ছোকরা চাই।" আপনার দেশের কোই লেড়কা-এড়কা হো তো এনে দিন না, চাকরী করবে।" সতীন্দ্রবাবু এ-কথার জবাবে শুধুমাত্র "আচ্ছা" বলে মালিককে নমস্কার করে সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে মেসে ফিরে এলেন।

মেসে এসে সুদীপ দেখে হীরেন একমনে কি যেন লিখে চলেছে মেঝেতে আধ-শোয়া অবস্থায়। সুদীপ তাড়াতাড়ি "হীরেন" "হীরেন" করে ঘরে ঢুকতেই হীরেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে এবং হাতের কাগজ-কলম হাতে নিয়েই ধড়মড় করে উঠে বসে। সে সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে "কি রে, কি হয়েছে? কিছু বলবি কি?" সুদীপের ডাকে এমনই একটা আকুলতা ছিল যে, হীরেন একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তাই সে ওরকম চমকে উঠেছিল। সুদীপ ধীরে-ধীরে হীরেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "নেতাজী সুভাষ রোডে কে-এক নন্দীবাবুদের দোকানে একটি কাজ খালি আছে, ওঁদের ছোটবাবু একজন বাঙালী কর্ম্মচারী চেয়েছেন; হীরেনদা, তুমি বাবাকে বলে দাও না আমি ঐ কাজটা করব।" সুদীপের কথায় হীরেন চমকে ওঠে এবং বলে, "সে কিরে, এই যে তুই পড়াশুনা করবি বলে কাঠ-খড় পুড়িয়ে কাকাবাবু ও আমি এত চেষ্টা করে তোকে কলেজে ভর্ত্তি করলাম, চাকরী করতে গেলে তোর পড়াশুনা হবে কেমন করে? অন্ততঃ এফ. এ.-টা পাশ করে নে, তারপর না-হয় যা হোক একটা কিছু করা যাবে।" হীরেনের কথাগুলোয় এমনই একটা তাৎপর্য্যব্যঞ্জক গাম্ভীর্য ছিল যে, সুদীপ এ-কথার উত্তরে আর কোন কথা বলতে পারল না, বরং তার চাকরীর জন্য হীরেনদা কিছু করবে না মনে হ'তে তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সে-জল গণ্ড বেয়ে মেঝেয় পড়তে লাগল। ব্যাপার দেখে হীরেন তো হতভম্ব। সে তাড়াতাড়ি সুদীপের একখানা হাত ধ'রে তাকে ঘরের একপাশে বসিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে তার পাশে বসে অনুনয়ের সুরে বলল, "সুদীপ, তোর কি হয়েছে বলত? তুই এত চাকরী-চাকরী করছিস কেন? আর তাছাড়া নন্দীবাবুদের দোকানে চাকরী করে খুব জোর দশ কি পনের টাকা মাইনে পাবি, তাতে কি তোর খরচ চালিয়ে পড়াশুনা করে যেতে পারবি। চাকরী করতে গেলে প্রথমেই তো পড়াশুনা ছাড়তে হবে।" হীরেন সহমর্ম্মিতার সুরে কথা বলায় ক্রন্দনরত সুদীপ কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে হীরেনকে তাদের সংসারের অবস্থার কথা এমন মর্ম্মান্তিকভাবে বর্ণনা করে যে, সব শুনে হীরেনের চোখেও জল নেমে আসে। সুদীপ বলে, 'হীরেনদা, বাবা-মা ও ভাই-বোনেদের এ-কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এতদিন বাবা বহু কষ্ট করে আমায় ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়েছেন, কিন্তু এবার মনে হচ্ছে 'বাবা

বোধ হয় আর সামলাতে পারবেন না, কারণ প্রদীপ ও অধীপ বড় হচ্ছে তারপর দু-দুটো বোন আছে, প্রদীপ, ও অধীপের পড়াশুনা, বোনেদের বিয়ে এ-সব কথা ভাবতে গেলে আমি দু-চোখে অন্ধকার দেখি।" হীরেন সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন ক'রে তখনকার মত সুদীপকে বলে, "দেখি কি করা যায়।" সুদীপকে 'দেখি' বললেও ব্যাপারটা সতীন্দ্রবাবুকে বলা যে কতটা দুঃসাধ্য তা সুদীপও যেমন বোঝে হীরেনও তেমনিই বোঝে। সুদীপের জীবনের লক্ষ্য অর্থ উপার্জ্জন করে পিতামাতার দুঃখের সংসারকে সচ্ছল ও সচ্ছন্দ করে তোলা কিন্তু সতীন্দ্রবাবুর আন্তরিক ইচ্ছা কষ্টের মধ্য দিয়ে হলেও ছেলে আরও লেখাপড়া শিখুক, লেখাপড়া শিখে বড় হোক। তাই দু-জনের ইচ্ছার মাঝখানে পড়ে হীরেন দোটানার দোলায় দুলতে থাকল। রাত্রে ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর শুয়ে হীরেন ভাবতে লাগল তার নিজের সংসারও খুবই দুঃখময়, কিন্তু তার দুঃখ সুদীপের মত এতটা ভয়াবহ নয়, কারণ তার সংসারে শুধু বিধবা মা ও সে আর সুদীপদের সংসারে এতগুলি মানুষ। সুদীপের কথা ভাবতে-ভাবতে সারারাত্রি তার দুচোখের পাতা এক হ'ল না, বিছানায় পড়ে-পড়ে সে শুধু এপাশ-ওপাশ করতে থাকল। অবশেষে ভোর হতে না হতেই হীরেন উঠে পাশের ঘর থেকে সুদীপকে উঠিয়ে দুজনে মেস থেকে বের হয়ে গেল, কয়েক মিনিটের মধ্যে সুদীপ দেখল হীরেনের হাত ধরে নিমতলা দমকল ও আনন্দময়ী কালীবাড়ী ছাড়িয়ে নিমতলা ট্রাম গুমটি পেরিয়ে শ্মশানঘাট পাশে রেখে তারা গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছেছে।

হেমন্তের এই নির্মল ভোরে তখন সবে মাত্র রাস্তায় জল দেওয়া ও রাস্তা পরিষ্কার করা শুরু হয়েছে আর ইতস্ততঃ দু-চারজন ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলেছেন। কারও মুখে কৃষ্ণনাম, কারও কণ্ঠে নিতাই-গৌর আবার কারও কণ্ঠে সিয়ারাম। কলকাতা আসা থেকে সুদীপ কোনদিন রাস্তায় বের হয় নি, তাই হেমন্তের ভোরে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে মেখে হীরেনের সঙ্গে চলতে তার ভালই লাগছিল। চলতে-চলতে দুজনে আহিরিটোলা ঘাটের কাছে এক নির্জ্জন স্থানে এসে বসল। কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটার পর হীরেন সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল যে, সে কি সত্যিই আর পড়াশুনা করতে চায় না, না, কি এটা একটা খেয়াল মাত্র। হীরেনের কথায় সুদীপ যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং বলল, "হীরেনদা, তোমাকে সত্যিই আমি আপন দাদার মত শ্রদ্ধা করি, আমায় তুমি কেন বিশ্বাস করতে পারছ না? তুমি বিশ্বাস কর হীরেনদা, দয়ার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে পরের অর্থে লেখাপড়া শিখতে আমার আর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।" এর পরই কিছুটা স্বগতোক্তির

মতই যেন সুদীপ উচ্চারণ করে, "গরীবদের পড়াশুনাটাও যেন একটা সখের ব্যাপার। নাঃ হীরেনদা, এ-সব আমার পোষাচ্ছে না। তুমি যা হোক করে আমায় ঐ চাকরীটার ব্যবস্থা করে দাও।" বলার সময় সুদীপের কণ্ঠস্বরে এমনই একটা আন্তরিক আকুলতা ঝরে পড়ছিল যে, তার মুখ-চোখের দিকে চেয়ে হীরেনের মনটা নরম হয়ে গেল, কিন্তু তবু সে সুদীপের কাঁধে হাত রেখে আর একবার প্রশ্ন করল, "দেখ ভাই, এ সুযোগ হয়ত আর কোনদিনই পাবি না, আজকে যদি কলেজ ছেড়ে বড়বাজারে দোকানকর্ম্মচারীর খাতায় নাম লেখাস তো কোনদিনই হয়ত আর প্রেসিডেন্সীতে ফিরতে পারবি না। সুতরাং আর একবার ভাল ক'রে সব দিক ভেবে দেখ, তারপর শুধু আমার কথাতেই তো হবে না, তোর বাবা অর্থাৎ কাকাবাবু যদি রাজী হন তবেই হয়ত ব্যবস্থা হতে পারে।"

হীরেনের এ-কথায় সুদীপ দৃঢ়-স্বরে জবাব দিল, "জান হীরেনদা, ঈশ্বর যাঁদের গরীব করে পৃথিবীতে পাঠান তাঁদের জন্য অনেক নিষ্ঠুর সত্যও সামনে রেখে দেন। আমার আর লেখাপড়া হবে না এও যেমন একটা নিষ্ঠুর সত্য, চাকরি আমায় নিতে হবে এও তেমনি একটা নিষ্ঠুর সত্য। এ সত্যগুলো আমি দিনরাত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমার অর্দ্ধভুক্তা মা ও ক্ষুধাকাতর ভাই-বোনেদের করুণ দৃষ্টি যে আমায় সব সময় তাড়িয়ে ফিরছে হীরেনদা, আমি কেমন করে তাদের সেই মুখগুলোকে ভুলি, বলতে পার? তুমিই বল হীরেনদা, পড়াশুনা কি আমার কাছে বিলাসিতা নয়? পড়াশুনা করে নষ্ট করবার মত সময় কোথায় আমার হীরেনদা? তাছাড়া জান হীরেনদা, মা বোধ হয় আর খুব বেশী দিন বাঁচবেন না, পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে একটি দিনের তরেও যদি পেট ভরে দু-মুঠো মাছ-ভাত তাঁর মুখে তুলে দিতে না পারি তাহলে কি হবে আমার লেখাপড়ায়? কি করব আমি ভাল ছেলে হয়ে?" কথাগুলো বলতে-বলতে সুদীপ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দু-হাতে মুখ চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বেগ সংবরণ করতে থাকে। কিছুটা কেঁদে তাকে হাল্কা হবার সুযোগ দেয় হীরেন; তারপর এক সময় তার কাঁধে নিজের ডান হাতটা রেখে ধীরে-ধীরে বলে, "চল সুদীপ, এবার মেসে ফিরি।" হীরেনের কথায় সুদীপ গঙ্গার জল চোখে-মুখে ছিটিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে নেয় আর তারপর দুই বন্ধুতে মেসের দিকে চলতে শুরু করে।

চলতে-চলতে সুদীপ দেখে সূর্য্যদেব তখন পূর্ব্বদিকে রঙীন আলোর প্লাবনে চারদিক উদ্ভাসিত করে উদিত হচ্ছেন, দু-একটা কাক ও পায়রা এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে। সামনেই রেল লাইনের ধারে নিম গাছে কয়েকটা শালিখ ক্যাঁচর-ম্যাচর করছে। হঠাৎ সূর্য্যের দিকে চেয়ে 'সঞ্চয়িতা'য়-পড়া রবি

ঠাকুরের 'সুপ্রভাত' কবিতার প্রথম লাইনগুলো মনে পড়ে যায়, সুদীপ আপন মনে আবৃত্তি ক'রে ওঠে "রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া / বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।" মনে-মনে বার-বার লাইনগুলো আবৃত্তি ক'রে সুদীপের মনে হয়—কি দারুণ অর্থপূর্ণ রচনা। তার মনে হয়, দুঃখের, কষ্টের, ক্ষুধার বিদ্যুৎবাণ যেন লেখাপড়ার স্বপ্নকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার বক্ষ বিদীর্ণ করতে চাইছে আর ভোরের ঐ নবীন সূর্য্য যেন গলিত স্বর্ণধারাসদৃশ আলোকের জ্যোতি বিকীরণ ক'রে পথ দেখিয়ে, "বড় তাকে হতেই হবে" তার এই সত্যকে হৃদয়দুয়ার ভেদ ক'রে অন্তরের অন্তরতম স্থানে পৌঁছে দিতে চাইছে। আচম্বিতে হাত দুটো জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সে ঐ প্রভাতসূর্যের উদ্দেশ্যে তার প্রণাম জানায়। তারপর এক সময় হীরেনের সঙ্গে এসে মেসে ওঠে।

এর পরও দু-একদিন কেটে যায়। কিন্তু হীরেন ভেবেই পায় না কি ক'রে সে কাকাবাবু অর্থাৎ সুদীপের বাবার কাছে কথাটা তুলবে। সেদিন ছিল সোমবার। সুদীপ হঠাৎ এসে হীরেনকে বলে, "আচ্ছা হীরেনদা, তুমি নন্দীবাবুদের চেন তো? আমায় একবার ওঁদের ওখানে নিয়ে চল, যা বলার আমিই বলব।" সুদীপের কথায় হীরেন বুঝতে পারে—সে যে সতীন্দ্রবাবুকে কথাটা বলতে পারছে না এটা বুঝেই সুদীপ এই প্রস্তাবটা করেছে। হীরেন একবার ভাবে কাকাবাবুকে না জানিয়ে সুদীপকে নন্দীবাবুদের ওখানে নিয়ে গেলে কাজটা অন্যায় হবে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গত বৃহস্পতিবার ভোরে গঙ্গাতীরের ঘটনাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই হীরেন মন থেকে সব দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে সুদীপকে বলে, "আচ্ছা আজ যাব, কলেজ যাবার সময় তোকে নিয়ে বড়বাজার ঘুরে হ্যারিসন রোড ধরে হাঁটতে-হাঁটতে কলেজে যাব।"

এর পর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কথামতো দুই বন্ধুতে বেলা প্রায় ন'টার সময় কলেজে যাবে ব'লে মেস হতে বের হয়ে যায় দেখে সতীন্দ্রবাবু বলেন, "কি ব্যাপার? আজ এত সকাল-সকাল যে?" উত্তরে হীরেন আমতা-আমতা ক'রে বলে, "বড়বাজারে একটা কাজ আছে আমার, দুজনে আজকে বড়বাজার হয়ে কাজটা সেরে কলেজে যাব। তাই একটু সকাল-সকাল যাচ্ছি।" হীরেন ও সুদীপের উপর অগাধ বিশ্বাস, তাই সতীন্দ্রবাবু আর কোন প্রশ্ন করেন না, বরং নটা বেজে গেছে শুনে তাড়াতাড়ি স্নানের উদ্দেশ্যে নীচ তলার কলের দিকে চলে যান।

বড়বাজারে এসে হ্যারিসন রোড পার হয়ে নেতাজী সুভাষ রোডে প্রবেশ করে সুদীপ দেখে দুপাশে সারি-সারি নারকেলদড়ি, চট, ত্রিপল, নাটবল্টু, লোহার তার, বাসন, তামা, পিতল, তারের জালের দোকান। দোকানের সাইন বোর্ডগুলো

প'ড়ে-প'ড়ে সে বুঝতে পারে সবই বাঙালীর দোকান। দেখতে-দেখতে সুদীপ ভাবে এই এত বাঙালী দোকানদারী করে খাচ্ছে, এঁরা সবাই কি একেবারে রূপার চামচ মুখে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন! হয়ত অনেকেই খুব দীন অবস্থা থেকে আজকের এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সুদীপের মনে কেমন যেন একটা দৃঢ়তার সঞ্চার হয়। সে ভাবে, সৎপথে থেকে পরিশ্রম করলে সেও নিশ্চয়ই একদিন একখানা দোকান চালাতে পারে। সুদীপ এই কথা ভাবছে এমন সময় হীরেন তার হাত ধরে একটা আলতো টান মেরে বলে, "এই যে এসে গেছি, ঐ দেখ 'নন্দী এণ্ড কোং'।" হীরেনের ডান হাতের তর্জ্জনী অনুসরণ ক'রে সুদীপ দেখে হলুদ রঙের একটা সাইন বোর্ড যার চার পাশ কালো রঙের কাঠের বাটাম দিয়ে বাঁধানো আর মাঝে সবুজ রঙ দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'নন্দী এণ্ড কোং'; সর্বপ্রকার তার, কাঁটাতার, তারের দড়ি, তারের জাল, কোদাল, বেলচা ইত্যাদি দ্রব্য বিক্রেতা ও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার, ঠিকানা আটষট্টি বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-এক। সাইন বোর্ডের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে চোখ নামিয়ে দোকানের ভিতরে চোখ ফেলতেই প্রথমে নজরে পড়ল ফুটপাথ থেকে দোকানটা প্রায় দেড় হাত উঁচুতে অবস্থিত এবং দোকানের প্রবেশপথের সিঁড়িতে ও দোকানের দুপাশে নানা ধরনের তারের জাল, কাঁটাতার, বেলচা, গাঁইতি, শাবল ইত্যাদি এবং দরজা থেকে ফুট চার দূরে ভিতরের দিকে একটা খালি চেয়ার ও সামনে একটা তিন ফুট আন্দাজ লম্বা ও দু' ফুট মত চওড়া কাঠের টেবিল যার উপরটা সবুজ রঙের একটা রেক্সিন দিয়ে মোড়া। অত্যন্ত সঙ্কুচিত চিত্তে দুরুদুরু বক্ষে হীরেন ও সুদীপ দোকানে প্রবেশ করেই দেখল একজন হিন্দুস্থানী তখন দোকান পরিষ্কারে রত। হঠাৎ এত সকালে হীরেন ও সুদীপের মত দুটি কিশোরকে দোকানে ঢুকতে দেখে হিন্দুস্থানীটি বেশ বাজখাই গলায় প্রশ্ন করল, "কেয়া চাইয়ে খোকাবাবু?" খোকাবাবু অর্থাৎ সুদীপ ও হীরেন তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখল লোকটি বেশ মোটাসোটা ও গাঁট্টাগোট্টা। লোকটির চেহারার মধ্যে সব থেকে যা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হ'ল তার নাকের নীচে এক জোড়া মোটা-মোটা গোঁফ এবং ছোট-ছোট করে ছাঁটা মাথার চুলের মধ্যে ব্রহ্মতালুর ঠিক নিচেই পিছন দিকে একটি বিরাট টিকি। এই টিকিটির আবার মাঝখানে ফাঁস-দেওয়া। টিকির দিকে লক্ষ্য পড়তেই দুই বন্ধু ফিক করে একটু হেসে ফেলল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদের সংযত করে নিয়ে বুঝতে পারল সম্ভবতঃ টিকির দৈর্ঘ্য হ্রাস করে সেটাকে সংযত করে রাখবার জন্যই ওটিতে ফাঁস দেওয়ার ব্যবস্থা। লোকটি ততক্ষণে ঝাঁটা ছেড়ে সুদীপ ও হীরেনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হীরেন লোকটিকে একেবারে সামনে পেয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এখানে কোন লোক

লাগবে কি ?" হীরেনের এ কথায় লোকটি অর্থাৎ মউজীরাম বেশ গম্ভীর স্বরেই জবাব দিল, 'সো তো হামি বোলতে পারে না খোকাবাবু। বাবু আসলে আপনে লোক খোঁজ লিজিয়ে গা।' এর পর হীরেন প্রশ্ন করে বাবু বেলা প্রায় বারটায় আসবেন জেনে দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সামনের ফুটপাথে নেমে দুই বন্ধুতে যুক্তি করে সেদিনকার মত কলেজ যাওয়া স্থগিত রাখল।

এখনও হাতে প্রায় দু-ঘণ্টা সময়, সুতরাং সুদীপ হীরেনকে বলল, চল না হীরেনদা আমরা এর মধ্যে এই জায়গাটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখি।

হীরেনও বুঝে দেখল কথাটা সুদীপ মন্দ বলে নি, কারণ দু' ঘণ্টা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে না থেকে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ালে অনেক কিছু দেখা যাবে। এতদিন তারও এদিকে আসবার মত বিশেষ কোন প্রয়োজন কোনদিন পড়ে নি, অথচ লোকমুখে, বিশেষতঃ সতীন্দ্র কাকার মুখে এই বড়বাজার সম্বন্ধে কত রকমের গল্পই না শুনেছে। শুনেছে এই বড়বাজার নাকি সুদূর বোম্বাইয়ের বাজারের মতই বিখ্যাত বাজার। এই বড়বাজারেই নাকি ব্যবসা করে কত গরীব ধনী হয়েছে আবার কত ধনী রাতারাতি দেউলিয়া হয়েছে। এই বড়বাজারেই পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নাকি নেই। ভাবতে-ভাবতে বড়বাজার সম্বন্ধে হীরেনেরও মনে কেমন যেন একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয় এবং সুদীপের একখানা হাত ধরে ফুটপাথ ছেড়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে পা দেয়।

ফুটপাথ ছেড়ে দু'জনে দক্ষিণ মুখে হাঁটতে আরম্ভ করে। খানকয়েক দোকান পেরোতেই দু'জনে এসে পড়ে একটা চওড়া রাস্তায়। দোকানের সাইন বোর্ড পড়ে জানতে পারে যে, সে-রাস্তার নাম উড্‌মণ্ট স্ট্রীট। এই উড্‌মণ্ট স্ট্রীট পূর্ব্ব-পশ্চিমে ক্লাইভ স্ট্রীটের বুক চিরে চলে গেছে স্ট্র্যাণ্ড রোডের দিকে। হীরেন ও সুদীপ উড্‌মণ্ট স্ট্রীট পার হয়ে এসে আবার ক্লাইভ স্ট্রীটে পড়ে এবং তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আশেপাশের দোকানগুলি চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকে। উড্‌মণ্ট স্ট্রীটের ওপাশটায় যেমন দেখেছিল নাটবল্টু, দড়ি-ত্রিপল, তামা-পিতল, তার, তারের জাল ইত্যাদির দোকান, এপাশটাতেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের লৌহ ও লৌহজাত সামগ্রীর, মেসিন পার্টসের, রঙের ও ওষুধের দোকান। এ পাশের দোকানগুলির পরিমাপ বেশ বড়। এরই মধ্যে রাস্তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত মহেশ ভট্টাচার্য্য মশায়ের ওষুধের দোকানটা নজরে পড়বার মত। দোকানটার প্রায় বিশ ফুট চওড়া দরজাটার ফাঁক দিয়ে ভিতরে নজর পড়তেই দেখতে পেল বিস্তর কাচের আলমারীতে হাজার রকমের ওষুধের বোতল ও প্যাকেট এবং ডাক্তারী শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক সাজানো। দোকানে প্রায় শতখানেক লোক কাজ করছে। সুদীপ

ও হীরেন দু'জনেই একটু বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং মিনিট দুয়েক দোকানটার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে-মনে ভাবতে থাকে কি বিরাট ব্যাপারই না চলছে এ অঞ্চলে।

এর পর দুই বন্ধু আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে দেখল সামনে আর একটা বড় রাস্তা। এ রাস্তার নাম ক্যানিং স্ট্রীট। ক্যানিং স্ট্রীটে পৌছে তারা পূর্ব্বদিকে মুখ করে হাঁটতে-হাঁটতে একটা চৌমাথায় এসে পৌছল। উত্তর থেকে যে-রাস্তাটা এসে এখানে ক্যানিং স্ট্রীটকে ছেদ করে আরও দক্ষিণে চলে গেছে এ রাস্তাটার নাম ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রীট। সুদীপ ও হীরেন ক্যানিং স্ট্রীট ছেড়ে ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রীট ধরে দক্ষিণ মুখে হাঁটতে লাগল এবং দেখল এই এলাকায় দোকানদারদের মধ্যে অনেকেই চীনদেশীয় লোক। মাঝে-মাঝে দু'একজন বাঙালীও আছেন। সুদীপ মনে-মনে ভেবে নিল, সম্ভবতঃ চীনদেশীয় লোকেদের দোকান এতদঞ্চলে বেশী থাকায় রাস্তাটার নামকরণ চায়না বাজার স্ট্রীট হয়ে গেছে আর সম্ভবতঃ ঐ চীনদেশীয় লোকেরা বহুদিন ধরেই এই এলাকায় ব্যবসায়ে রত অর্থাৎ এই চীনাবাজার বহু দিনের পুরাতন বলেই হয়ত এই রাস্তার নামের সঙ্গে ওল্ড কথাটাও যোগ হয়ে গেছে। যাই হোক, সুদীপ চারদিক চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকে। কত রকমের কাগজ, কলম, কাপ, ডিস, কাঁচের গ্লাস, হ্যারিকেন লণ্ঠন, হ্যাজাক লাইট, ডে-লাইট, কারবাইড গ্যাসের লাইট, বড়-বড় আয়না, বিভিন্ন রঙের কাঁচের দোকান। দেখে-শুনে যে-রাস্তাটা দিয়ে বের হয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়ে তার নাম ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস। ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসে এসে তারা বাঁ দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে মোড় নেয় এবং কয়েক পা হেটে এসেই যে-রাস্তায় পড়ে সে-রাস্তার নাম ব্র্যাবোর্ন রোড। ব্র্যাবোর্ন রোডে এসে দুই বন্ধু উত্তর মুখে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে-হাঁটতে কিছু দূর আসতেই শুনতে পায় কোথায় যেন একটা বেশ বড় ঘড়িতে ঢং করে আওয়াজ হলো। সুদীপ তাড়াতাড়ি মুখ তুলে হীরেনের দিকে চাইতেই হীরেন পূর্ব্বদিকের ফুটপাথ নির্দ্দেশ করে, সুদীপকে দেখাল যে, ও-দিকের চার্চ্চের মাথায় যে-বড় ঘড়িটা রয়েছে ঐ ঘড়িটায় সাড়ে এগারটা বাজল। সাড়ে এগারটা বাজল শুনে সুদীপ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল এবং হীরেনকে বলল, "চল হীরেনদা, এবার আবার নন্দী কোম্পানীতে যাওয়া যাক।"

দুই বন্ধু ধীরে-ধীরে আবার নন্দী এণ্ড কোং এর সামনে এসে ফুটপাথ থেকে লক্ষ্য করল যে, সামনের চেয়ারটা তখনও ফাঁকা, তার অর্থ বাবু তখনও আসেন নি, তবে ভিতরে সেই হিন্দুস্থানীটি ছাড়াও আরও জন দুই লোক বেঞ্চে বসে রয়েছে। তারা কর্ম্মচারী হতে পারে আবার খরিদ্দারও হতে পারে। সুদীপ ও হীরেন যুক্তি

করে বাবু না আসা পর্য্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করাই ঠিক করল এবং বাইরে দাঁড়িয়ে আশপাশের ও সামনের ফুটপাথের উপর অবস্থিত সব দোকানেই বেশ কর্ম্ম-তৎপরতা লক্ষ্য করল। সব দোকানেই বিভিন্ন ধরনের লোক আসা-যাওয়া করছে, মালপত্র কেনাকাটা করছে, রাস্তার দু'ধারে অপেক্ষমান ঠেলা ও রিক্সাতে চাপিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাল নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নন্দী কোম্পানিতে এই প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে কোন লোককে ঢুকতে বা বেরোতে দেখল না। ভিতরের তিনটি লোক শুধু বেঞ্চে বসে ঝিমোচ্ছে।

ইতিমধ্যে সাদা ঘোড়ায় টানা একখানা ফিটন গাড়ী সুদীপ ও হীরেন যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়াল এবং সহিস নেমে এসে সেলাম দিয়ে দরজা খুলে দিলে অপরূপ কাঞ্চনকান্তি এক যুবক গাড়ী হতে নামল। সুদীপ ও হীরেন চেয়ে দেখল চওড়াপাড় ধুতির কোঁচার অগ্রভাগ ভদ্রলোকের বামহাতে ধরা; গায়ে অত্যন্ত দামী সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় সরু সোনার চেন আর ডান হাতে একটা টিনের কৌটা যার গায়ে লেখা 'রেড এণ্ড হোয়াইট', মাথার চুলের মাঝখানে সিঁথিকাটা ও চুল ব্যাকব্রাশ করা। ভদ্রলোক কোনদিকে না তাকিয়ে চকচকে পাম্পসুতে মচমচ আওয়াজ তুলে রাস্তায় একটা মিষ্টি আতরের গন্ধ ছড়িয়ে নন্দী এণ্ড কোংতে গিয়ে ঢুকলেন। ফুটপাথে-দাঁড়িয়ে-থাকা সুদীপ ও হীরেন অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে দেখে বুঝল ভদ্রলোক যেমন সুপুরুষ, তেমনি রুচিবান। ভদ্রলোকের বয়স দেখে কিন্তু মনে হ'ল খুব বেশী হ'লে বাইশ-তেইশ বছর অর্থাৎ সুদীপ বা হীরেনের থেকে চার-পাঁচ বছরের বড় হবেন। নন্দীবাবুদের সম্বন্ধে হীরেন সতীন্দ্রকাকার কাছে যতদূর শুনেছে তাতে সে এইটুকুই মাত্র জানে যে, ঐ নন্দীবাবুরা বর্দ্ধমান জেলার মীরহাট-বৈদ্যপুর অঞ্চলের জমিদার ও কলিকাতার অন্ততঃ খান-তিরিশেক অট্টালিকার মালিক। নন্দীবাবুদের বিত্ত, প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা শুনে হীরেন ভেবেছিল নন্দী এণ্ড কোং-এর মালিক সেজ নন্দী ও ছোট নন্দী যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ বেশ বয়স্ক গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী মানুষই হবেন। কিন্তু এইমাত্র যিনি ফিটন থেকে নেমে গিয়ে নন্দী এণ্ড কোম্পানির মালিকের চেয়ারে বসলেন তিনি তো এমন কিছু রাশভারী ভারিক্কি গোছের লোক নন, বরং সৌম্যদর্শন, সুন্দর, সহাস্যবদন এক তরুণ। ঐ ফুটপাথ থেকেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হীরেন ও সুদীপের এতক্ষণে ভয়টা যেন একটু দূরীভূত হল এবং বুকে সাহস সঞ্চয় করে দু'জনে এসে দোকানে ঢুকেই একসঙ্গে হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করল। উপেন্দ্রবাবুও প্রতি-নমস্কার করে ব্যাপার কি জানতে চাইলে হীরেন ধীরে-ধীরে সুদীপের জন্য তাঁকে

চাকরীর কথা বলতে তিনি পাশের বেঞ্চে তাদের দু'জনকে বসতে নির্দেশ দিলেন এবং হাতের কাজ কয়েকটা সেরে নিয়ে তাদের সঙ্গে পুনরায় আলাপ শুরু করলেন। কথায়-কথায় সুদীপের বাবার নাম জিজ্ঞাসা করায় সুদীপ সতীন্দ্রবাবুর নাম বলল। "সতীন্দ্রনাথ দত্ত" নাম বলতে উপেন্দ্রবাবু অতটা খেয়াল করলেন না বটে, কিন্তু খেয়াল করলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, সুদীপ ছেলেটি ভালোটিয়াদের বাজার-সরকার সতীন্দ্রবাবুর পুত্র—উপেন্দ্রবাবু যাঁকে শুধু সতীন্দ্র বলে জানেন। উপেন্দ্রবাবু সতীন্দ্রবাবুকে ভাল করেই চিনতেন, কারণ তাঁদের বিরাট সংসারের বারমাসের রান্নার জন্য এবং পূজা-পার্ব্বণের জন্য যে পরিমাণ ঘি লাগে তার সবটাই ঐ ভালোটিয়াদের কাছ হতে আসে আর পাওনা টাকার তাগাদা করতে ঐ সতীন্দ্রবাবুই তাঁর কাছে মাঝে-মাঝে আসেন। যাই হোক, উপেন্দ্রবাবুর অনবধানতার জন্যই প্রসঙ্গটা খুব একটা গুরুত্ব পেল না।

কয়েক মিনিট কথাবার্তার পর তিনি সুদীপকে চাকরিতে বহাল করতে রাজী হলেন। বেতন মাসিক পনর টাকা এবং দৈনিক এক পয়সা করে জলপানি। কথা হ'ল, কয়েকদিন পরেই দুর্গাপূজার ছুটি পড়ে যাচ্ছে, তাই দুর্গাপূজার শেষ দিন অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন থেকেই সুদীপ তার নতুন চাকরিতে যোগ দেবে। তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে দুই বন্ধুতে খুব খুশী। নন্দী এণ্ড কোম্পানি হতে বাইরে এসে খুশীতে ভরপুর দুই বন্ধু দুজনকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল।

দেখতে-দেখতে পূজার ছুটি এসে গেল। সাংসারিক প্রয়োজনের টুকিটাকি কয়েকটা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে সতীন্দ্রবাবু সুদীপকে নিয়ে সপ্তমীর দিন বাঘাসনে এলেন। সপ্তমী-অষ্টমী কাটার পরই নবমীর দিন সকালে সুদীপ মা চন্দ্রাদেবীকে বলল, "মা, আজ একটু সকাল-সকাল রান্না চাপিও, কারণ খেয়ে-দেয়ে আমি কলকাতা যাব।" সুদীপের এ-কথায় চন্দ্রা একটু বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে তার দিকে চাইলে সুদীপ শুধু মৃদুহাস্যের রহস্যময় জাল বিস্তার ক'রে মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইল কিন্তু বাবা দাওয়ায় বসে আছেন বলে মুখে সে কোন কথাই বলল না। ধীরে-ধীরে বেলা বেড়ে যায় এবং সুদীপও মনে-মনে ছটফট করতে থাকে, তারপর এক সময় স্নান সেরে আমতলা ঘরের দাওয়ায় বসে মাকে বলে, 'মা ভাত দাও।' চন্দ্রাদেবী সুদীপকে ভাত বেড়ে দিয়ে পাশে ব'সে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "এই তো কতদিন পর মাত্র পরশু এসেছিস, তোর কলেজের পূজার ছুটি শেষ হতে তো এখনও অনেক বাকী, তবু এরই মধ্যে চলে যাচ্ছিস কেন বাবা?" মায়ের কথার উত্তরে সুদীপ চুপি-চুপি বলল, "আমি একটা চাকরি পেয়েছি মা, সেই চাকরিতে আগামী কাল অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন সকালেই যোগ দিতে হবে।" সুদীপ চলে যাবে শুনে

সকাল থেকেই চন্দ্রাদেবীর মনটা ভারী হয়েছিল, কিন্তু সে কলকাতায় চাকরী পেয়েছে শুনে তাঁর মধ্যে সুদীপের যে মা রয়েছেন সেই মা যেন সুদীপকে শত-হস্তে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন। খুশীতে চন্দ্রার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তাঁর মনে হ'ল মাত্র আঠার বছরের ছেলে সুদীপ সংসারের জন্যে এরই মধ্যে কত চিন্তাই না করছে। সংসারের জন্য চিন্তা করতে গিয়ে সুদীপের মত তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে যে লেখাপড়াটুকু জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে, দুঃখ-দৈন্যের বেদীতলে আগামী দিনের উচ্চশিক্ষাসঞ্জাত জ্ঞানবিহঙ্গীকে বলি দিতে হচ্ছে এ চিন্তা কিন্তু চন্দ্রাদেবীর মাথায় একবারও এল না, আর আসবার কথাও নয়, কারণ তিনি সরল প্রাণের পল্লীরমণী, বিশ্বসংসারের এত খবর তাঁর জানার কথা নয়, আগ্রহও নেই। তাঁর মত রমণীগণ, তাঁর মত মায়েরা স্বামী, সন্তান ও সংসারের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়ে যদি অন্য সকলের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন, তবেই আনন্দিত ও সুখী। সুদীপ চাকরী পেয়েছে শুনে চন্দ্রাও তাই যারপরনাই সুখী হলেন।

যথাসময়ে সুদীপ মাকে প্রণাম করে নবমীর দিন দ্বিপ্রহরে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং চন্দ্রা সুদীপকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন এবং পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা ক'রে "দুর্গা দুর্গা" বলে দুর্গানাম স্মরণ করলেন। বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় পা দিতেই সুদীপের বাঘাসন গ্রামটাকে আজ যেন দারুণ ভাল লাগল। গ্রামের প্রধান রাস্তাটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, বেশ প্রশস্ত। বাড়ী থেকে বের হয়ে প্রথমেই পূর্ব্বদিকে কিছুটা হেঁটে বাবা বাঘেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে মাটি থেকে মুখ তুলে মন্দিরের দিকে চাইতেই প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ সুদীপের চোখের সামনে ভেসে উঠল। কবে কোন্ গুরুদাস ঘোষ মাটি কাটতে-কাটতে এই মূর্ত্তি আবিষ্কার করেছিল এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অধিকারীরা বাবার সেবার ভার নিয়েছিল আর গ্রামের পঞ্চজনের আর্থিক আনুকূল্যে বাবারই স্বপ্নপ্রদত্ত নির্দ্দেশমত কবে যে ইঁটের দেওয়াল ও খড়ের চালের এই মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল তা সুদীপ জানে না, কিন্তু আজকের এই জরাজীর্ণ মন্দিরটিই যেন নতুন শোভা নিয়ে তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বাবা বাঘেশ্বরকে প্রণাম করে সে মনে-মনে বাবার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ছেড়ে বাইরে এসে দক্ষিণে মনসামন্দিরে ও উত্তরে ষষ্ঠীতলায় প্রণাম ক'রে পুনরায় পশ্চিমমুখী হয়ে নিগন স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হ'ল। হীরেনদার সহযোগিতায় স্ব-প্রচেষ্টায় সে আজ চাকরী পেয়েছে বলেই হয়ত তার মনটা আনন্দে পূর্ণ হয়ে আছে আর তাই বোধ হয় এই গ্রামের সবকিছুই আজ তার কাছে মধুময় হয়ে উঠেছে। ধীরে-ধীরে সুদীপ গ্রামপ্রান্তে 'শান্তিসায়র' ও 'তিরুলী' পিছনে রেখে

কেঁকের নালা পার হয়ে কাঁদরের ধারে এসে দেখল হরামাঝির ডিঙ্গি নৌকো ওপারে বাঁধা। অনেক ডাকাডাকি ও চেঁচামেচির পর হরামাঝি ডিঙ্গি নিয়ে সুদীপকে কাঁদর পার করে দিল। এর পর সুদীপ আর কোনদিকে না চেয়ে হন্‌হন্‌ করে চলতে থাকল, কারণ বাঘাসন হতে নিগন প্রায় চার ক্রোশ রাস্তা। তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার হাঁটাপথ। এদিকে সুদীপকে বাড়ীতে অনুপস্থিত দেখে সতীন্দ্রবাবু চন্দ্রাকে প্রশ্ন করতে চন্দ্রা সব কথা সতীন্দ্রবাবুকে যথাযথ বিবৃত করলেন। সব শুনে সতীন্দ্র কেমন যেন গুম হয়ে গেলেন।

কলকাতা পৌঁছে মেসে যাবার সময় সুদীপ 'খোট্টা' বাজার থেকে কিছু চিঁড়ে ও গুড় কিনে নিল। কারণ পূজার সময় মেসে কেউ নেই, সবাই যে-যার বাড়ী চলে গেছে। সবাই বাড়ী গেছে বলে, রান্নারও কোন ব্যবস্থা নেই। সকলে যখন থাকে তখন পালা করে কেউ রান্না করে, কেউ বাজার করে, কেউ নীচতলা থেকে জল তুলে আনে, কেউ হাঁড়ি, কড়াই, বালতি মেজে ধুয়ে সাফ করে আর যে-যার নিজের এঁটো বাসন ধোয়। সুদীপ মনে-মনে ভাবল রাত্রিটা ঐ চিঁড়ে-গুড়ে বেশ চলে যাবে। যথাসময়ে আহার সমাধা করে সুদীপ মেঝেয় একখানা জরাজীর্ণ মাদুর বিছিয়ে দক্ষিণ হস্তের বাহুকে বালিশ করে শুয়ে পড়ল, কারণ মেসে আসা অবধি বিছানা বলতে সুদীপের ঐ-টুকুই সম্বল। শুয়েও কিন্তু বহুক্ষণ সুদীপের ঘুম এল না। প্রথমতঃ নতুন চাকরীর একটা আনন্দজনিত উত্তেজনা, দ্বিতীয়তঃ নতুন মালিক নন্দীবাবুরা কি রকম লোক হবেন, কতদিন তাকে বহাল রাখবেন ইত্যাদি নানা চিন্তা। এভাবে রাত্রি বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবমীর রাত্রের কলকাতা বেশ খানিকটা শান্ত হয়ে গেছে। ঘুম না আসার জন্য সুদীপ একবার বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং রাস্তার দিকে চেয়ে দেখল রাত্রি অধিক হলেও রাস্তায় তখনও অনেক নারীপুরুষ বেশ ঝলমলে পোষাক-আশাক পরে' ঘুরছে। সুদীপ বুঝতে পারল—এই পাথুরিয়াঘাটা পাড়ায় দুর্গাপূজা না থাকলেও লোকে বিভিন্ন স্থান হতে ঠাকুর দেখে ঘরে ফিরছে বা দেখতে যাচ্ছে। সুদীপ বেশ কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে কুঁজো থেকে টিনের গ্লাসে জল গড়িয়ে খেয়ে কুঁজোর মুখে গ্লাসটা চাপা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ভ্রমণক্লান্ত শরীরে এবার শোয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপ গভীর নিদ্রামগ্ন হ'ল। ঘুম ভাঙ্গল একেবারে সকালে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে গঙ্গাস্নান করে এসে সুদীপ নিমতলায় গিয়ে মা আনন্দময়ীকে প্রণাম করে বড়বাজারের উদ্দেশে রওনা হ'ল।

স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সুদীপ দেখতে পেল এরই মধ্যে অনেক দোকান খুলে গেছে, কেউ দোকান পরিষ্কার করছে, কেউ ধুনো-গঙ্গাজল দিচ্ছে,

আবার কেউ দ্রব্যসম্ভার সাজিয়ে এরই মধ্যে বাণিজ্যের জন্য তৈরী হয়ে গেছে। সব দেখে সুদীপ ভাবল তাহলে এতক্ষণে হয়ত নন্দী এণ্ড কোম্পানি খুলে গেছে। ছিঃ ছিঃ, আজ প্রথম দিনেই সে নিজে দেরী করে ফেলল! এই ভেবে সুদীপ বেশ জোরে হেঁটে ক্লাইভ স্ট্রীটে পৌঁছে নন্দী এণ্ড কোম্পানির সামনে এসে দেখল সে-দোকান তো খোলেই নি, তাছাড়া এ এলাকার অধিকাংশ দোকানই তখনও বন্ধ। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে সুদীপের নজরে পড়ল উল্টোদিকের ফুটপাথের উপর পাল ব্রাদার্সের দোকানের দেওয়ালে একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি রয়েছে। এদিকের ফুট-পাথে দাঁড়িয়েই সুদীপ দেখতে পেল মাত্র সাড়ে পাঁচটা বাজে। সুদীপ ঐখানে ফুট-পাথে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে সে-দিনের দেখা সেই হিন্দুস্থানী একগোছা চাবি হাতে করে সামনে আসতেই সুদীপের মুখে হাসি ফুটল। হিন্দুস্থানী মুটে কিভাবে দোকান খুলে ঝাঁটপাট দিয়ে মাল সাজাতে লাগল সুদীপ একাগ্র চিত্তে সবই নিরীক্ষণ করতে থাকল। মাল সাজান হয়ে গেলে হিন্দুস্থানী সুদীপকে বলল, "খোকাবাবু, আপনি একটু বোসেন, হামি থোড়া ফুলমালা লিয়ে আসছি।" ফুলমালা এনে দোকানের দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো সব ঠাকুরের পটে ও মূর্ত্তিতে পরিয়ে দিয়ে একটা ছোট্ট পিতলের ধুনুচিতে খান-কয়েক টিকে দিয়ে আগুন জেলে একটা পিচবোর্ডের টুকরো করে বাতাস দিয়ে সেটা ধরিয়ে তাতে একটা টিনের কৌটো থেকে ধুনো বের করে দিল। পুনরায় একটু হাওয়া দিতেই ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেল আর সমস্ত দোকানঘরটা চন্দন মিষ্টি গন্ধে পূর্ণ হয়ে উঠল। সুদীপের মনে হ'ল গন্ধটা শুধু ধুনোরই নয়, নিশ্চয় ঐ ধুনোর সঙ্গে চন্দনকাঠের গুঁড়ো বা ঐ জাতীয় কিছু মেশানো আছে। এর পর প্রথমে একটা তামার ঘটি থেকে একটু গঙ্গাজল নিয়ে দোকানের সামনে এবং দোকানের দেওয়ালে টাঙ্গানো মা কালীর পটে ও এক কোণে দেওয়ালের গা হতে ঝুলন্ত একটি কাঠের সিংহাসনে উপবিষ্ট গণেশমূর্ত্তি ও গণেশমূর্ত্তির ঠিক পাশেই ঝুলন্ত মা লক্ষ্মীর পটের উদ্দেশে ও কাঠের একটি ক্যাশ-বাক্সের উপর এক দু-ফোঁটা করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে ধুনো দেখানো শেষ করল। ধুনো দেখানোর সময়েও সুদীপ নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করল হিন্দুস্থানীটি কিভাবে ধুনো দেখাচ্ছে। গঙ্গাজল দেওয়ার সময় যেমন দোকানের সামনে থেকে শুরু হয়েছিল ধুনোর বেলাতেও ঠিক সেই ভাবেই ধুনো দেখান হ'ল এবং ধুনুচিটা নিয়ে আরতি করার ভঙ্গীতে সব ঠাকুরকে ধুনো দেখাল। সব শেষে ক্যাশ বাক্সটায় ধুনো দেখিয়ে ধুনুচিটা কিছুক্ষণ ক্যাশ বাক্সর উপর রেখে তারপর আস্তে আস্তে সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আগুনটা বাইরে ফেলল এবং ধুনুচিটা এনে যথাস্থানে রাখল।

দোকানের প্রাথমিক কাজটুকু সেরে একটা কাপড়ের ঝাড়ন নিয়ে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিলের ধূলো মুছে কয়েক মিনিটের মধ্যে সব ঝক্‌ঝকে তকতকে করে তুলল হিন্দুস্থানীটি। তারপর সে একটা পিতলের কলসী ও জলখাবার কয়েকটা গেলাস নিয়ে কলতলার উদ্দেশে চলে গেল। সুদীপ বুঝল সব ধুয়ে অদূরবর্ত্তী কোন কল থেকে খাবার জল আনবার জন্য গেল। লোকটি ফিরে এলে সুদীপ তাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলল—তার নাম মউজীরাম সিং। এরপর মউজীরামও সুদীপকে জিজ্ঞাসা করে তার নাম-ধাম-ঠিকানা সব জানতে চাইলে সুদীপ যথাযথ উত্তর দিল। সুদীপ ও মউজীরামের কথাবার্ত্তার সময়ই হঠাৎ একজন মোটা মত অবাঙালী বাবু এসে দোকানে ঢুকল এবং এক বাণ্ডিল শাবল দেখিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করল। মহামুস্কিলে পড়ল সুদীপ, কারণ সে সবে আজ প্রথম এসেছে, কোন জিনিষেরই দাম সে জানে না অথচ বিজয়া দশমীর অর্থাৎ বাঙ্গালীর যাত্রার দিনের দোকানের প্রথম খরিদ্দার। সুদীপ যথাসম্ভব বিনীত কণ্ঠে নমস্কার করে তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে মউজীরামকে দাম জিজ্ঞাসা করতে মউজীরাম বাবুর টেবিলের উপরে রাখা হলুদ-রঙের একটা কাগজের ফাইল দেখিয়ে বলল, "এর ভিতরে সব দাম লিখা আছে, আপনি দেখে বোলে দিন।" সুদীপ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, সে একনজরে শাবলের বাণ্ডিলটার দিকে চেয়ে দেখল শাবলের সাইজটা চার ফুট আর গায়ে লাল রঙের কাগজে লেখা আছে টাটা প্রোডাক্ট। সুদীপ বুঝল তা হলে টাটা কোম্পানির প্রাইস-লিষ্ট দেখতে হবে। ফাইলটা খুলে দু-চারখানা কাগজ ওল্টাতেই টাটা কোম্পানির প্রস্তুত মালের প্রাইস-লিষ্টটা বের হয়ে পড়ল। প্রাইস-লিষ্ট খুলে সে দেখল চার ফুট সাইজের শাবলের দাম ছয় টাকা ডজন। সুদীপ মনে-মনে ভেবে নিল কোম্পানির দাম যদি ছয় টাকা ডজন হয় তাহলে মাল আনতে, ঘরে তুলতে নিশ্চয়ই আরও কিছু খরচা আছে। মনে-মনে আন্দাজে একটা হিসাব ক'রে নিয়ে সুদীপ দাম দিল সাড়ে আট টাকা ডজন। দাম শুনে খরিদ্দার ভদ্রলোক একবার বললেন, "বহুৎ জাদা।" একথার অর্থ সুদীপ বুঝল না দেখে মউজীরাম তাকে বুঝিয়ে দিল যে, দাম বেশী বলা হয়ে গেছে। সুদীপ তখন একবার মাথা চুলকিয়ে আবার প্রাইস-লিষ্টটায় চোখ বুলিয়ে বলল, "আচ্ছা, আট টাকা পর্য্যন্ত হয়ে যাবে।" ভদ্রলোক দাম সম্বন্ধে আর কিছু না বলে, চব্বিশ ডজন মালের অর্ডার দিলেন এবং হিসাব করে টাকা মিটিয়ে কিভাবে মাল কোথায় পাঠাতে হবে সব বুঝিয়ে লিখিয়ে দিয়ে গেলেন। খরিদ্দার ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর কিন্তু সুদীপের বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল, কারণ কোন কিছু না জেনেই ভগবান ভরসা করে সে সকাল বেলায় প্রায় দুইশত টাকার মাল বিক্রয় করল। কিন্তু যদি দাম ঠিক না হয়ে লোকসান হয়ে

থাকে, যদি বাবুরা এসে বকাবকি করেন—ভিতরে-ভিতরে এই ভয়ে ভীত হয়ে সুদীপ সেই প্রাইস-লিষ্টের ফাইলটা হাতে নিয়ে আবার চোখ বুলোতে লাগল। সুদীপ দেখল ঐ ফাইলের ভিতরে বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন রকম দ্রব্যসামগ্রীর দাম লেখা আছে—কোন কাগজে লেখা বারো গেজ/বারো গেজ কাঁটাতার দশ টাকা হন্দর, বার গেজ / চৌদ্দ গেজ কাঁটাতার বার টাকা হন্দর, কোন কাগজে লেখা ছয় নম্বর কোদাল চার টাকা ডজন, আট নম্বর কোদাল সাড়ে পাঁচ টাকা ডজন, কোন কাগজে লেখা চার মেস আঠারো গেজ জালের দাম দুই পয়সা স্কোয়ার ফুট, ছয় মেস কুড়ি গেজ জালের দাম চার পয়সা স্কোয়ার ফুট ইত্যাদি। প্রাইস-লিষ্ট দেখে সুদীপ কোনটা কিছু বুঝল আবার কোনটা একেবারেই বুঝল না, যেমন—শাবলের সাইজ অনুযায়ী দামগুলো বুঝতে কোন অসুবিধা হল না বটে, কিন্তু কোদাল, কাঁটাতার বা তারের জাল সম্বন্ধে সে শুধু এটুকুই বুঝল যে, কাঁটাতারের দামটা ওজন হিসাবে আর জালের দাম স্কোয়ার ফুট অর্থাৎ একফুট লম্বা এক ফুট চওড়া হিসাবে এবং কোদাল ও গাঁইতির দাম এক ডজন অর্থাৎ প্রতি বারটি হিসাবে লেখা আছে। সবকিছু না বুঝলেও সুদীপ প্রাইস-লিষ্ট ফাইলটা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে লাগল। বেঞ্চে বসে সে প্রাইস-লিষ্ট ফাইল নিয়ে যখন একমনে নাড়াচাড়া করছে তখন হঠাৎ সেদিনের মত জুতার একটা মচমচ আওয়াজ শুনে সে ফাইল থেকে চোখ তুলতেই দেখল সেদিনের দেখা সেই বাবুটি দোকানে প্রবেশ করছেন। সুদীপ তাড়াতাড়ি হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করল এবং তিনি চেয়ারে না বসা পর্য্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থাকল। সুদীপের ভদ্রতাজ্ঞানটুকু ছোটবাবু অর্থাৎ উপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াল না, কারণ তাঁর শরীরে জমিদারবংশের রক্ত প্রবাহিত বলে এসব দিকে তাঁর স্বভাবতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অন্য কর্ম্মচারীরা ঠিক এই ভুলটা করার জন্য বহুবার তাঁর কাছে অপমানিত হয়েছে, তবু তাদের ভুল হয়। সুদীপ আজ প্রথম এসেছে, কিন্তু তার এই সহজাত শিক্ষা দেখে ছোটবাবু খুশীই হন এবং মুখে মৃদু হাসি এনে তাকে বসতে বলেন। টেবিলের দিকে মুখ নীচু করতেই তাঁর লক্ষ্য পড়ে টেবিলের বামপার্শ্বে একটা জালের টুক্‌রো চাপা কতকগুলো পাঁচ টাকার নোট। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুদীপের দিকে চাইতেই সুদীপ বলল, "চব্বিশ ডজন চার ফুট সাইজের শাবল বিক্রী হয়েছে আট টাকা ডজন হিসাবে।" সুদীপের কথা শুনে উপেনবাবু চমকে উঠলেন এবং বললেন, "করেছ কি? সাড়ে ছয় টাকা যার বিক্রয়মূল্য সেই মাল তুমি আট টাকায় বিক্রী করেছ! এত বেশী দামে!" না, না, বড্ড বেশী দাম নিয়েছ, খদ্দের যদি বাজার যাচাই করে তো নিশ্চয়ই টাকা ফেরত নিতে আসবে।" বাবুর কথা শুনে বেশী দামে বিক্রী করার

জন্য সুদীপের যেমন আনন্দ হ'ল, তেমনি হয়ত টাকা ফেরত দিতে হতে পারে জেনে তার দুঃখও হ'ল। মনে-মনে ভাবল সকাল বেলার বউনির খদ্দের, তার জীবনের প্রথম বিক্রয়, আর শেষকালে কিনা বেশী দাম নেওয়ার অপরাধে টাকা ফেরত দিতে হবে। সুদীপ যখন এই সব ভাবছে সেই সময় আরও দু'জন কর্ম্মচারী একসঙ্গে দোকানে ঢুকল। তাদের দেখে ছোটবাবু দেরীতে আসার জন্য তিরস্কার করে উঠলেন, কিন্তু উত্তর না দিয়ে তারা ছোটবাবুকে নমস্কার করে ভিতরে প্রবেশ করে যে-যার কাজের জন্য প্রস্তুত হল। ওরই মধ্যে একজন—নাম হরিপদবাবু, সোজা একেবারে দোকানের ভিতর দিকে একটা ছোট চৌকির উপর যেখানে একরাশ খাতাপত্র রাখা আছে সেখানে গিয়ে খাতার কাজে মন দিলেন আর একজন সুদীপেরই পাশে এসে দাঁড়াল। সুদীপ বুঝল এ ভদ্রলোক তারই মত একজন সাধারণ কর্মচারী। ভদ্রলোককে পাশে দাঁড়াতে দেখে সুদীপ আলাপ করে জেনে নিল তার নাম নিতাইচরণ দে। নিতাই সুদীপের চেয়ে দু'চার বছরের বড়ই হবে, সুতরাং নিতাইচরণ প্রথমদিন থেকেই সুদীপের নিতাইদা হয়ে গেল।

অপরিচয়ের সলজ্জ ভাবটা কাটিয়ে সুদীপও হাতে-ধরা প্রাইস-লিষ্ট ফাইলটায় লেখা জিনিষগুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নিতাইয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিল। সুদীপের প্রশ্নের উত্তরে নিতাই একে-একে তাকে অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিতে লাগল—যেমন, বারো গেজ বাই বার গেজ সাইজের কাঁটাতার বলতে কি বোঝায় প্রশ্নের উত্তরে নিতাই একটা কাঁটাতারের বাণ্ডিলের কাছে সুদীপকে নিয়ে গিয়ে দেখাল যে, দুটো তার পাকিয়ে-পাকিয়ে কাঁটাতার তৈরী আর ঐ দুটি পাকানো তারের মধ্যে প্রতি তিন ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি অন্তর-অন্তর চারটি ছুঁচলো মুখবিশিষ্ট তারের কাঁটা বেশ শক্ত করে পাকিয়ে লাগান আছে। এই কাঁটাগুলি আবার দুটি প্রধান তারের সঙ্গে এমন সুনিপুণ ও দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে লাগান আছে যে, হাত দিয়ে ঠেলে দিলে, এমন কি, হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেও স্থানচ্যুত হবে না। নিতাই বুঝিয়ে দিল—দুটি করে তার দিয়ে যদি কাঁটাগুলি পাকান থাকে তবে তাকে টু-প্লাই কাঁটাতার আর প্রধান তার যদি তিনটি করে পাকিয়ে কাঁটাগুলিকে ধরে রাখা হয় তাকে থ্রি-প্লাই কাঁটাতার বলে। আর প্রধান তার ও কাঁটার তার দুটোই যদি বারো গেজের হয় তা হলে তাকে বার বাই বার গেজ কাঁটাতার বলে, আবার প্রধান তার বার গেজ ও কাঁটার তার যদি চৌদ্দ গেজ হয় তাহলে তাকে বার বাই চৌদ্দ কাঁটাতার বলে। নিতাই যখন এই কাঁটাতার সম্বন্ধে বোঝাচ্ছে তখন সুদীপের হঠাৎ খেয়াল হল আসলে গেজটা কি সে তো তাই জানে না। একথা মনে হতেই সুদীপ নিতাইকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা নিতাইদা, এই গেজটা কি ?"

নিতাই তখন দোকানের পিছন দিকে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো দুটো গোলগোল লোহার চাকতি মত জিনিষ নিয়ে এসে সুদীপের হাতে দিলে সুদীপ তার গায়ে লেখা ইংরাজী অক্ষরগুলো পড়ে দেখে যে, একটার গায়ে লেখা আছে বার্মিংহাম ওয়ার গেজ আর একটার গায়ে লেখা স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার গেজ। সুদীপ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাকতিগুলো দেখতে-দেখতে দেখে চাকতি দুটোর কিনারাগুলো কাটা-কাটা আর প্রত্যেকটা কাটা জায়গা সামান্য কিছুটা সমান্তরালভাবে গিয়ে ভিতরটা গোল হয়ে গেছে। ঐ গোলাকার ছিদ্রটার ঠিক নীচেই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় লেখা এক-একটা খাঁজ দেখিয়ে নিতাই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, এক অর্থে এক গেজ, ছয় অর্থে ছয় গেজ, বার অর্থে বার গেজ এবং মুখে বলা হয়ে গেলে একটুকরো বার গেজ তার নিয়ে সে সুদীপকে দেখায় কি ক'রে কেমনভাবে তারের গেজ মাপতে হয়। নিতাই দেখিয়ে দিয়ে আরও দুটো টুকরো তার এনে সুদীপকে দিয়ে বলল, "এবার তুমি মেপে বল দেখি এগুলো কি তার আছে?" নিতাই যেভাবে বার গেজ তারটাকে মেপেছিল ঠিক সেইভাবে মেপে অর্থাৎ কোন্ তারটা কোন্ খাঁজটার সামনের দিক দিয়ে সামান্য দৃঢ়ভাবে ঢুকছে দেখে বলল, "একটা যোল গেজ আর একটা আঠার গেজ।" সুদীপের মাপ নির্ভুল হয়েছে দেখে নিতাই বলল, "এই তো শিখে গেলে তার কিভাবে মাপতে হয়।" তখন সুদীপ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা নিতাইদা, জালের প্রাইস-লিষ্টের মধ্যে দেখছিলাম চার মেস আঠার গেজ, ছয় মেস বিশ গেজ, এগুলো কি? একটা তো বুঝলাম আঠার গেজ মানে আঠার গেজ তার দিয়ে জালটা তৈরী কিন্তু চার মেস কথাটার অর্থ কি?" নিতাই তখন হাসতে-হাসতে জবাব দেয়, "চার মেস মানে হ'ল একটা জালের লম্বার দিকে কিংবা চওড়ার দিকে অর্থাৎ টানা ও বুনন এই দুই দিকে যদি ইঞ্চি কাঠ ফেলে মাপা যায় এবং এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে সারিতে যদি চারটি ছিদ্র থাকে অর্থাৎ এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে যদি মোট ষোলটি ছিদ্র থাকে তবে তাকেই চার মেস বলে। তেমনি এক ইঞ্চি দীর্ঘ সারিতে যদি ছয়টি ছিদ্র থাকে অর্থাৎ এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে যদি ছয় × ছয় অর্থাৎ ছত্রিশটি ছিদ্র থাকে তবে তাকে ছয় মেস জাল বলে।" এর পর নিতাই কয়েকটা জালের রোলের কাছে সুদীপকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলে, "মোটামুটি জাল পঞ্চাশ ফুট লম্বা ও দুই, আড়াই, তিন ফুট বা চার ফুট চওড়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই লম্বার দিকটাকে টানার দিক বলা হয় আর চওড়ার দিকটাকে পোড়েন বা বুননের দিক বলা হয় ইংরাজীতে যাকে যথাক্রমে ওয়ার্প ও ওয়েফ্ট সাইড বলে। সুদীপ এবার নিতাইকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে, "জাল কত রকমের হয়?" এ-প্রশ্নের জবাবে নিতাই বলে, "জাল বহু রকমের হয়, এই যেমন চৌকো ঘরের জাল

দেখছ, যাকে ইংরাজীতে স্কোয়ার মেস বলে, তেমনি আবার ষড়কোণের জালকে হেক্সাগোন্যাল মেস বলে। মুরগী বা পাখী পুষতে এই জালের চাহিদা সব থেকে বেশী বলে একে চিকেন মেস বা বার্ড ফেন্সিং নেটও বলা হয়। এছাড়াও গার্ডেন ফেন্সিং, চেন লিঙ্ক ফেন্সিং, এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল মেস, ওয়েল্ডেড মেস, পারফোরেটেড সীট গ্লাস-সাবষ্টিটিউট নেট ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের জাল হয়। বলতে বলতে নিতাই একবার থেমে যায়, কিন্তু সুদীপ আগ্রহ ভ'রে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে নিতাই আবার বলতে থাকে, "এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল জাল মেসিনে লোহার সীটকে ছিদ্র করে এবং ডাইসে টেনে তৈরী হয়, যেহেতু টেনে-টেনে ঐ ছিদ্রগুলোকে বাড়ানো হয় সেহেতু এর নাম এক্সপ্যাণ্ডেড আবার পারফোরেটেড সীটও ছিদ্র করেই তৈরী হয় ; এর বেলায় বিভিন্ন ধাতুর চাদরের উপর বিভিন্ন মাপের গোল-গোল চাকতি কেটে বা লম্বা-লম্বা ফালি কেটে বাদ দিয়ে চাদরটিকে ছিদ্রযুক্ত করা হয় আর যেহেতু চাদরগুলি ছিদ্রযুক্ত হয় সেহেতু এগুলির নাম সছিদ্র চাদর বা পারফোরেটেড সীট। আর গ্লাস সাবষ্টিটিউট নেট হ'ল বিভিন্ন ধরনের জালের উপর অভ্রের একটা আবরণ দেওয়া অর্থাৎ জালের ছিদ্রগুলি অভ্র দিয়ে ভর্ত্তি করা থাকবে। এগুলি কাচের বদলে ব্যবহার করা যায় বলে এর নাম গ্লাস সাবষ্টিটিউট নেট। এছাড়াও বহু রকমের মোটা ও সরু তারের বড় ও ছোট ঘরের জাল হয় যা বাড়ীর জানালায়, চিড়িয়াখানায়, জেলখানায়, মাছের ভেড়ীতে, বনে, চা বাগানে ও বিভিন্ন কলকারখানা যেমন, ষ্টীল মিল, ময়দা-কল, চিনি-কল, সুতা-কল, কাপড়-কল, পাট-কল, ঔষধের কারখানা, সার-কারখানা, কয়লা-খনি, অভ্র-খনি ইত্যাদি এবং কৃষিক্ষেত্রে, পেট্রোলিয়াম ছাঁকতে, রেলগাড়ী ও মোটরগাড়ীর যন্ত্রাংশে আরও বহু রকম জালের ব্যবহার হয়। বলতে গেলে এই তার ও তারজাত দ্রব্য জাল, কাঁটাতার ইত্যাদি মানুষের বহু প্রয়োজনে লাগে। ধর বাড়ীতে সামান্য একটা আটা-চালা চালুনীতে যেমন এক টুকরো জাল না হলে হয় না, তেমনি বিরাট একটা ষ্টীল-মিল বা ফার্টিলাইজার কারখানাতেও জাল না হলে চলে না। সুদীপ এতক্ষণ নীরবে সবই শুনছিল, এবার সে ধীরে-ধীরে নিতাইকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে' জানতে পারে এই জাল বিভিন্ন ধাতুর তারের হয়, যেমন লোহার, পিতলের, তামার, ব্রোঞ্জের, এলুমিনিয়ামের, স্টেনলেস্-ষ্টীলের ও রূপার তারের।" নিতাই ও সুদীপের কথায় হঠাৎ এতক্ষণে বাধা পড়ে। এতক্ষণে আবার একজন খরিদ্দার দোকানে প্রবেশ করে কাঁটাতার চায় দেখে, সুদীপ তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্ত ও বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "কত গেজের মাল চাই?" ভদ্রলোক বলেন, "বারো গেজ / বার গেজ।" সুদীপ তখন তাঁকে যে-মালটি দেখায় নিতাই দূর হতে তা লক্ষ্য করে দেখে

যে সে ঠিক মালই দেখিয়েছে। নিতাই বুঝতে পারে সুদীপ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, কারণ একবার বলে দেওয়াতেই সে বুঝতে পেরেছে জিনিষটা। এর পর কাঁটাতার ওজন করে খরিদ্দারকে ডেলিভারী দিয়ে সুদীপ আবার এসে নিতাইয়ের কাছে দাঁড়ায় ও প্রশ্ন করে, "আচ্ছা নিতাইদা, জাল তো বিভিন্ন রকমের তার দিয়ে বিভিন্ন সাইজ ও বিভিন্ন মেসের তৈরী হয়, কিন্তু যে-জিনিস হতে জাল প্রস্তুত হয় সেই তার যেমন ধরুন লোহার তার কত রকমের হয় ?" সুদীপের প্রশ্নের উত্তরে নিতাই একটু ভেবে বলে, "লোহার তার বহু রকমের হয়, যেমন ধর মাইল্ড স্টীল অর্থাৎ কাঁচা লোহা, গ্যালভানাইজড স্টীল অর্থাৎ পাকা লোহা। কাঁচা লোহা বললে বুঝতে হবে লোহার-উপর কোন আবরণ থাকে না, আর থাকে না বলে তাড়াতাড়ি জং ধরতে পারে। পাকা লোহা অর্থাৎ গ্যালভানাইজড আয়রণ বলতে বোঝায় যে কাঁচা লোহার উপর জিঙ্কের তথা দস্তার একটা আবরণ দেওয়া হয়। এই পাকা লোহার উপর যেহেতু দস্তার আবরণ থাকে সেহেতু তাড়াতাড়ি জং ধরে না এবং তাই পাকা লোহার তৈরী সামগ্রী ব্যবহারের সুবিধা অনেক এবং চলেও বেশীদিন। এ ছাড়াও কার্ব্বন স্টীল, স্প্রীং স্টীল ইত্যাদি নানা ধরনের লোহার তার হয়, তবে মোটামুটি মাইল্ড ষ্টীল ও গ্যালভানাইজড ষ্টীল এই দুই ধরনের তার ও তারজাত দ্রব্যই সাধারণভাবে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়।" নিতাইয়ের এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে ওদিকে ছোটবাবু উপেন্দ্রের গম্ভীর গলা শোনা গেল। তিনি নিতাইকে সেদিনের মত দোকান বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সুদীপ তাড়াতাড়ি গিয়ে উপেন্দ্রকে প্রণাম করল। সুদীপের প্রণাম করা দেখে উপেন্দ্র বিস্মিতভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন, "কি হে হঠাৎ পেন্নাম কেন ?" সুদীপ অত্যন্ত শান্ত ও সংযত কণ্ঠে জবাব দিল, "আজ যে বিজয়া দশমী।" সুদীপের এই কথা শুনে উপেন্দ্র তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, "তুমি সত্যিই অবাক করলে সুদীপ, আজ পাচ বছর হ'ল আমি এই দোকান করেছি কিন্তু কোনদিন কোন কর্ম্মচারী তো আমায় এমনভাবে প্রণাম করে নি। বড়বাজারে ব্যবসা করলেও আমরাও যে মানুষ, আমাদের মধ্যেও যে একটা যোগসূত্র ও সম্পর্ক থাকা উচিত এটা যেন তুমি আজ আমায় বুঝিয়ে দিলে। সত্যিই সুদীপ, আজ তোমার প্রথম দিনের ব্যবহারে আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি মন দিয়ে কাজকর্ম্ম শেখ, ঈশ্বর তোমায় অনেক বড় করবেন।" এই কথাগুলি বলে, উপেন্দ্র ঠাকুর-প্রণাম করে বাড়ী যাবার আগে মউজীরামকে দরজায় তালা বন্ধ করে চাবি বাড়ীতে পৌছে দেবার নির্দ্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

উপেন্দ্র চলে যাওয়ার পর নিতাই মাল তুলে দোকান বন্ধের ব্যবস্থা করতে লাগল আর হরিপদ সুদীপকে কাছে ডেকে রসিকতার সুরে বলতে লাগলেন, "কি

হে, একদিনেতেই যে বড্ড বাড়াবাড়ি দেখছি, এত কৈটালি ভাল নয়, একটু সাবধানে চলো, বুঝলে?" কথাগুলো হরিপদবাবু এমনভাবে বললেন, যেন সুদীপ আজ প্রথম দিনেতেই বিরাট একটা অন্যায় কিছু করে বসে আছে। নিতাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হলেও এই হরিপদবাবুর সঙ্গে এখনও পর্য্যন্ত তেমন পরিচয় হয় নি, তাই তাঁর কথার অর্থ কিছুই না বুঝে সুদীপ শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। হাঁ করে সুদীপকে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে হরিপদবাবু আবার খেঁকিয়ে উঠলেন, "আবার পেন্নাম, একটা লম্পট, মাতাল, বদমাস্ শয়তানকে আবার পেন্নাম করা হচ্ছে, যত্তোসব, হুঃ।" হরিপদবাবুর শেষের কথাগুলি শুনে সুদীপের কণ্ঠ থেকে যেন আপনা-আপনিই বেরিয়ে এল, "কি সব যা-তা বকছেন?" সুদীপের এ-কথায় হরিপদবাবু যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলতে লাগলেন, "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা? আমি যা-তা বকছি? জান এই কোম্পানীর জন্মদিন থেকেই আমি এখানকার খাতাবাবু, আমাকে বলা হচ্ছে কিনা যা-তা বকছি!" সুদীপ আর থাকতে না পেরে একটু হেসে ফেলে এবং যেন মজা করার জন্যই বলে, "খাতাবাবু, আমি তো আপনার ছোট ভাইয়ের মত, কিন্তু হঠাৎ আমার উপর ক্ষেপে গেলেন কেন? অপরাধটা কি?" সুদীপের এ-কথায় হরিপদ দ্বিগুন ক্ষেপে যায় এবং কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলে বলতে থাকে, "কি আমার খাতাবাবু বলে আমায় ঠাট্টা করা হচ্ছে? জানো এই খাতায় কলম চালিয়ে আমি হয়কে নয় আর নয়কে হয় করে দিতে পারি। বুঝবে সেদিন, যেদিন তোমার নামে একশ টাকা হাওলাতী লিখে দেব।" হরিপদবাবুর কথাবার্ত্তা বলার ধরনে সুদীপের যেন আরও মজা লেগে যায়। সে আরও কিছুটা মজা করবার জন্য বলে, "তা হাওলাত না নিলেও হাওলাতী লেখা যায় নাকি?" একথার সঙ্গে-সঙ্গে হরিপদবাবু মুখটায় কেমন একটা বিশেষ ভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠেন, "তবে? তবে কি? খাতা হাতে থাকলে যা-ইচ্ছা-তাই করা যায়। দেব হাওলাতী লিখে, তখন ঐ মাইনের টাকা থেকে শোধ দিতে-দিতে জীবন শেষ হয়ে যাবে। ঘরকে আর কিস্‌স্যু নিয়ে যেতে হবে না, বুঝলে? আমার সঙ্গে আর কোনদিন যেন জ্যাঠামো করতে এসো না, জ্যাঠামো করতে এয়েচো কি মরেচো, অমনি হাওলাতী।" এই বলে সুদীপের দিকে একবার বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে হরিপদ বের হয়ে যায়। এতক্ষণ রহস্য করলেও হরিপদ চলে যাওয়ার পর সুদীপের ভয় লাগে কারণ এই ধরনের লোকের সঙ্গে সুদীপের সম্যক্ পরিচয় আছে; তার নিজের গ্রামে, গ্রামের আশপাশের বহু গ্রামে এরকম লোক বহু আছে যারা গরীব লোকদের টাকা না দিয়ে বা কম টাকা দিয়ে বেশী টাকায় হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেয়। খাতায় কলমে

এরা পারে না এমন কাজ নেই। সুদীপ ভয়ে-ভয়ে নিতাইকে প্রশ্ন করে, "নিতাইদা, কি হবে? সত্যি-সত্যি যদি হরিপদবাবু আমার নামে হাওলাতী লিখে দেয়?" তার ঐ প্রশ্নে নিতাই গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, "তা দিতে পারে, ও সাংঘাতিক লোক, ওর অসাধ্য কাজ নাই।" বলেই নিতাই হাতের কাজ ফেলে রেখে সুদীপকে বলে, "শোন সুদীপ, আমরা গরীবের ছেলে, সামান্য দশ-বিশ টাকা মাইনের কাজ করতে এসেছি, আর খাতাবাবুর ষাট টাকা মাইনে, তার উপর ঐ খাতাপত্র কালি-কলম কিনতে-টিনতে গিয়ে দু-দশ টাকা কমিশনও পায়, সুতরাং ওর সঙ্গে লাগতে যেও না ভাই, ওর সঙ্গে ভুলেও তুমি রসিকতা করতে যেও না কোনদিন। সেই যে কথায় বলে না বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, এও হ'ল তাই। বাবুর থেকেও হরিপদ-বাবুর মেজাজ এক কাঠি উপরে। তুমি নতুন এসেছ, এ-সব তো জানো না, তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ওকে ঘাঁটালে বাবুর কাছে আমাদের নামে যা-তা বলবে, মিথ্যা-মিথ্যা অপবাদ দেবে। ওর জন্য আমাকে বহুবার অহেতুক অপমান সহ্য করতে হয়েছে।" নিতাইয়ের কথা শুনে মউজীরামও সুদীপকে বলে "এ খোকাবাবু, লিতাইবাবু ঠিক বুলছেন, ও-লোকটাকে আপনি বিশেষ কিছু বলবেন না।"

নিতাই ও মউজীরামের কথা শুনে সুদীপের মনে হয় লোকটার এত দেমাকের কারণ কি। শুধু খাতার কাজ জানে বলে? মনে মনে তার প্রশ্ন জাগে—খাতার কাজ জানলেই কি যা খুশী তাই করা যায়? নিশ্চয়ই না, সেখানেও সততা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। এই সব ভাবতে-ভাবতে সুদীপ মনে-মনে সঙ্কল্প করে খাতার কাজটাও তাকে শিখতে হবে, আর ওটা শিখতে তার অসুবিধা হবে না, কারণ তার বাবাই তো একজন খাতা লেখার পাকা লোক।

দোকান বন্ধ করে সকলে যে-যার বাসায় চলে যায়। সুদীপও মেসে ফেরে। মেসে ফিরে সুদীপ রাত্রের আহারের জন্য রন্ধনে ব্যাপৃত হয়, কারণ আজ সতীন্দ্রবাবুও কলকাতায় ফিরবেন। যথাসময়ে রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে সুদীপ সন্ধ্যা নাগাদ মেস থেকে বের হয়ে নিমতলা ট্রামগুমটির কাছে আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে থাকে। সুদীপ কলকাতার দুর্গাপ্রতিমা এই প্রথম দেখছে, তাই তার দৃষ্টিতে বিসর্জনের জন্য গঙ্গার দিকে ধাবমান সাজসজ্জাহীন এই প্রতিমাগুলিও অত্যন্ত সুন্দর লাগে। কোন কোন প্রতিমা সপরিবারে একই চালে, আবার কেউ কেউ পৃথকভাবে অর্থাৎ দুর্গা-অসুর এক চালে আর লক্ষ্মী-সরস্বতী কার্তিক-গণেশ পৃথক পৃথকভাবে লোকের কাঁধে চড়ে চলেছেন। প্রতিমা দেখে সুদীপের মনে হয় যেন সব প্রতিমাই জীবন্ত ও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।

প্রতিমা দেখতে দেখতে প্রতিমাশিল্পীদের উদ্দেশে সুদীপের মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। শেষে প্রতিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সে এক সময় ঘরে ফিরে। মেসে ফিরে দেখে তখনও পর্য্যন্ত সতীন্দ্রবাবু বাঘাসন থেকে আসেন নি। সুদীপ ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তার দিকের বারান্দাটায় দাঁড়ায়। বারান্দায় দাঁড়াতেই আজ সারাদিনের সমস্ত ঘটনা সুদীপের চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে। দোকান বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে হরিপদবাবুর কথাগুলো সুদীপের মনে পড়ে যায়। সে মনে মনে ভাবে উপেন্দ্রবাবুকে প্রণাম করার জন্য সুদীপকে তিরস্কার করে হরিপদবাবু উপেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে যে কথাগুলো বললেন, সে কথাগুলো কি সত্যি? অমন সুদেহী সুপুরুষ উপেন্দ্রবাবুর বয়স খুব বেশী হলে হয়ত বাইশ কি তেইশ অর্থাৎ একেবারে তরুণ। এক অভিজাত পরিবারের এত অল্পবয়স্ক একটি তরুণের সম্পর্কে বলা কথাগুলি কি সত্যি হতে পারে? নাও হতে পারে। সুদীপ ভাবতে থাকে, দুপুরে বলা হরিপদবাবুর কথাগুলো হয়ত তারুণ্যের প্রতি বার্দ্ধক্যের স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষাপরায়ণতা থেকে উদ্ভূত কিছু বাক্যের সমষ্টি। সুদীপ এই সব ভাবছিল এমন সময় তাদের ঘরের দরজায় কড়ানাড়া পড়তেই সুদীপের চমক ভাঙ্গে এবং তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে দিয়ে সামনে বাবাকে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। সতীন্দ্রবাবু ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন বটে, কিন্তু সুদীপ লক্ষ্য করল যে, বাবার মুখখানা গাম্ভীর্য্যে থমথম্ করছে। সুদীপ ভাল করে বাবার মুখের পানে চেয়ে বুঝতে পারল এ গাম্ভীর্য্য ছদ্ম গাম্ভীর্য্য নয়। সতীন্দ্রবাবুর মত সৎ ও কর্ম্মনিষ্ঠ মানুষের মুখে যখন এ ধরনের গাম্ভীর্য্যের প্রতিফলন দেখা যায়, তখন সুদীপের মত বুদ্ধিমান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই গাম্ভীর্য্য অন্তরের একটা গভীর মর্ম্মবেদনার প্রতিফলন। এই যন্ত্রণার যে কি কারণ তাও সুদীপ জানে, তাই আর একবার সে বাবার কাছে গিয়ে বাবার পায়ে হাত রেখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে, "বাবা, তুমি আমায় ক্ষমা কর, তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে আমি চাকরিতে ঢুকেছি।" সুদীপের এই কাতর ক্ষমা প্রার্থনায় সতীন্দ্রবাবুরও চমক ভাঙ্গে। গতকাল সুচন্দ্রার মুখ থেকে সুদীপের চাকরীর কথা শোনার পর থেকে তাঁর মনটা বেশ ভারী হয়েছিল, কিন্তু এখন যেন তাঁর মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল। তাঁর যেন মনে হল তাঁর দৈন্যের সংসারে সাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা সৃষ্টির আশায়ই তো তাঁর ছেলে সুদীপ স্বচেষ্টায় চাকরি জোগাড় করে নিয়েছে এই বয়সে নিজের খেলাধূলা পড়াশুনা কৈশোরের চাপল্য আনন্দ সব জলাঞ্জলি দিয়ে। সংসারের দুঃখকষ্টের জোয়ালটা তাঁর নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে সে স্বস্কন্ধে তুলে নিতে চাইছে। এই মুহূর্তে

সতীন্দ্রবাবুর মনে হল সুদীপ কোন অন্যায়ই করে নি, বরং সে সন্তানের কাজই করেছে। সতীন্দ্রবাবু নীচু হয়ে সুদীপের একটা হাত ধরে পদতল থেকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

পরদিন সুদীপ যথাসময়ে নন্দী কোম্পানীতে গিয়ে কাজে যোগ দিল। আজও সুদীপ লক্ষ্য করল ছোটবাবু অর্থাৎ উপেন্দ্রবাবু বেলা প্রায় একটা নাগাদ দোকানে এসে পৌঁছলেন। ছোটবাবু আসবার আগে থেকেই দোকানে যথারীতি বেচাকেনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। নিতাই ও সুদীপ দুজনে এরই মধ্যে প্রায় শ'তিনেক টাকার মত মাল বিক্রয় করেছে। উপেন্দ্রবাবু আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন সাহেব এসে দোকানে ঢুকল এবং বাবুর সামনে চেয়ারে বসে তাঁর হাতের ব্যাগ খুলে কি যেন একটা মালের নমুনা বাবুর হাতে দিল। উপেন্দ্রবাবু একবার হাতে করে নেড়ে-চেড়ে দেখে নমুনাটা নিতাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন, "নিতাই, দেখ তো, এটা কত মেস জাল আছে। জালের টুক্‌রোটা হাতে নিয়ে নিতাই বাবুর টেবিল থেকে ছোট্ট মত কি যেন একটা যন্ত্র তুলে নিয়ে সেটা জালের গায়ে লাগিয়ে যন্ত্রটার কাঁচে চোখ দিয়ে জালটা কিছুক্ষণ দেখে বলল, "এটা পিতলের তারের একশ' মেস জাল আছে।" এর পর ছোটবাবু সাহেব ভদ্রলোককে বললেন, "এর দাম পড়বে দু'টাকা আট আনা স্কোয়ার ফুট।" সাহেব শুনে বললেন, "ইট ইজ টু মাচ, কুছু চিপ করবে তো হামি নিবে।" এর পর কিছু কমিয়ে দু' টাকা চার আনা স্কোয়ার ফুটে সাহেবকে তিনশ' স্কোয়ার ফুট মাল বিক্রয় করা হল। ছয় শত পঁচাত্তর টাকার জাল নিয়ে সাহেব চলে গেল।

সাহেব চলে যাওয়ার পর সুদীপ নিতাইকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল নিতাই কি ভাবে বুঝতে পারল যে জালটা একশ' মেস জাল। উত্তরে নিতাই আবার বাবুর টেবিল থেকে সেই ছোট্ট মত যন্ত্রটা তুলে নিয়ে প্রথমে সেটার সম্বন্ধে সুদীপকে বুঝিয়ে দিল। নিতাই বলল, "এটার নাম হ'ল আই-গ্লাস বা কাউনটিং গ্লাস। চোখের সামনে লাগিয়ে দেখা হয় বলে একে আই-গ্লাস বলে। আবার যেহেতু বিভিন্ন ঘরের জাল গোণা যায় সেহেতু এর নাম কাউনটিং গ্লাস"। নিতাইয়ের কথা অনুসরণ করে সুদীপ দেখতে পায় যে, যন্ত্রটার সমান্তরাল দুটো অংশ ধরে আছে আর একটা অংশ যার গায়ে ঐ দুটো অংশকে ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখা যায়। সমান্তরাল দুটি অংশের একদিকে মাঝখানে কিছুটা জায়গায় গোল মত একটা লেন্স লাগানো, আর ঐ লেন্সের দিকে নীচের অপর অংশটা নিখুঁতভাবে সিকি ইঞ্চি মত চৌকো করে কাটা। ঐ চৌকো জায়গাটা জালের গায়ে লাগিয়ে লেন্সটা চোখের কাছে নিয়ে সুদীপ দেখতে পেল জালের ঘরগুলো বেশ বড়-বড় লাগছে এবং একটি-একটি

ক'রে গুণে সে দেখল ঐ সিকি ইঞ্চি চৌকো জায়গার মধ্যে মোট পঁচিশটা ঘর রয়েছে। সিকি ইঞ্চিতে পঁচিশটা, অর্থাৎ ইঞ্চিতে পঁচিশ × চার = একশতটা ঘর আছে। সুদীপ এতক্ষণে বুঝল কেন নিতাইদা এই জালটাকে একশ মেস জাল বলছিল।

সুদীপ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মিহি ঘরের বিভিন্ন জালের গায়ে আই-গ্লাস লাগিয়ে গুণে-গুণে দেখতে লাগল এবং দেখে বুঝল যে, কোনটা তিরিশ মেস, কোনটা চল্লিশ মেস, কোনটা ষাট মেস জাল। এইভাবে অনেকক্ষণ জাল দেখার পর সুদীপ আই-গ্লাসটা নামিয়ে রেখে দিল। ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক এসে বেলচা কিনতে চাইল এবং বলল, "চার নম্বর বেলচা দিন"। নিতাই চার নম্বর বেলচা দেখাল এবং দামদস্তুর ঠিক হওয়ায় এক গ্রোস বেলচাও বিক্রয় হ'ল। এবার সুদীপ নিতাইকে ধরল বেলচাটা চার নম্বর কি করে বোঝা যায়। নিতাই তখন সুদীপকে বোঝাল বেলচার ওজন অনুযায়ী নম্বর হয়, যেমন ধর, আড়াই সের ওজনের বেলচাকে চার নম্বর বেলচা বলে। তিনসের ওজনের বেলচাকে ছয় নম্বর বেলচা বলে! এতক্ষণে সুদীপের মাথায় ঢুকল আসল ব্যাপারটা কি।

এইভাবে দিনের পর দিন আপন অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহের তাগিদে সুদীপ অতি অল্পদিনেই দোকানের কাজকর্ম্ম মোটামুটি শিখে ফেলল এবং ছোটবাবুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। যে খরিদ্দার একবার নন্দী কোম্পানীতে উঠত সুদীপের অতীব মধুর ব্যবহারে তার আর মাল না কিনে ফিরবার উপায় থাকত না। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে, সসম্মানে এবং অত্যন্ত আপন জনের মত ব্যবহার করত বলে সুদীপ বছর দুয়েকের ভিতর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের হার্ডওয়্যার পটীতে একজন বেষ্ট-সেলস্‌ম্যান হয়ে উঠল।

সতীন্দ্রবাবু ইতিমধ্যে হীরেনের মারফত বাঁকুড়া জেলার ছাতারকানালী গ্রামের কমলাক্ষ সামন্ত মশায়ের কন্যা সুরমার সঙ্গে সুদীপের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করলেন। তিনি সুদীপের বিবাহের জন্য তৎপর হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের বংশে খুব বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সুদীপ এ সবের কিছুই আগে থেকে জানতে পারল না। জানল শুধু আশীর্ব্বাদের দিন, যখন কমলাক্ষবাবু ও তাঁর এক খুড়তুতো ভাই সুদীপকে আশীর্ব্বাদ করতে ঐ কলকাতার মেস বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। আশীর্ব্বাদের কাজ সমাপ্ত হলে সুদীপ একসময় হীরেনকে শুধু গভীর দুঃখের সঙ্গে বলল, "হীরেন দা, তুমি শেষকালে এই করলে? দেখছ নিজের খাবার সংস্থান নাই, তার উপর আবার আর একজনকে এই দুঃখকষ্টের মধ্যে এনে ফেলবার ষড়যন্ত্র করলে, ভুলেও একবার আমায় আগে জানতে দিলে না?"

হীরেন সুদীপের হাত দুটো চেপে ধ'রে বলল, "আমায় ক্ষমা কর ভাই। কাকাবাবু বেশ কিছুদিন ধরে বড্ড পীড়াপীড়ি করছিলেন আমায়। তা ছাড়া তোকে বলতে

তাঁরই মানা ছিল, তাই বলতে পারি নি। গুরুজনের কথার অবাধ্য হয়ে তোকে বললে পরোক্ষে তাঁকেই অসম্মান করা হ'ত। আমার দিকটা ভেবে তুই আমায় ক্ষমা কর ভাই। তা ছাড়া যেখানে তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস বা যে তোর সহধর্ম্মিণী হয়ে আসবে তাকে আমি অত্যন্ত শিশুকাল থেকেই জানি। সে কোনদিক দিয়েই তোর অযোগ্য হবে না। রূপে সরস্বতী না হলেও গুণে যে লক্ষ্মী এ কথা আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পরি। আমি তোর মঙ্গলের কথা ভেবেই এত জায়গা থাকতে ওখানে ঐ এত দূরে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করলাম। কারণ আমি নিশ্চিত জানি সুরমার মত মেয়েকে পাশে পেলে তুই সুখী হবি, তোর জীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

হীরেনের কথায় সুদীপ আর কিছু বলতে সাহস করল না, কারণ বন্ধু-স্থানীয় হলেও হীরেনকে আজও সে দাদা বলে সম্মান করে। অন্তরের নিভৃতে মেয়েটি ও তার পরিজনবর্গ সম্বন্ধে হাজার প্রশ্ন উঁকি দিলেও সামাজিক রীতির কথা ভেবে সুদীপ আর কিছু প্রশ্ন করল না। শুধু নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্য আর একবার বলল, "আগে একবার বললেই পারতে।"

হীরেন আবার বলল, "আগে কেন তোকে বলতে পারি নি তা তো বলেইছি, এবার তোর যা খুশী আমায় বল্ আমি সব সহ্য করব।" হীরেনের এ কথার পর সুদীপ এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না, শুধু বলল, "দিনটা যেন আমায় একটু আগে থেকে বলো, কারণ দোকানের মালিককে বলে ছুটি নিতে হবে।"

এর পর মাসখানেকের মধ্যে সুদীপের বিয়ে হয়ে গেল কার্যোপলক্ষ্যে রাঁচি-নিবাসী বাঁকুড়া জেলার এক অভিজাত বংশের সন্তান কমলাক্ষ সামন্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরমার সঙ্গে। কমলাক্ষবাবুর অবস্থাও প্রায় সতীন্দ্রবাবুর মতই, তাই তিনিও বলতে গেলে শুধুমাত্র শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠালেন। সুরমা যদিও রাঁচিতে অর্থাৎ শহরে থেকে মানুষ, তবু তার মধ্যে গ্রামের সহজ সারল্য ও সজীবতাটুকু নষ্ট হয় নি, বরং নগরজীবনের ছোঁয়ায় সে অনেক মার্জ্জিত ও বিচার-বোধসম্পন্না হয়ে গড়ে উঠেছে। বিবাহের রাত্রেই সুরমাকে দেখে সুদীপের খুব ভাল লেগে গেল। সুদীপের সব থেকে ভাল লাগল শ্যামাঙ্গী কিশোরীর টানাটানা দুটি ভুরু ও তার নীচে দীঘল দুটি চোখ। সুদীপের মনে হ'ল শুধু চোখ দুটি দিয়েই মেয়েটি অনেক কথা বলে বা বুঝিয়ে দিতে পারে। বাসরঘরে ঢুকে সুদীপ নিভৃতে একসময় মেয়েটিকে প্রশ্ন করল, "কি নাম তোমার?" পরিষ্কার নিষ্কম্প মধুর সুরেলা স্বরে মেয়েটি অত্যন্ত ধীরে জবাব দিল, "সুরমা দত্ত"। সুরমার এই জবাবে সুদীপ বুঝল মেয়েটি বেশী দূর লেখাপড়া না শিখলেও স্বভাবতই বুদ্ধিমতী,

কারণ সবেমাত্র বিবাহের পরে নাম জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ মেয়েরই ভুল হবার সম্ভাবনা, কারণ পিতার উপাধি বলে ফেলবার সম্ভাবনাই সেক্ষেত্রে প্রবল থাকে। কিন্তু এ মেয়েটি গোত্রান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে "সুরমা দত্ত" বলে পরিচয় দিয়েছে অর্থাৎ স্বামীর উপাধি বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। সুদীপ মনে-মনে খুশীই হয়।

এর পর নববধূ গৃহে এলে ক্রমে দেখা গেল সংসারের কাজ-কর্ম্ম সেবা-যত্ন সব দিক দিয়ে সে সত্যিই যেন জীবন্ত লক্ষ্মী, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-পরিজন সবাই বড় বৌ বলতে অজ্ঞান। সুদীপের বিধবা বোন কমলাও যেন এতদিনে যথার্থ বন্ধু পেল। কমলার দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে সুরমা কমলাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কাঁদে; কমলার স্বামীর অকাল মৃত্যু যেন তারই কোন পরমাত্মীয় বিয়োগের সমান। তার মনের মত ব্যথার ব্যথী পেয়ে কমলাও 'বৌদি, বৌদি', করে বৌদির নিকট সান্ত্বনা খুঁজে পায়। সুরমা অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেছিল তাই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি সে অনায়াসে সুর করে পড়তে পারত, কমলাও তার পাশে বসে চুপ করে শুনে-শুনে ঐ সব গ্রন্থ পাঠের সুর ও কথার অর্থ সব শিখে নিত। একলা থাকার সময় ঐ সব বই পড়েই সময় কাটিয়ে নিজের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজত। সুদীপ পরের চাকরী করে; তাই ইচ্ছা হলেও সে যখন-তখন বাড়ী আসতে পারত না, আর সেজন্য ননদ-ভাজ দু'জনে দু'জনের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজত। একজন খুঁজত বিরহের সান্ত্বনা আর একজন সব হারানোর ব্যথার সান্ত্বনা।

দিন এইভাবেই গড়িয়ে চলছিল। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি একদিন সকাল থেকেই আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। দেখে মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি যেন গোটা কলকাতাটাকে, শুধু গোটা কলকাতাকেই বা কেন, গোটা দেশটাকেই হয়ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর শুধু বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে আছে ঝোড়ো হাওয়া, বিদ্যুতের ঝলকানি ও কড়কড় করে বজ্রপাতের ধ্বনি। মেসের ঘরে বসে-বসে সুদীপ 'সঞ্চয়িতা'র পাতা ওল্টাচ্ছিল এবং একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল। তার আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে হীরেনও তার পাশে বসে আবৃত্তি শুনছিল। এমন সময় মউজীরাম বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে কাক-ভেজা হয়ে সুদীপের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মউজীকে দেখে সুদীপ তাড়াতাড়ি 'সঞ্চয়িতা' নামিয়ে দ্রুতপদে বারান্দায় বেরিয়ে মউজীর কাছে এসে প্রশ্ন করে, "কি ব্যাপার মউজী? এই এত বৃষ্টিতে বেরিয়েছ কেন? দোকানের চাবি দিতে এসেছ নাকি?"

মউজী বলে, "না খোকাবাবু, মাইজী বলেছেন, দোকান-ওকান খুলতে হোবে না। আপনি জলদি করে একবার ছোটবাবুর বাড়ী চলেন।" মউজীর কথায় সুদীপ এক আকাশ বিস্ময় নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বলল, "আমাকে? মাইজী ডেকেছেন?" মনে-মনে ভাবতে থাকে, কি জানি কি ব্যাপার? উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী হঠাৎ এই এত বৃষ্টির মধ্যে সাতসকালে ডাকতে পাঠালেন কেন? যাই হোক, মউজীর নাছোড়বান্দাভাব দেখে সুদীপ বেশ বুঝতে পারে যে, ছোটবাবুর বাড়ী অর্থাৎ দুই নম্বর ভুবন সরকার লেনে না গিয়ে তার উপায় নেই। সে একবার ভাবে হয়ত কোন বিপদ-আপদ বা উপেন্দ্রবাবুর শরীর-টরীর খারাপ হয়ে থাকবে, তাই তাঁর স্ত্রী অনুপমা দেবী নিরুপায় হয়েই সুদীপকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। যেই এ কথা সুদীপের মনে উদয় হয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে সে আলনা থেকে একটা আধময়লা সার্ট গায়ে গলিয়ে নিয়ে মউজীর সঙ্গে ভুবন সরকার লেনের উদ্দেশে রওনা হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মউজী ও সুদীপ ছোটবাবুর বাড়ীতে এসে পৌঁছলো। সুদীপের মেসের বাড়ী হতে উপেন্দ্রবাবুর বাড়ী হাঁটাপথে মিনিট পনরর রাস্তা, কিন্তু বৃষ্টির যা দাপট তাতে মেসবাড়ীর বাইরে আসার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুদীপ মউজীর মতই একেবারে কাক-ভেজা হয়ে গেল। গায়ের জামা, পরনের ধুতি সব একেবারে ভিজে গিয়ে জড়িয়ে-জাপটে গায়ের সঙ্গে লেগে গেল। বাড়ীতে ঢুকে সুদীপকে একতলার বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে মউজী উপরে খবর দিতে গেল আর সুদীপ নিজের কাপড়-জামা নিঙ্ড়ে-নিঙ্ড়ে জল বের করতে লাগল। সুদীপ যখন গায়ের জামা-কাপড় থেকে জল নিঙ্ড়ে জ্যাবজ্যাবে ভাব থেকে রেহাই পাবার অনর্থক প্রচেষ্টায় রত, ঠিক সেই সময় দোতলার বারান্দা থেকে মহিলাকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, "উপরে এস।" কণ্ঠধ্বনিতে চকিত হয়ে উপরে চাইতেই সুদীপ দেখতে পেল দু'হাতে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এক অল্পবয়স্কা মহিলা। মহিলা বললে ভুলই হয়, সুদীপের মনে হ'ল যেন সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণা অপরূপা এক কিশোরী। নীচের বারান্দা থেকে শুধু মহিলার দু'খানি বাহু ও মুখটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তাতেই সুদীপ বেশ বুঝতে পারছিল যে, মহিলা খুব রূপবতী।

সুদীপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহিলা নম্রমৃদুকণ্ঠে আবার বললেন, "উপরে এস ভাই।" মহিলার এই দ্বিতীয়বারের ডাক শোনার পরে সুদীপ একটু চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক দেখছে দেখে মহিলা বুঝতে পারেন সুদীপ উপরে উঠবার সিঁড়ি খুঁজছে। সুদীপের অবস্থাটা বুঝে অনুপমা দেবী নিজে নেমে এসে সিঁড়ির দরজা থেকে সুদীপকে "এস ভাই" বলে ডাক দেন। অনুপমার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে সিঁড়ির দরজার দিকে চোখ পড়তেই সুদীপ দেখতে পায় অনুপমা দেবী সিঁড়ির দরজাটা

খুলে দিয়ে দু'হাত দরজার দু'পাশের ফ্রেমে রেখে দাঁড়িয়ে। অনুপমার দিকে চোখ পড়তেই সুদীপ বুঝতে পারে উপরে দণ্ডায়মানা অনুপমাকে নিচে থেকে যত রূপবতী মনে হয়েছিল, অনুপমা দেবী যেন তার চেয়ে শতগুণে সুন্দরী। তার একবার মনে হয় সে যেন শিল্পীর ইজেলে সযত্নে রক্ষিত বিশ্বখ্যাত কোন শিল্পীর আঁকা মোনালিসার ছবি দেখছে। সুদীপ মনে মনে ভাবে এও কি সম্ভব? নারীর এত রূপ? মানুষের এইরূপ অনুপম দেহবল্লরী হতে পারে আজ অনুপমা দেবীকে না দেখলে তা যেন তার কল্পনারও বাইরে থেকে যেত। সুদীপ কেমন যেন হতচকিতের মত অনুপমা দেবীর মুখের দিকে চেয়েছিল, কিন্তু অনুপমা দেবীর দ্বিতীয় বারের ডাকে তার চমক ভাঙ্গে এবং তাঁকে নমস্কার করে তাঁর পশ্চাতে গুটিগুটি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার সময় সুদীপ লক্ষ্য করে হীরেনদার সঙ্গে যখন লাহাদের বাড়ী খেতে যেত তখন লাহাদের বাড়ীতেও এইরকম সব রঙ-বেরঙের পাথর-বসানো, নক্সা-করা সিঁড়ি দেখেছিল। তার একবার মনে হ'ল তার বাবু অর্থাৎ উপেন্দ্রবাবুও তাহলে বিরাট ধনী ব্যক্তি। একথা মনে হতেই সুদীপের মনটা আনন্দে ভরে গেল, তার যেন ভাবতেও ভাল লাগছিল যে, সে তাহলে লাহাদের মতই আর এক ধনী ব্যক্তির আশ্রয়ে মানুষ হবার সুযোগ পেয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে লাহাদের সঙ্গে নন্দীবাবুদের ব্যবহারের তফাতটাও তার নজরে এল। লাহাদের বাড়ীতে যে ব্যবহারটা সুদীপ-হীরেনের মত ছেলেরা পায় সেটা তাদের অনিচ্ছা-উদ্ভূত ধনীর ব্যবহার যার মধ্যে অন্তরের কোন যোগই সুদীপের নজরে কখনও কোন সময়েই পড়ে নি।

কয়েকটি গরীব মেধাবী ছাত্রকে তাঁরা একবেলা দুটি করে ভাত দেন বটে, তবে সেই ভাত দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাতের মতই অগণ্য বাক্যের বাণও মাঝে-মাঝে নিক্ষেপ করে থাকেন, কোনদিন খেতে যেতে দেরী হ'লে; একবারের বেশী দু'বার ভাত চেয়ে ফেললে তো আর রক্ষে নেই, সেদিন বাবু থেকে ঠাকুর-চাকর-ঝি পর্য্যন্ত সবাই সুদীপ-হীরেনের মত ছেলেকে যা নয় তাই বলে অপমান ও হেনস্তা করে থাকেন অর্থাৎ কথায়-কথায় বুঝিয়ে দেন যে, তারা গরীব, পরান্নভোজী, তাঁদের দয়ায় বেঁচে আছে। হীরেনদার মুখে সুদীপ পরে শুনেছে যে, লাহাদের বিদ্যোৎসাহী কোন পূর্বপুরুষের উইল অনুযায়ীই আজকের লাহাদের বাধ্য হয়ে ঐটুকু করতে হচ্ছে, না হলে কি আর হীরেন-সুদীপের মত ছেলেকে ওঁরা পাত্তা দিতেন। যেদিন থেকে সুদীপ এই সব জানতে পেরেছে সেই দিন থেকেই সসম্মানে সরে পড়ার মতলবে সে হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে এবং হীরেনদার সহযোগিতায় নন্দী কোম্পানীর এই চাকরি সে পেয়েছে। আর তাই তাঁদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসবার তার সুযোগ ঘটেছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সুদীপের

মাথার ভিতর দিয়ে অসংখ্য ভাবনা খেলা করে গেল। তারপর অনুপমার ডাকে তার চমক ভাঙ্গল। অনুপমা বারান্দায় দণ্ডায়মান সুদীপকে বললেন, "তোমাকে এই এত বৃষ্টিতে ডেকে এনেছি ব'লে খুব অবাক লাগছে তো? কিন্তু এ ছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না ভাই। তোমাদের ছোটবাবু সেই গতকাল সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হয়েছেন, আজ এই এত বেলা পর্য্যন্ত ফেরেন নি। কোথায় যে গেছেন ঠিকানাও তো জানি না, তবে লোকের মুখে শুনেছি উনি নাকি সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও গ্রে ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় যান। অন্য সময় এরকম হলে নিতাই বা হরিপদবাবু গিয়ে ওঁকে নিয়ে আসে, কিন্তু আজ এই বৃষ্টিতে নিতাই বা হরিপদবাবু কেউই তো দোকানে আসবেন না, তাই অগত্যা তোমায় ডেকেছি। পারবে ভাই ওনাকে খুঁজে আনতে?" শেষের দিকের কথাগুলো বলার সময় অনুপমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন কেঁপে যায় এবং তাঁর কথায় কেমন যেন আন্তরিক আকুলতা ও বিষণ্ণতাও প্রকাশ পায়। সুদীপ ব্যাপারটি কিছুই বুঝতে পারে না, তাই নীরবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সুদীপের এই হতচকিত অবস্থা দেখে অনুপমা আবার বলে ওঠেন, "যাও ভাই, দাঁড়িয়ে থেকো না, একলা যদি না যেতে পারো তাহলে মউজীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।" শেষের এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ ঠেলে কান্না উঠে এল এবং বড় বড় দুটি চোখের কোল বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। অনুপমা দেবী নিজেকে সংবরণ করবার জন্যই দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আরও মিনিট দুয়েক হতভম্বের মত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সুদীপ মউজীকে ডেকে নিয়ে নন্দীবাড়ীর বাইরে বের হয়ে এল।

নন্দীবাড়ীর বাইরে এসে রাস্তায় পড়তেই সুদীপ দেখল পথঘাট জলে থৈথৈ করছে, ফুটপাথ রাস্তা নালা নর্দমা সব একাকার হয়ে গিয়েছে। একটু আগে যখন নন্দীবাড়ীতে সে ঢুকেছিল তখনও এতটা জল রাস্তায় জমে নি, কিন্তু এই মিনিট কয়েকের মধ্যেই যেন সব একাকার। পুরো কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটটাই যেন একটা বড় নদীর চেহারা নিয়েছে আর আশপাশের অলিগলি ও ছোট রাস্তাগুলো সব যেন শাখানদীর চেহারা ধরেছে। যেদিকে তাকাও শুধু জল আর জল। চারদিকের এই জলের মধ্যে বড় বড় বাড়ীগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দেখলে মনে হয় একটা বিরাট সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ কোন দৈত্য এসে যাদুবলে যেন কিছু প্রাসাদ তুলে দিয়ে গেছে। প্রত্যেকটি বাড়ীর দরজা-জানালা এমনভাবে বন্ধ যে, শার্সিপাল্লার ভিতর থেকে বিজলী আলোর রেখা বাইরে থেকে দেখা না গেলে মনেই হ'ত না যে, ঐ অট্টালিকাগুলোর মধ্যে জীবনের

চিহ্ন আছে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এসে পশ্চিমমুখো হয়ে দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে সুদীপ ও মউজী শ্রীমানী মার্কেট ছাড়িয়ে বেশ-কিছুটা এগিয়ে মহেশ ভট্টাচার্য্যের ওষুধের দোকানের কাছে এসে পৌছায়। এখানে রাস্তায় জল কিছুটা কম, তবু দু'জনেই সাবধানে হাঁটে, কারণ রাস্তার জলের সঙ্গে যত নোংরা আবর্জ্জনা, ডাবের খোলা, কলার চোকা, আরও অবর্ণনীয় যত অস্পৃশ্য দ্রব্য সামগ্রী পদে-পদে এসে তাদের পায়ে ঠেকতে থাকে। পল্লীগ্রামের জলকাদা মেখেই সুদীপ এত বড় হয়েছে, সেখানে জলকাদা গায়ে লাগলে কোনদিন এতটা ঘেন্না হয় নি, কিন্তু আজ এই কলকাতা শহরের দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা-মিশ্রিত হাঁটু জলে রাস্তা চলতে তার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকে। আরও কিছুটা এগিয়ে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে বিবেকানন্দ রোড বরাবর দক্ষিণমুখো হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সুদীপ মউজীকে প্রশ্ন করে উপেন্দ্রবাবু কোথায় থাকতে পারেন সে-বিষয় জানতে চাইলে মউজী উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকে। উত্তর না পেয়ে বার-বার প্রশ্ন করাতে মউজী শুধুমাত্র বলে, "চলেন হামার সাথ, দেখতেই পাবেন।" মউজীর এই কথা সুদীপের কাছে খুবই রহস্যময় মনে হয়। সুদীপ যেন ধাঁধায় পড়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন যেন গোলমেলে ঠেকতে থাকে। উপেন্দ্রবাবু রাত্রিভর বাড়ী ফেরেন নি, কোথায় আছেন তা তাঁর স্ত্রী জানেন না, অথচ সামান্য মানুষ মউজীরাম সব জানে। অনেক চিন্তার অঙ্ক সুদীপের মাথায় খেলা করতে চায়, কিন্তু সমাধান কোনটারই হয় না, তাই অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সুদীপ মউজীর সঙ্গে সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও গ্রে ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে কিছুটা পূর্বে একটা চারতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। সুদীপকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে মউজী বাড়ীটার ভিতরে চলে যায়। সুদীপ ঐ বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চারপাশটা একটু দেখে নেয়। দেখে সামনে উল্টোদিকে একটা ছোট্ট পার্ক আর তার ঠিক পাশেতেই একটা পেট্রল পাম্প। পেট্রল পাম্পের গায়েই একটা মোটর গাড়ী সারাবার ছোটখাট কারখানা। তার পাশে একটা টায়ার-টিউব-ব্যাটারি ইত্যাদি মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের দোকান। যেদিকে সে দাঁড়িয়ে, সেখানটার সামনেই একটা পান-বিড়ির দোকান, তার পাশে একটা তেলেভাজার দোকান। তেলেভাজার দোকানে নজর পড়তেই দেখে ঐ প্রচণ্ড বৃষ্টিতেও কি দারুণ ভিড়। বর্ষার দিনে তেলেভাজা খাবার জন্যে বহু লোকে বৃষ্টিতে ভিজেই তেলেভাজা কিনতে এসেছে। লোকের তেলেভাজার লোভ দেখে সুদীপ নিজের কথাটাও একবার ভেবে নেয়। বৃষ্টিবাদলার দিনে আলুর চপ বা বেগুনির সঙ্গে তেল-লঙ্কা

সহযোগে মুড়ি খেতে তারও ভাল লাগে, আর শুধু তারই বা কেন, সুদীপ ভেবে নেয় সম্ভবতঃ প্রতিটি বাঙালীরই ভাল লাগে। সুদীপ যখন তেলেভাজা-মুড়ির চিন্তায় দূরমনস্ক ঠিক তখনই মউজী এসে তার হাত ধরে টানে, বলে, "চলিয়ে, উপরমে ছোটবাবু আছেন।" মউজীর সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপ বাড়ীটার ভিতরে যেতে গিয়ে দেখে বাড়ীটার গায়ে একটা পিতলের ফলকে নম্বর লেখা—সাতাত্তর নম্বর সেণ্ট্রাল এভিনিউ। বাড়ীটি চারতলা। মউজীকে অনুসরণ করে সুদীপ বাড়ীতে ঢুকে দেখে বাড়ীর মাঝখানে একটুকরো চৌকো উঠোন, চার পাশে লাল সিমেণ্ট দিয়ে রঙ-করা উঁচু বারান্দা আর বারান্দার পিছনে চারদিকে চারখানা করে মোট ষোলখানা ঘর, একতলাতেই ষোলখানা। সুদীপ মনে-মনে হিসেব করে নেয় যে, বাড়ীতে মোট চৌষট্টিখানা ঘর আছে। সুদীপ কিছুটা বিস্মিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে দেখে মউজী তার ডান হাতটা ধরে টান দিয়ে বলে, "চলিয়ে, তিন তলামে বাবু হ্যায়।" সুদীপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরে উঠতে-উঠতে হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক ঝাঁক মিষ্টি বাজনার আওয়াজ আর তার সঙ্গে ঘুঙুরের আওয়াজ এসে তার কানে ঢোকে। মউজীর সঙ্গে দোতলার বারান্দায় পৌঁছলে সুদীপ বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কোন ঘরে গানবাজনা হচ্ছে। গানবাজনার সঙ্গে-সঙ্গে মাঝে-মাঝে সমস্বরে হাসির আওয়াজও উঠছে। সুদীপ কেমন যেন হতচকিতের মত বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়ে এবং আবার এদিক ওদিক দেখতে থাকে। দেখতে ইচ্ছা করলেও বারান্দা থেকে কিন্তু কোন ঘরের ভিতরে কি হচ্ছে তা দেখবার উপায় নেই, কারণ প্রত্যেকটি ঘরের দরজায় ঝুলছে মোটা কাপড়ের সুন্দর সুন্দর পর্দা। সুদীপ ঐভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে মউজী তাকে বলে, "চলিয়ে খোকাবাবু, এখানে দাঁড়ানো ভাল নেই।"

বাড়ীটাতে ঢুকেই বাড়ীটাকে সুদীপের কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়েছিল, কিন্তু মউজীর এ কথায় এর রহস্যময়তা যেন আর একটু বৃদ্ধি পেল। সে মউজীকে প্রশ্ন করল, "কেন মউজী, এ বাড়ীতে কি আছে?" মউজী বলল, "আপনি ছোট ছেলে আছেন খোকাবাবু, আপনাকে সব কথা শুনতে নেই। আসেন, চলেন, উপরে চলেন।" মউজীর কথায় সুদীপ আবার একপা একপা করে তিন তলার দিকে উঠতে থাকে, সিঁড়িতে উঠবার সময় একটি মেয়ে প্রায় আলুথালু বেশে একেবারে সুদীপের গা ঘেঁষে তরতর করে নীচে নেমে যায়। সুদীপের গায়ে তার হাতটা ঠেকতেই সুদীপ ভাবে, আচ্ছা বেহায়া মেয়ে তো, একেবারে অচেনা লোকের গায়ে গা ঠেকিয়ে নেমে যাচ্ছে! এর পর তিনতলায় উঠে উত্তরের বারান্দা পার হয়ে পূবের বারান্দায় এসে পড়তেই সুদীপের কানে এসে ঢোকে

অত্যন্ত সুখশ্রাব্য একটি ভজন গান। গানখানি যিনি গাইছেন তাঁর কণ্ঠ যে কতখানি পরিণত এবং সুমধুর তা সুদীপ গানের কয়েকটি কথার উচ্চারণভঙ্গী ও সুরের তানলয় শুনেই বুঝতে পারে। যে-ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসছিল, সে-ঘরের পর্দাটা ঠেলে সুদীপের একবার দেখতে ইচ্ছা করে এবং অন্যমনস্ক ভাবে পর্দায় হাতও দেয়, কিন্তু পর্দায় হাত দেবার সঙ্গে-সঙ্গে একটু আগে বলা মউজীর কথাটায় অর্থাৎ "এ-জায়গা ভাল নয়", তার খেয়াল পড়ে যায়। তখনই সুদীপ পর্দা থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়, কিন্তু ততক্ষণে ঘরের ভিতরের গান বন্ধ হয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ এসেছে, "বাইরে কে? ভিতরে আসুন।" সামান্য দুটি কথা "বাইরে কে? ভিতরে আসুন," কিন্তু সুদীপের মনে হ'ল যেন দুটি কথাই নয়, এ-যেন একই বাঁশীর দুটি কোমল ধ্বনি। সুদীপের মনে হ'ল এও যেন ক্ষণপূর্ব্বে গীত সেই মিষ্টি গানেরই দুটি কথা। শুধু গান থেকে আলাদা করে নিয়ে কথা দুটিকে সাধারণ কথার মত করে উচ্চারণ করা হয়েছে। সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণ সুদীপের সারা অঙ্গে কেমন যেন অননুভূতপূর্ব্ব একটা শিহরণ খেলে যায়। ভিতর থেকে আবার সেই কণ্ঠের ডাক আসে, "কৈ আসুন, ভিতরে আসুন।" এবার মউজী সুদীপকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "যাইয়ে খোকাবাবু, অন্দর যাইয়ে, এ ঘরেই ছোটবাবু আছেন, এইটাই কুসুমবাঈয়ের ঘর।" "কুসুমবাঈ?" মউজীর কণ্ঠে কুসুমবাঈয়ের নামটা উচ্চারিত হতে সুদীপের মাথা হতে পা পর্য্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়। সে মনে-মনে ভাবে কুসুমবাঈ? এই ঘরে আছেন কুসুমবাঈ, যে কুসুমবাঈ সঙ্গীতে অতুলনীয়া, নৃত্যে উর্ব্বশীসমা! সুদীপ এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দরজার পর্দাটা নড়ে উঠতেই দেখতে পায় কুসুমবাঈ স্বয়ং তার সামনে দাঁড়িয়ে। কম্প্রচিত্তে কুসুমবাঈয়ের মুখের দিকে চাইতেই সুদীপ সেখানে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যসুষমার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখতে পায়। এ-বাড়ীর সকল রহস্য সকল বিস্ময় যেন হঠাৎ উন্মোচিত হয়ে স্বপ্নের দেবীসমা এই কুসুমবাঈরূপে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুদীপের বিহ্বল অবস্থা দেখে তার ডান হাতটা নিঃসঙ্কোচে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কুসুম বলল, "আসুন, ভিতরে আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?" বলেই মউজীর দিকে ফিরে বাইরে দরজার কাছে রাখা একটা টুলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আবার বলল, "মউজীরাম, তুমি একটু এখানে এই টুলটায় বস, আমি বাবুকে জাগিয়ে চা খাইয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" মউজীকে বাইরে বসিয়ে সুদীপকে টানতে-টানতে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি চেয়ারে বসিয়ে কুসুম সুদীপকে বলল, "ভিজে একেবারে একসা হয়ে গেছেন, আগে একটু চা খেয়ে শরীরটাকে গরম করে নিন," বলেই সুদীপকে কোন আপত্তির সুযোগ না দিয়ে

কুসুম ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের গায়ে একট দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেল, কুসুম ও-ঘরে গিয়ে ঢুকতেই দু-ঘরের মাঝখানের দরজাটা ধীরে-ধীরে আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে গেল, সুদীপ বুঝল দরজায় নিশ্চয়ই স্প্রীং লাগান আছে। একাকীত্বের সুযোগে এতক্ষণে সুদীপের নিজেকে কিছুটা সচ্ছন্দ মনে হ'ল, তাই সে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ঘরের সমস্ত আসবাব ও খুঁটিনাটি জিনিসপত্র দেখতে লাগল। ঘরখানি বেশ বড়, উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে সুন্দর কাঠের সিংহাসনে শ্বেতপাথরের একটি ছোট্ট রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, তার পাশে একখানি গীতা। মূর্ত্তির গলায় সদ্যপ্রদত্ত মালা, চরণতলে নানা বর্ণের কিছু ফুল ও কপালে চন্দনের ফোঁটা। সিংহাসনের পাশেই পিতলের ছোট্ট ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে এবং দীপাধারে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। সিংহাসনের ঠিক সামনেই একখানি কম্বলের আসন আর তার পাশেই একটি তানপুরা। এসব দেখে সুদীপ এক লহমায় বুঝতে পারে যে, সদ্যস্নাতা কুসুম তা হ'লে এতক্ষণ কৃষ্ণার্চ্চনা শেষে ভজন গীতের মাধ্যমে কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন করছিল। ঘরের অপর দিকে নজর পড়তেই সুদীপ দেখতে পায় দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একজনের শয়নের উপযোগী একটি ছোটখাট আর তার পাশেই একটি কাঠের আলমারী। আলমারীর কাচের পাল্লার এদিক থেকে ভিতরে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের পুতুল ও চিনে মাটির কাপ ডিস, গোটা বার কাচের গেলাস ও খানকয়েক ধর্ম্মগ্রন্থ। আলমারীর জিনিষপত্র, খাটের বিছানা ও ঘরের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী এমনই সুপরিপাটিরূপে সজ্জিত যে, একনজর দেখলেই গৃহস্বামিনীর রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সুদীপ স্তব্ধ বিস্ময়ে সবকিছু যখন দেখছিল ঠিক তখনই এক পেয়ালা চা, কিছু ঘিয়ে-ভাজা বাদাম ও খানকয়েক বিস্কুট হাতে নিয়ে কুসুম তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সুদীপ কুসুমকে তার সামনে দেখে সসঙ্কোচে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বা সুপ্রতুল ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোন মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন বা অপ্রতুল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ যেমন কথা বলতে লজ্জা পায় বা সঙ্কোচ বোধ করে, এই মুহূর্ত্তে সুদীপের মনেও যেন সেই লজ্জা বা সঙ্কোচটাই চেপে বসে; সে যেন কেমন আত্মভোলা দৃষ্টিতে শুধু কুসুমের দিকে চেয়ে থাকে। কুসুমের মুখের দিকে চেয়ে সুদীপের মনে হয় ও-মুখে যেন স্বর্গীয় উজ্জ্বলতা আর চিত্তবিমোহনকারী সুকুমার শান্তশ্রী রয়েছে।

হাতের চায়ের ট্রেটা সুদীপের চেয়ারের পাশে রক্ষিত একটি ছোট্ট টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে হাসতে-হাসতে সুদীপকে লক্ষ্য করে কুসুম বলে, "নিন, এগুলো একটু খেয়ে নিন, আমি বাবুকে জাগিয়ে দিয়েছি, মিনিট পনরর মধ্যে উনি

ব্াইরে আসবেন।” কুসুমের কথায় সুদীপ একবার রুদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করে “বাবু ?” কুসুম ঠিক তেমনিই হাসতে-হাসতে বলে, “কেন আপনাদের ছোট বাবুকে নিয়ে যাবেন না ?” কুসুমের এই কথায় একটা মধুময় পবিত্র বিহ্বলতা যা এতক্ষণ সুদীপকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল সেটা যেন হঠাৎ কেটে যায় এবং বিচিত্র একটা স্বপ্নের রাজ্য থেকে নেমে সে বাস্তবে পা রাখে। তার মনে পড়ে সে কে, এবং কেন এখানে এসেছে। সে কে ও কেন এখানে এসেছে তা মনে হতেই সুদীপ যেন নিজের বস্তুসত্তা ও ব্যক্তিত্ব ফিরে পায় এবং বলে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁকে নিতেই তো আসা।” কুসুমের লক্ষ্য পড়ে সুদীপ হঠাৎ যেন কেমন একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে। সুদীপকে তার চঞ্চলতাটুকু কাটিয়ে ওঠবার সুযোগ দেবার জন্য কুসুম আবার প্রশ্ন করে, “আজ হরিপদবাবু বা নিতাইবাবু না এসে আপনি যে ? আপনাকে তো এর আগে কখনো দেখি নি !” সুদীপ বলে, “আমি উপেন্দ্রবাবুর দোকানে বছর দুয়েক কাজে লেগেছি।”

মাত্র বছর দুয়েক কাজে লেগেছেন, তাতেই ছোট রাণীমা এঁকে এতখানি বিশ্বাস করে একেবারে এখান পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন ! তিনি একবারও ভাবলেন না যে, এত অল্পবয়স্ক ছেলেকে এ সমস্ত জায়গায় পাঠানোর পরিণাম কি হ'তে পারে ! এই কথা মনে-মনে চিন্তা করে কুসুম সুদীপকে লক্ষ্য করে বলে, “এত বৃষ্টিতে আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না ?” কুসুমের এ-কথায় সুদীপ হো-হো করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে আর হাসতে-হাসতেই বলে, “আর দিদি ! আমাদের আবার সুখ কোথায় যে কষ্টটাকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখব। আমাদের কাছে যে কষ্টটায় যন্ত্রণা একটু কম সেইটাই সুখ অর্থাৎ সুখের মুখই যে আজ পর্য্যন্ত দেখল না সে সুখ আর দুখের তফাতটা বুঝবে কি করে বলুন।”

সুদীপের এ কথায় কুসুমের মুখের চেহারাটাই যেন বদলে যায় ; তার মুখ থেকে একটা অলৌকিক সুষমা ঝরে পড়তে থাকে এই মুহূর্ত্তে। কুসুমের মনে হয় যেন তার জীবনে কিছুই হারায় নি, সবই আছে। এই তো এইমাত্র একজন তাকে দিদি সম্বোধন করে ডেকেছে, এ-ডাকের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই, নেই কোন মালিন্য, নেই কোন অসাচ্ছন্দ্য। সুদীপ যে তাকে অন্তরের আগ্রহে দিদি বলে সম্বোধন করেছে এ-কথা কুসুমবাঈয়ের মত জীবনে-বহু-বিচিত্র-অভিজ্ঞতাসম্পন্না রমণীর বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না, কারণ মাত্র চব্বিশ বছরের জীবনে কুসুম বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছে আর প্রায় সকলের মধ্যেই দেখেছে আবিলতাপূর্ণ দৃষ্টি, কলুষকালিমালিপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কুশ্রীকামনাসিক্ত বাসনা যা দিনের পর দিন তার অন্তরে শুধু পুরুষ মানুষের প্রতি ঘৃণার

বিন্ধ্যাচল সৃষ্টি করেছে। ব্যতিক্রম শুধু ঐ উপেন্দ্রবাবু আর আজকের এই সদ্য-পরিচিত তরুণ যার নামটুকুও সে এখনও পর্য্যন্ত জানে না।

সহজসরলতাভরা সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে এই মুহূর্তে কুসুমের মনে হয়, ছুটে গিয়ে সুদীপকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে বুকে জাপটে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে খানিকটা আদর করে, কিন্তু অন্তরের দুর্দ্দমনীয় আবেগকে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হস্তে অবদমিত করে। শুধু তার অন্তরের ভগ্নীসত্তাটুকু কিছুক্ষণের মত তাকে তার পারিপার্শ্বিক জগত থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে বিহ্বল করে রাখে এবং অস্ফুট কণ্ঠে তার বুকের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে তিনটি কথা—"দিদি? আমি তোমার দিদি? আমি তোমার দিদি?" অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলেও সুদীপের মত তীক্ষ্ণধী তরুণের শ্রবণে সে-কথা প্রবেশ করে এবং সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, "হ্যা, বাড়ীতে আমি সবার বড়, আমার ছোট-ছোট তিনটি বোন আছে, কিন্তু দিদি নেই, আজ থেকে তুমি আমার দিদি হলে।" সুদীপের এ কথায় কুসুমের আর নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব হ'ল না, তার স্নেহাতুর রমণীমন যেন বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে সামনে পেয়েছে। এই মুহূর্ত্তকে বৃথা যেতে দিতে কুসুমের মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না, তাই সে ছুটে এসে সুদীপকে বুকে টেনে নেয় এবং আদরে-সোহাগে একেবারে আপন দেহের সঙ্গে এক করে নিতে চায়। তার আবেগে থরথর কম্পমান শরীরের উত্তাপ সুদীপকেও অস্থির করে দেয়, সে কুসুমের চরণ স্পর্শ করে তাকে প্রণাম করবার জন্য নীচু হতেই কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু সুদীপের ঘাড়ের উপর ঝরে পড়ে। সুদীপ বুঝতে পারে কুসুমের জীবনে কোথাও এমন একটা কোন বেদনাময় ইতিহাস লুকিয়ে আছে যে, যার পশ্চাৎপটে আছে হয়ত অনেক রিক্ততা, অনেক শূন্যতা, অনেক ব্যর্থতা।

সুদীপ যখন নীচু হয়ে কুসুমকে প্রণাম করছিল ঠিক সেই সময় পাশের ঘরের দরজা ঠেলে উপেন্দ্রবাবু এসে সে-ঘরে উপস্থিত হয়ে প্রণামের দৃশ্য দেখে কুসুম ও সুদীপকে সচকিত করে উচ্চৈঃস্বরে হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন ও বলেন, "যা বাব্বা, আবার পেন্নাম? বলি তোমাদের হ'ল কি?" উপেন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বরে সচকিতচিত্তে সলজ্জ-ভাবে দু'জনে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই উপেন্দ্রবাবু হঠাৎ সুদীপকে সেখানে দেখে স্তব্ধ হয়ে যান, তাঁর মুখের কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে যায়। তাঁর মাথা যেন আপনি খানিকটা নত হয়ে যায়। জগতে এমনি লোক কিছু-কিছু আছেন যাঁদের দেখলে অত্যন্ত অসংযমী, অত্যাচারী মানুষেরও স্পর্দ্ধা-উন্নত শির আপনা হতেই অবনত হয়। উপেন্দ্রবাবুর কাছে সুদীপ এমনিই একটি তরুণ॥

আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তায় সুদীপ যাই হোক, উপেন্দ্রবাবুর নিকট সে তাঁর দাক্ষিণ্য ও স্নেহের পাত্র, তাই তাকে এখানে এই পরিবেশে দেখে উপেন্দ্রবাবু নিজেকে হীন ভাবছেন বুঝতে পেরে সুদীপও মনে-মনে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সমস্ত কিছু লক্ষ্য ক'রে শ্মশানস্তব্ধ ঘরটাকে স্বাভাবিক করবার জন্য কুসুম উপেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য ক'রে হাসতে-হাসতে বলে, "জানো নন্দীবাবু, আমি আজ একজন নতুন ভাই পেলাম, এই দেখ আমার সেই ভাই," বলে সুদীপের ডান হাতটা নিজের দু-হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে একটু মৃদু চাপ দেয়।

কুসুমের এই কথায় উপেন্দ্রবাবু কিছুটা সহজ হয়ে ওঠেন এবং বলেন, "ও তাই বুঝি এত পেন্নামের ঘটা! আমি ভাবছিলাম, ব্যাপারটা কি? বাঈকে আবার সম্মান জানিয়ে পেন্নাম করে কে? চিরকাল তো লোকে ছিঃ ছিঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করেই থাকে। যাক তবু ভাল, তোমাকে মান দেবার অন্ততঃ একজন লোকও এই কলকাতা শহরে পেলে।" এই বলে সুদীপের দিকে চেয়ে উপেন্দ্রবাবু বললেন, "কৈ হে ছোকরা চল তোমাদের রাজপ্রাসাদের প্রসাদ পেতে।" উপেন্দ্রবাবু কি বলতে চাইছেন অর্থাৎ নিজেকেই নিজে উপহাস করছেন বুঝে সুদীপ ও কুসুম মৃদুস্বরে একসঙ্গে হেসে ফেলে। হঠাৎ কুসুমের নজরে পড়ে উপেন্দ্রবাবুর হাতে সিগারেটের টিন নেই। তাড়াতাড়ি সে-পাশের ঘরে গিয়ে রেড এণ্ড হোয়াইটের টিনটা এনে উপেন্দ্রর হাতে দিয়ে অনুযোগের সুরে বলে, "এক্ষুণি এই বেচারাকে আবার তিনতলায় দৌড়ে আসতে হ'ত?" কুসুমের এ কথায় ঠাট্টা করবার অভিপ্রায়ে উপেন্দ্রবাবু বলেন, "ওঃ একদিনের ভাইয়ের জন্য যে দরদ উথলে উঠছে আর হতভাগা আমিটা যে সিগারেট না পেলে মরে যেতাম সে খেয়ালটা নেই দেখছি, বা-বাঃ, ভাল কথা, এবার থেকে এই নতুন ভাই এসে তোমার খোঁজখবর নিয়ে যাবে, আমি আর আসছি না।"

উপেন্দ্রবাবুর এ কথায় কুসুম লজ্জাপ্লুতা হয়ে বলে, "যাও, আমি তাই বলেছি নাকি? আমার ভাইকেও চাই আর তোমাকেও চাই, কাউকেই আমি হারাতে চাই না।" কুসুমের এ-কথায় উপেন্দ্র ও সুদীপ দু-জনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে এবং তার নিকট বিদায় নিয়ে দুজনে ঘরের বাইরে পা দিতেই উপেন্দ্রবাবু মউজীকে দেখে বলে ওঠেন, "এতক্ষণে উপেন্দ্র জানিল কিরূপে তুমি পশিলে এ-পুরে।" সুদীপের দিকে চেয়ে বলেন, "তাহলে এই ব্যাটা ছাতুই তোমাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। যাক, ভালই করেছে, জায়গাটা তোমারও দেখা হয়ে গেল, এরপর থেকে আমাকে নিয়ে যেতে তুমিই আসবে এখানে, কি বল?" সুদীপের উত্তরের অপেক্ষা না করে উপেন্দ্রবাবু মউজীকে বলেন, "যাও একঠো ঘোড়াগাড়ী বোলাকে'লে আও।" মউজী ঘোড়াগাড়ী ডাকতে গেলে তিনি সুদীপকে নিয়ে নীচে নামতে থাকেন।

নীচে এসে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে উপেন্দ্রবাবু মউজীকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন তাঁর বাড়ীর দিকে ঐ অঞ্চলে অনেক জল জমেছে। বেশী জল জমলে তাঁর বাড়ীর উঠোনে ও নীচের তলার রান্নাঘর, বাথরুম ও বৈঠকখানার মেঝেতেও জল উঠতে পারে ভেবে উপেন্দ্রবাবু একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। গাড়ীতে উঠে সহিসকে বলেন, "একটু তাড়াতাড়ি চল্।" যে-সংসারের কোন চিন্তাই এতক্ষণ তাঁর মাথায় ছিল না, হঠাৎ সেই সংসারের চিন্তায় তিনি যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সুদীপ তাঁর এই ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে মনে-মনে ভাবে উপেন্দ্রবাবুর মত মানুষ যাঁরা আপনকে পর আর পরকে আপন করেছেন তাঁদের বুঝি এই রকমটাই হয়। দু-নৌকায় চড়তে গিয়ে যখন যে-নৌকায় পা দেন সেই নৌকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে মনোযোগী হয়ে ওঠেন, কিন্তু একবারও বুঝতে চান না যে, একসঙ্গে দু-নৌকায় পা দেবার চেষ্টা করলে দুটো নৌকাই টাল খায় আর দুর্যোগে তো কথাই নেই। ঝড়ের তীব্রতা সামাল দেবার মত মনোবল না থাকলে দু-পায়ের তলা থেকে দুটো নৌকা দুদিকে ছিটকে বেরিয়ে যায় আর উপেন্দ্রবাবুর মত মানুষরা তখন অসহায় হয়ে ছিটকে নদীগর্ভে অর্থাৎ সংসারের গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হন। সুদীপের মনে এ-সব কথা উদিত হলেও উপেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে এতটা বিপজ্জনক চিন্তা করতে তার ইচ্ছা করে না, সে অন্য চিন্তা করতে চায় অর্থাৎ কুসুমকে কয়েক মিনিট দেখে সে যা বুঝেছে তাতে তার সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণাই সুদীপের হয় নি, তাই তারই কথা ভাবতে থাকে।

সুদীপকে অন্যমনস্ক দেখে উপেন্দ্রবাবু একটা সিগারেট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, "নাও হে ছোকরা, এটা ধরিয়ে নাও দেখি, শীতটা একটু কেটে যাবে।" উপেন্দ্রবাবুর এ-কথায় সুদীপ সঙ্কোচে লজ্জায় একেবারে কুঁচকে যায়, তার মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে। সে ঘোড়াগাড়ীর মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সেঁটে বসে থাকে। তার লজ্জা ভাঙ্গাবার জন্য উপেন্দ্রবাবু তার থুতনিটা ধরে মুখটা উপর দিকে তুলে হাতের সিগারেটটা ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে ফস করে একটা দেশলাই জেলে সিগারেটের মুখে আগুনটা ধরেন। গোটা ব্যাপারটা সুদীপকে এমনই হতভম্ব করে দিয়েছিল যে, সিগারেটে টান দেওয়া তো দূরে থাকুক, সিগারেট যে সে মোটেই খায় না এ-কথাটা পর্য্যন্ত বলতে ভুলে গিয়েছিল। সিগারেট না টানতে দেশলাইয়ের আগুনটা ক্রমশ উপেন্দ্রবাবুর আঙ্গুলের কাছ পর্য্যন্ত এসে পৌছতে আঙ্গুলে ছ্যাকা লাগবার ভয়ে উপেন্দ্রবাবু সেটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আবার একটা কাঠি জেলে সুদীপের মুখের সিগারেটের সামনে ধরলেন এবং আবার সুদীপকে বললেন, "নাও টানো,

এ-কাঠিটাও যে পুড়ে যাচ্ছে।" একই অবস্থায় এসে এ-কাঠিটাও নিভে গেল। এর পর উপেন্দ্রবাবু সুদীপের ডান কাঁধের উপর নিজের ডান হাতখানা রেখে বাহুর উর্দ্ধদেশে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে গভীর কণ্ঠে বললেন, "কয়েক মিনিটের পরিচয়ে কুসুমকে তুমি দিদি করে নিতে পারলে আর এতদিনের পরিচয়ে আমাকে ভাই ভাবতে পারছ না, বন্ধু ভাবতে পারছ না! বন্ধু ভাবতে পারছ না— কথাগুলো বলার সময় আবেগের সঙ্গে উপেন্দ্রবাবু সুদীপের কাঁধটা ধরে এমনভাবে সজোরে ঝাঁকুনী দিলেন যে, তার সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠল এবং মুখ থেকে সিগারেটটা খসে গাড়ীর পাটাতনে পড়ে গেল। সুদীপ তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে সেটা কুড়োতে যেতেই উপেন্দ্রবাবু তার হাতটা টেনে ধরে টিন থেকে আর একটা সিগারেট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, "ওটা যাক, এই নাও, এটা ধরাও।" এবার সুদীপ ধীরে-ধীরে তাঁর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে ধরিয়ে বাইরের দিকে মুখ করে দু-একটা টান দিতেই ধূমপানে অনভ্যস্ত কণ্ঠে খুক-খুক করে কাশতে লাগল। তার অবস্থা দেখে উপেন্দ্রবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তোমার সিগারেটের বা বিড়ির নেশা নেই, না? তুমি সিগারেটটা সবটা খেও না, ফেলে দাও।" একথা বলার কারণ হ'ল—উপেন্দ্রবাবু ভালই জানতেন ধূমপানে অনভ্যস্ত লোকের কাছে রেড এণ্ড হোয়াইটের মত কড়া সিগারেট কতখানি অস্বস্তির কারণ। সিগারেটে অভ্যাস নেই অথচ শুধুমাত্র তাঁর অনুরোধে পড়ে' সুদীপ সেটা টেনে যাচ্ছে দেখে উপেন্দ্রবাবু তাকে সিগারেট ফেলে দিতে বললেন।

সিগারেট ফেলে দিয়ে সুদীপ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত চিত্তে, বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে আবার উপেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বিচিত্র ভাবনার বিভিন্ন রঙ তখন সুদীপের মনের ক্যানভাসে তুলি টেনে চলেছে। সে তখন ভাবছে তার দুঃখহত বর্ষাস্নাত এই ক্ষুদ্র জীবনে এত পরম পাওয়াও লুকিয়ে ছিল। কুসুমের মত ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও নৃত্যপটিয়সী মহীয়সী রমণীর স্নেহের সুধা এবং কলকাতার বিখ্যাত ধনী নন্দীপরিবারের ছোট কর্তা উপেন্দ্রবাবুর মত মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব—এসব কি সত্যি, না, কি আচম্বিত আবেগের ক্ষণস্থির উচ্ছলতা মাত্র! নিজের মনেই প্রশ্নটা ঘুরতে থাকে। চিন্তার খাদে প্রবেশ করতে গিয়ে সুদীপের মনে যেমন আনন্দের শততরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে যায় তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার এও মনে হয় যে, দুটোই হয়তো পরিবেশঘটিত সাময়িক আবেগোচ্ছ্বাসের ব্যাপার। যাই হোক, এ-নিয়ে আর সুদীপের চিন্তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না, কারণ ইতিমধ্যে গাড়ী উপেন্দ্রবাবুর ভুবন সরকার লেনের বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মউজীরাম সহিসের পাশ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ায়। গাড়ী থেকে সুদীপকেই আগে নামতে হয়, নেমে হাত বাড়িয়ে উপেন্দ্রবাবুর হাতটা ধরে তাঁকেও নামায়। এর পর গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে বাড়ীতে ঢুকেই উপেন্দ্রবাবু দেখেন যে, আজকে এখনও পর্য্যন্ত তাঁর বাড়ীতে জল দাঁড়ায় নি; উঠোনটাও ভর্ত্তি হয়ে যায় নি দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং মউজীরামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "কি ব্যাপার মউজী, আজ আঙ্গিনামে একদম পানি নেই হ্যায়।" মউজী জবাবে বলে, "ক্যা মালুম বাবু, হামভি তো ওহি দেখতা হ্যায়।"

উপেন্দ্রবাবু ও মউজীর কথাবার্ত্তা শুনে সুদীপ মনে-মনে একটু হাসে এবং ধীরে-ধীরে বলে, "আজ আর পানি জমবে না ছোটবাবু।" সুদীপের এ-কথায় ছোটবাবু বলেন, "কেন বল দেখি, আজকে কি বরুণদেব আমার বাড়ীটাকে ভুলে গেলেন?" উপেন্দ্রবাবুর এ-কথায় সুদীপ হাসতে-হাসতে আবার বলে, "আমি সকালে মউজীর সঙ্গে যখন এখানে এসেছিলাম তখন উঠোনের মাঝখানে জল দেখে হাইড্রান্টের মুখটা থেকে জালতির উপর জমা ময়লা, শুকনো পাতা, কাগজ, কলার চোকা ইত্যাদি নানা ধরনের রাবিশগুলো ভাল করে সরিয়ে দিয়েছি, তাই জল জমবার আগেই সব জলটুকু ঐ ড্রেন দিয়ে নেমে নীচে চলে যাচ্ছে। আপনার বাড়ী রাস্তা থেকে অনেক উঁচু। বাড়ীর ড্রেন পরিষ্কার থাকলে এখানে জল ওঠার কোন কারণই নেই। সুদীপের এ-কথায় উপেন্দ্রবাবু বুঝতে পারেন কেন তাঁর বাড়ীতে এতদিন বৃষ্টি হলেই জল জমত; বোঝার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মউজীকে এক ধমক দিয়ে বলেন, "হতচ্ছাড়া, তোরা তাহলে কি করিস রে, ড্রেনের মুখের ঝাঁঝরির উপর জমা ময়লাগুলোকে পায়ে করে সরিয়ে দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করে দিতে পারিস না?" বাবুর কথা মউজী সবটা বুঝতে না পারলেও এটা বুঝতে পারে যে, তার কিছু একটা অন্যায় হয়েছে, তাই মুখ কাঁচুমাঁচু করে সে সুদীপের দিকে চাইতেই সুদীপ তাকে ড্রেনের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেয় কি করে ড্রেনটা পরিষ্কার রাখতে হয়; বুঝিয়ে দেয় কিভাবে বৃষ্টির দিনে ঝাঁঝরিটাকে বারবার পরিষ্কার রাখতে হয়। সব দেখে-বুঝে মউজী এক গাল হেসে বলে ওঠে, "কসুর হো গিয়া বাবুজী, আইন্দা এইসা গলতি আর কখ্‌নো হোবে না।" মউজীর এই বিনয়াবনত ভাব দেখে উপেন্দ্র ও সুদীপ দুজনেই হেসে ফেলে এবং সুদীপের হাতটা ধরে উপেন্দ্র টানতে-টানতে তাকে একেবারে দোতলায় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন।

সুদীপকে নিয়ে উপেন্দ্রকে ঐভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে ঘরের খাটে অর্দ্ধশায়িতা আলুলায়িতকেশা অনুপমা একেবারে হকচকিয়ে উঠে বসেন এবং উপেন্দ্রের

উদ্দেশ্যে মৃদু অনুযোগের সুরে বলেন, "আঃ তোমার কি কোন কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নেই ? গত কাল রাতে বাইরে থেকে যা ইচ্ছা তাই করে এলে, এখন ঘরেতেও কি মান-ইজ্জত নিয়ে আমায় থাকতে দেবে না ?"

অনুপমার এ-কথা যে সুদীপের মত একজন অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা তা না বলে দিলেও সুদীপের বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় না, মুহূর্ত্তের মধ্যে লজ্জায় তার মাথাটা হেঁট হয়ে যায় এবং সকালের দেখা অনুপমা দেবীর সেই দেবী মূর্ত্তি ঐ একটি কথায় যেন কোথায় তলিয়ে গিয়ে তাঁকে এক অত্যন্ত সাধারণ রমণীতে রূপান্তরিত করে। এই মুহূর্ত্তে সুদীপের মনে পড়ে যায় আর এক নারীর কথা, সে-নারী কুসুম। সুদীপ মনে-মনে ভাবতে থাকে সামান্য মুখের কথাতেই মানুষকে কত আপন করে নেওয়া যায় আবার সেই মুখের কথারই রূঢ়তা-বাণে বিদ্ধ করে মানুষকে কত দূরে ঠেলে দেওয়া যায়। অনুপমার ঐ সামান্য কটি রূঢ় বাক্যই সুদীপের মত বিচক্ষণ তরুণের নিকট যথেষ্ট, তাই ওখানে আর ঐ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয় ভেবে সে উপেন্দ্রকে নমস্কার করে' চলে যেতে চায়। সুদীপ চলে যেতে চায় দেখে উপেন্দ্র তাকে বলেন, "আরে সেই সকাল থেকে বৃষ্টিতে ভিজেছ, এখন স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে এখানে কিছু খেয়ে তারপর যাবে, এই এতবেলায় গিয়ে কি আর মেসে ভাত পাবে নাকি ? নাও এই লুঙ্গিটা পরে' স্নান সেরে এস দেখি।" এই বলে উপেন্দ্র আলনা থেকে একটা লুঙ্গি নিয়ে একেবারে সুদীপের কাঁধে ফেলে দিলেন। সে পড়ল মহা মুস্কিলে। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার অনুপমার কথাটা তার মনে পড়ে যাওয়ায় কে যেন তার পিঠে সপাং করে একটা চাবুক মেরে দিল। সে একবার অনুপমার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। দেখল সে-মুখে সকালের দেখা সেই নম্রমধুর গৃহস্থ বধূটি যেন আর নেই, তার বদলে আছে জমিদার পরিবারের দর্পিতা এক রূপসী রমণীর কঠিন অবয়ব। অনুপমার চোখের উপর চোখ পড়তেই সুদীপ বেশ বুঝতে পারে যে, সেই চোখে নেই কোন স্নেহের আমন্ত্রণ, নেই কোন প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি, পরিবর্ত্তে সেখানে ফুটে উঠেছে যেন এক সামান্য দোকান কর্ম্মচারীর প্রতি তার গৃহস্বামিনীর ঘৃণা-ব্যঞ্জক বক্র দৃষ্টি, যে-দৃষ্টি তাকে বলে দিচ্ছে এই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকারই তোমার যোগ্যতা নেই, লুঙ্গি পরা তো দূরের কথা। সুদীপ কাঁধ হতে লুঙ্গিটা নিয়ে আলনায় রেখে দিয়ে উপেন্দ্রবাবুকে নমস্কার করে' বিদায় নিয়ে ধীরে-ধীরে নীচে নামতে থাকে। উপেন্দ্রবাবুও তার সঙ্গে-সঙ্গে নীচে নেমে আসেন। বাড়ীর সদর দরজার কাছে এসে সুদীপের কাঁধে হাত দিয়ে তিনি বলেন, "তুমি কিছু মনে করো না। অনুপমা মাঝে-মাঝে ঐ রকম হয়ে যায়; না হলে কিন্তু ও-মানুষটা সত্যিই

ভাল।" কিন্তু সুদীপ বুঝতে পারে যে, তার চলে আসার কারণটা বুঝেই উপেন্দ্রবাবু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই এ-কথা বলেছেন। সে তাড়াতাড়ি উপেন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বলে, "না না, আমি ওনার কথায় কিছু মনে করি নি, সেই সকালে বেরিয়েছি, বাবা হয়ত এতক্ষণে খোঁজাখুঁজি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, তাই মেসে যাবার জন্যই তাড়াতাড়ি করছি।" কথাটা শেষ করে উপেন্দ্রর মুখের দিকে চাইতেই সুদীপ দেখতে পায় উপেন্দ্রবাবুর টকটকে ফর্সা মুখটায় কে যেন এক পোঁচ লাল রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে। তাঁর সারা মুখটা যেন কেমন থম্থম্ করছে। উপেন্দ্রর মুখ দেখে সুদীপের বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় না যে, অনুপমার ঐ সামান্য শ্লেষাত্মক কথায় উপেন্দ্রবাবুও যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন। ক্ষণকাল উপেন্দ্রর ব্যথাতুর মুখপানে চেয়ে সুদীপ তাঁকে আবার নমস্কার করে এবং বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এক হাঁটু জলে নেমে পড়ে।

সুদীপ যখন রাস্তায় নামে, বৃষ্টির বেগ তখন কিছুটা কমলেও ঝরে চলেছে সমানে, অঝোরে, ফলে রাস্তায় জলের পরিমাণটাও বেশ-কিছু বেড়েছে। বড় রাস্তায় বের হয়ে সুদীপ দেখে রাস্তার ছ'পাশের অনেক দোকানের মধ্যে জল ঢুকে গেছে এবং ভিতরের দ্রব্যসামগ্রী সামলাবার জন্য দোকানের মালিক ও কর্ম্মচারীগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ-দৃশ্য দেখে সুদীপের মনে হয় যদি তাদের নন্দী কোম্পানীতেও জল ঢুকে গিয়ে থাকে তা হলে কি হবে। এই কথা ভেবে সে আবার উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় এবং মউজীর নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকে। সুদীপের কণ্ঠস্বরে উপেন্দ্রবাবু দোতলার বারান্দা থেকে সাড়া দিলে সুদীপ দোকানের চাবি নিয়ে মউজীকে পাঠিয়ে দিতে বলে। সুদীপের কথার উত্তরে উপেন্দ্রবাবু বলেন, "এত বৃষ্টিতে দোকান খুলে কোন লাভ নেই।" উপেন্দ্রবাবুর এ-কথায় সুদীপ বলে, "বাইরে সব দোকানের মধ্যে জল ঢুকে গেছে দেখলাম, আমাদের দোকানেও যদি জল ঢুকে গিয়ে থাকে, তা হলে জিনিষপত্র সব নষ্ট হয়ে যাবে, তাই একবার দেখা দরকার।" তার কথায় উপেন্দ্রবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "ক্লাইভ ষ্ট্রিটের ঐ এলাকায় যখন এক হাঁটু জল জমবে তখন গোটা কলকাতার অর্দ্ধেকটাই জলের তলায় চলে যাবে, তুমি নিশ্চিন্তে মেসে যাও, আমাদের ওখানে জল দাঁড়ায় না।" উপেন্দ্রবাবুর এ-কথায় সুদীপ কিছুটা আশ্বস্ত হলেও মনের মধ্যে তার একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। সে উপেন্দ্রবাবুকে আর কিছু না বলে সোজা বড়বাজার চলে আসে এবং এসে দেখে, হ্যাঁ, উপেন্দ্রবাবুর কথাই ঠিক, এ-এলাকায় কোথাও জল দাঁড়ায় নি, শুধু রাস্তার দুই প্রান্ত দিয়ে হুহু শব্দে জল গিয়ে হাইড্রান্টে ঢুকছে আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ দোকানই বন্ধ। এতক্ষণে সুদীপ নিশ্চিন্ত হয়ে মেসের দিকে পা বাড়ায়।

মেসে আসতেই সতীন্দ্রবাবু সুদীপকে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, "এত বৃষ্টিতে ভিজে সকাল থেকে কোথায় ঘুরছিলে বাবা ?" সতীন্দ্রের কথার উত্তরে সুদীপ শুধু কুসুমের প্রসঙ্গটুকুর সামান্য পরিবর্তন করে' সব কথা বলল এবং তারপর স্নান-খাওয়া সেরে ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছিয়ে গা এলিয়ে দিল। সকাল থেকে সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে সেদিনের উপেন্দ্রবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ-করে'-বলা হরিপদবাবুর কথাগুলো সুদীপের মনে এল, কিন্তু গভীর চিন্তা করেও সুদীপ উপেন্দ্রবাবু ও কুসুমের সম্পর্কে কোন নীচু কথা মনে ঠাঁই দিতে পারল না।

দিন কয়েক পরে সতীন্দ্রবাবু সুচন্দ্রার পত্রে জানতে পারলেন যে, তাঁর বৈবাহিক নিবারণ যশ মহাশয় কমলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বাঘাসনে দিয়ে গেছেন এবং বলে গেছেন আপাততঃ কমলা কিছুদিনের জন্য বাঘাসনেই থাকবে, পরে তিনি লোক পাঠিয়ে আবার কমলাকে যবগ্রামে নিয়ে যাবেন। সুচন্দ্রার পত্রপাঠে কমলার ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে সতীন্দ্রবাবুর তা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না, কারণ কমলাই প্রথম নয়, প্রায় প্রতিটি বিধবা বঙ্গললনার ভাগ্যে যা ঘটে কমলার ভাগ্যেও তাই ঘটতে চলেছে অর্থাৎ এর পর থেকে বাপের ঘরকেই কমলার আজীবনের বাসস্থান হিসেবে মেনে নিতে হবে। সুচন্দ্রার চিঠিটা আর একবার ভাল করে পড়ে সতীন্দ্রবাবুর শুধু একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তিনি সুদীপকে ডেকে চিঠিটা তার হাতে এগিয়ে দিলেন। চিঠিটা পড়ে সুদীপের চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এল। কমলার যে শেষ পর্য্যন্ত এই পরিণতি হবে সে-আন্দাজ কিছুটা থাকলেও তা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে সে-কথা সুদীপ ভাবতে পারে নি, কারণ বয়সে সে তরুণ, তার অন্তরের কোমল প্রবৃত্তির কলিগুলি সবেমাত্র দল মেলতে শুরু করেছে, তাই মায়ের চিঠিটা পড়ে মানুষের অমানবিক স্বার্থপরতার কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা খুঁজতে অপারগ হওয়ায় ছোট বোন কমলার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আপাততঃ ভাবপ্রবণ মনের আবেগ অশ্রুর আকারে চোখের কোল বেয়ে বুকের উপর গড়িয়ে পড়ল।

কমলার যাইই হোক, সময় কিন্তু কারও জন্য থমকে থাকে না, তাই সংসারও স্থবির হয়ে থাকে না। আপন গতিতে তাকে চলতে হয়, তাই সতীন্দ্রবাবু-সুদীপকেও পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হয় এবং স্ব-স্ব কর্মে মনোনিবেশ করতে হয়। সেদিন তারিখটা ছিল সাতাশে চৈত্র। তিনদিন পরে নববর্ষ অর্থাৎ দোকানদারদের খাতা মহরৎ। এই সময়টা বাঙালী দোকানদারদের শ্বাস নেবার সময় থাকে না, কারণ সারা বছরের ব্যবসায় সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ,

দেনা-পাওনা, মজুত মালের হিসাব করা, দোকান-গুদাম ঝাড়া, মোছা, রঙ করা। পুরাতন ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর রঙ-পালিশ করে কিছুটা চাকচিক্য ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি কাজে প্রতিটি দোকানের মালিক-কর্ম্মচারী সকলেই খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বড়বাজারে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দোকানগুলোর চেহারার মধ্যেও সেই চাঞ্চল্যের ভাব। বাজারের যে-কোন দোকানের দিকে বা গোটাগুটি বাজারের দিকে চাইলে মনে হয় যেন অত্যাসন্ন একটা উৎসবের আনন্দে সবাই মেতে আছেন। এরই মধ্যে সম্বৎসর যারা ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি মুখচোখের গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তাঁরা যেন ওই হাওয়াতেই নিজেদের গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। নন্দী এণ্ড কোম্পানীর দোকানেও সেদিন মজুত মালের হিসাব-নিকাশ চলছিল। হিসাব নিতে নিতে দেখা গেল চার নম্বর বেলচা ও দু-বাণ্ডিল কাঁটাতার অস্থির পড়েছে। বার-বার গুণে গেঁথে দেখেও কিছুতেই ঐ দুটি দ্রব্যের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। সব দেখেশুনে চেয়ারে উপবিষ্ট উপেন্দ্র-বাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি সুদীপকে ডেকে বেশ তিক্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “সুদীপ, আমি তোমাকে ও নিতাইকে যথেষ্ট বিশ্বাস করি, তাই তোমাদের উপর ভরসা করেই দোকানে আসতে দেরী করি বা দোকান ছেড়ে সকাল-সকাল উঠে পড়ি; কাজটা কিন্তু তোমরা ভাল কর নাই।” এই কথা বলে উপেন্দ্র-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতঘড়িটার দিকে একবার নজর দিয়ে বললেন, “আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি, তোমরা অন্যান্য মালের ষ্টক নাও। আমি আগামীকাল এসে মিলিয়ে দেখব।” এই কথা বলে উপেন্দ্রবাবু চলে গেলে সুদীপ ও নিতাই দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বেঞ্চে বসে পড়ল। যাবার সময় উপেন্দ্রবাবু যা বলে গেলেন তার অর্থ না বোঝার মত বয়স ওদের কারোরই নয়, তাই উপেন্দ্র বাবু যে যাবার আগে তাদের চোর সাব্যস্ত করে বোঝাপোড়া করবার সুযোগ করে দিয়ে এই অসময়ে অর্থাৎ দুপুর দুটোয় দোকান ছেড়ে বাড়ী চলে গেলেন এই কথা বুঝে দুজনেই ভেঙ্গে পড়ল। নিতাই তো কেঁদেই ফেলল এবং কাঁদতে কাঁদতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে মাথার কাছে দেওয়ালের গায়ে ঝুলন্ত মা কালীর পটে হাত দিয়ে শপথ করে বলতে লাগল যে, সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এক দিকে পটে হাত দিয়ে দিব্যি করছে আর একদিকে তার দুচোখ দিয়ে বৃষ্টির ধারার মত জলের ধারা বইছে দেখে সুদীপের মনে-মনে কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গেল যে, নিতাইদা চোর হতেই পারে না আর নিজের সম্বন্ধে তো কথাই নেই। কারণ সুদীপ ভাল করেই জানে যে, সে নিজে শুদ্ধচিত্ত, সুতরাং বাকী থাকল কেবল আর দু-জন অর্থাৎ হরিপদবাবু আর মউজীরাম। মাত্র চারজন

কর্ম্মচারী আর এদেরই মধ্যে যিনি অন্নদাতা তাঁরই সর্বনাশ করবার মানসিকতা ! সুদীপের কেমন যেন জিদ চেপে গেল, মনে-মনে সে ভেবে নিল—নাঃ চোরকে আবিষ্কার করতেই হবে তাতে যদি মউজীরাম, এমন কি হরিপদ বাবুকেও তু-চার ঘা দিতে হয় তো তাতেও সে পিছোবে না, কারণ চোর না ধরতে পারলে একটা বিরাট কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে এ-দোকান থেকে বিদায় নিতে হবে আর অপর কোন জায়গাতেও চাকরী মিলবে না, সবাই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে—সে চোর, চুরি করে দোকানের মাল বেচে দেয়। সেই অবস্থার কথা চিন্তা করতেই সুদীপের মাথাটা গরম হয়ে ওঠে আর ওদিকে উপেন্দ্র বাবুকে ফিটনে চড়িয়ে দিয়ে মউজীরামও পুনরার দোকানে এসে হাজির হয়। মউজীরাম দোকানে ঢুকতেই সুদীপ বেশ গুরুগম্ভীর গলায় ধমকের সুরে বলে ওঠে, "মউজী, বোলো মাল ক্যা হুয়া ? একদম সাচ বোলে গা, নেহিতো মারকে মুহ তোর দুঙ্গা।" বলে মউজীর দিকে এক ঘুঁষি উঁচিয়ে সুদীপ আস্ফালন করে। মউজীও সঙ্গে সঙ্গে রেগে যায় এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, "হামকো কিঁউ মারিয়েগা ? মারনা হ্যায় তো উনকো মারিয়ে।" "উনকো মারিয়ে," বলে যার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় তিনি হরিপদবাবু। মউজীর কথায় সুদীপ ও নিতাই তুজনেই হতবাক হয়ে যায়। যে হরিপদবাবু জামাকাপড়ে ময়লা লাগবে, হাতে কালি লাগবে বলে কোন দিন কোন মালে হাত দেন না, যাঁর মুখে সব সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর নাম, কণ্ঠে হরিকাঠের মালা, যিনি সব সময় উপেন্দ্রবাবুকে চোর, লম্পট মাতাল বলে সমালোচনা করেন তিনিই কিনা চোর ! তিনিই কিনা দোকানের মাল সরিয়েছেন। না, না, এ হতেই পারে না। মউজী হয়তো নিজের ঘাড় থেকে দোষ নামাবার জন্য হরিপদবাবুর নামে দোষ চাপাচ্ছে—একথা ভেবে সুদীপ পুনরায় বাঘের মত চিৎকার করে বলে, "এ তুম ক্যা বোলতা হ্যায় ?"

সুদীপের এই কথার উত্তরে মউজী আস্তে আস্তে দোকানের পিছন দিকে যেখানে বসে হরিপদবাবু খাতা লিখছিলেন সেইখানে গিয়ে হরিপদবাবুকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে, "ক্যায়া বাবু বলিয়ে, সাচ বোলনেমে ইতনা সরম কিঁউ হ্যায় ? বোলিয়ে বোলিয়ে, তেরা মুহ তো খোলিয়ে।" হরিপদবাবু এতেও চুপচাপ, মুখে কোন কথা নেই, নিবিষ্ট চিত্তে খাতার দিকে তাকিয়ে একমনে তিনি লিখে চলেছেন, যেন কিছুই হয়নি এইরকম একখানা ভাব তাঁর মুখেচোখে। এই সময় সুদীপের মনে পড়ে যায় প্রায় তিন বছর আগে হরিপদবাবুর বলা সেই কথাগুলো অর্থাৎ "হাওলাতি লিখে দেব," "ওটা একটা মাতাল, লম্পট," "দরদ একেবারে উথ্‌লে উঠছে," ইত্যাদি। মনে হতেই সুদীপের তরুণ রক্ত যেন প্রতিশোধ নেবার উন্মত্ততায়

চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে সোজা হরিপদবাবুর জলচৌকির কাছে গিয়ে হরিপদ বাবুর বুকের জামাটা বজ্রহস্তে চেপে ধরে সজোরে দুটো ঝাঁকুনী দিতেই হরিপদ বাবুর নাকের ডগা থেকে তাঁর সাধের রিমলেশ চশমাটা ছিটকে সম্মুখে উন্মুক্ত খাতার উপরে গিয়ে পড়ে। তিনদিনের ছোকরা সুদীপ তার মত একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর গায়ে হাত তুলবে একথা ভাবতেই পারেন নি হরিপদবাবু। তাই সুদীপের বজ্রমুষ্টির ঝাঁকুনিতে ঘাবড়ে গিয়ে হাত দুটো জোড়া করে ভয়ার্ত্ত স্বরে বললেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বলছি, আমি সব বলছি।" ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা, সুদীপের মাথায় যেন তখন খুন চেপে গেছে; তাই সে আরও জোরে ঝাঁকুনী দিয়ে কর্কশ স্বরে গর্জ্জন করে উঠে, "শয়তান কোথাকার, বল মাল নিয়ে কি করেছ?"

সুদীপের দ্বিতীয় বারের ঝাঁকুনীতে হরিপদ ঘেমে ওঠেন এবং কাঁপা-কাঁপা গলায় বলতে থাকেন, "আমার গ্রামের বাড়ীর পুকুরের পাড়ে বেড়া দেবার জন্য দু-বাণ্ডিল কাঁটাতার নিয়েছি আর আমাদের দেশের এক বন্ধু স্কুলবাড়ী তৈরী করাচ্ছে, বেলচাগুলো স্কুলবাড়ীর কাজের জন্য দান করেছি।"

সুদীপ আবার গর্জে ওঠে, "দান করেছ? ব্যাটা ইতর কোথাকার! নন্দীবাবুর দোকান থেকে চুরি না করে নিজের জমীদারী থেকে দানটা করলেই তো পারতে? ওঃ দানবীর কর্ণ এসেছেন! বেইমান ছোটলোক কোথাকার?" এর পর হরিপদকে ছেড়ে মউজীকে প্রশ্ন করে সুদীপ জানতে পারে গত শনিবার অর্থাৎ চব্বিশ তারিখে আড়াইটার পর দোকান থেকে সবাই যখন চলে গিয়েছিল তখনও খাতার কাজ একটু বাকী আছে বলে দোকানে হরিপদ খাতা লিখছিল এবং মউজী চাবী বন্ধ করবার জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিল। সবাই চলে গেলে হরিপদবাবু দু'বাণ্ডিল কাঁটাতার আর একডজন বেলচা মউজীকে রিক্সা ভাড়া করে তুলে দিতে বললে মউজী প্রথম আপত্তি করেছিল, কিন্তু হরিপদবাবু তখন মউজীকে বলেছিলেন যে, তিনি উপেন্দ্রবাবুকে বলে চেয়ে নিয়েছেন ঐ কাঁটাতার ও বেলচা। সরলপ্রাণের অশিক্ষিত মুটে মউজী হরিপদবাবুর এ-কথার উপর আর দ্বিরুক্তি না করে তার কথামত একটা রিক্সা ভাড়া করে দু'বাণ্ডিল কাঁটাতার ও এক ডজন বেলচা রিক্সায় তুলে হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল।

চুরির রহস্য যে এত সহজেই উন্মোচিত হবে সুদীপ তা ভাবতেই পারে নি; তাই রহস্য উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকান বন্ধ করে নিতাই-মউজী-হরিপদ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে সোজাসুজি উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল। উপেন্দ্র বাবুর নিকট নিজেকে চোর সাজিয়ে দেখানোর কল্পনাও তার অন্তরে মুহূর্ত্তের

জন্য সহ্য হচ্ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা মালিক-কর্ম্মচারীর পর্যায় থেকে উঠে নিবিড় বন্ধুত্বের স্তরে এসে গিয়েছিল।

বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়েই সুদীপ 'ছোটবাবু' 'ছোটবাবু' বলে হাঁক দিল। তার কণ্ঠস্বরে আবেগাকুল উত্তেজনা ঝরে পড়ছিল। সুদীপের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে দোতলার ঘরে বিশ্রামরত উপেন্দ্রবাবু এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন এবং নীচে উঠোনে তাঁর দোকানের সব কটি কর্ম্মচারীকে উপস্থিত দেখে একবার ভাল করে সকলের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করে বুঝলেন যে, সকলের মুখেই একটা অস্পষ্ট অধৈর্য্য ও উত্তেজনার ভাব। তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কি ব্যাপার সুদীপ? সবাই মিলে দোকান ছেড়ে চলে এলে যে?"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই হরিপদ গিয়ে তাঁর পাদুটো জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, বলতে লাগল, "আমি অন্যায় করে ফেলেছি বাবু, আমাকে মারুন, ধরুন, যা করবার হয় করুন, আমি এ-রকম কাজ আর কক্ষনো করব না।" মুহূর্ত্তে ছোটবাবু সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে গম্ভীর স্বরে সকলকে সেখান থেকে চলে যেতে নির্দ্দেশ দিয়ে বললেন, "দোকানের ব্যাপার, দোকানেই এর ফয়সালা হবে, এখানে নয়।" ছোটবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি, জমিদার বংশের সন্তান, তিনি ভালই বুঝতেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা বিশ্রামক্ষেত্রে অর্থাৎ বাসগৃহে পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসে বিচার করলে বিচারক বা বিচারপ্রার্থী কারোরই স্বস্তি থাকে না, তাছাড়া বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিকে পরিবারের অন্যান্য পরিজন বা ঝি-চাকরদের সামনেও ছোট করা হয়, যেটা করা আদৌ উচিত নয়। তাই তিনি সকলকে চলে যেতে নির্দ্দেশ দিয়ে সুদীপকে ইশারায় দোতলায় উঠে আসতে বলে নিজে আগেই উঠে গেলেন।

সবাই চলে গেলে সুদীপ ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল এবং অর্দ্ধতল পর্য্যন্ত উঠে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত এসে হঠাৎ যেন কারো চাবুক খেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কিছুদিন আগের বলা অনুপমা দেবীর কর্কশ বাক্যগুলো সুদীপের শ্রবণমূলে যেন বিদ্ধ হ'ল। অস্ফুট একটা 'আঃ' শব্দ তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল এবং সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে নীচের দিকে নামতে লাগল। সুদীপ যখন পড়ি কি মরি করে নীচের দিকে নামছে ঠিক সেই সময় আচম্বিতে এক পরিচিত নারীকণ্ঠের সুমধুর ধ্বনি নেমে এল, "কি হ'ল, পালাচ্ছ কেন ভাই? এস, উপরে এস।" একি? এ কার কণ্ঠস্বর! এ স্বর তো অনুপমা দেবীর নয়। এ যেন অন্য এক চেনা স্বর। কিন্তু এ-সুর এ-স্বর এখানে! উপেন্দ্রবাবুর

বাড়ীতে! এ-সময়ে কি করে বেজে উঠল? বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে সুদীপ আবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে ফিরে চাইতেই দেখতে পেল কুসুম তার ডান হাতখানা সুদীপের দিকেই বাড়িয়ে দিয়ে মাত্র কয়েকটা ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে তার অপরূপ জ্যোতি, মুখে তার অনাবিল আনন্দ, অধরে তার সুমধুর হাসি। ক্ষণপূর্বে যে সুদীপ অনুপমা দেবীর কথা ভেবে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল সেই সুদীপই অত্যন্ত স্বস্তির সঙ্গে বলে উঠল, "একি দিদি, তুমি এখানে?" কুসুম সুদীপের এ-কথার জবাব দেবার আগেই উপেন্দ্রবাবু বারান্দা থেকে সহাস্যে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হে, আজ বৌদিদি নেই, তাই শুধু দিদি আছেন। এস, আর চিন্তা করতে হবে না, এবার উপরে এস দেখি।"

বৌদিদি অর্থাৎ অনুপমার কথায় সুদীপের আবার যেন আগের অস্বস্তিটা ফিরে এল। তার মুখের আনন্দোজ্জ্বল হাসিটা আবার মিলিয়ে গেল, কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবেই সুদীপ প্রশ্ন করে ফেলল, "কেন, বৌদি কোথায়?"

সুদীপের কথার উত্তরে কুসুম সহাস্যে বলল, "দিদি বেনারস গেছে কয়েক দিনের জন্য, তাই নন্দী-বাবুর সংসারের দায়িত্বটা আমার স্কন্ধে, সুতরাং এখন তোমাকে সাজা দেওয়ার দায়িত্বটাও আমার, বুঝলে তো?" বলে সুদীপের ডান হাতটা ধরে টানতে-টানতে তাকে দোতলায় এনে বারান্দায় একটা গদী-আঁটা সোফায় বসতে দিয়ে কুসুম বলল, "কি খাবে বল?"

কুসুমের "কি খাবে বল" কথাগুলোর মধ্যে সুদীপ যেন এক মমতাময়ী মাতার সহৃদয়তার সন্ধান পেল। সুদীপ মনে-মনে ভাবল—যদিও সে কুসুমকে দিদি বলেই সম্বোধন করেছে, তবুও এই মুহূর্ত্তে যেন সুচন্দ্রার মত এক মাতৃমূর্ত্তি কুসুমের অন্তর থেকে ঐ কয়টি শব্দ উচ্চারণ করেছে। সুদীপের মনে হ'ল আসলে সব নারীর মধ্যেই তো থাকে এক চিরন্তন মাতৃসত্ত্বা আর কুসুমের অন্তরের সেই মাতৃসত্ত্বাই তাকে এখন কিছু খেতে অনুরোধ করছে। সুদীপের অন্তরের ক্ষণপূর্ব্বের সমস্ত অস্বস্তি বিদূরিত হ'ল এবং আনন্দে তার অন্তর আপ্লুত হয়ে উঠল; হঠাৎ যেন সে খুব ক্ষুধাতুর হয়ে উঠল এবং হাসতে-হাসতে বলল, "দিদি, তুমি হাতে তুলে যা দেবে আমি তাই খাব, আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে, যা দেবে তাড়াতাড়ি দাও।"

সুদীপের কথায় কুসুম তার জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করতে রান্নাঘরে প্রবেশ করল এবং এই সুযোগে সুদীপকে প্রশ্ন করে উপেন্দ্রবাবু দোকানের কাঁটাতার ও বেলচার ঘটনাটা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক সব কথা জেনে নিলেন। ইতিমধ্যে কুসুম দুটি রেকাবীতে করে দুজনের জন্য জলখাবার নিয়ে সেখানে হাজির হ'ল। কুসুমকে আসতে দেখে সুদীপ ও উপেন্দ্রবাবু প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে অন্য কথায় চলে গেলেন।

কুসুম খাবারের রেকাবী দুটি সামনে একটা টিপয়ের উপরে রেখে আরও কিছু আনবার জন্য রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার দুটো প্লেটে করে কি যেন নিয়ে এসে হাজির হ'ল। খাবারের পরিমাণ ও পদের দিকে চেয়ে সুদীপ বলে উঠল, "আমাকে দেখে কি তোমার রাক্ষস বলে মনে হয়েছে যে, এতগুলো লুচি, আলুভাজা, তার উপর আবার ঐ অতটা হালুয়া ও মিষ্টি এনে হাজির করলে?" সুদীপের কথায় উপেন্দ্রবাবু সরস ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, "নাও হে নাও, খেয়ে নাও, লজ্জা করে আর কি হবে? না খেলে ঐ লোহার মত শক্ত শরীরটা থাকবে কি করে, শুধু জল খেয়ে খেয়ে এই রকম লোহার শরীরে কি জং ধরাতে চাও?" উপেন্দ্রবাবুর কথায় হেসে কুসুম সুদীপের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে সত্যিই সুদীপের শরীরটা প্রথম দিন সে যেরূপ দেখেছিল তার থেকে অনেক মজবুত হয়েছে, গায়ের রঙও বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। আসলে সুদীপের চেহারার মধ্যে অজ পাড়াগাঁয়ের সেই রোদ-পোড়া তামাটে রঙটা আর নেই, তার বদলে শহরের চাকচিক্যের সঙ্গে থাপ খেয়ে যাবার মত বেশ জৌলুষ এসেছে। তার দিকে চেয়ে-চেয়ে কুসুমের যেন মনে হ'ল শুধু রং ও চেহারাই নয়, সুদীপের বুদ্ধিদীপ্ত ও তরুণ চোখদুটো যেন আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রথম দিনে দেখা সেই জড়সড় ভাবটাও সুদীপ যেন একেবারে ঝেড়ে ফেলে সৌখীন এক শহুরে যুবকে পরিণত হয়েছে। শুধু তার পোযাক-আশাকের মধ্যে জৌলুষ নেই বলেই তাকে অমন মলিন দেখায়, না হলে কলকাতার যে-কোন অভিজাত পরিবারের সযত্নলালিত সন্তানের চেয়ে সুদীপ কোন অংশে কম নয়। এই কথা যেই মনে হওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে কুসুমের মনে একটা বুদ্ধিও খেলে যায়—সে মনে-মনে স্থির করে নেয়, সামনেই পয়লা বৈশাখ, তাই খাতা মহরতের দিনে দোকানে পরে যাবার জন্য সুদীপকে একখানা ভাল তাঁতের ধুতি ও একটা ভাল আদ্দির পাঞ্জাবী উপহার দেবে। কথাটা মনে-মনে ভাবলেও বলতে সাহস করে না, কারণ সে নন্দী-বাবুর মুখে সুদীপের আত্মসম্মানজ্ঞানের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। গরীব ঘরের সন্তান হলেও সুদীপ যদি কারও দান না নেয়? যদি কুসুমের দেওয়া আন্তরিক উপহারের সামগ্রী সে ফিরিয়ে দেয় বা নিতে রাজী না হয় তাহলে? তাহলে কুসুমেরও কষ্টের সীমা থাকবে না, কারণ কুসুমও মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়ে তাকে নিজের ভাইয়ের মতই ভেবে স্নেহসিক্ত দৃষ্টিতে দেখেছে।

কুসুম ও উপেন্দ্রর পীড়াপীড়িতে সুদীপ যখন খাবারে মনঃসংযোগ করেছে তখন হঠাৎ কুসুম বলে উঠল, "ব্রাহ্মণ ভোজন করালে দক্ষিণা দিতে হয় জানি, কিন্তু ভ্রাতৃ-ভোজন করালে কি দিতে হয় তা তো জানি না, তুমি জান নন্দীবাবু?" বলে নন্দীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে হাসতে থাকে। তীক্ষ্ণধী নন্দীবাবুর বুঝতে বাকী

থাকে না যে, কুসুম সুদীপকে একটা কিছু দিতে চাইছে, তাই তিনি রসাত্মক কণ্ঠে বলে ওঠেন "তা দিতে পারো, ইচ্ছে করলে কলকাতার একটা সুন্দরী ধরে তোমার ভাইকে উপহার দিতে পার যার সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতটা ধরে তোমার ভাই ড্যাং ড্যাং করে সংসারের সাতশ পাকে জড়িয়ে পড়বে।" নন্দীবাবুর এ-কথায় কুসুম হেসে ওঠে আর সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু হাসতে গিয়ে সুদীপের গলায় খাবার লাগে। সে তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস থেকে খানিকটা জল খেয়ে গলাটাকে পরিষ্কার করে।

কুসুম হাসতে-হাসতেই বলে, "বৌ উপহার দেবার জন্য ওর মা-বাবা আছেন, সেটা তো তাঁরা আগেই দিয়ে রেখেছেন, তুমি অন্য কিছু বল।"

"ইস্, কি ভুলো মন দেখেছ আমার? সুদীপের যে একটা মিষ্টি বউ আছে তা আমার খেয়ালই ছিল না। আচ্ছা মুশকিলে ফেললে তো আমায়। কি বলি বলো তো? বৌ যখন আছেই অন্য কিছুও ইচ্ছা করলে দিতে পার, যেমন ধর, ভালো একজোড়া ধুতি-পাঞ্জাবী বা ভাল একজোড়া চকচকে পাম্প সু বা ভাল একটা আংটি বা শীতের দিনে গায়ে দেবার জন্য ভাল একখানা কাশ্মীরী শাল ইত্যাদি বহু কিছু আছে।"

হঠাৎ হাত তুলে নন্দীবাবুকে থামিয়ে দিয়ে কুসুম বলল, "থাক থাক, অত দুনিয়ার ফন্দ আর তোমায় করতে হবে না। ঐ প্রথম যে কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অর্থাৎ একজোড়া ধুতি ও একজোড়া আদ্দির পাঞ্জাবী ঐ ঐটাই আমি ভাইকে কিনে দেব।"

ধুতি-পাঞ্জাবীর কথায় সুদীপ হাঁ হাঁ করে ওঠে। কারণ ধুতি যদিও সে পরে পাঞ্জাবী আজ পর্য্যন্ত কোনদিন সে পরে নি, বরাবর সে মোটা ছিটের হাফ-হাতা সার্টই পরে এসেছে। তাই পাঞ্জাবীর কথা শুনে সে তীব্র আপত্তি জানায়। বলে "ওরে বাবা, ও-সব আমি পরতে পারব না, আমায় তুমি মাফ কর দিদি।"

সুদীপের কথায় কুসুমের মুখটা মুহূর্তে মলিন হয়ে ওঠে, বেদনার্ত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, "কেন, কি হয়েছে? কেন পরতে পারবে না ভাই?" সুদীপ সজোরে বলে ওঠে, "না, না, ওসব আমার দ্বারা হবে না।"

সুদীপের এই নেতিবাচক উত্তরে নন্দীবাবু রসিকতা করে বলেন, "ওহে পর, পর; পরলে দেখবে নন্দী কোম্পানীতে আমাকে আর কেউ-বাবু বলছে না, সবাই তোমাকেই বাবু-বাবু করছে।"

সুদীপ চমকে ওঠে বলে, "আপনার সব কিছুতেই ঠাট্টা, ওসব পাঞ্জাবী-টাঞ্জাবী পরা আমার দ্বারা হবে-টবে না, অন্য কিছু থাকে তো বলুন।" সুদীপের এই কথায়

কুসুমের নিরক্ত মুখখানায় আবার যেন রক্তের সঞ্চার হয়, তার মুখটায় আবার হাসির রেখা ফুটে ওঠে। আর নন্দীবাবু বলেন, "পাঞ্জাবী না পরে তুমি কি আদ্দির হাফ-সার্ট পরবে নাকি? বেশ বুদ্ধি তো তোমার!" নন্দীবাবুর কথায় সুদীপ চুপ করে থাকে দেখে কুসুম বলে, "তাই করিয়ে দেব, তুমি আদ্দির হাফ সার্ট'ই পরবে; কিন্তু আর যে বেশী সময় হাতে নেই, তিন দিনের মধ্যে কি হয়ে উঠবে?"

কুসুমের এ-কথায় সুদীপ বলে ওঠে, "এত তাড়ার কি আছে? পরেই হবে।" কুসুম বলে, "না, তোমায় পয়লা বৈশাখ আমার দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবী পরে দোকানে যেতে হবে।" এই কথা বলে কুসুম আর্ত্ত দৃষ্টিতে নন্দীবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, "বল না নন্দীবাবু, তোমার দর্জি কি এই তুদিনের মধ্যে সার্ট তৈরী করে দিতে পারবে না?"

"পারবে না মানে! আমি বললে, সে ব্যাটার বাপ পারবে, তা সে তো কোন্ ছার।"

নন্দীবাবুর কথায় কুসুম আগ্রহান্বিত স্বরে বলে, "তা হলে জলখাবার খেয়ে তুমি আমার এই ভাইটিকে নিয়ে গিয়ে দর্জ্জির কাছে মাপ দিয়ে এস।"

অতঃপর জলযোগান্তে সুদীপকে নিয়ে উপেন্দ্রবাবু ট্রাম ধরে শ্যামবাজার কোহিনুর কোম্পানীতে গিয়ে জামার অর্ডার দিয়ে বলে দিলেন যে, পরদিন বেলা দেড়টা-তুটোর মধ্যে সার্টগুলো যেন তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দোকানদার খুশী হয়ে অর্ডার নিয়ে তাঁর নির্দ্দেশমত যথাসময়ে সার্ট পৌছে যাবে বলে আশ্বাস দিলে উপেন্দ্রবাবু ও সুদীপ সেখান থেকে বের হলেন এবং পাশেই একটা কাপড়ের দোকানে তুখানা সরেস তাঁতের ধুতি কিনে সুদীপের হাতে দিতে গেলে সুদীপ কিঞ্চিৎ মজা করবার জন্যই বলল, "আপনার কাছ হতে নেব কেন? আমি বাড়ী গিয়ে আমার দিদির হাত হতে নেব।"

"আচ্ছা, আমি বেটা তাহলে ফালতু? ঠিক আছে, চল তবে, বাড়ীই চল, দিদির জিনিষ দিদির হাত থেকেই নেবে চল।" বলেই সুদীপের পিঠে একটা স্নেহসিক্ত থাপ্পড় দিয়ে ধর্ম্মতলামুখী একটা ট্রামে পুনরায় সুদীপকে ওঠালেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। বাড়ীতে ঢুকেই নন্দীবাবু "কুসুম", "কুসুম" বলে চিৎকার করে ডাকতেই কুসুম বারান্দায় দেখা দিল। এর পর নন্দীবাবু উপরে উঠে এসে কুসুমের হাতে ধুতির প্যাকেটটা দিয়ে বললেন; "এই নাও, তোমার ভাই আবার ধুতিপাঞ্জাবী তোমার হাত ছাড়া আর কারও হাত থেকে নেবে না।" নন্দীবাবুর এ-কথায় কুসুম হাসতে হাসতে প্যাকেটটা খুলে একবার ধুতি

জুটো দেখে স্বদীপকে দিতে চায়। স্বদীপ বলে, "এক সঙ্গে সার্টগুলোর সঙ্গেই নেব। আমি একত্রিশে চৈত্র যে-কোন সময় এসে নিয়ে যাব দিদি, এখন এগুলো তোমার কাছেই রেখে দাও।"

স্বদীপের এ-কথায় কুসুম বলে, "কিন্তু আমি তো আগামীকাল সকালেই এখান হতে চলে যাব। দিদি বেনারস হতে কাল সকালেই ফিরছেন। দিদি ফিরলেই আমি আবার সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ে চলে যাব।"

নন্দীবাবু এই সময় বলেন, "আরে ঠিক আছে, আগামীকাল পাঞ্জাবী জুটো এসে গেলে স্পেশ্যাল আর্জেণ্ট চার্জ্জ দিয়ে কাচিয়ে পরশু সন্ধ্যায় অর্থাৎ উনত্রিশে সন্ধ্যায় তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেব। তারপর স্বদীপের যখন সময় হবে গিয়ে নিয়ে নেবে ওখান থেকে।"

নন্দীবাবুর এই ব্যবস্থায় কুসুম বা স্বদীপ কারো আর আপত্তি থাকে না। এরপর স্বদীপ নন্দীবাবু ও কুসুমকে নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মেসের দিকে রওনা হ'ল; মেসে এসে হাতপা ধুয়ে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখন স্বদীপের মনটা অনেক হাল্কা। এই মুহূর্ত্তে তার মনে হয় পৃথিবীতে যেন কোন দুঃখ, কোন কষ্ট নেই, নেই কোন বেদনা, হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি। স্বদীপ আপন অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারে কুসুমের মত মেয়ের পবিত্র সংস্পর্শে আসার জন্যই তার মনটা আজ এত খুশী ও এত হাল্কা হয়ে গেছে। কুসুমের প্রত্যেকটি কথায় প্রতিটি ব্যবহারে এমনই একটা সুষ্ঠু সৌন্দর্য আছে যা অতিশয় নীচাশয় লোককেও সদাশয় করে তোলে, অতি কঠোর নিষ্ঠুর লোককেও নরম ও ভদ্র করে তোলে। কুসুমের কথা ভাবতে ভাবতে একবার তার মনের কোণে একটা প্রশ্নের কাঁটা খচখচ করে ওঠে; প্রশ্নটা হ'ল—কুসুমই বা কে, আর ছোটবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কেমন? কুসুমকে কিছুতেই সামান্য একজন বারাঙ্গনা বলে ভাবতে স্বদীপের কিছুতেই ইচ্ছা হয় না আর উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটাও হীন বলে স্বদীপের কোন সময়েই মনে হয় না। সম্পর্কের মধ্যে কোন হীনতা থাকলে বেনারস যাবার সময় অনুপমা কুসুমের হাতে তাঁর সংসারের দায়িত্ব দিয়ে যেতেন না, কিন্তু কি এমন সম্পর্ক! অথবা কুসুমই বা কে যে শহরের ভদ্রপল্লীর বাসাবাড়ী ছেড়ে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের আখড়া কলঙ্কময় পল্লীর একটা বাড়ীর ঘর নিয়ে বাস করছে। অনেক ভেবেও এ রহস্যের কোন কূলকিনারা করতে পারে না স্বদীপ। তার মনে হয়, এ রহস্যের সমাধানের সূত্র বোধ হয় উপেন্দ্রবাবু, অনুপমা ও কুসুমের নিজেদের হাতে ছাড়া আর কারও হাতে নেই। যাঁদের হাতে রহস্য সমাধানের চাবি তাঁদের সঙ্গে স্বদীপের সম্পর্কটা এমনই একটা প্রীতির মাধুর্য্যে

মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, তাঁদের কাউকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটা শুধু গর্হিতই নয়, অত্যন্ত অন্যায়। অবশেষে সুদীপের পক্ষে এই মুহূর্তে যেটুকু চিন্তা করা উচিত অর্থাৎ উপেন্দ্রবাবু তার অন্নদাতা আর কুসুম তার দিদি এইটুকু ছাড়া তার সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। কুসুমের কথা মনে এলেই কেমন যেন একটা ভাল-লাগা সুদীপকে চেপে ধরে। কাছে এলে কেমন যেন ভগ্নীপ্রীতিতে তার মনটা ভরপুর হয়ে ওঠে। মনে মনে কমলার আসনে বসিয়ে কুসুমকে চিন্তা করতে থাকে এবং মুহূর্তের মধ্যে তার মনের সব মালিন্যই দূর হয়ে যায় আর সে কুসুম ও কমলার ভ্রাতৃত্বের আসন পেয়েছে বলে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করে।

অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে চৈত্রের শেষ তিন দিন কোথা দিয়ে যে কেটে যায় সুদীপ বুঝতে পারে না। দোকানের সমস্ত কাজকর্ম্ম গুছিয়ে পরদিন কালীঘাটে খাতাপূজার ব্যবস্থাদির আয়োজন সম্পূর্ণ করে বিদায়ী বর্ষের শেষ দিনে বৈকাল চার ঘটিকা নাগাদ মেসে ফিরে সুদীপ স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে তার দিদি অর্থাৎ কুসুমের নিকট জামাকাপড় আনতে রওনা হয়। কুসুমের বাসায় এসে দেখে কেউ কোথাও নেই, দরজায় তালা ঝুলছে। দরজায় তালা দেখে সুদীপ কিঞ্চিৎ বিস্মিত চিত্তে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে, এমন সময় ঐ বাড়ীর দারোয়ান সুদীপের নিকট এগিয়ে এসে তার দিকে একটা চাবির রিং এগিয়ে দিয়ে বলে, “এই লিন বাবু, ছোট দিদিমণির ঘরের চাবি, আপনাকে বসতে বলে গেছেন, দিদিমণি এক্ষুণি এসে পড়বেন।” দারোয়ানের হাত হতে চাবির গোছাটা নিয়ে ফিরতে যাবে এমন সময় দেখে হাঁফাতে হাঁফাতে কুসুম সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। কুসুমকে দেখে সুদীপ সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে পড়ে। কুসুম তার কাছে এসে বলে, “যা ভেবেছি ঠিক তাই, সারা দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে-বসে যেই একটু বেরিয়েছি অমনি তুমি এসে হাজির হয়েছ; আমি না এসে পড়লে ফিরে যেতে নাকি?”

কুসুমের কথায় সুদীপ হাতের চাবির গোছাটায় আওয়াজ তুলে বলে, “হ্যাঁ, ফিরে যাবার জন্যই তো এই চাবিটা হস্তগত করেছিলাম।” বলে একটু হাসে। কুসুম সুদীপের চাবিশুদ্ধু হাতটা ধরে টানতে টানতে তিনতলায় নিয়ে এসে ঘরের চাবি খুলে হাতের প্যাকেটটা খুলে একটা আনকোরা নতুন গেঞ্জী বের করে সুদীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, “নাও, এই গেঞ্জীটা পরে দ্যাখ তো, গায়ে ঠিক লাগে কিনা। এতক্ষণে সুদীপ বুঝতে পারে চৈত্রমাসের রৌদ্র মাথায় করে কুসুম কোথায় গিয়েছিল। খুশীর আনন্দে তার চোখে জল এসে যায়। সে শুধু একবার অস্ফুটে উচ্চারণ করে ফেলে, “দিদি! আমার জন্য তুমি এত কষ্ট করতে গেলে কেন?”

সুদীপের এ-কথায় কুসুম বলল, "কষ্ট আর কি? এই তো দু-পা হেঁটে গিয়ে হাতিবাগান থেকে কিনে এনেছি, আন্দাজে কিনেছি; লক্ষ্মীভাইটি আমার, একবার-পরে দেখ ঠিক হয়েছে কিনা।" কুসুমের কথা বলার সানুনয় ভঙ্গীতে সুদীপ আর মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করে গায়ের হাফ সার্ট ও পিঠ-ছেঁড়া একটা গেঞ্জী খুলে নতুন গেঞ্জীটা পরে দেখে একেবারে ঠিক তার মাপ মত হয়েছে। সুদীপ তখন বলে ওঠে, "আন্দাজে তুমি তো ঠিকই কিনেছ দিদি, একেবারে ঠিক আমার গায়ের মাপ মত।" এর পর কোন কথা না বলে কুসুম আর একটা প্যাকেট থেকে একটা আণ্ডার-প্যাণ্ট বের করে সেটার ভাঁজ খুলে সুদীপের কোমরেব কাছে ধরে নিজেই পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে যায় এবং মিনিট খানেক পরে যখন বের হয়ে আসে তখন সুদীপ দেখে তার হাতে একটা মাথার চুলে লাগাবার পিন ও প্যাণ্টে পরাবার জন্য ফিতে। সুদীপ তার পুরাতন গেঞ্জী-জামা পরে উত্তর দিকের দেওয়ালসংলগ্ন একটা টুলের উপর বসে এবং একমনে কুসুমের প্যাণ্টে ফিতে পরানো দেখতে থাকে। একটায় সুতো পরানো হয়ে গেলে কুসুম আর একটা প্যাণ্ট প্যাকেট থেকে বের করে সেটাতেও ফিতে পরাতে থাকে। দ্বিতীয় প্যাণ্টটা প্যাকেট থেকে বের করার সময় কি যেন একটা মেঝেতে পড়ে। সুদীপ লক্ষ্য করে দেখে একজোড়া দুধের মত সাদা রুমাল। সুদীপ নীরবে সব কিছু লক্ষ্য করতে থাকে এবং মনে-মনে ভাবতে থাকে তার যদি সহোদরা বিত্তবতী কোন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী থাকতেন তিনিও হয়তো এমনি করেই তার জন্য জামাকাপড় কিনে দিতেন। সুদীপের অন্তর কুসুমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায়।

আণ্ডার-প্যাণ্টে ফিতে পরানো হয়ে গেলে সেগুলোকে ভাঁজ করে' প্যাকেটে রাখতে গিয়ে রুমাল দুটো না দেখে কুসুম আঁতকে ওঠে এবং বলে, "দেখেছ দোকানীটার কাণ্ড, বললাম দুখানা সাদা রুমাল দিতে, তা দেয় নি, আশ্চর্য্য!" সুদীপ চুপচাপ সব দেখছিল, এতক্ষণে সে মুখ খোলে, "আশ্চর্য্য দোকানীটা, না, তুমি দিদি? দোকানী কোন ভুল করে নি, এই নাও তোমার রুমাল," বলে সুদীপ কুসুমেরই পায়ের কাছে মেঝেয় পড়ে-থাকা রুমাল দুটো তুলে নিয়ে কুসুমের হাতে দেয়।

রুমাল দুটো হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে কুসুম সেগুলো প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে এবং খোলা গেঞ্জীটাকে ভাঁজ করে অন্য প্যাকেটে ভরে দেয়। এরপর সামনের আলমারী হতে ধুতি ও সার্টগুলো বের করে এনে সুদীপের সামনে ধরে এবং বলে, "নাও, ধর এগুলো"। সুদীপ সেগুলো হাতে করে নিয়ে কুসুমকে পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম করে হাতটা মাথায় মুখে ঠেকায়। সুদীপ প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই

কুসুমও তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার শিরশ্চুম্বন করে এবং বলে, "বস, চা করছি, খেয়ে যাবে।"

বাইরের দিকের দরজাটায় খিল তুলে দিয়ে কুসুম সুদীপকে নিয়ে ভিতরের ঘরে আসে এবং সুদীপকে খাটের উপর বসতে দিয়ে পাশেই আর একটা ছোট ঘরে ঢুকে স্টোভ্ জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দেয়। সে খাটের ধারে এসে সুদীপের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা সুদীপ, এই রকম একটা বাড়ীতে থাকতে দেখে ও আমার নাম কুসুমবাঈ শুনে তোমার কি একটুও ঘৃণা হয় না?"

যে রহস্যময় প্রশ্নটা সদাসর্ব্বদা সুদীপের মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে রহস্যের একটা সম্মানজনক সমাধানের সূত্রে সুদীপ যতটা সুখী হবে পৃথিবীতে হয়ত আর কেউই ততটা সুখী হবে না সেই রহস্যের বেড়াজাল কুসুম নিজ হাতেই ছিন্ন করতে চায় বুঝে অন্তরের সহস্র আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে সুদীপ বলে, "কি হবে আমার ও-সব শুনে? তুমি আমার দিদি, ব্যস্, আর কিছু শোনার আমার প্রয়োজন নেই।"

সুদীপকে বাধা দিয়ে কুসুম বলে, "তা হয় না সুদীপ, তুমি আমায় দিদি বলে ডেকেছ আর আমিও তোমায় ভাই বলে বুকে তুলে নিয়েছি, আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যেমন কোন মলিনতা নেই তেমনি কোন ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তোমার অন্তরে একটা রহস্যের অন্ধকার জেগে থাকবে এটাও আমার সহ্য হবে না। তুমি একটু বস, আমি চাটা নিয়ে এসে তোমার কাছে বসে সব বলব।"

"সব বলব" বলার মধ্যেই যেন একটা ব্যথার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে, কুসুম চা নিয়ে এসে খাটের উপর তার পাশে বসে বলতে চাইলে সুদীপ একবার বাধা দিতে চায়, কিন্তু কুসুমের বলবার আকুলতায় তার বাধা দেবার মনোভাব নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায় আর কুসুম বলতে আরম্ভ করে।

আমার আসল নাম কুসুম চৌধুরী। বৈঁচীগ্রামের জমিদার-পরিবার চৌধুরী বাবুদের বড়কর্ত্তা অনাথবন্ধু চৌধুরীর একমাত্র কন্যা আমি। অনাথবন্ধু চৌধুরীর নামটা শুনে সুদীপ চমকে ওঠে, কারণ বর্দ্ধমান জেলায় এমন এলাকা নেই যেখানে ঐ চৌধুরী পরিবারের কিছু-না-কিছু সম্পত্তি নেই, তাছাড়া জমিদার অনাথ চৌধুরী যেমন সৎ, কর্ম্মপরায়ণ, তেমনি দেশপ্রেমিক ব্যক্তি বলে খ্যাতি ছিল, দেশজোড়া তাঁর নাম। তাঁর কন্যা এই কুসুম! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সুদীপ শুনতে থাকে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে যায় সে। কুসুম বলতে থাকে, সাত ভাইয়ের পর আমার জন্ম, সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন বলে আমায় লোকে "চম্পা" বলে ডাকত,

লোকে ডাকতে-ডাকতে আমার ডাক-নামটাও চম্পাই হয়ে যায় শেষ পর্য্যন্ত। খুব ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়া ও নাচগানে আমার সমান আগ্রহ, তাই বাবা ও দাদারা সবাই আমায় উৎসাহ দিতেন লেখাপড়া ও গানবাজনা করবার জন্য। বাবা ও দাদাদের কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে নৃত্যগীতেও সমান পারদর্শিনী হয়ে উঠলাম। চৌদ্দ বছর বয়সেই চারদিকে আমার নাচগান নিয়ে প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল। হাল্কা গান ছেড়ে আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকে ঝোঁক দিলাম, কিন্তু বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানার গুরুর অভাব বোধ হওয়ায় বাবাকে বললাম, আমি বেনারসে গিয়ে প্রখ্যাত শিল্পী সৈয়দ খাঁর কাছে গান শিখতে চাই।

বাবা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন আর রাজী না হওয়ার কোন কারণও ছিল না, কারণ বেনারসে আমাদের বাড়ী ছিল, চাকরবাকরও ছিল। বছরের মধ্যে প্রায় সব সময়েই বাড়ীর কেউ-না-কেউ কিছু দিনের জন্য ওখানে গিয়ে থেকেও আসতেন। সুতরাং বাবা রাজী হতেই চিঠিপত্র মারফৎ যোগাযোগ করতে সৈয়দ খাঁ সাহেবও রাজী হয়ে গেলেন গান শেখাতে। তিনি সপ্তাহে একদিন গান শেখাবার জন্য যা দক্ষিণা চাইলেন বাবা তাতেই রাজী হয়ে গেলেন, কারণ বাবা নিজে খুবই সঙ্গীতপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম দিকে মা কিছুতেই রাজী হন নি বেনারসে গিয়ে আমার গান শিখবার প্রস্তাবে। পরে বাবা ও দাদাদের চাপে পড়ে মাও রাজী হয়ে গেলেন। সপ্তাহে একদিন গান ও দুদিন নাচের তালিম চলতে লাগল বেনারসের সেরা দুই শিল্পীর নিকট। সব ঠিকই চলছিল, কিন্তু ঈশ্বরের খেয়াল ছিল অন্যরকম। তিনি মনে-মনে হয়ত হাসছিলেন এবং ভাবছিলেন, "দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।" এরপরে এল সেই কালরাত্রি। সেদিন তারিখটা ছিল চৌঠা ভাদ্র। সকাল থেকেই আকাশের কোণে মেঘ আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝির-ঝিরে হাওয়া। বেলা যতই বাড়তে থাকে মেঘ ততই জমাট বাঁধতে থাকে, আর হাওয়ার বেগও তত বাড়তে থাকে। অবশেষে বেলা চারটা নাগাদ খাঁ সাহেব এলেন। তিনি খুবই কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তখন প্রায় দেড় বছর আমার শেখা হয়েছে। তার মধ্যে কোনদিন ওঁর অনুপস্থিতি দেখি নি।

সেদিনকার আবহাওয়ার পরিস্থিতির জন্য আমার সঙ্গীততৃষাতুর মনপ্রাণ যখন প্রতিটি মুহূর্ত্তে খাঁ সাহেবের জন্য প্রতীক্ষা করে-করে ক্লান্ত, ঠিক তখনই ঐ দুর্দ্দান্ত ঝড়-জলের মধ্যে বাড়ীর গেট ঠেলে খাঁ সাহেবকে ঢুকতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। বয়সটা কম ছিল, তাই সব দিক না বুঝে ছুটে এসে খাঁ সাহেবের হাতটা ধরে ফেলেছিলাম আর বলে ফেলেছিলাম, "এত বৃষ্টির মধ্যেও যে আপনি আসবেন তা আমি ভাবতেও পারি নি।" আমার কথায় হাসতে-হাসতে তিনি

বলেছিলেন, "মাসের মাত্র চারটি দিন আসার জন্য তোমার বাবা আমায় দু-শ টাকা দিচ্ছেন খুকী, সুতরাং সামান্য একটু বৃষ্টির জন্য না এলে যে তাঁর উপর অবিচার করা হবে ; তাছাড়া তোমার মত অসাধারণ ছাত্রীই বা আমার কজন আছে বল ?"

কথা বলতে বলতে খাঁ সাহেবের হাতটা ধরেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছি- এমন সময় দেখি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছে প্রৌঢ়া ঝি বিনতা, যাকে আমরা পিসী সম্বোধনে ডাকতাম। বিনতা আমাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে হঠাৎ জিভ্‌টা খানিকটা বের করে মাথায় এক হাত ঘোমটা টেনে চট্‌ করে সরে এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার ঐ রকম করে জিভ্‌ বের করা বা ঘোমটা টেনে পাশে সরে দাঁড়ানোর মধ্যে যে কোন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে তা তখন ভাবতে পারিনি, কিন্তু পরে বুঝেছি। খাঁ সাহেবের সব পরিচ্ছদ ভিজে থাকায় বাবার একটা ধুতি ও একটা গেঞ্জী তাঁকে পরতে দিয়ে তাঁর জামাকাপড়গুলো কেচে নিঙ্‌ড়ে বারান্দার তারে ঝুলিয়ে তানপূরা নিয়ে বসলাম। এরপর চলল রেওয়াজ, একের পর এক— বাগেশ্রী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, পিলু। গাইতে-গাইতে কখন যে রাত দশটা বেজে গেছে কারও খেয়াল নেই। সঙ্গীতশিল্পীকে বর্ষা যেন পাগল করে দেয়, বর্ষণমুখর রাত্রে শিল্পীর যেন ক্লান্তি আসে না, তাই আমি আবার ধরতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু খাঁ সাহেব নিষেধ করে বললেন, "আজ আর না, গলা খারাপ হয়ে যাবে, তাছাড়া আমাকেও ফিরতে হবে।" হাতের তানপুরা নামিয়ে ঘর হতে বের হয়ে বারান্দায় এসে দেখলাম তখন ঝড়ের গতি প্রচণ্ড বেড়েছে আর বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটার সঙ্গে শিলার টুকরো ঝরছে। এ অবস্থায় খাঁ সাহেবকে ছেড়ে দিতে মন চাইল না, তাই সে-রাত্রের মত আমাদের বাড়ীতেই তাঁকে থেকে যেতে অনুরোধ করলাম। খাঁ সাহেব ইতস্ততঃ করে রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ঝড়-বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ দেখলেন না তখন থাকতে রাজী হলেন। সামান্য কিছু আহার্য্য গ্রহণ করে তিনি দোতলাতেই একখানা ঘরে শয্যা গ্রহণ করলেন আর পাশের ঘরে থাকলাম আমি। শোবার সময় বহুবার বিনতা পিসীকে বললাম আমার ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শোবার জন্য, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হ'ল না। আমার কথা শুনে কেবল মুচকি হাসতে লাগল। তখন সেই হাসির অর্থ না বুঝলেও এতদিনে বুঝতে পেরেছি সে-হাসির পিছনে ছিল অন্য উদ্দেশ্য। যাই হোক, একাই পাশের ঘরে শুলাম। এরপর রাত আরও গভীর হলে ঝড়ের তীব্রতা বাড়ল এবং বিদ্যুতের সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হতে লাগল। ঘরের দরজা-জানালা সব ঝন্‌ঝন করতে লাগল, তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে দেখি বারান্দার একপাশে রাখা লণ্ঠনটা নিভে গেছে। ঐ প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে ঝড় ও বজ্রের আওয়াজে ভয়ে সমস্ত শরীরটা হিম

হয়ে গেল। এমন অবস্থা হ'ল মনে হ'ল তক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি করে পাশের ঘরের দরজায় ঘা দিলাম, বার কয়েক আঘাত করতেই দরজা খুলে খাঁ সাহেব বেরোতে যাবেন এমন সময় প্রচণ্ড জোরে শব্দ করে নিকটেই একটা বাজ ভেঙ্গে পড়ল আর আমি বিদ্যুতের আলোয় সামনে খাঁ সাহেবকে দেখে ভয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয় কি খুকী, আমি তো রয়েছি।' খাঁ সাহেব যখন ঐ কথা বলছেন তখন আবার একটা বিদ্যুতের শিখায় সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল আর হঠাৎ ঐ সময় খাঁ সাহেবের ঘরের সামনে সিঁড়িটার কাছে নজর পড়তেই মনে হ'ল ঘোমটা মাথায় দিয়ে যেন একজন কেউ চট করে নীচের দিকে নেমে গেল। খাঁ সাহেবকে বললাম আমার কেমন ভয় করছে, আপনি একবার বাইরেটা দেখে আসুন। খাঁ সাহেব দেখে এসে বললেন, 'কেউ কোথাও নেই। তুমি ভুল দেখেছ খুকী।' খাঁ সাহেব বললেও সেদিন আমি ভুল দেখিনি, পরে জেনেছি বিনতা পিসী তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বিদ্যুতের আলোয় আমাদের জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে আবার নীচে নেমে গিয়েছিল।

এরপর খাঁ সাহেব বললেন, 'তোমার ভয় লাগে তো তুমি এ-ঘরের খাটে শুতে পার, আমি বরং মেঝেটায় শুচ্ছি।' খাঁ সাহেবের কথা শুনে তাই করলাম, তারপর আস্তে-আস্তে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছি, ঝড়বৃষ্টিও থেমে গেছে এবং কখন সকাল হয়ে গেছে তা কেউই জানতে পারি নি। ঘুম ভাঙ্গল ঝি বিনতা পিসীর সোরগোল শুনে। সিঁড়ির নীচে থেকেই সে ডেকে চলেছে, 'ও খুকী ওঠ, কখন উঠবে, য়্যাঁ ? গাছেপালায় যে রোদ উঠেছে গো, কি ঘুম রে বাবা।' বিনতা পিসীর ডাকে সাড়া দিয়ে বিছানায় উঠে বসতেই দেখি দরজাটা হাট করে খোলা আর নীচে খালি মেঝেয় খাঁ সাহেব তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বিছানায় বসে পরিস্থিতিটা একবার ভেবে নিয়ে বেশবাস সংযত করে ধীরে-ধীরে নীচে নামলাম। নীচে নামতেই বিনতা পিসীর প্রথম কথা, 'ছি-ছি শেষকালে একটা মোচলমানের সঙ্গে ?' বয়স যদিও তখন মাত্র সাড়ে পনর, তবুও ঐটুকুই যথেষ্ট, কারণ ও ইঙ্গিত বোঝবার পক্ষে সাড়ে পনর বছরই যথেষ্ট। লুকোচুরি না করে বিনতা পিসীকে গত রাত্রির সব ঘটনা খুলে বললাম—কেন ও-ঘরে গিয়েছিলাম, ঐ খাটে শুয়েছিলাম সমস্ত কিছু ; কিন্তু ভবী ভোলবার নয়, সে সেই এক কথা আউড়ে যেতে লাগল, 'খুকী, তুমি করলে কি, ছিঃ ছিঃ, শেষকালে একটা মোচলমানের সঙ্গে !' বার-বার তার ঐ এক কথা শুনে এক সময় প্রচণ্ড রাগ হ'ল, বললাম, 'দেখ বিনতা পিসী, তুমি এ বাড়ীর ঝি, ঝিয়ের মত থাকবে, তার বেশী নয়, এরপর পুনরায় যদি ঐ কথা শুনি তো বাবাকে চিঠি

লিখে তোমার ছুটি করিয়ে দেব।' বললাম বটে, কিন্তু আমাকে চিঠি লিখতে হ'ল না, চিঠি বিনতা পিসীই লেখাল ঠাকুর হরেরামকে দিয়ে এবং কয়েকদিন পরে দেখি সদলে বাবা, মা ও বড়দা এসে হাজির। কেউ বললেন, 'কুলের কলঙ্কিনী।' কেউ বললেন, 'এই মুহূর্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা', কেউ বললেন, 'গলায় দড়িও জুটল না তোর?' অনেক করে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুতেই কাউকে বোঝাতে পারলাম না। আপন মেয়ের কথার থেকে বাড়ীর ঝি বিনতার কথার মূল্য তাঁদের কাছে বেশী হ'ল। অবশেষে অকারণে আপন লোকের ঘৃণা আর অহেতুক অপবাদের লজ্জার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ডুবে মরব বলে বিকেল থেকে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে চুপচাপ বসে আছি সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষায়, এমন সময় আমার খুড়তুতো দিদি অনুপমা ও জামাইবাবু উপেন্দ্রবাবু ওখানে গিয়ে হাজির। ওঁরা সেই দিনই কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ওঁদের বাড়ী আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে। আমি ওখানে আছি শুনে বিকেলে বেড়াতে বেরোবার আগে আমায় সঙ্গে নিতে গিয়ে দেখেছেন আমি বাড়ীতে নেই। বাবা-মাকে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর না পেয়ে বিনতাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে সব বলেছে এবং আরও বলেছে, 'বাবু তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।' আমাদের বাড়ী থেকে বের হয়ে নন্দীবাবু সোজা থানায় গিয়ে একটা ডাইরী করে নিজেই টাঙ্গা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে হাজির।

ওদিকে আমি বিকেলে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর বাবা-মা-দাদা ওঁরা প্রথমে হয়ত ভেবেছিলেন যে, ধারে-কাছে কোথাও গেছি, দুচার মিনিটেই ফিরব কিন্তু রাত্রি যখন দশটা হয়ে গেছে তখনও ফিরিনি দেখে ওঁরাও খুঁজতে বের হয়েছিলেন। গঙ্গার ঘাটে বসে আমার মুখ থেকে সব কিছু শুনে উপেন্দ্রবাবু বললেন, 'নাও, আমার সঙ্গে ও-বাড়ীতে চল, পরে আগামী কাল সকালে জ্যাঠা মশায়ের সঙ্গে যুক্তি করে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।' জামাইবাবু বললেও আমি তো আমার বাবাকে জানি, তিনি যখন এ রকম একটা মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে আমার উপর কোপান্বিত হয়েছেন তখন তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝান বোধ হয় শিবেরও অসাধ্য। যাই হোক, জামাইবাবুর কথায় গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে অনুদিদির বাড়ীতে এলাম এবং রাগে-দুঃখে-অভিমানে ওখানেই বসে-বসে কেঁদে-কেঁদে যখন রাত্রি দেড়টা বাজল তখন শুনলাম বাইরে থেকে কে একজন নন্দীবাবু এবং দিদির নাম ধরে ডাকছে। বুঝলাম দাদার গলা। দাদার ডাক শুনে নন্দীবাবু নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ভয়ার্ত কণ্ঠে দাদার প্রশ্ন, 'আচ্ছা, তোমরা চম্পাকে দেখেছ?' নন্দী-বাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না,' নন্দীবাবুর 'না' শুনে দাদা যেন হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং আকুল

কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "সেই কোন্ বিকেলে বেরিয়েছে, এখনও পর্য্যন্ত তার কোন পাত্তা নেই। কোথায় গেল মেয়েটা।" নন্দীবাবু আরও দৃঢ় ও সংযত কণ্ঠে দাদাকে প্রতিপ্রশ্ন করলেন, "বাঃ, সেই বিকেলে বেরিয়েছে আর এখন রাত্রি প্রায় পৌনে দুটো, এতক্ষণে মেয়েটার জন্য খোঁজ হচ্ছে! বাঃ, চৌধুরী বাড়ীর ব্যবস্থাটা চমৎকার তো?" নন্দীবাবুর শ্লেষভরা ঐ কথাগুলো শুনে দাদা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে যেমন হঠাৎই এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই চলে গেলেন আর নন্দীবাবুও সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে খিলটা আটকে দোতলায় উঠে এলেন। ওদিকে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি আর অনুদি ওঁদের দুজনের সব কথাই শুনেছি, তাই নন্দীবাবু আসতেই অনুদি তাঁকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"জ্যাঠামশায় খোঁজাখুঁজি করছেন আর তুমি বললে না চম্পা এখানে রয়েছে। ওরা যে সারা রাত ধরে খোঁজাখুঁজি করবেন, কষ্ট পাবেন।"

"হ্যাঁ, খোঁজাখুঁজি করবেন! কষ্ট পাবেন!' তা এতক্ষণ হয়েছিল কি তোমার জ্যাঠামশায়ের? তোমার বড়দার? মেয়েটা যদি জলে ঝাঁপই দিত তাহলে এতক্ষণ পরে খোঁজাখুঁজি করে কি করতেনটা ওঁরা শুনি?" অনুদি বলল, "ছিঃ-ছিঃ, কি লোক গো তুমি! তোমার প্রাণে কি দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই?"

"আছে, আছে, দয়া আছে, মায়া আছে, মমতা আছে, দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, সব আছে। আর আছে বলেই তো মেয়ের জন্য একটু দুঃখ, একটু কষ্ট ওঁদের হোক এটাই আমি চাই। সারারাত খোঁজাখুঁজি করুন। জ্যাঠাইমা কান্নাকাটি করুন, জ্যাঠামশায় হা-হুতাশ করুন, বড়দা হায়-হায় করুন, তারপর কাল সকালে রোদ উঠলে দেখা যাবে। নাও এখন শুয়ে পড়গে তোমরা, অনেক রাত হ'ল, আর বকর-বকর করো না, যাও শুয়ে পড়গে"। সে রাত্রের মত সবাই শুতে চলে গেলাম। শুলাম বটে, কিন্তু একটা অস্থিরতার জন্য চোখের দু' পাতা আর এক হ'ল না। সারারাত জেগেই কেটে গেল।

পরদিন সকাল হতেই দেখি মা আর বড়দা আবার কাকার বাড়ীতে এসে হাজির। মাকে ও বড়দাকে দেখেই জামাইবাবু আমায় তিনতলার চিলের ঘরে লুকিয়ে রেখে নীচে এসে কথা বলতে লাগলেন। তখন সব শুনতে পারি নি, কিন্তু পরে নন্দীবাবুর মুখে যা শুনেছি এবার সেটাই তোমায় বলছি, শোন।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কুসুমের খেয়াল হয় সুদীপের চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে একটুকুও খায় নি। তাই তার উদ্দেশ্যে কুসুম বলে উঠল, "একি ভাই, চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, গল্পটা আগে শেষ করে নিই, তারপর তোমায় আবার চা খাওয়াব।" সুদীপের যেন ধ্যান ভঙ্গ হ'ল,

সে কেমন যেন ভিজে-ভিজে গলায় বলল, "না, না, ঠিক আছে, তুমি বল দিদি, বাকীটুকু শোনবার জন্য আমার মনটা ছটফট করছে।" সুদীপের আগ্রহভরা কণ্ঠস্বর শুনে কুসুম আবার বলতে আরম্ভ করল।

নন্দীবাবুর সঙ্গে মায়ের যা কথোপকথন হয়েছিল তা হ'ল, মা কাঁদতে-কাঁদতে জামাইবাবুকে "বলেছিলেন, কি হবে বাবা উপেন, আমার কুসুমকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, সাত ছেলের পর ও যে আমার একটি মাত্র মেয়ে, বাবা। কি করব আমি কোথায় যাই।" বলতে-বলতে মা কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন আর অনুদি তাঁর কাছে গিয়ে চোখের পাতা ভিজিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলেছিল, "কেঁদো না জ্যাঠাইমা, তুমি দেখো সে ঠিক ফিরে আসবে, তোমরা কেউ তাকে বুঝতে চাও নি, কষ্ট দিয়েছ বলে তার হয়তো অভিমান হয়েছে, তাই দু-দিন কোথাও গিয়ে লুকিয়ে আছে। সময় হলেই সে ঠিক ফিরে আসবে।" অনুদির কথা শুনে মা ককিয়ে উঠে বলেছিলন, "নারে অনু, সে আর ফিরবে না, সেও যে তোর জ্যাঠামশায়ের মত বড্ড জেদী, তাকে তোরা জানিস না, আমি যে তাকে গর্ভে ধরেছি, তাকে আমি যতটা জানি ততটা কেউ জানে না।" বলতে বলতে মায়ের কান্নার বেগ বেড়ে গিয়েছিল, নির্ব্বান্ধব কাশী নগরীতে দুটি আপনজন পেয়ে মায়ের অবরুদ্ধ আবেগ যেন সেদিন বুক ফেটে বেরিয়ে এসেছিল। আমি তিন তলার চিলেকোঠার ঘর থেকেই মায়ের উচ্চৈঃস্বরে কান্না শুনে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। একবার মনে হয়েছিল দরজা খুলে বেরিয়ে যাই, কিন্তু দরজা টানতেই বুঝলাম যে, নন্দীবাবু বাইর থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে গেছেন। মনে মনে নন্দীবাবুর উপর একবার রাগও হ'ল। এত লুকোচুরি করে কি লাভ। আসল কথাটা বলে দিলেই হয়, বলে দিলেই হয় যে, আমি মরি নি বা কোথাও পালিয়ে যাই নি, এখানেই সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে আছি। যাই হোক, শেষমেষ নন্দীবাবু ও'দের বললেন থানায় একটা ডাইরী করতে এবং আরও চারিদিকে খোঁজখবর নিতে।

ও'রা উঠে চলে গেলে নন্দীবাবু হাসতে হাসতে এসে চিলে ঘরের দরজা খুলে দিয়ে আমায় নামিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "নাও হে চম্পারাণী, এবার স্নানটান করে ভাল করে খাওয়াদাওয়া করে একটু ঘুমিয়েটুমিয়ে নাও। বিকেলে আবার বাপের বাড়ী যেতে হবে তো।" নন্দীবাবুর রসিকতাটা খুব ভাল লাগছিল না তখন আমার, কারণ মায়ের কষ্ট দেখে মানসিক অস্থিরতাটা তখন আমার আরো বেড়ে গেছে, তাই বললাম, আমি কোথাও যাবো না, যা ফয়সালা করবেন এখানে বসেই আপনি করবেন, এখন আমি কিছুতেই ও-মুখো হতে পারব না।"

নন্দীবাবুও দমবার পাত্র নন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা করে বলে উঠলেন, "এই রে সেরেছে, এক তোমার দিদি পেত্নীটা ঘাড়ে চেপে সব সময় ঘাড় মটকাচ্ছে, আবার তুমি শুদ্ধ এই কচি ঘাড়টাকে নিয়ে টানাটানি করতে চাও নাকি ?" না বাবা সে আমি পারব না, আমার ঘাড়টা অত শক্ত নয় যে, অনাথ চৌধুরী মশায়ের আদরের নিধি চম্পারাণীকে ঘাড়ে চড়াব ।" নন্দীবাবুর এই সরস হাস্য কথায় মুহূর্তে আমার অবসাদগ্রস্ত মনটা হাল্কা হয়ে গেল, আমি যেন গতকাল থেকে কি হয়েছে না হয়েছে সব ভুলে গেলাম এবং প্রত্যুত্তরে ঠাট্টা করে বললাম, "কেন এ পেত্নীটা কি একেবারে অচল ? নন্দীবাবুর পাতে দেবার যোগ্য নয় ?" আমার কথা শুনে নন্দীবাবু হেসে উঠলেন এবং বললেন; "না গো ছোটরাণী, তা নয়, পেত্নীটা খুবই যোগ্য, সঙ্গীতে সুধাকণ্ঠী, নৃত্যে অদ্বিতীয়া, দেখতেও অপরূপা, কিন্তু এই নন্দীবাবুটাই যে ঘুণধরা বাঁশের টুকরো।" এই কথা বলে নন্দীবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। নন্দীবাবু বিত্তবান ঘরের সন্তান হলেও ছোটবেলায় লেখাপড়া বেশীদূর করেন নি, তাই বড়বেলায় নিজেনিজেই নিজের অযোগ্যতার কথা বলে যেন স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইতেন। নন্দীবাবুর কথায় বুঝলাম যে, তাঁর সঙ্গে তখনকার মত রসিকতা করা চলবে না।

যাই হোক, শেষকালে ঠিক হ'ল যে, নন্দীবাবু দুপুরের পর ওবাড়ীতে গিয়ে বলবেন যে, থানা থেকে খবর দেওয়ায় সন্ধান পেয়ে তিনি গিয়ে চম্পাকে নিয়ে ও-বাড়ীতে এসেছেন তার এক বান্ধবীর বাড়ী থেকে এবং প্রয়োজন হলে মা-বাবা-দাদা সকলে গিয়ে চম্পার সাথে কথা বলতে পারেন। চুক্তিটা আমিই ঠিক করলাম, কারণ মানুষের মনের এমন এক-একটা অবস্থা আসে, যখন তার জন্মদাতা পিতা বা জন্মদাত্রী মাতার থেকেও অনাত্মীয় বা অপরজনকে প্রিয় বা হিতাকাঙ্খী বলে মনে হয় এবং মা-বাবার স্নেহটাও তার উপর কতখানি বর্ত্তেছে তাও বাজিয়ে দেখে নিতে ইচ্ছা করে। আমারও তখন ঠিক ঐ অবস্থাটাই ছিল, তাছাড়া যে বাবা-মা-দাদা নিজের মেয়ের বা বোনের কথায় অবিশ্বাস করে সামান্য একটা ঝি, সে বয়সে বড় ও একই গ্রামের লোক বলে তার কথায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাঁদের কাছে নিজে থেকেই ফিরে যাবার কথা কল্পনা করতেও তখন আমার ঘৃণা বোধ হ'ল, অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করলাম।

এরপর যুক্তিমতই কাজ হ'ল, দুপুর প্রায় দুটোর সময় নন্দীবাবু ও-বাড়ীতে বলতে গেলেন যে, চম্পাকে পাওয়া গেছে। চম্পাকে পাওয়া গেছে শুনে সঙ্গে-সঙ্গে সবাই এ-বাড়ী চলে এলেন। সবাই বারান্দায় একটা মাদুরে বসলে নন্দীবাবু আমায় ডাক দিলেন, নন্দীবাবুর ডাকে আমি ধীরে ধীরে ঘর হতে বের হয়ে সেখানে

উপস্থিত হলাম। আমি সেখানে যেতেই নন্দীবাবু বললেন, "চম্পা, জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা ও বড়দাকে প্রণাম কর।" বড়দা সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি করে বললেন, "থাক থাক আবার প্রণাম কেন?" সঙ্গে-সঙ্গে নন্দীবাবু বললেন, "ওর নব জন্ম হয়েছে, প্রণাম করবে না মানে? জানেন ও মরতে মরতে বেঁচে গেছে, ওঃ, পুলিশ যদি ঠিক সময়ে না পৌছতো তা হলে কি যে হ'ত? হয়ত গঙ্গার জল থেকে শুধু ওর লাশটাই ফিরত। যাকগে, সে যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন আর সে সব আলোচনা করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

নন্দীবাবুর এ-কথায় মা তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। মায়ের এই রকম ব্যবহারে বাবা গম্ভীর গলায় মাকে ধমকে উঠলেন। এরপর অনেক তর্কবিতর্কের ঝড় বয়ে গেল, কিন্তু মাকে দাদাকে কিছুটা নিমরাজী করা গেলেও বাবাকে কিছুতেই আমার নির্দ্দোষিতার কথা বোঝানো গেল না। বাবার মুখে কোন কোমল ভাব দেখা গেল না। সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন তখন নন্দীবাবু অনুদিকে ইশারা করে ডেকে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরেই আবার দুজনে ফিরে এসে অনুদি মায়ের কানে কানে কি একটা কথা বললেন। তাতে সঙ্গে সঙ্গে মা চিৎকার করে বাবাকে বললেন, "এতই যদি তোমার সন্দেহ হয় তো ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করে নাও না, আজকাল তো সব রকম সুবিধাই হয়েছে বড় বড় হাসপাতালে। আর হাসপাতালে যদি না দিতে চাও তো ডাঃ চিত্তশঙ্কর দা-এর মত কোন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পার।"

মায়ের কথা শুনে আমার লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল, মনে-মনে তখন বলছিলাম, হে ধরণী, দ্বিধা হও। কিন্তু যুক্তিটা জামাইবাবুর দেওয়া—এটা বুঝে মায়ের উপর রাগ না হয়ে রাগটা পড়ল জামাইবাবুর উপর। পরে অবশ্য নন্দীবাবুর মুখে শুনেছি অনুদি বাবাকে ডেকে আলাদাভাবে আমাকে না শুনিয়ে চুপি-চুপি কথাটা বলতে বলেছিলেন মাকে, কিন্তু মীমাংসার কোন আশা না দেখে হাতের কাছে একটা ক্ষীণ সূত্র পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে কথাটা চিৎকার করে সকলকে শুনিয়েই বলে ফেলেছিলেন মা। মায়েরও তখন দোষ ছিল না, কারণ যে-কোন ভাবেই হোক, তিনি তখন মেয়েকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল।

আমার বিরক্তি লাগলেও মায়ের এই কথায় যেন কিছুটা কাজ হ'ল। বাবা খানিকক্ষণ চুপচাপ হতভম্বের মত বসে থেকে শেষে বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছ তখন তাই হবে, তাহলে ওকে আগে কলকাতায় ডাক্তার দেখিয়ে পরে বৈঁচী গ্রামে নিয়ে যাব, তার আগে নয়।"

আচ্ছা তুমিই বল সুদীপ, বাবা-মার এই ধরনের কথোপকথনের পর কোন মেয়ের কি সেই বাবা-মার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে? অবশ্য তুমি তো ভাই পুরুষ মানুষ, এ-সব ক্ষেত্রে মেয়েদের মনের অবস্থা যে কি রকম হয় তা মেয়ে ছাড়া আর কারো পক্ষেই বোঝা অসম্ভব। আমার মনের অবস্থাও তখন সাংঘাতিক। তখন কেবল মনে হচ্ছে নন্দীবাবু ও অনুদির কথায় কেন ওদের সঙ্গে ফিরে এলাম এবং সব ঘটনা ওদের বলতেই বা গেলাম। ওদের কিছু না বলে যা করতে গিয়েছিলাম সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে তা করলেই তো হ'ত, তাহলে এতক্ষণে মা-গঙ্গার বুকে আশ্রয় পেয়ে অন্ততঃ আমার লাশটা শান্তিতে বহু দূরে ভেসে যেত। বাড়ীতে ফিরে নিজের বাবা-মার কাছে এভাবে অকারণে অপদস্থ হতে হ'ত না, অহেতুক অশান্তি ভোগ করতে হ'ত না।

যাই হোক, বাবার শেষ কথাগুলো শুনে আমারও যেন কি রকম জিদ চেপে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বললাম, "তোমাদের অত ভাবতে হবে না, আমি কুলটা নাম নিয়ে আর তোমাদের সংসারে ফিরে যেতে চাই না, আর কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে লোক হাসিয়েও কাজ নেই। আমি যেমন আছি এখানেই থাকব, আর তাও যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে তোমাদের ছোট করবার জন্য তোমাদের বাড়ীতেও থাকব না, নিজের ব্যবস্থা আমি নিজে করে নেব। আমার জন্য তোমাদের কাউকে চিন্তা করতে হবে না।" এই বলে আমি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। এতক্ষণের সকলের দেওয়া সমস্ত অপমান, বুকের মধ্যে আবদ্ধ অভিমান বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল। এর পর সবাই অনেক ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু আমি দরজা খুললাম না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, রাত্রি প্রায় এগারটায় ঘুম ভাঙ্গলে দেখি অনুদি ও জামাইবাবু সামনের জানালার কাছে বসে আছেন ঘরের দিকে তাকিয়ে। তাঁদের ওভাবে বসে থাকতে দেখে নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য নিজেরই লজ্জা হল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে কলঘরে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে এসে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমি কাছে যেতেই জামাইবাবু বললেন, "চল চম্পা, খাবে চল," আমি বললাম, "না, খাব না, কিছু ভাল লাগছে না, একদম খিধে নেই।" জামাইবাবু বললেন, "তা বললে কি হয়। তুমি না খেলে যে তোমার দিদি ও আমাকেও অভুক্ত থাকতে হবে। তা ছাড়া তুমি যে আমাদের অতিথি, অতিথি না খেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় জান তো?"

নন্দীবাবুর সামান্য ঐ কটা কথার মধ্যে এমনই মাধুর্য্যমিশ্রিত স্নেহ ও সম্মানের সুর ছিল যে, তাঁর আর অনুদির মুখের দিকে চেয়ে আর 'না' বলতে পারলাম না। ধীরে-ধীরে তাঁদের সংগে খাবারঘরে গেলাম। খেতে বসে নন্দীবাবু নিজে থেকেই বললেন, "আচ্ছা তোমার বাবা না হয় না বুঝে একটা বিরাট ভুল করতে চলেছেন, কিন্তু কোন দোষে দোষী না হলেও তুমি নিজের প্রতি নিজে এত নিষ্ঠুর হতে চাইছ কেন?"

নন্দীবাবুর এ কথায় আমি বললাম, ও আপনি বুঝবেন না, জগতে মেয়েদের এমন অনেক ব্যথা থাকে যা কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না, এমন অনেক দুঃখ থাকে যার জন্য কারও নিকট সান্ত্বনা চাওয়া যায় না, আমি জানি আর ঈশ্বর সাক্ষী. আমি কোন দোষে দোষী নই, আমি শুদ্ধ, পবিত্র, কিন্তু আমার জন্মদাতা পিতাই যখন সে-কথা মানতে রাজী নন তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কাউকে শত চেষ্টা করলেও তো তা মানাতে পারব না, অবশ্য আপনার ও অনুদির কথা স্বতন্ত্র। আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। কথাগুলো বলে চুপ করলে নন্দীবাবু ধীর-গম্ভীর স্বরে বললেন, "তুমি বিকেলে ঘরে দরজা বন্ধ করার পর তোমার বাবাকে বহু কষ্টে আমি রাজী করিয়েছি। যা-ব্যবস্থা হয়েছে তা হ'ল তুমি আপাতত বেনারসেই থাকবে। তোমাদের পুরোন ঝি বিনতা ও ঠাকুর হবেবামকে তো তোমার বাবা আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং এখন নতুন লোক দেখতে হবে। যাই হোক, দু'এক দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমিই সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে বেনারস থেকে যাব। তোমার কোন চিন্তা নেই। তবে তোমার বাবা একটা সর্ত্ত আরোপ করেছেন, সেটা হ'ল খাঁ সাহেবের কাছে গান আর তোমার শেখা চলবে না, তবে বিদ্যাবাঈয়ের কাছে নাচটা শিখতে পার।"

নন্দীবাবুর কথায় আমি আঁৎকে উঠলাম, কি, আমার গান শেখা বন্ধ? যার জন্য সুদূর বাংলাদেশের বৈঁচী গ্রাম থেকে এই কাশী শহরে আমার আসা সেই সঙ্গীতকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আমায় কাশীতে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে? না, না, এ-সম্ভব নয়। এ রকম কোন সর্ত্ত মেনে নিয়ে আমি বাবার বাড়ীতে যেতে চাই না। তার থেকে অন্য কোথাও চলে যাব।

আমার এই কথায় নন্দীবাবু সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "আঃ ছোটরাণী, তুমি উতলা হচ্ছ কেন? একটা ভুল বোঝাবুঝি যখন ঘটে গেছে সেটাকে থিতিয়ে যেতে খানিকটা সময় তো তোমায় দিতে হবে। মাস কয়েক ধৈর্য্য ধরে থাক তা'হলে দেখবে তোমার বাবাই আবার তোমায় আদর করে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

তাছাড়া গানের কথা ভাবছ? তারও আমি ব্যবস্থা করে দেব; তোমার বাবা তো আর বেনারসে, থাকতে আসেন নি, সুতরাং বাবা চলে গেলে আবার খাঁ সাহেবও আসবেন তোমায় গান শেখাতে।"

একথা শুনে আমি বললাম, কিন্তু খাঁ সাহেবের প্রণামীর টাকাটা আসবে কি করে?

আমার এ-কথায় নন্দীবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "ছোটরাণী, তোমার এইটুকু মাথায় এত চিন্তা করতে গেলে তুমি তো পাগল হয়ে যাবে, তোমার চিন্তার কিছুটা আমায় ধার দাও না এখন, পরে আরো বড় হলে ফিরিয়ে নিও বরং। খাঁ সাহেবের প্রণামীর টাকার চিন্তা তোমায় করতে হবে না, সে চিন্তাটা আমার উপর ছেড়ে দাও।

নন্দীবাবুর এ-কথা শুনে আমি বললাম, না, না, সে হয় না, সে আমি পারব না।

আমার এই বিচলিত ভাব দেখে নন্দীবাবু আমার হাত দুটি ধরে বেশ আবেগ-মিশ্রিত গম্ভীর স্বরে বললেন, "আচ্ছা চম্পা, তুমি অনুর ছোট বোন, আর আমার কি কেউ নও? অনুর ছোট বোন মানে তুমি তো আমারও ছোট বোন, দাদার কাছে ছোট বোনের নিতে কি লজ্জা থাকে?"

কথাগুলো বলার সময় নন্দীবাবুর কণ্ঠে এমনই আত্মীয়তার সুর ও আবেগের উষ্ণতা ছিল যে, নন্দীবাবু খুড়তুতো ভগ্নীপতি হলেও সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল যেন আমার বড় দাদার চেয়েও আপন জন এবং মানসিক গঠনের দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চস্তরের মানুষ। তাই আর আপত্তি করি নি, শুধুমাত্র নিজের মুখের জেদটুকু বজায় রাখবার জন্য বলেছিলাম, ঠিক আছে, নেব, কিন্তু একটা সর্ত্তে।

নন্দীবাবু বললেন, "কি সেই সর্ত্ত?" আমি বললাম, 'সর্ত্ত হ'ল ফেরং দেবার মত অবস্থায় পৌঁছলে আমি আপনাকে আপনার টাকা ফিরিয়ে দেব, তখন কিন্তু ফেরং নিতে হবে, কোন ওজর-আপত্তি চলবে না।'

নন্দীবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলেন, "তথাস্তু দেবী"। তাঁর ভাবখানা দেখে মনে হয়েছিল, সর্ত্ত আরোপ করলেও টাকাটা যে তখনকার মত আমি নিতে রাজী হয়েছি, সেই আনন্দেই তিনি যেন অন্তরে আটখানা হয়ে গেছেন।

এরপর নন্দীবাবুর ব্যবস্থা অনুযায়ীই সব ঠিক হয়ে গেল। দিন চারেক পরে বাবা-মা ও দাদা বৈঁচীগ্রামে ফিরে গেলেন। যাবার সময় শুধু মাকে নন্দীবাবু সব খোলাখুলি বললেন। নন্দীবাবুর কথা শুনে মা প্রত্যেক মাসে তাঁর টাকাটা কলকাতায়

পাঠিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে নন্দীবাবু এই বলে ঘোর আপত্তি জানালেন, যে, জ্যাঠাবাবু যদি জানতে পারেন তাহলে চম্পার গান শেখাই বন্ধ হয়ে যাবে, তাই মাকে বুঝিয়ে বললেন পরে একসময় তিনি এককালীন সব টাকাটা নিয়ে আসবেন মায়ের কাছ থেকে। নন্দীবাবুর এই বিচক্ষণতা ও সহৃদয়তায় মাও খুব খুশী মনে নন্দীবাবুর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে ট্রেনে উঠে বসলেন।

মা-বাবা ফিরে যাবার পর আমার নাচগান শেখা ঠিকই চলছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে মাস ছয়েক বাদে একটা দুঃসংবাদে আমার জীবনের সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। দাদার টেলিগ্রাম পেয়ে জানতে পারলাম—বাবা হঠাৎ মারা গেছেন। টেলিগ্রামে এও লেখা ছিল, "বৈঁচীগ্রামে এসো না, লোকে নানা কথা বলছে।" এক তো বাবা মারা গেছেন, তারপর বৈঁচীগ্রামে যেতে বারণ। আমাদের আগের ঝি বিনতা ছিল আমাদের গ্রামের স্বর্ণকারদের মেয়ে, তাই বুঝলাম বাবা বেনারস থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর সে গ্রামে ফিরে আমার নামে নানা কথা বলতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই এবং সেই জন্যই হয়ত দাদা ঐভাবে লিখেছেন, কিন্তু দাদা লিখলে কি হবে, আমার বুকটা যেন কেউ হাতুড়ী দিয়ে ভেঙ্গে দিতে চাইছিল সে সময়। বাবার শেষ কাজের সময় আমি গ্রামে ফিরতে পারব না, এমনই গ্রাম আর এমনই গ্রামীন সমাজ! বাবার কথা মনে হতে মায়ের কথা ভেবে, বিনা অপরাধে নিজের চরম শাস্তির কথা ভেবে বুক ভেঙ্গে চোখ ছাপিয়ে জল বইতে লাগল; ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমার কান্না শুনে নিচের রান্নাঘর থেকে নতুন রাঁধুনী কেয়া ছুটে এল। সে এসে সব শুনে আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিল, আমার মাথাটা তার বুকের উপর টেনে নিয়ে আমার মাথায় গায়ে অনেক হাত বুলিয়ে দিল। তার কথায় ও ব্যবহারে একটা যেন ভগ্নীপ্রীতি অনুভব করলাম। বুঝলাম কেয়ার বয়সটা আমার থেকে হয়ত বছর চারেক বেশী হবে, তাই তার মনের ভিতরের কোমল প্রবৃত্তির স্রোতটুকু তখনও নীহারিত হয়নি। হঠাৎ কেয়াকে আমার খুব ভাল লেগে গেল। কেয়াকে জড়িয়েই সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলাম। দিন কয়েকের মধ্যেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কেয়া আমাকে অনেক শক্ত করে তুলল, আমি যেন মনে অনেক বল পেলাম। দিন যেতে লাগল আর ধীরে-ধীরে পিতৃবিয়োগের ব্যথার তাপও অনেকটা কমে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে মন কঠিন করে গান নিয়ে মেতে উঠলাম। ইতিমধ্যে বেনারস সঙ্গীত সভা ও সমাজ থেকে বহু সুখ্যাতি ও সুনাম পেয়ে খাঁ সাহেবের সুযোগ্যা ছাত্রী হিসাবে সঙ্গীতের বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও মানপত্র অর্জ্জন করলাম। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমার ছবি সমেত সে-সংবাদ পরিবেশিত হ'ল। চারিদিকে আমাকে নিয়ে সঙ্গীত

রসিক সমাজে যেন একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। হৃদয় আনন্দে কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। নিজের সাফল্যে নিজেই যখন খুশীতে ডগমগ তখন দেশে ফিরবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বড় দাদাকে পত্র লিখলাম। প্রায় দিন পনর পরে সে-পত্রের জবাব এল। জবাব কি এল জান ভাই?

কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের কণ্ঠ হতে একরাশ কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে এল এবং তার ঐ কান্না-ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর শুনে সুদীপ চমকে তার মুখপানে চেয়ে বলে উঠল, "থাক না দিদি, তোমার যদি কষ্ট হয় সে-সব কথা বলতে হবে না।"

সুদীপের কথায় কুসুম কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, "বলতে আমাকে হবেই সুদীপ; তুমি যে আমায় দিদির আসনে বসিয়েছ ভাই, তোমার আমার মধ্যে কোন লুকোচুরি যে আমারই সহ্য হবে না, শুনে তোমার কষ্ট হচ্ছে জেনেও এসব আমায় বলতেই হবে।"

সুদীপ আর প্রতিবাদ না করে নীরবে বসে শুনতে থাকে। কুসুম বলে চলে, দাদা একখানা ইনল্যাণ্ড লেটারে লিখলেন, "তোর বিবাহের জন্য আমরা কেউ দায়িত্ব নিতে পারব না, বাবা তোর জন্য কলকাতায় ব্যাঙ্কে দশহাজার টাকা রেখে গেছেন এবং কলকাতার সাতাত্তর নম্বর চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের বাড়ীর তিনখানা ঘর থাকবার জন্য দিয়ে গেছেন।" তাই আজ এই আশ্রয়টুকুই আমার সম্বল। বাবা মারা যাওয়ার বছর তিন চারেকের মধ্যেই এত বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, বেনারসের বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল। বাবার উইল অনুযায়ী আমার এই ফ্ল্যাটটুকু ছাড়া কলকাতার এই বাড়ীর বাকী অংশ এক অবাঙালী লিজ নিল। ঐ অবাঙ্গালী লিজ নিয়ে অধিক অর্থের লোভে যাদের ভাড়া দিয়েছে সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। এই পরিবেশে যে কি যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয় তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। মাঝে মাঝে মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি অথবা বিষ খেয়ে মরি, কিন্তু তাও পারি না। আসলে নিজের লোকদের ব্যবহার দেখে দেখে নিজে এত দুর্ব্বল ও হতাশ হয়ে গেছি যে, নিজেকে শাস্তি দিতেও যেন ভয় হয়, বড় দুর্ব্বল মনে হয়।

এই কথা বলে মুহূর্ত্ত কয়েক থেমে কুসুম যেন কার উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করার ভঙ্গী করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ভাগ্যিস নন্দীবাবু ছিলেন, উনি না থাকলে আমার যে কি দুর্গতিই হত! একমাত্র নন্দীবাবু ও অনুদিই সেই বেনারসের ঘটনার পর থেকে প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে সমানে আমাকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। ঐ সামনে ঠাকুরের তাকে আমার কৃষ্ণগোপাল ঠাকুর আছেন, আর ছোট ভাই তুমি সামনে আছ, নন্দীবাবু দেবতা, দেবতা;

নন্দীবাবুর মত মানুষ কোটিতে দুটি মেলে কিনা সন্দেহ। নন্দীবাবু এখানে প্রায়ই আসেন, তন্ময় হয়ে আমার গান শোনেন, মাঝে মধ্যে নেশাও একটু আধটু করেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোনদিন কোন জিনিষটারই সীমা ছাড়িয়ে যান না। তা ছাড়া আজ বছর ছয়েকের আলাপ নন্দীবাবুর সঙ্গে। আমার অঙ্গ স্পর্শ দূরে থাকুক আমার দিকে কোনদিন কোন কু-দৃষ্টিতে উনি তাকিয়েছেন বা আমার সম্বন্ধে কোন কুকথা মুহূর্ত্তের তরেও ওঁর মনের কোণে ঠাঁই পেয়েছে বলে আমার কোনদিন কোন মুহূর্ত্তেই মনে হয় নি। তবে ইদানীং অনুদির কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে মনে হয় অনুদি হয়ত মনে মনে নন্দীবাবুর ও আমার সম্পর্কে কাল্পনিক কোন কলুষের কথা ভেবে কষ্ট পান এবং তাঁর কথাবার্ত্তায় সে কথা মাঝে মধ্যে প্রকাশও হয়ে পড়ে। অনুদি যাইই ভাবুন বা বিশ্বশুদ্ধ লোকে যাইই বলুক, ঈশ্বর জানেন আর আমি জানি নন্দীবাবু নিষ্কলুষ। শুধু গানের অকৃত্রিম নেশাই ওঁকে আমার কাছে টেনে আনে। সুরের সুরায় মাতাল হবার প্রবণতা না থাকলে তিনি কোন দিনই আমার এই দুঃস্থ পরিবেশে পা রাখতেন না। বল সুদীপ এটা কি দোষের?"

কুসুমের শেষ প্রশ্ন যে সুদীপকে লক্ষ্য করেই একথা বুঝেও সুদীপ কোন উত্তর করতে পারে না। শুধু বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে কুসুমের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কথা থেমে গেছে, কিন্তু কুসুমের সুরেলা কণ্ঠের নাদপীযূষ যেন তাকে তখনও কেমন বিহ্বল করে রেখেছে। কুসুমের করুণ কাহিনী তখনও তার তরুণ অন্তরকে তোলপাড় করে চলেছে। ইতিমধ্যে কুসুম কখন উঠে গেছে এবং পুনরায় কখন তার জন্য চা করে এনেছে এতক্ষণ তার খেয়ালই হয় নি। খেয়াল হ'ল যখন কুসুম সশরীরে সামনে এসে 'না'ও, ধর' বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল। কুসুমের হাতটা চিবুক স্পর্শ করতেই সুদীপ আবার আত্মস্থ হ'ল এবং চায়ের পেয়ালাটা কুসুমের হাত থেকে নিয়ে ধীরে ধীয়ে চায়ে চুমুক দিল। সুদীপের চা খাওয়া হতে হতে কুসুম তার জামাকাপড়গুলি গোছ করে এনে তার পাশে নামিয়ে রাখল এবং প্রশ্ন করল, "আবার কবে আসছ?"

সুদীপ বলল, "আগামীকাল তো খুব ভোরেই কালীঘাটে যেতে হবে। তারপর সারাদিন দোকানে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। সম্ভবত দোসরা বৈশাখ ছুটি থাকবে, যদি ছুটি থাকে তাহলে দু' তারিখে বিকেলে আসব তোমার কাছে।"

বাধা দিয়ে কুসুম বলল, "না বিকেলে নয়, দুপুরে আসবে এবং এখানে খাবে।"

খাওয়ার নিমন্ত্রণে সুদীপ আপত্তি করে উঠল কিন্তু কুসুমের কাছে তার কোন আপত্তিই টিকল না এবং অবশেষে দোস্‌রা বৈশাখ দুপুরে কুসুমের কাছে খাবে কথা দিয়ে সে ছাড়া পেল।

পয়লা বৈশাখ খুব ভোরে উঠেই সুদীপ গঙ্গাস্নান সেরে দোকানের খাতাপত্র নিয়ে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল এবং যথাসময়ে সেখানে পৌছল। সেখানে গিয়ে সুদীপ দেখল তার আসার বহু আগে থেকেই অনেক লোক খাতাপূজা করবার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। মন্দিরে প্রবেশের একটি দরজা এবং সেই দরজার সামনে বিভিন্ন দিক হতে সারিবদ্ধ মানুষ খাতার বাণ্ডিল হাতে উদগ্রীব চিত্তে দণ্ডায়মান। কেউ কেউ সারিতে দাঁড়িয়েই রাত্রিজাগরণ-জনিত ক্লান্ত শরীরে শ্রান্ত চক্ষু ছুটি নিমীলিত করে ঘুমের আমেজ উপভোগ করছে, আবার কেউ-কেউ খাতার বাণ্ডিল কোলে করে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। অনেকে আবার সারিতে না দাঁড়িয়ে মন্দিরের গায়ে উঠানের উপরে বসে সেখানেই পুজা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুদীপ চারিদিকে চেয়ে দেখতে থাকে নামাবলী গায়ে পুরোহিতরা ব্যস্তসমস্তভাবে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। কেউ-কেউ আবার যজমানদের নাম ধরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি-করছে। সুদীপের এই প্রথম কালীঘাটে খাতাপুজার জন্য আসা। একে দেবীর পীঠস্থান এই তীর্থ কালীঘাট, তার উপর আবার আজ বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ বিশেষ পবিত্র দিন। কে জানে হয়ত আজকের এই পবিত্র দিনটিতে বিধি অনুযায়ী পূজা করতে পারলে সম্বৎসর দোকানে বাণিজ্য ভালভাবে চলবে। সুদীপ যখন একপাশে দাঁড়িয়ে নানা চিন্তায় মগ্ন তখনই খুব কাছ থেকে 'নন্দী কোম্পানী,' 'নন্দী কোম্পনী' করে কে একজন চিৎকার করে উঠল। সুদীপ দেখল তার বাম দিকে অদূরে দাঁড়িয়ে এক পুরোহিত হাত তুলে, নন্দী কোম্পানী, নন্দী কোম্পানী করে চিৎকার করছেন এবং সুদীপ কিছু ভাববার বা করবার আগেই সেখানে সেই পুরোহিতের কাছে দু-জন ভদ্রলোক ছুটি খাতার বাণ্ডিল হাতে হাজির হয়ে গেলেন। পুরোহিত তাঁদের দিকে একবার চেয়ে আবার উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিতে লাগলেন, "নন্দী কোম্পানী, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নন্দী কোম্পানী, তার জালের দোকান "নন্দী কোম্পানী'।" এতক্ষণে সুদীপ বুঝতে পারে এ-ডাক তারই উদ্দেশ্যে। সে তাড়াতাড়ি খাতার বাণ্ডিল হাতে সেই পুরোহিতের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও আপনি কালিপদ মুখার্জী ?" মন্দিরচত্বরের উজ্জ্বল আলোয় একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সুদীপ বুঝল উপেন্দ্রবাবু পুরোহিতের যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন এ ভদ্রলোকের চেহারা ঠিক তেমন-তেমনিই বটে, সুতরাং সুদীপের আর কোনই সন্দেহ রইল না।

পুরোহিত সুদীপের হাত হতে খাতার বাণ্ডিল নিয়ে তাকে গণেশমূর্তি, মা কালীর পট ও পূজার অন্যান্য সামগ্রী কিনে আনতে নির্দ্দেশ দিলে সে তাড়াতাড়ি মন্দির-চত্বরের বাইরে চলে গেল, কারণ ভিতরে প্রবেশের সময়েই সে দেখে এসেছিল

বাইরে রাস্তায় ও ফুটপাথে সারি সারি মূর্ত্তি, পট, ফুল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্রব্যের দোকান বসেছে। চারিদিকে তাকিয়ে সুদীপ বুঝল এ-সব দোকান অস্থায়ী। মেলাতলায় যেমন দু-একদিনের জন্যে দোকানী এসে তাদের দ্রব্যসামগ্রী সাজিয়ে বসে, এখানেও তেমনি আজকের এই শুভ পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে খাতামহরৎ উৎসবের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দোকানী পসরা সাজিয়ে বসেছে। সুদীপ এদিক ওদিক খুঁজে বামদিকে বক্রশুণ্ডবিশিষ্ট গণেশমূর্ত্তি খুঁজতে থাকে, কারণ এই রকম শুঁড়বিশিষ্ট গণেশমূর্ত্তিই কিনতে নন্দীবাবু নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক খুঁজেও সুদীপ ঐরকম নিখুঁত একটি গণেশমূর্ত্তি খুঁজে পায় না, তাই আরও খুঁজতে থাকে এবং মন্দির থেকে বেশ কিছুটা দূরে একেবারে আদিগঙ্গার খালের কাছে এসে ঐ রকম মূর্ত্তি পায়। সুদীপ দেখে যে-লোকটির কাছে ঐ ধরণের মূর্ত্তি রয়েছে তার সব কটিই বামবক্র-শুঁড়-বিশিষ্ট এবং মাত্র জন কয়েক ভদ্রলোক ঐ ধরণের মূর্ত্তি কিনতে এসেছেন। সুদীপের এটা বুঝতে দেরী হয় না যে, এটা একটা সংস্কারের ব্যাপার। কারও হয়ত ঐ ধরণের মূর্ত্তি প্রথম থেকে কেনা হচ্ছে, ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি হচ্ছে, তাই ঐ ধরণের মূর্ত্তির উপর তাঁর দুর্ব্বলতা। যাই হোক, সুদীপ একটি ঝুড়ি কিনে একটি সুন্দর মূর্ত্তি কেনে; কালীর পট ও বাকী অন্যান্য জিনিষ কিনে ঝুড়িতে ভরে মন্দিরে এসে হাজির হয়। সুদীপ মন্দিরে হাজির হতেই কালীবাবু তার হাতটা খপ করে ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে একেবারে মন্দিরের প্রবেশদরজায় এসে হাজির হন। সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেই সামনের সারি হতে একটি পনের-ষোল বছরের ছেলে চট করে সরে আসে এবং কালীবাবু সুদীপকে ঠেলে সেই জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেন। সুদীপের বুঝতে বাকী থাকে না যে, সুদীপের যাতে দেরী না হয় সেইজন্যই চতুর মুখুজ্যে মশায় ঐ কাজটুকু করলেন। সুদীপ যখন সারিতে প্রবেশ করছে ঠিক সেই সময় পিছন থেকে দুচারজন চিৎকার করে ওঠে, "লাইনে আসুন, লাইনে আসুন, আমরা সারারাত জেগে অপেক্ষা করছি খেলা করতে নয়।" কেউ কেউ আবার টিপ্পনি কাটে, "কালী ঠাকুরের গুরু এলেন রে।" নানা রকম মন্তব্য শুনে সুদীপের খারাপ লাগে, কিন্তু কালী পুরোহিত তখন যে ছেলেটি সারি হতে বেরিয়ে এসেছিল তাকে সামনে ধরে চিৎকার করে ওঠে,"এও গতকাল সন্ধ্যা নটা থেকে এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, খেলা করতে নয়।" মুখুজ্জে মশায়ের বলার মধ্যে এমনই একটা কটু গাম্ভীর্য ছিল যে, তাঁর চিৎকার শুনে আর কেউ কিছু বলতে সাহস করল না। সব চুপচাপ হয়ে গেল। অবশ্য চুপচাপ হওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। সেটা সুদীপ পরে শুনেছে। সেটা হ'ল কালীপদ মুখুজ্যে মাতৃমন্দিরের তিন পুরুষের সেবাইৎ, কোন ঠিকা পুরোহিত নন, তাই ইচ্ছা করলে তিনি নাকি মন্দিরের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করে

দিতে পারেন, তাই যাঁরা এ-কথাটা জানেন তাঁরা আর মুখুজ্যে মশায়কে ঘাঁটান না, বরং তাঁর যজমান হয়ে পূজা বা মাতৃদর্শনের সহজ সুযোগ গ্রহণ করেন। তা ছাড়া তখন আরও একটা অলিখিত নিয়ম বলবৎ ছিল, সেটা হ'ল, মন্দিরের যে—কয়েকজন সেবাইৎ আছেন তাঁদের পূজা বা তাঁদের যজমানদের পূজা আগে হবে, তারপর অন্য লোকের। তাই মুখুজ্যে মশায় যখন চিৎকার করে উঠলেন তখন সব চুপচাপ হয়ে গেল। এরপর মুখুজ্যে মশায় সুদীপের কাছে এসে বললেন, "তুমি এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক, সময় হয়ে এসেছে, ঠিক চারটেয় মন্দির খুলবে; মন্দির খুললে আমি ভিতরে চলে যাব আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আমার পিছন-পিছন ঢুকে যাবে।" বলেই মুখুজ্যে মশায় নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন। সুদীপ একটু এদিক ওদিক চেয়ে পাশের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে জেনে নিল চারটে বাজতে তখনও মিনিট দশেক দেরী আছে। এদিক ওদিক চাইতেই একটু দূরে সুদীপ দেখল কয়েকজন পুরুষের পেছনেই মেয়েদের একটা বিরাট লাইন পড়েছে। সদ্যস্নাতা বিভিন্ন বর্ণের নববস্ত্র বা পট্টবস্ত্র পরিহিতা বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের দেখে সুদীপের মনে হ'ল কেউ যেন কোন কুসুমোদ্যান হতে বিভিন্ন বর্ণের কুসুম আহরণ করে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে গেছে। চার পাশ দেখতে দেখতে সুদীপের মনে হয় বছরের প্রথম দিনটির প্রথম কয়েক ঘণ্টা এমন বৈচিত্র্য-ময়তার মধ্যে কাটবে তা সে গতকাল পর্যন্ত, গতকালই বা কেন, এই মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত ভাবতেই পারে নি। সুদীপ একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে এতক্ষণে তার খেয়াল হয় যে, সে কুসুমের দেওয়া ধুতি আর আদ্দির সার্ট পরেছে এবং পোষাকগুলো বেশ চকচক করছে। তার মনে হয় আশপাশের সব লোক বোধ হয় তাকেই দেখছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা লজ্জা তাকে ঘিরে ধরে।

সুদীপ যখন এই সব কথা ভাবছে ঠিক তখনই একটা ভিড়ের চাপ ও ঠেলা-ঠেলিতে পাশের লাইনের কয়েকজন মন্দিরের উঠোনে পড়ে গেল, একজনের মাথায় রগের কাছটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, আরও দু-তিন জনে "উঃ বাবারে, গেছিরে" বলতে বলতে কোন রকমে উঠে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওদিকে সঙ্গে-সঙ্গে দুজন লাঠিধারী সিপাই এসে হুমকি দিতে দিতে লাইনটাকে সোজা করে দিতে লাগল। এমন সময় সুদীপের মনে হ'ল মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে কে যেন খুলছেন। সে সঙ্গে-সঙ্গে সেই দিকে চেয়ে উদগ্রীব হয়ে রইল।

ধীরে-ধীরে মন্দিরের দরজা খুলে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুদীপের পুরোহিত মুখুজ্যে মশায় কোথা হতে এসে ছোঁ মেরে তার হাতের ঝুড়িটা নিজে নিয়ে

বললেন, "চলে এস"। সুদীপ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে অনুসরণ করে' মন্দিরের সাড়ে-চারফুট মাপের প্রবেশপথ দিয়ে মাথা নিচু করে' মন্দিরে ঢুকল। ভিতরে ঢুকেই সামনে মায়ের মূর্ত্তি দেখে সে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ওদিকে মুখুজ্জ্যে মশায় তখন গণেশপূজা সেরে কালীপূজা ধরে ফেলেছেন। কালীর পটে সিঁদুর দিয়ে তিনি খাতার বাণ্ডিল খুলে একটা জাবদা খাতায় সামনের দিকের একটা পৃষ্ঠায় স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে রূপোর টাকা দিয়ে গোটাকয়েক ছাপ দিলেন এবং একটু মন্ত্র পাঠ করে সেই পাতায় একটু সিদ্ধি ছড়িয়ে দিয়ে খাতা বন্ধ করে মায়ের চরণে ঠেকিয়ে তারপর সুদীপের কপালে ঠেকিয়ে ঝুড়িতে রাখলেন। ঠিক একইভাবে বাকী আরও দু-তিনটা খাতাপূজা সেরে ঝুড়িতে রেখে মায়ের চরণতল হতে কিছু পুষ্পবিল্বপত্র তুলে পুষ্পার্ঘ্য হিসাবে সুদীপের হাতে দিয়ে বললেন, "ধর"। সুদীপ তাড়াতাড়ি সেগুলো ঝুড়িরই একপাশে রেখে মুখুজ্যে মশায়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করল এবং মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে মূর্ত্তির চরণ স্পর্শ করে হাত কপালে ঠেকাল। মুখুজ্যে মশায় মায়ের চরণ হতে কিছুটা সিঁদুর নিয়ে সুদীপের চওড়া কপালে একটা দীর্ঘ তিলক কেটে দিলেন। এরপর নির্গমনের জন্য সংরক্ষিত অন্য দরজা দিয়ে সুদীপ মুখুজ্যে মশায়ের সঙ্গে মন্দির হতে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। বাইরে বেরিয়ে এসে মুখুজ্যে মশায়কে প্রণাম করে' নন্দী মশায়ের নির্দ্দেশ মত এগার টাকা দক্ষিণা দিয়ে বিকেলে তাঁকে দোকানে মিষ্টিমুখ করতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে তাঁর কাছ হতে বিদায় নিল এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে বড়বাজার অভিমুখে রওনা হ'ল।

বড়বাজারে এসে সুদীপ দেখল ইতিমধ্যে বহু দোকান যেন নবসাজে সজ্জিত। বহু দোকানের প্রবেশদ্বারে কলাগাছ, আমশাখা এবং সশীষ ডাব সমেত মঙ্গলঘট। প্রবেশদ্বারগুলি আমশাখা ও বিচিত্র বর্ণের পুষ্পস্তবক গেঁথে-গেঁথে মালার মতো করে সাজানো। কোন-কোন দোকান আবার অসংখ্য গাঁদাফুলের মালা দ্বারা সজ্জিত। কারও দরজায় ঝুলছে বেলকুঁড়ির মালা, কারও বা কাগজের ফুলের মালা, আবার কারও বা রঙীন কাগজের শিকলী। দেখতে-দেখতে সুদীপের মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠল। মনে-মনে সে ভাবল সারা বছর বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীঠাসা যে ঘরগুলোকে ভাল করে পরিষ্কার পর্য্যন্ত করা যায় না সেই ঘরগুলোই যেন এক-একটা পূজামণ্ডপের রূপ ধারণ করেছে। নিজের দোকান নন্দী-কোম্পানীর সামনে এসে সুদীপের বুকটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দোকানের দরজায় আমশাখা ও বিভিন্ন ফুলমালার কারুকার্য্য, দোকানের ভিতর থেকে একটা চন্দনের সুগন্ধ ভেসে

এসে রাস্তা পর্য্যন্ত সুরভিত করে তুলেছে। সুদীপ বুঝল ধূনোর সংগে চন্দনকাঠের গুঁড়োর সংমিশ্রন ঘটানোতেই ধূনোর ধোঁয়ার সংগে ঐ সুগন্ধটা উঠছে। ঘোড়ার গাড়ী দরজার সামনে এসে পৌছতেই নিতাই ও মউজীরাম হাতজোড় করে দোকান ছেড়ে এসে রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াল, নূতন বছরের গণেশ, কালীমূর্ত্তি ও নূতন খাতাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। সুদীপ জামার পকেট থেকে টাকা বের করে' গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে পূজার ঝুড়ি সমেত নীচে এসে দোকানের উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার জানিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল এবং যথাযোগ্য স্থানে গণেশমূর্ত্তি ও কালীমার পটকে সংস্থাপিত করে খাতার বাণ্ডিলটি খাতা লেখার জায়গায় রেখে সকলের সংগে কোলাকুলি করল।

নিতাই এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিল। এইবার সে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি এনে বলল, "বাঃ, তোমাকে আজ কিন্তু ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। তোমার আদ্দির জামাটা কি সুন্দর ফিট করেছে সুদীপ, কোথা থেকে এটা করালে?" উত্তরে সুদীপ সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দিল, "শ্যামবাজারে একটা দোকান থেকে।" নিতাই বলল, "খুব সুন্দর কেটেছে জামাটা।" সুদীপ একথার আর কোন জবাব না দিয়ে নিতাইকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা কটায় খাতাপত্তন হবে, নিতাইদা, তুমি জান?" নিতাই বলল, "সাতটা পনর মিনিটের পর, কিন্তু পত্তন এবার করবেটা কে? হরিপদ তো সাতাশ তারিখের পর থেকে উধাও। অন্যান্য বছর তো হরিপদবাবুই খাতা পত্তন করতেন"। নিতাইয়ের কথায় সুদীপের হঠাৎ যেন খেয়াল হয় ব্যাপারটার প্রতি। সে মনে ভাবে সত্যিই তো হরিপদবাবু সেই ঘটনার পর দোকানে আসছেন না। হরিপদবাবুর সেদিনের অবস্থাটার কথা মনে আসতেই সুদীপের মনটা এক দিকে যেমন ঘৃণায় রি রি করে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি হাসিও পায়, সে মনে মনে ভাবে, বেচারা! কিন্তু তখন কি সুদীপ জানত যে, যাকে "বেচারা" বলে সে ভাবছে সেই বেচারাটি কি দারুণ একখানা ছক্কার চাল নিয়ে সুদীপের মুখে ঝামা ঘসে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। আজকের শুভদিনে আর হরিপদর মত লোকের কথা মনে ঠাঁই দেবে না ভেবে নিয়ে সুদীপ নিতাই ও মউজীর সংগে হাত মিলিয়ে দোকানের বাকী টুকিটাকি কাজগুলো সেরে ফেলতে লাগল। হাতের কাজ সারতে-সারতেই সুদীপ একবার ঠিক সামনের দোকান পাল ব্রাদার্সের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল বেলা একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় সাতটা। সাতটা বেজেছে দেখে সুদীপ একবার নিতাইয়ের উদ্দেশ্যে বলল, "বাবু তো এখনও এলেন না।" নিতাই বলল, "ভাবছ কেন, বাবু ঠিক সময়মতো এসে পড়বেন।" নিতাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল দোকানের ঠিক সামনে রাস্তায়

একখানা ফিটন এসে দাঁড়াল। ঘোড়ার গলার ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজে নিতাই ও সুদীপ দুজনে চোখ তুলে দেখল। মউজীরাম ততক্ষণে নেমে গিয়ে ফিটনের দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়েছে আর উপেন্দ্রবাবু একটা হাতে মউজীর কাঁধে ভর দিয়ে গাড়ী হতে নামছেন। তারাও দুজনে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল বাবুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। গাড়ী হতে নামতেই সুদীপ উপেন্দ্রবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে উপেন্দ্রবাবু তার হাত দুটো ধরে তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। সুদীপের দেখাদেখি নিতাইও বাবুকে নমস্কার করল। নিতাইকেও উপেন্দ্রবাবু বক্ষলগ্ন করে আলিঙ্গন করলেন। মউজীরাম ঘাড়টা নীচু করে হাত দুটো জড়ো করে বলল—"রাম রাম বাবু, পহেলা বৈশাখের রাম রাম।" মউজীর রাম-রামের ভঙ্গী দেখে উপেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা! বুড্ঢা তুম ভি হামকো রাম রাম করতা হ্যায়!" উপেন্দ্রবাবুর মন খুশী থাকলে মউজীকে বুড্ঢা বলেই ডাকেন আর মউজীও সেটা ভালোভাবেই বোঝে, তাই উপেন্দ্রবাবুর এ-কথায় মউজী মোটা গলায় হো-হো করে খানিকটা হেসে দিল। এর পর সকলে মিলে দোকানে উঠলে উপেন্দ্রবাবু সুদীপের কাছে একটু গঙ্গাজল চেয়ে নিয়ে হাতে-মুখে-মাথায় ছিটিয়ে গণেশমূর্ত্তি ও কালীর পটের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে খাতার বাণ্ডিলের কাছে গিয়ে মাথাটা তাতে ঠেকিয়ে ভক্তি ভরে প্রণাম জানালেন। হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হওয়ায় পকেট থেকে পাঞ্জাবীর বোতামঘরের সঙ্গে সোনার চেন দিয়ে বাঁধা পকেট ঘড়িটা দেখে চমকে উঠলেন, বললেন, "একি, সাতটা যে বেজে গেছে! কই হরিপদবাবু তো এখনও এলেন না! খাতা পত্তন করবার সময় যে হয়ে এল!"

উপেন্দ্রবাবুর কথায় উদ্বেগের ভাব লক্ষ্য করে সুদীপ বলল, "সম্ভবতঃ হরিপদ-বাবু আর আসবেন না, কারণ তিনি তো সাতাশে চৈত্রের সেই ঘটনার পর থেকেই আর আসছেন না।" সুদীপের কথায় উপেন্দ্রবাবুরও খেয়াল হয়, তিনি মনে-মনে একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "সত্যিই তো এ-কদিন কাজকর্ম্মের মধ্যে কথাটা বেমালুম খেয়ালই হয়নি, যাকগে, না আসেন না আসবেন, তুমিই পত্তন কর খাতা", বলে সুদীপের হাতটা ধরে টানতে-টানতে তাকে পিছনের চৌকিতে খাতা লেখার জায়গায় এনে বসিয়ে দিলেন।

খাতা পত্তন করতে সুদীপের কোন অসুবিধাই হ'ল না। যথারীতি শ্রীশ্রী৺দুর্গা মাতা সহায়, শ্রীশ্রী৺কালীমাতার শ্রীচরণ প্রসাদে এই কারবার করিতেছি, বিতারিখ শুভ পয়লা বৈশাখ, তেরশ চল্লিশ সাল, মঙ্গলবার লিখল, পরে জমা-খরচের ঘর কেটে, জমার ঘরে প্রথমে মা কালীর নামে একুশ টাকা জমার পরে দোকানের দুই অংশীদার

ভূপেন্দ্রবাবু-ও উপেন্দ্রবাবুর প্রত্যেকের নামে এগার টাকা হিসাবে জমা করে' খাতা বন্ধ করে প্রণামান্তে খাতায় ধূনো দেখিয়ে পুনরায় প্রণামপূর্ব্বক খাতাখানি উপেন্দ্রবাবুর হাতে দিল। উপেন্দ্রবাবু খাতা হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশকে ও মা কালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। এরপর নিতাই কালীঘাট-থেকে-আনা মাতৃপূজার প্রসাদ বিতরণ করতে লাগল।

নিতাই যখন প্রসাদ বিতরণ করছে ঠিক সেই সময় সবাই দেখল ভূপেন্দ্রবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবুর পশ্চাতে হরিপদবাবু প্রবেশ করছেন। ভূপেন্দ্রবাবু দাদা, তাই তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য উপেন্দ্রবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ভূপেন্দ্রবাবু গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "থাক থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না" এর পর তিনি নিজেই সামনের বেঞ্চে বসলেন এবং পাশে হরিপদকেও ডেকে বসালেন। উপেন্দ্রবাবু কিন্তু চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিতাই সকলের মত ভূপেন্দ্রবাবু ও হরিপদবাবুকে প্রসাদ দিতে গেল, কিন্তু তাঁদের কেউই প্রসাদের দিকে ফিরেও দেখলেন না। উপেন্দ্রবাবু দাদার দিকে চেয়ে তাঁর মুখচোখের শুষ্ক ভাব ও অগোছাল কেশরাশি দেখে বুঝলেন নিশ্চয়ই "মীরহাট" থেকে খুব ভোরেই দাদা ও হরিপদবাবু রওনা হয়ে এসেছেন। তিনি ভূপেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্যে বললেন, "বাড়ীতে গিয়ে স্নানটান করে একটু বিশ্রাম করে এলেই তো পারতে। তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত।"

উপেন্দ্রের এই কথার জবাবে ভূপেন্দ্রবাবু বেশ শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, "আমি তোমার আদরযত্নের লোভে কলকাতা বেড়াতে আসি নি, এসেছি কৈফিয়ৎ নিতে।" ভূপেন্দ্রবাবু এ-রকম উগ্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে কথা বলায় উপেন্দ্রের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গে। তিনি নীরব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকেন। উপেন্দ্রের এই নীরব ভঙ্গীও যেন ভূপেন্দ্রের সহ্য হয় না, তিনি বলেন, "আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।" ভূপেন্দ্রবাবুর এ-কথারও জবাব উপেন্দ্রবাবু দেন না দেখে বেশ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে তিনি বলে ওঠেন, "কার হুকুমে হরিপদকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছ? যত চোর, গুণ্ডা, বদমাস্ নিয়ে এসে দোকানটাকে একটা বদমাসদের আড্ডায় পরিণত করেছ আর তোমাদের বদমাইসীর অসুবিধা হবে বলে হরিপদকে সরিয়ে দিয়েছ, হ্যাঁ? বল এ পর্য্যন্ত কত টাকার মাল সরিয়েছ? কোথায় টাকা রেখেছ?"

ভূপেন্দ্রবাবুর এ-কথায় শুধু উপেন্দ্রই নয়, দোকানে উপস্থিত অন্যান্য সকলেই যেন আকাশ থেকে পড়ল এবং সবাই এক দৃষ্টে ভূপেন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে রইল

তিনি আরও কি বলেন শোনবার জন্য। ভূপেন্দ্রবাবুর এ-কথায় উপেন্দ্রবাবু নীরব; লজ্জায় তাঁর মাথাটা কাটা যেতে লাগল। তিনি বুঝলেন, হরিপদকে হাতে-নাতে ধরার জন্য আক্রোশ বশে হরিপদ দাদাকে যা-তা বলে ঝগড়া লাগাবার জন্য উত্তেজিত করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। উপেন্দ্রবাবু মনে-মনে ভাবেন, আজ পয়লা বৈশাখের মত একটা শুভ দিনে সাতসকালে দোকানের মধ্যে এমন একটা কেলেঙ্কারী হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। মনে যাই ভাবুন, মুখে এ-কথার একটা উত্তর দিতেই হয়, না হলে ব্যাপারটা আরও বেড়ে যায়। তাই উপেন্দ্রবাবু ধীরে-ধীরে দাদাকে বললেন, "আজকে পয়লা বৈশাখ, শুভদিন, আজ ও সব কথা থাক দাদা, পরে আলোচনা করা যাবে।" ব্যাপারটা আপাততঃ স্থগিত রেখে উত্তেজনা উপশমের চেষ্টা করলেও ভূপেন্দ্রবাবু থামবার পাত্র নন। তিনি উপেন্দ্রবাবুর একথার অন্য অর্থ করে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,-"আমিও এই দোকানের একজন অংশীদার, দস্তুরমত আমারও টাকা খাটছে, সুতরাং কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার আমারও আছে, তুমি ভাবছ, না বলে এড়িয়ে গেলে আমি ছেড়ে দেব তোমায়? তাই-ই যদি ভেবে থাক তবে শুনে রাখ, ভাই বলে ছেড়ে আমি কাউকে দেব না, পাই-টু-পাই হিসাব দেখে নেব আমি, আর যে-সব কর্ম্মচারী তোমাকে চুরি করতে সাহায্য করছে তাদের নামেও থানায় ডাইরী করব। দেখি মালিক লাই দিয়ে তাদের কেমন করে বাঁচাতে পারে।"

ভূপেন্দ্রবাবুর এ-অপমানও উপেন্দ্রবাবু হজম করে যাচ্ছেন দেখে সুদীপ একটু অস্থির হয়ে পড়ে। এতক্ষণ শুধু মালিককে টেনেই হচ্ছিল, কিন্তু এবার তার সঙ্গে কর্ম্মচারীদেরও জড়িয়ে কথা বলা হচ্ছে শুনে সে অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে ভূপেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্যে বলে, "চোর কর্ম্মচারীটি তো আপনার পাশেই বসে রয়েছেন, ওনাকেই প্রশ্ন করুন না দু-বাণ্ডিল কাঁটাতার ও এক ডজন বেলচা যেটা উনি আপনাদের গ্রামের স্কুল কমিটিকে দান করেছেন সেটা কোথা থেকে উনি পেয়েছেন?" সুদীপের এই নম্র কণ্ঠের কথায় ভূপেন্দ্রবাবু পার্শ্বে উপবিষ্ট হরিপদ-বাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। তিনি মনে-মনে কিছু চিন্তা করে নিলেন, কারণ গ্রামের স্কুল কমিটির সেক্রেটারী তিনি নিজে এবং এও সত্যি কথা যে, হরিপদ স্কুলের জন্য বেলচা দিয়েছে ছখানা, কিন্তু কাঁটাতার? কৈ না তো, হরিপদ কোন কাঁটাতার তো স্কুলকে দেয়নি, বরং তাঁর খেয়াল হয়ে যায় যে, দিন-দুই আগে হরিপদর খুড়ো দীঘির উত্তর পাড়টা কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দেওয়া হচ্ছে দেখেছেন। তা ছাড়া আরও ছখানা বেলচা? মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যে কি যেন চিন্তা করে নিয়ে ভূপেন্দ্রবাবু হরিপদকে দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করলেন, "কি হরিপদ,

জবাব দিচ্ছ না যে? বল কাঁটাতার আর বেলচা কোথায় পেয়েছ?" হরিপদ ভূপেন্দ্রবাবুর এ-কথার জবাবে তার জামার ডান দিকের পকেট থেকে ফস করে একখানা ফর্দ্দের কাগজ বের করে ভূপেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়েই চিৎকার করে উঠল, "দস্তরমত পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছি, এই দেখুন তার ফর্দ্দ।" হরিপদর এ-কথায় সবাই হতভম্ব, সবাই ভাবে লোকটা বলে কি, আচ্ছা শয়তান তো?

সুদীপ ভূপেন্দ্রবাবুর কাছ হতে ফর্দ্দটা চেয়ে নিয়ে হরিপদর দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করে, "বলুন কোন্ দোকানের ফর্দ্দ এটা? কাঁটাতার তো বেলজিয়াম হতে আমদানি-করা মাল, যদিও কাঁচা রসিদে ঐ মাল বিক্রয় হয় না তবুও আপনাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করছি, বলুন এই ফর্দ্দটা কোন্ দোকানের ফর্দ্দ। কোন্ দোকান থেকে আপনি কিনেছেন?" সুদীপের একথায় হরিপদবাবু কিছুটা বেকায়দায় পড়ে, কারণ সে নিজে ভালই জানে কাঁটাতার কাঁচা ফর্দ্দে পাওয়া যায় না, এই আমদানীকৃত মালের প্রতিটি ইঞ্চি প্রতিটি ছটাকের হিসাব দাখিল করতে হয় আয়রণ এণ্ড স্টীল কণ্ট্রোলার অফিসে, তবেই আবার আমদানী লাইসেন্স পাওয়া যায়, তাই সব ইম্পোর্টারই কাঁটাতারের আমদানীকৃত পরিমাণ ও বিক্রীত পরিমাণের নিখুঁত হিসাব রাখেন। আর নন্দী কোম্পানীর হিসাব রক্ষার দায়িত্ব তো তাঁর নিজের উপরই ন্যস্ত ছিল। সুতরাং সুদীপ তাঁকে অত্যন্ত কোণঠাসা করে ফেলেছে বুঝে তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেও নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্য হঠাৎ একটা কোম্পানীর নাম করে বসলেন, বললেন "আমি পাল ব্রাদার্স থেকে কিনেছি।"

সুদীপ আর কোন কথা না তুলে ফর্দ্দটা হাতে করে নিয়ে নন্দী কোম্পানীর ঠিক সামনে পাল ব্রাদার্সের মালিকের কাছে চলে যায় এবং তাঁকে প্রশ্ন করে জানতে পারে যে, ফর্দ্দটা পাল ব্রাদার্সের মোটেই নয়, সুতরাং সুদীপের আর সন্দেহই থাকে না যে, ফর্দ্দটা একটি বাজে ফর্দ্দ এবং হরিপদবাবুর কোন পরিচিত ব্যক্তির হাতে লেখানো। সে নন্দী কোম্পানীতে ফিরে ফর্দ্দটা ভূপেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়ে বলল, "ফর্দ্দটা জাল ফর্দ্দ, উনি পাল ব্রাদার্সে কাঁটাতার কেনেন নি, বিশ্বাস না হয় আপনি নিজে ফর্দ্দটা নিয়ে পাল ব্রাদার্সের মালিকের কাছে গিয়ে পরখ করে দেখতে পারেন।" সুদীপের এই প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ভূপেন্দ্রবাবু একবার তার মুখের দিকে চেয়ে হরিপদবাবুকে চেপে ধরতেই হরিপদবাবু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "শয়তানটা মিথ্যা কথা বলছে, আমি পাল ব্রাদার্সেই কিনেছি, কণ্ট্রোলের মাল তারা বিলছাড়া বেচে দিয়েছে বলে ভয়ে বলেনি"। হরিপদবাবুর এ-কথায় ভূপেন্দ্র বাবু নিজে উঠে পাল ব্রাদার্সে যান এবং সব শুনে বুঝতে পারেন সুদীপের কথাই

ঠিক, তাই ফিরে এসে হরিপদবাবুর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে তার জামার কলার চেপে ধরতেই সে একেবারে ভূপেন্দ্রবাবুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে এবং ককিয়ে কেঁদে ওঠে বলে, "আমি অন্যায় করেছি সেজবাবু, আমায় মাফ করুন, আমায় মারবেন না, দোহাই, বাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। এইবার আমায় ছেড়ে দিন, আর কক্ষনো এ কাজ করব না। এবারের মত আমায় ক্ষমা করে দিন।"

হরিপদবাবুর এইভাবে কাকুতিমিনতি করা দেখে ভূপেন্দ্রবাবু এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং নিজের ভাই ও দোকানের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কটাক্ষ করে কথা বলার জন্য লজ্জা বোধ করেন। এর পর হরিপদর জামার কলার ছেড়ে উপেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে বলেন, "তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ঐ শয়তান হরিপদটার কথায় বিশ্বাস করে আমি তোমার উপর অবিচার করেছি। তুমি আমার উপর রাগ করো না।" ছোট ভাই উপেন্দ্রবাবু এতক্ষণ চুপ করে সমস্ত নাটকটাই দেখছিলেন। এতক্ষণে মুখ খুললেন, বললেন, "সামান্য একটা পঞ্চাশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস করে আজ বছরের প্রথম শুভ দিনটিতে তুমি যা করলে দাদা, তার তুলনা হয় না; ছিঃ দাদা, ছিঃ, লজ্জায় আমার মাথাটা মাটিতে মিশে যাচ্ছে। শোন সেজদা, এর পর আর এই দোকানে আমি একলা বসব না, তা ছাড়া ক্যাশের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না, তোমাকেও বসতে হবে এবং ক্যাশের দায়িত্ব নিতে হবে, না হলে এই আমি দোকান থেকে চললাম আর ঢুকব না।"

উপেন্দ্রবাবুর নীরব গাম্ভীর্য্য যে ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ অভিমানের পাহাড় গড়ে তুলেছে তা সুদীপও বুঝতে পারে নি, তাই উপেন্দ্রবাবুর এই হঠাৎ বের হয়ে যাওয়ায় সে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেও মুহূর্ত্তের মধ্যে চিন্তা করে যে, আজ পয়লা বৈশাখ, শুভদিনে দোকান হতে মালিক চলে যাবেন রাগ করে অভিমানের বশে, সেও কি হয়! তাই আত্মস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

উপেন্দ্রবাবু ফিরে আসেন কিন্তু মালিকের চেয়ারে আর বসেন না, পাশেই আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকেন। সুদীপ ধীরে-ধীরে বলে, "আমিও আর কাল থেকে আসব না, কারণ আমরা কর্ম্মচারী, গরীব হতে পারি, তাই বলে চোর অপবাদ! এ অপবাদ সহ্য হয় না।" বলতে বলতে সুদীপের গলা ঠেলে কান্না বের হয়ে আসতে চায়। এদিকে আসল চোর হরিপদ ততক্ষণে সবার অন্যমনস্কতার সুযোগে দোকান ছেড়ে চলে গিয়েছে।

উপেন্দ্রবাবু ও সুদীপের কথা শুনে ভূপেন্দ্রবাবু আবার নিজের সংযম হারিয়ে বেশ উত্তপ্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করেন, "বেশ তাই হবে, তোমরা সবাই চলে যেও, আমিই দোকান চালাব, কি এত ভয় দেখাচ্ছ ? ভারী তো পনর টাকা দরের লোক, তার আবার দেমাক।" বলে ঝট করে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে তিনি দোকান ছেড়ে হন্‌হন্‌ করে বের হয়ে যান। শুভ দিনের পবিত্র আবহাওয়াটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ কাটবার পর সুদীপ লক্ষ্য করে উপেন্দ্র-বাবুর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সুদীপ বুঝতে পারে ভূপেন্দ্র-বাবুর অসংযত কথাগুলো উপেন্দ্রবাবুর পক্ষে কত নিদারুণ বেদনাদায়ক হয়েছে, তাই তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে কিছু বলতে যায় আর ঠিক সেই সময় পয়লা বৈশাখের প্রথম খরিদ্দারটি দোকানে ঢোকে। দোকানে খরিদ্দার ঢুকছে দেখে সুদীপ তাড়াতাড়ি তাঁর প্রতি মনোযোগ দেয় এবং উপেন্দ্রবাবুও মুহূর্তে সংযত হয়ে যান। কিছু জালের নমুনা দেখে পছন্দ করে সামান্য দরকষাকষি করে খরিদ্দার প্রায় সতরশত টাকা মূল্যের জাল কেনেন। জালের বাণ্ডিলগুলি বেঁধে গুটিয়ে প্যাকেট করে খরিদ্দারের মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সুদীপ উপেন্দ্রবাবুর দিকে নজর দেবার সময় পায়। চেয়ে দেখে উপেন্দ্রবাবুর আগের সেই বেদনাসিক্ত গম্ভীর ভাবটা অনেকখানি কমে গেছে আর তার জায়গায় মুখে যেন একটা মধুর প্রশান্ত গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। সুদীপ তাঁর মুখপানে চেয়েই বোঝে যে, পয়লা বৈশাখের প্রথম খরিদ্দারকে মোটা অঙ্কের দ্রব্য বিক্রয়ে সফল হওয়ায় অন্তরে তাঁর কিছুটা আনন্দ হয়েছে, তাই হয়ত এই মুহূর্তে ভূপেন্দ্রবাবুর দেওয়া দুঃখ ভুলে কিছুটা স্বস্তির চিহ্ন তার মুখেচোখে ফুটে উঠেছে।

সুদীপ তাঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে উপেন্দ্রবাবু হঠাৎ মুখে হাসির রেখা টেনে বলেন, "কি হে, ছোকরা, খিধে পেয়েছে নাকি ? সেই কোন্ ভোরে উঠে কালীঘাটে গিয়েছিলে, খিধে পায়নি ?" উত্তরে সুদীপ হাসে, তার মনে হয় এতক্ষণে উপেন্দ্রবাবু ঠিক তাঁর মেজাজটি ফিরে পেয়েছেন। হাসতে হাসতেই সুদীপ উত্তর দেয়, "তা একটু একটু পেয়েছে।" সুদীপের কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্যাশ থেকে একটা দুটাকার নোট নিতাইয়ের দিকে এগিয়ে ধরে উপেন্দ্রবাবু বলেন, "যাও নিতাই, এই দুটাকার সন্দেশ নিয়ে এসে তোমরা সবাই একটু মিষ্টিমুখ করে নাও, আর সময় পাবে না, কারণ এর পর তো আবার অতিথি-অভ্যাগত আসতে শুরু করবেন। তাঁদের আপ্যায়ন করতে-করতেই সময় চলে যাবে ; যাও যাও, তাড়াতাড়ি মিষ্টি নিয়ে এস।"

এর পর সারাদিন বিভিন্ন কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে নূতন খাতার অতিথিদের অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধিদের ও খুচরা খরিদ্দারের মধ্যে নিয়মিত যারা মাল কেনেন এবং বাজারের বেশ কিছু দোকানদার ও মালসরবরাহকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মিষ্টিমুখ করানো চলতে থাকে। এরই মধ্যে আবার শুভ দিন উপলক্ষ্যে অনেক সরবরাহকারী সংস্থা মাল ডেলিভারী দিয়েছে, সেগুলিকেও চালান মিলিয়ে গুছিয়ে রাখা, চালান সই করা ইত্যাদি করতে করতে নিতাই, মউজী ও সুদীপ যেন হিমসিম খেয়ে যায়। সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে ছুটি মেলে রাত্রি প্রায় নটায়।

দোকান বন্ধ করে উপেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় নিয়ে সুদীপ বাসার দিকে পা বাড়ায়। ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে পাথুরিয়াঘাটা কতটুকুই বা পথ, কিন্তু ঐ পথটুকু হাঁটতেই যেন সুদীপের বেশ কষ্ট হতে থাকে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে যে, ভিতরে ভিতরে সে কতখানি ক্লান্ত। কোন রকমে মেসে এসে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে সামান্য চাট্টি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। শোয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্লান্তিতে তার দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে। তার মনে হয়, কেউ যেন জোর করে তার দু'-চোখের পাতাগুলো টেনে টেনে বন্ধ করে দিচ্ছে, চেষ্টা করেও আর খোলা যাচ্ছে না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সুদীপ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঘুম ভাঙ্গে একেবারে পর দিন সকাল পাঁচটায়। বৈশাখ মাসের সকাল পাঁচটা। সুদীপ বিছানা ছেড়ে উঠে দেখে চারিদিকে বেশ আলো হয়ে গেছে। মাদুরের উপর উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙ্গতে গিয়ে সুদীপ অনুভব করে সারা শরীরে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব, সঙ্গে একটু-একটু ব্যথাব্যথাও করছে। সুদীপ আর একবার বালিশে মাথা রেখে গড়িয়ে নেবে বলে' শুয়ে পড়ে কিন্তু ঠিক সেই সময় সতীন্দ্রবাবু ঘরে ঢোকেন। বাবা ঘরে ঢুকছেন দেখে সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চায়। সতীন্দ্রবাবু সুদীপেরই মাদুরের এক পাশে বসে ডান হাতটা সুদীপের দিকে প্রসারিত করে একটা কাগজ তার হাতে দিলেন এবং মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন, "তোমার মায়ের চিঠি, পড়।" চিঠিটা খুলে পড়তে-পড়তে সুদীপের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। চিঠিটা হাতে করেই বাবাকে প্রশ্ন করে, "কিন্তু এত টাকা? একেবারে তিনশত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে বাবা?" সতীন্দ্রবাবু বললেন, "ও তুমি ভেবো না, তোমার এতদিনকার বেতনের পুরো টাকাটাই আমার কাছে আছে, এই তিন বছরের তোমার বেতনের টাকা বাবদ প্রায় সাড়ে চারশত টাকা আমি আলাদা করে জমিয়ে রেখেছি; সেই টাকা থেকেই ঐ জমি চার বিঘা নেব ভাবছি। কেঁয়েদের জমি, খুবই ভাল

জমি, তাছাড়া এক লপ্তে চার বিঘা বাকুরী, বাঘাসনের মাঠে খুব কমই আছে, সুতরাং সাতপাঁচ ভেবে দেরী করা চলবে না, আমি আজই কেশবলালজীর কাছে গিয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাব।" এই কথা বলে সুদীপকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সতীন্দ্রবাবু ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মায়ের চিঠিটা পড়ে সুদীপও আনন্দিত হয়েছিল, কারণ খবরটা যদিও মামার মারফৎ এসেছে, তবু সুচন্দ্রা দেবী যে তড়িঘড়ি কলকাতা পর্য্যন্ত খবরটা পাঠিয়েছেন এর জন্ত সুদীপ মনে-মনে মাকে প্রণাম না জানিয়ে পারে না। সুদীপ বোঝে যে, তাদের নবান্নের ধান ফলাবার মত সামান্য জমিও নাই, তাই মা-বাবার খুবই কষ্ট। এবার হয়ত ঈশ্বর মুখ তুলে চাইবেন, হয়ত জমিটা সতীন্দ্রবাবু কিনতে পারবেন অর্থাৎ তাদের নবান্নের ব্যবস্থা হবে। নিজেদের ধানের জমি হবে আর সেই ধানের জমি থেকে ধান কেটে নবান্ন হবে—কথাটা ভাবতেই যেন সুদীপের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ জাগছে। ভাবতে-ভাবতে সুদীপ অনেক গভীরে চলে যায় এবং চিন্তা করতে থাকে যে, জমি তো ভগবানেরই সৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদ, তবে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক আর্থিক কৌলিন্যের জোরে কেন জমির মালিক হবে, আর বাকীরা ভূমিহীন হয়ে থাকবে? তাদের অর্থ নাই বলেই তো জমি নেই, একটা বাড়ীর মত বাড়ী নেই, গোয়াল নেই, গরু নেই, বলতে গেলে কিছুই নেই। সুদীপ আরও ভাবে হয়ত প্রকৃতির সম্পদ বলেই জমিজায়গা, ভিটেবাড়ী চিরকাল কারও একেবারে নিজস্ব হয়ে থাকে না, সেই জন্যই হয়ত যুগে-যুগে ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, না হলে ঐ ভট্টাচার্য্যদের অতবড় জমিদারীই কেঁয়েদের কাছে বাঁধা পড়বে কেন আর কেঁয়েরাই বা সেই সব জমি কোর্টে ডিক্রী নিয়ে বিক্রয় করবে কেন। ভাবতে-ভাবতে সুদীপের মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে, সে উঠে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে বাইরে বারান্দায় দাঁড়ায়। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে ইতিমধ্যেই পাথুরিয়াঘাটা-পাড়া বেশ কর্ম্মচঞ্চল হয়ে পড়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় দু-একটা ঘোড়ার ঘণ্টার ডুং ডাং আওয়াজ ও মানুষের কণ্ঠের বিভিন্ন গ্রামের চিৎকার শুনতে-শুনতে দূরমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ খেয়াল পড়ে গেল আজ দোসরা বৈশাখ। আজ দুপুরে তো কুসুম দিদির কাছে খাবার নিমন্ত্রণ। যাঃ, ব্যাপারটা একদম ভুলেই গিয়েছিল, মনে পড়তেই সুদীপের মনটা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। এক্ষুণি তার দিদির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল, কিন্তু ইচ্ছা হলেই তো সব জিনিষ করা যায় না; ভদ্রতা-অভদ্রতা, সময়-অসময় তো আছে। তাই সুদীপ তখনকার মত চঞ্চলতা পরিহার করে' রাস্তার দিকে চেয়ে সময় কাটাতে লাগল। বেলা যখন বেশ কিছুটা বেড়ে

গিয়েছে, তখন হঠাৎ হীরেনদার ডাকে সুদীপের চমক ভাঙল। সুদীপ দেখল দু-হাতে দু-কাপ চা নিয়ে হীরেনদা তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সুদীপ হীরেনের হাতে চা দেখে চমকে উঠে বলল, "একি হীরেনদা, চা? এই মেসে চা? বাবা দেখলে আর রক্ষে নেই, করেছ কি তুমি?" সুদীপ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ঘর আর বারান্দার মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইল। সুদীপের এই ভয় ও বিস্ময় দেখে হীরেন হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল, আর বলল, ভয় নাই, নির্ভয়ে খা, কাকাবাবু নিজেই গতকাল চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম কিনে এনেছেন এবং আজ থেকে চায়ের জন্য এক পোয়া করে দুধের ব্যবস্থাও হয়েছে। দুধটা আসতে একটু দেরী হয়েছে বলেই চাটা তৈরী হতে এত দেরী হল, না হলে আরও ভোরেই চাটা পেতিস, নে, নে, ধর, জুড়িয়ে গেল যে, তাড়াতাড়ি ধর।"

হীরেনের কথায় আশ্বস্ত হয়ে সুদীপ চাটা নিল বটে, কিন্তু নেওয়ার সময় তার হাতটা একটু কেঁপে গেল, কারণ সে জানে সতীন্দ্রবাবুর ভাষায় চা, পান, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি একেবারে বুড়ো বয়সের নেশা। বুড়ো বয়সে মানুষের হাতে যখন কোন কাজ থাকে না তখন চা খেয়ে বা পান থেতো করে চিবিয়ে বা বিড়ি সিগারেট খেয়ে মানুষ সময় কাটায়। তা ছাড়া এগুলো শারীরিক কোন উপকারে তো লাগেই না, বরং স্বাস্থ্যের হানিই ঘটায়। এই যাঁর মতবাদ, সেই বাবা নিজে হাতে চায়ের সরঞ্জাম কিনে এনেছেন শুনে সুদীপ সত্যিই বিস্মিত হয়। তখন বিস্মিত হলেও পরে সুদীপ জেনেছে যে, ভালোটিয়া রতনলালের কাজ করতে-করতে ওখানে চা খেয়ে-খেয়ে বাবা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাই মেসেও চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যাই হোক, ব্যবস্থা যেভাবেই হোক ব্যবস্থাটা সুদীপ বা হীরেনের কাছে সুব্যবস্থাই মনে হয়েছে, কারণ তাদের মাঝে-মাঝে চা খেতে ভীষণ ইচ্ছা করত এবং সেটা সতীন্দ্রবাবুকে লুকিয়েই বাইরে কোন দোকানে গিয়ে খেয়ে আসতে হত। এবার থেকে অন্ততঃ চায়ের জন্য বাইরের দোকানে গিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে বাজে চা খেতে হবে না। দুই বন্ধুতে চা খেতে-খেতে মনে-মনে সতীন্দ্রবাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানায়। চা খেয়ে হীরেন কাপ দুটো নিয়ে চলে গেল আর সুদীপ স্নানের জন্য নীচের তলায় কলঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

স্নান শেষে উপরে উঠবার সময় সিঁড়ির পাশের ঘরে হীরেনদার টাইমপীস ঘড়িটার দিকে চেয়ে সুদীপ দেখল পৌনে নটা বাজে। নিজের ঘরে ঢুকে দড়িতে ঝোলান গত রাত্রের ছাড়া জামাকাপড়গুলো পরতে গিয়ে সুদীপ দেখল সেগুলো কালীঘাটের সিঁদূরের দাগে তারপর গত কালের সারা দিনের ধকলে ঘামে ভিজে ময়লা ধরে একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে। তাই সে দুটোকে না নামিয়ে যথাস্থানে

থাকতে দিয়ে কুসুমেরই দেওয়া আর একটা সার্ট ও একখানা ধুতি বের করে পরল এবং সতীন্দ্রবাবু বাঘাসন যাবেন বলে সামান্য কিছু জিনিসপত্র কিনে তাঁকে হাওড়া স্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিতে গেল। বেলা এগারটার বর্দ্ধমান লোকাল ছেড়ে যাওয়ার পর হাওড়া স্টেশন থেকেই সুদীপ ট্রামগাড়ীতে চড়ে কলেজ ষ্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে নামল এবং ট্রাম বদল করে শ্যামবাজারের ট্রামে চেপে আবার হাতিবাগান এসে নেমে কুসুমের বাসার দিকে পা বাড়াল। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় থেকে উত্তর মুখে হাঁটতে-হাঁটতে সুদীপ একবার ভাবল সে আজকে হঠাৎ আনন্দের উচ্ছলতায় দু-দুবার ট্রামে চেপে অনেক পয়সা খরচ করে ফেলেছে। আবার একবার ভাবল, যাকগে পয়সা, আজ বড় আনন্দের দিন। একদিকে বাবা দেশে গেলেন জমি কিনবেন বলে, আবার অন্যদিকে কুসুমের কাছে তার নিমন্ত্রণ। দু-দুটো ব্যাপারই তার কাছে ভীষণ আনন্দের, তাই আজকের ট্রাম-ভাড়া খরচের ব্যাপারটা নেহাৎই সামান্য ব্যাপার।" জমির ব্যাপারটা ভাবতে-ভাবতে সুদীপের একটু চিন্তা হ'ল, কে জানে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত জমিটা তাদের হবে কিনা, অন্য কোন লোক আবার বেশী দাম দিয়ে নিয়ে নেবে কিনা ; যা হয় হোকগে, ঈশ্বর কপালে যা লিখেছেন তার বেশী এক বিন্দু নড়বার ক্ষমতা যে মানুষের নেই একথা মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছুটা চিন্তান্বিত চিত্তেই কুসুমের দরজায় এসে টোকা দিল।

দরজায় টোকা শুনে কুসুম এসে দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়াতেই সুদীপ অবাক। হাল্‌কা ঘি-রঙের একখানা রেশমের শাড়ী পড়েছে কুসুম। লাল ডগডগে, চওড়া পাড়ের শাড়ীটায় কুসুমকে অপূর্ব্ব লাগছে। কপালে একটা শ্বেত চন্দনের ছোট্ট টিপ, চুলগুলোও এলো করে সারা পিঠে ছড়ানো, মুখটা ঘামে একটু-একটু ভিজে, শরীরের ঘাম জামা ভিজিয়ে দিয়েছে। কুসুমকে দেখে সুদীপের মনে হয় যেন এই মাত্র কোন পূজার যোগাড় করতে-করতে উঠে এসেছে। সুদীপ যখন কুসুমের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে ঠিক তখনই কুসুম সুদীপের ডান হাতটা ধরে একটু টান দিয়ে তাকে দরজার ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে একটা চেয়ার দিয়ে সুদীপকে বসতে বলল। সুদীপ বসলে কুসুম তার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভাল করে সুদীপকে নিরীক্ষণ করে বলল, "বাঃ কি সুন্দর লাগছে, এমন সুন্দর চেহারা তোমার, আর এমন সমস্ত জামাকাপড় পরে থাক, কি রকম যেন লাগে। এর পর থেকে তুমি এই রকম পোশাকই পরবে।" কুসুমের কথায় সুদীপ সামান্য লজ্জা পেল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই লজ্জা কাটিয়ে কুসুমকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার দিদিটিও কিন্তু কম সুন্দর নয়, ঠিক যেন মন্দিরের

দেবীমূর্ত্তি।" সুদীপের কথায় কুসুম মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "যাঃ, আমি আবার সুন্দর কোন্‌খানে।" বলে সলজ্জভাবে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই কুসুম এ-ঘরে এসে সুদীপকে বলল, "চল খাবার দিয়েছি।" সুদীপ কুসুমের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "সে কি, এরই মধ্যে? আমি যে তোমার গান শুনব ভাবছিলাম দিদি।" কুসুম বলল, "এই ভর দুপুরে গান?" সুদীপ বলল, "কেন, ক্ষতি কি?" কুসুম বলল, "না, এখন থাক, তুমি বরং বিকেলে শুনো, এখন খাবে চল।" এর পর সুদীপ আর কিছু না বলে খেতে বসল। খেতে বসে দেখল কুসুম একটা বড় বগী থালায় পরিষ্কার ধবধবে সুগন্ধী চালের ভাত দিয়ে শাক ভাজা, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, বড়ি ভাজা ইত্যাদি তিন চার রকমের ভাজাভুজি পাতে রেখে থালার চারদিকে গোটা ছয়েক বাটিতে ডাল, তরকারী-মাছের ঝাল ইত্যাদি, তার সঙ্গে একটা ছোট পাথরের বাটীতে চাটনি, একটা কাঁচের প্লেটে দই ও আর একটা প্লেটে দু-রকমের মিষ্টি রেখেছে। সুদীপ খেতে বসে থালা ও থালার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিটা বুলিয়ে "ওরে বাবা, তুমি করেছ কি দিদি!" বলে চমকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, কুসুম তার কাঁধটা ধরে টিপে বসিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি বস তো, এমন কিছু করি নি, যার জন্য একেবারে ভয়ে তোমায় উঠে পড়তে হবে।" সুদীপ তার ডান হাতের তর্জ্জনীটা দিয়ে থালার চার দিকটা দেখিয়ে বলে উঠল, "এগুলো কিছুই নয়? আরও হলে তুমি খুশী হতে? তুমি কি তোমার এই ছোট ভাইটিকে রাবণ রাজার বংশধর ভেবেছ নাকি দিদি? তাছাড়া এরই মধ্যে এত সব করলে কখন্‌?"

সুদীপের কথায় কুসুম মুখে তৃপ্তির মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে' উঠল, "কখন আবার? ও-সব আমার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়ে গেছে, তোমাকে ওসব ভাবতে হবে না, নাও, খেতে শুরু কর।" কুসুমের কথায় সুদীপ ঘাড় নীচু করে খাবারে মন দেয় আর কুসুম একটা তালপাতার হাত-পাখা নিয়ে তার পাশে বসে তাকে বাতাস দিতে থাকে। বোশেখ মাসের দুপুরের গরমে ঘামে ভিজে সুদীপের খেতে কষ্ট হবে ভেবে মমতাস্নিগ্ধ তৃপ্তচিত্তে কুসুম তাকে বাতাস দিতে থাকে। সুদীপ একবার অনুযোগ করে, "তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি, মেসে কি আমায় বাতাস দেওয়ার লোক আছে? মিছামিছি তুমি এত কষ্ট করছ, গরমে আমার কোন কষ্ট হয় না।" কুসুম বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, খাও তো দেখি। জানি আমার ভাইটি বীরপুরুষ, তার বর্ষা-বৃষ্টি-রোদ-গরম কিছুতেই কষ্ট হয় না, তবু আমার কাছে তো ছোট ভাই, স্নেহের পাত্র।"

কুসুমের কথায় এমন একটা করুণ মমত্ব ফুটে ওঠে যে, ঠিক এই মুহূর্তে সুদীপের মমতাময়ী মা সুচন্দ্রা দেবীর কথা তার মনে পড়ে। মায়ের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাইবোনগুলোর কথাও মনে পড়ে যায়। সে ভাবতে থাকে, কেমন সুখে সে কুসুমের হাতে রান্না পঞ্চব্যঞ্জন গলাধঃকরণ করছে আর বাঘাসনে তার মা, স্ত্রী সুরমা, বিধবা বোন কমলা ও অন্যান্য ভাইবোন হয়ত এতক্ষণে চাট্টি শুশনি শাক কিংবা কচু-আলু সিদ্ধ করে খাবার যোগাড় করছে। বাড়ীর কথা মনে হতেই মুহূর্তের জন্য তার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, সুদীপ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসতে চায়। খাওয়া থামিয়ে তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কুসুম আদরের সুরে বলে উঠল, "কি হ'ল, খাও, কি, রান্না ভাল হয় নি?" সুদীপ তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে উঠল, "না, না, এই তো খাচ্ছি। রান্না? রান্নাগুলো অপূর্ব্ব হয়েছে। তুমি এত ভাল রাঁধতে জান তা আমি ভাবতেও পারি নি, এমন রান্না আমি জীবনেও খাই নি। সত্যি দিদি, তোমার এত গুণ, তুমি অপূর্ব্ব গান কর, অপূর্ব্ব রান্না কর, আসলে তুমি নিজেই অপূর্ব্ব, তাই তোমার সবই ভাল।"

সুদীপের সরল মনের এই খোলামেলা প্রশংসায় কুসুম বেশ কিছুটা লজ্জিত বোধ করে আর মনে-মনে ভাবে নারীর বৈশিষ্ট্যই তো এই। নারী যদি কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তার জন্য বোধ হয় সব কিছুই করতে পারে। সুদীপকে যে কুসুম মনপ্রাণ ঢেলে আপন ভাইয়ের মতই ভালবেসে ফেলেছে, তাই তো তার জন্য সেই ভোর থেকে উঠে আজ এত কাণ্ড করতে পেরেছে। এর মধ্যে যে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কি সুখ, তা কুসুমের মত স্নেহময়ী নারী ছাড়া আর কে বুঝবে। সুদীপও যে কিছুটা বোঝে না তা নয়। এই মুহূর্তে কমলার কথাটা মনে পড়ে তার বেশ কষ্ট হতে থাকে। হতভাগীটা জীবনের কোন সুখসাধই মেটাতে পারল না, শুরু না হতেই সব সারা হয়ে গেল কমলার জীবনে; আর সামান্য একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে কুসুমের মত রূপবতী, গুণবতী মহিলার ভাগ্যে কি পরিহাসই না জুটল। কুসুমের কথা ভাবতেই গোটা বাঙালী সমাজটার মাথায় পদাঘাত করতে ইচ্ছা করল সুদীপের। তার যেন মনে হ'ল, এই সব কারণেই ব্যথা পেয়ে মানুষ হয়ত বদলে যায়, কেউ হয় খ্রীষ্টান, কেউ গ্রহণ করে মুস্লিম ধর্ম্ম আবার কেউ কেউ নিজের সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে সমাজের বাইরে এসে আশ্রয় নেয় সমাজবহির্ভূত পল্লীতে যেখানে আবার সমাজনেতাদেরই গোপন হাতের স্পর্শে ও অনুপ্রেরণায় দেহমনের স্থূল তাগিদে দিনে দিনে পরিপুষ্ট হয় এক-একটি অবৈধ সমাজ, যে সমাজে রাতের অন্ধকারে গোপন যাতায়াত থাকে ঐ-সব হীন

কুচক্রী নেতাদের। কোন দোষে দোষী না হলেও কুসুম কি নিদারুণ অসহায়ভাবে জীবন যাপন করছে ভেবে সুদীপের মনটা কুসুমের প্রতি শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। নানা কথা চিন্তা করতে করতেই এক সময় খাওয়া শেষ করে সুদীপ উঠে পড়ে। সুদীপকে বিশ্রামের জন্য স্থান করে দিয়ে আহারান্তে কুসুম এসে সুদীপের পাশে বসে।

কুসুম এসে বসতেই সুদীপ তার নিকট বাঘাসনের ধানজমি কেনার প্রসঙ্গ তুলে বলল, "জানো দিদি, বাবা তো গেছেন সাড়ে চারশোটি টাকা সম্বল করে হাঁয়দার বাকুড়ী কেনবার আশায়, কিন্তু কেন যেন আমার বারবারই মনে হচ্ছে বাবা হয়তো এত সহজে জমিটা কিনতে পারবেন না।"

কুসুম বলল, "কেন পারবেন না? যিনি বিক্রী করবেন, তিনি যখন তোমার মামাকে কথা দিয়েছেন তখন না পারার কি আছে? মানুষের কথার কি কোন দাম নেই? না, না, আজকের মানুষ এখনও এতটা অমানুষ হয়ে যায় নি, ও নিয়ে তুমি ভেবো না ভাই, দেখো কাকাবাবু ঠিক জমি রেজিস্ট্রী করে' হাসিমুখে কলকাতা ফিরবেন।"

"না দিদি না; এত সহজে হবে বলে মনে হয় না, কারণ ভদ্রলোক কথা দিলেও বেইমানি করে বেশী দাম দিয়ে বা অন্য কোন ছুতো-নাতা ধরে বাধা সৃষ্টি করবার লোকের অভাব নেই আমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে।"

সুদীপের কথায় কুসুমের বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হ'ল। কুসুম মনে-মনে ভাবতে থাকল যে, দেখাশুনা ও যত্নের অভাবে তার বাবার এত বড় জমিদারী কয়েক বছরের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল আর অত্যন্ত কষ্টার্জ্জিত কয়েক শ' টাকা সম্বল করে সামান্য কিছু জমি কেনবার জন্য সুদীপের কতই না চিন্তা। সুদীপের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে কুসুমের বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, যে দামেই হোক, তুমি জমি চার বিঘা কিনে নাও, টাকা যা লাগে আমি দেব, কিন্তু সুদীপ আবার কি মনে করে বসবে বলে কুসুমের বলতে সাহস হয় না, বলি-বলি করেও সে বলতে পারল না কথাটা। শুধুমাত্র বলল, "তোমাদের একেবারে জমি নেই, সুতরাং এ-সুযোগ কোন রকমেই হাতছাড়া করা উচিত নয়।"

কুসুমের এ-কথার উত্তরে সুদীপ মৃদুস্বরে বলল, "তা তো বুঝলাম দিদি, কিন্তু এটাও তো ঠিক, যে, এ পৃথিবীতে টাকা যাদের আছে একমাত্র তাদেরই কোন সুযোগ হাতছাড়া হয় না, টাকা দিয়ে তারা সব রকম সুযোগেরই সৃষ্টি করে নেয় নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী; কিন্তু যাদের টাকা নেই তারা শত চেষ্টা করলেও বেশীর ভাগ সময়েই সুযোগ তাদের হাতের বাইরে চলে যায়।"

কুসুম ভুল ক'রে আবার বলতে যাচ্ছিল, 'টাকা আছে সুদীপ, টাকার জন্য চিন্তা নেই' কিন্তু টাকা—এ পর্য্যন্ত বলেই সে আত্মসম্বরণ করে নিল, কারণ সুদীপের আত্ম-মর্য্যাদার কথা স্মরণে আসায় স্বতঃই কুসুমের ঠোঁট দুটো বন্ধ হয়ে গেল। সে কেবল ব্যথাতুর নয়নে অসহায় দৃষ্টিতে সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এভাবে অনেকক্ষণ কাটার পর সুদীপই আবার কথা বলল, "আমাদের গ্রামের অনেকেরই তো কিছু-না-কিছু ভূসম্পত্তি আছে, কিন্তু সব সময়েই দেখা গেছে যাদের কিছুমাত্র ভূ-সম্পত্তি নেই তারা যখনই সামান্য কিছু জমি বা ভিটাবাড়ী কিনতে এগিয়েছে তারা তখনই যাদের আছে তাদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ-রকমটা যে কেন হয় তা বুঝতে পারি না।" কুসুম বলল, "এ আর না বোঝার কি আছে? যাদের আছে তাদের কিছু অর্থও আছে, আর অর্থ থাকলে তো গোটা পৃথিবীর উপরই আধিপত্য করা যায়। সুতরাং সামান্য দু-দশ কাঠা জমিজায়গার ব্যাপারে নাক গলাতে তাদের অসুবিধা কোথায়?"

"সত্যিই তাই দিদি, একজন গরীব সৎলোক প্রচণ্ড পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করে কিছু জমিজমা করছে অর্থাৎ দৈন্যের দুঃসহ বোঝার চাপে নীচু মাথাটা উঁচু করতে চাইছে শুনলেই আমাদের সমাজের কিছু তথাকথিত ভদ্রলোক ও ধনী লোক তাতে ঈর্ষান্বিত হবেই এবং প্রয়োজন না থাকলেও শুধুমাত্র একটা বোহেমিয়ান আত্মমর্যাদা বজায় রাখবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে গরীবের আশাকে ভণ্ডুল করবার চেষ্টা করবেই।"

কুসুম বলল, "হ্যাঁ, এখনও এটা চলছে বটে তবে সম্ভবতঃ এটা আর বেশীদিন চলবে না। কারণ শোনা যাচ্ছে সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন করছেন।" সুদীপ বলল, "সরকার যতই আইন করুন না কেন, এদেশের ভূ-সম্পত্তির সমস্যা এক বিচিত্র সমস্যা; এত সহজে সে-সমস্যা কি মিটবে?"

কুসুম বলল, "রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হলে লক্ষ-লক্ষ একর জমি তো ভূখাদকদের হাত হ'তে রেহাই পাবে।"

কুসুমের কথার জের টেনে সুদীপ বলল, "দেশে শিক্ষার প্রসার যতদিন না হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত শুধু ভূ-সম্পত্তির কেন কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। তা ছাড়া জমির সমস্যা তো এক প্রচণ্ড জটিল সমস্যা।"

কুসুম বলল, "কেন? জটিল কেন?" কুসুমের কথার জবাবে সুদীপ বলল, "ধর, আইনবলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে', পরিবারগত বা ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সীমানা বেঁধে দেওয়া হ'ল এবং বাকী উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিবন্দোবস্ত

করে দেওয়া হ'ল। আপাততঃ লোকসংখ্যা অনুযায়ী, ধর, মাথা পিছু দুই বিঘা বা পাঁচ বিঘা জমি ভাগে পড়ল এবং যাদের জমি ছিল না তারা সাময়িকভাবে জমির স্বত্ব পেয়ে আনন্দিত হ'ল, কিন্তু তাতে কি সমস্যা মিটল? মিটল না।" এই সময় কুসুম বাধা দিয়ে বলল, "কেন মিটবে না? সবাই যদি জমির মালিক হয় তা হলে অশান্তিটা কোথায়?" কুসুমের এ-কথার জবাবে সুদীপ হেসে উঠে বলল, "হ্যা আপাততঃ শান্তি হ'ল বটে, কিন্তু আজকে যে-লোকটি পাঁচ বিঘা জমি পেল আগামী দিনে তার পাঁচজন ছেলে হবে, তাদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে এক বিঘা করে ভাগে পড়ল, আবার ঐ পাঁচজন ছেলের যদি দুটি করে সন্তান হয় তাহলে তাদের অংশ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে দশ কাঠা করে অর্থাৎ যতই দিন যাবে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে লোক ততই আবার ভূমিহীন হয়ে পড়বে। শুধু তাইই নয়, ভূমিসমস্যার এ তো মাত্র একটা দিক। আরও বহু দিকে রয়েছে, যেমন ধর, জমিদারের জমি অধিগ্রহণ করে খাস জমি যখন বিলিবন্দোবস্ত করা হবে তখন কৃষি ও অকৃষি জমির প্রশ্ন উঠবে, জমির উর্ব্বরতা-অনুর্ব্বরতার প্রশ্ন উঠবে, সেচসেবিত এলাকা এবং সেচহীন এলাকার প্রশ্ন উঠবে। অনুর্ব্বর জমি ও সেচহীন এলাকার জমি কোন লোকই নিতে চাইবে না, সবাই ভাল জমি চাইবে, কারণ উর্ব্বর জমি এবং সেচ এলাকার জমিতে অল্প আয়াসে ফসল ফলানো যাবে আর অনুর্ব্বর জমিতে বা সেচহীন এলাকার জমিতে ফসল ফলানো হবে কষ্টসাধ্য। তার পর ধর, সব গ্রামেই এমন কিছু জমিদার নেই বা বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত জমিও নেই। যে-গ্রামে বা যে-অঞ্চলে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে না সেখানকার ভূমিহীনদের যদি অন্য এলাকায় জমির বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে ভিন্ন এলাকায় গিয়ে তারা চাষ করে কি বিশেষ সুবিধা করতে পারবে? সম্ভবতঃ না, কারণ প্রথমতঃ, নিজ গ্রামের বাড়ীঘর ছেড়ে ভিন্ন গ্রামে কেউই যেতে চাইবে না, দ্বিতীয়তঃ, কষ্ট স্বীকার করে ভিন্ন গ্রামে গেলেও সেখানকার কৃষকদের কাছ থেকে তারা কোন রকম সহযোগিতা-সহানুভূতি পাবে না, বরং প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হওয়াই সম্ভব।"

সুদীপের এই যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনা কুসুমের অত্যন্ত সঙ্গত মনে হওয়ায় সে বলে উঠল, "তুমি যা বলছ সবই ঠিক, কিন্তু স্বাধীন দেশের সরকার ইচ্ছা করলে আইন সভায় আইন পাশ করিয়ে সবই করতে পারবেন। তখন তো আর কোন আইন পাশ করবার জন্য লণ্ডনের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না। সুতরাং অসুবিধাটা কোথায়?"

ক্ষণকাল নীরব থেকে সুদীপ বলল, "অসুবিধাটা আছে বই কি দিদি। সর্ব্ব-প্রথম অসুবিধাটা হবে আইন সভায় আইন পাশ করানো, কারণ আইন সভায়

সভ্যদের বা তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের বিশাল ভূ-সম্পত্তিও থাকতে পারে এবং সেজন্য তাঁরা সহজে এই ধরণের কোন আইনকে নিশ্চয়ই প্রশ্রয় দিতে চাইবেন না, কারণ তা হলে, সেই আইনের শিকার হবেন সর্ব্বপ্রথম তাঁরাই, অবশ্য ব্যাপারটা আগেভাগে জানতে পারলে তাঁদের পক্ষে একটা সুবিধাও হবে।

সুবিধার কথা শুনে কুসুম বাধা দিয়ে বলে উঠল, "সুবিধাটা কি?"

সুদীপ হাসতে হাসতে বলল, "বুঝতে পারলে না সুবিধাটা কি?" কুসুম বলল, "না।" সুদীপ এবার কুসুমের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, "সুবিধার কথাটা তা হলে শোন। আইন সভায় সদস্যদের বা তাদের আত্মীয়পরিজনদের সুবিধাটা হ'ল, ভূমিসংক্রান্ত এই ধরণের কোন আইন হচ্ছে জানতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে তারা রাতারাতি জমিগুলো বেনামি করে ফেলবে।" কুসুম বলল, "বেনামী? বেনামী আবার কি?" কুসুমের এই প্রশ্নে সুদীপ হোঃ হোঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ফেলল, এবং বলল, "দিদি, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। অত বড় জমিদারের মেয়ে তুমি, বেনামী কাকে বলে জানো না! সত্যি দিদি, এত সরল সাদাসিধে বলেই তোমার কপালে এত কষ্ট। যাক, শোন তা হলে বেনামী কাকে বলে। বেনামী হ'ল, ধর, তোমার নামে একশ বিঘা জমি আছে, তুমি শুনলে সরকার আইন করছে—পঞ্চাশ বিঘার বেশী রাখতে দেবে না। যেই তুমি শুনলে অমনি তোমার বিশ্বস্ত কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব, যার বা যাদের জমি পঞ্চাশ বিঘার কম, তার বা তাদের নামে বিক্রয় কোবালা বা দানপত্র করে দিলে। তা হলে এক দিক দিয়ে তোমার জমি আইনানুগ পরিমাণ মত থাকল আবার ঐ কোবালা করে দেওয়া বা দানপত্র করে দেওয়া অর্থাৎ এক কথায় বেনামী করে দেওয়া জমির স্বত্বও তুমি ভোগ করতে থাকলে।"

কুসুম এই সময় বাধা দিয়ে আবার বলল, "যাদের নামে জমি বেনামী করবে তারা যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করে?" সুদীপ বলল, "সে আশঙ্কা তো থাকবেই, তবু তাদেরকে ছিটেফোঁটা কিছু দিয়ে যতদিন মুখ বন্ধ করে রাখা যায় ততদিনই লাভ। একেবারে সব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার চেয়ে সেটা কি ভাল নয়?" কুসুম বলল, "না, ভাল নয়, কারণ এত বড় মিথ্যাচার বেশীদিন চলতে পারে না।" সুদীপ বলল, "হ্যাঁ ঠিক তাই, কারণ এদেশে বেইমান লোকের সংখ্যাই বেশী।" আসলে কি জান দিদি, আসলে এদেশে এমন একটা সময় আসবে যখন এই জমিজায়গা নিয়ে সর্ব্বত্রই বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, এমন কি, রক্তারক্তি কাণ্ড পর্য্যন্ত ঘটবে। এতদিন জমিদাররা লাঠিয়াল দিয়ে প্রজা ঠাণ্ডা করে এসেছে, এবার প্রজারাই লাঠি দিয়ে জমিদার ঠাণ্ডা করবে।"

কথায় কথায় বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে দেখে কুসুম উঠে পড়ল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুদীপের জন্য চা করে নিয়ে আবার এ-ঘরে এসে হাজির হয়ে সুদীপকে বলল, "নাও ওঠ, চা খেয়ে নাও।" সুদীপ হাসতে হাসতে উঠে বসল এবং বলল, "তুমি দেখছি আমাকে কলকাতার বাবু না করে ছাড়বে না। কিন্তু এও তোমায় বলে রাখছি দিদি, যতই আমায় কলকাতার বাবু করার চেষ্টা কর না কেন, আমার মাটি কেনা আছে খড়ি নদীর তীরে, সেখানেই ধূলোবালির মধ্যে আমার জন্ম, আর ধূলোবালির মধ্যেই আমি শেষ শয্যা নেব।" সুদীপের এ-কথায় কুসুম তাড়াতাড়ি তার ডান হাতের তালু দিয়ে সুদীপের মুখটা চেপে ধরে বলে উঠল, "ছিঃ ছিঃ ভাই, একথা বলতে নাই, কে জানে মানুষের জীবনপথ কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে বদলে যায়। একদিন তুমি হয়ত খুব বড় হবে, এই শহরেই প্রচুর বিত্ত ও ভূসম্পত্তির মালিক হবে।" সুদীপ বাধা দিয়ে বলল, "থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে, থামো তো তুমি।" এর পর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে সুদীপ ধীরে উচ্চারণ করে, "জান দিদি, স্বপ্ন দেখতে সবারই ভাল লাগে, কিন্তু স্বপ্ন যে বেশীর ভাগ সময়েই বাস্তবে ধরা দেয় না তা অন্ততঃ তোমার অজানা নয়।"

সুদীপের কথায় কুসুমের মধ্যে আচম্বিতে কেমন যেন একটা দৃঢ়তা ফিরে আসে, সেও দৃঢ়কণ্ঠে সুদীপকে বলল, "আমি যদি ঠিকঠিকই ভাই বলে ভালবেসে থাকি তবে আমি আজ আশীর্ব্বাদ করছি সুদীপ, তুমি জীবনে বড় হবেই এবং যে-কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে অর্থাৎ কলকাতায় তুমি ভূ-সম্পত্তির মালিক হবে তাও সার্থক হবে।" কথাগুলো কুসুম ধীরে-ধীরে এমনই দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করল যে, সুদীপ শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে নীরবে চেয়ে থাকল, তার যেন মনে হ'ল ঠিক এই মুহূর্ত্তে কুসুমের মুখ নয়, তার সামনে সে দেখছে কৈলাস হতে আবির্ভূতা দেবীর মুখ। ক্ষণকালের মধ্যেই সুদীপের সে-ভাবটা কেটে গিয়ে সে বাস্তবে ফিরে এল এবং কুসুমকে লক্ষ্য করে বলল, "তুমি আমায় স্নেহ কর জানি, আমার মঙ্গল চাও তাও জানি, কিন্তু এতটা আশা কি ভাল? আমি তো নিজেকে জানি, পাড়াগাঁয়ের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে আমি, আমার পরিবারের সকলে হু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, আর আমি করব কলকাতায় সম্পত্তি! ভাবতেও অবাক লাগছে এমন অসম্ভব আশা তোমার মনে স্থান পেল কি করে?"

কুসুম আগের মতই দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "হ্যাঁ, স্থান পেয়েছে, আর স্থান যেটা পেয়েছে সেটা অকারণে নয়, সেটার মধ্যে কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে।" সুদীপ হাসতে হাসতেই বলল, "হ্যাঁ কারণ অবশ্যই আছে, আর সে-কারণটা তোমার এই ছোট ভাইটির প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের প্রবণতা, তাছাড়া আর অন্য কোন কারণ

আছে কি?" সুদীপের কথায় কুসুম কিছুটা উত্তেজিত অথচ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে, আর সে কারণটা হ'ল তোমার কষ্টসহিষ্ণুতা, তোমার অধ্যবসায়, তোমার সততা, সর্ব্বোপরি তোমার সধৈর্য্য সংগ্রাম।" কুসুমের বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলা এই কথাগুলো শুনে সুদীপ হঠাৎ হাতদুটো জোড়া করে কুসুমের দিকে চেয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, "দিদি, তুমি চুপ কর, চুপ কর, ওভাবে আর আমাকে বাড়িও না, আমি বাঘাসনের সতীন্দ্র মাষ্টারের ছেলে আর সতীন্দ্র মাষ্টারের ছেলে হয়েই থাকতে চাই, তার বেশী কোন আশা নাই।" এ-সময় কুসুম সুদীপকে বাধা দিয়ে অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বলল, "জানি ভাগ্যচক্র মানুষকে প্রতিনিয়ত ঘোরায়, কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো মানুষের চলে না, মানুষকে আপন ভাগ্যের চাকাকে নিজের কাঁধে ঠেলে চালাতে হয়, তবেই সে চাকা চলে। আর তোমার ভাগ্যের চাকাকে ঘোরাবার মত কাঁধের জোর তোমার যথেষ্টই আছে; অন্য কেউ না জানুক, অন্ততঃ নন্দীবাবু আর আমি সে কথা জানি আর জানি বলেই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস—একদিন তুমি বড় হবেই।"

এতক্ষণ সুদীপ কুসুমের কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল, এবার সে কেমন যেন একটা আবেশবিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠে, "দিদি, তুমি নারী, আমার গুরুজন, যুগে-যুগে বাঙালী নারী তার স্নেহের বা ভালবাসার পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছে; তার জন্য মঙ্গল কামনা করে ঘরের চৌকাঠে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকেছে, আজও আঁকছে, আর ভবিষ্যতেও আঁকবে, কিন্তু তাই বলে তোমার আশীর্ব্বাদের ছায়াপথ ধরে মনের নিভৃত আকাশে অত উঁচু স্বপ্নের আল্পনা আঁকতে আমার সাহস হয় না। অমন করে তুমি আমায় স্বপ্ন দেখিও না। তোমার আশীর্ব্বাদের মূল্য যদি কোনদিন রাখতে না পারি তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না।"

কুসুম আবার বলল, "কি হবে না হবে সেটা বলবে ভবিষ্যত। সে-বিচার বা সে-ভাবনা করে সময় নষ্ট না করে নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে ঠেলে নিয়ে চল ভাই, দেখবে সাফল্য একদিন ধরা দেবেই।"

কুসুমের একথায় সুদীপ উঠে কুসুমের পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "দিদি, তোমার শুভেচ্ছা ও অনুপ্রেরণা আজ থেকে আমার জীবনের পাথেয় হ'ল। চেষ্টার ত্রুটি আমি রাখব না, তবে সাফল্য কতখানি ধরা দেবে তা জানি না।" সুদীপের এ-কথার পরে কুসুমের মুখচোখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল, সে সুদীপের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে আদর করে বলল, "তুমি যে গান শুনবে বলেছিলে?" গানের কথায় সুদীপ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ দেখেছ, কথায়-কথায় একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, শোনাও না দিদি, তোমার গান।"

সুদীপের কথায় কুসুম ঘরের এককোণে সযত্নে রক্ষিত তানপুরাটা টেনে নিয়ে এসে সুদীপের কাছে বসে গান ধরল, গানের ভাষা, ভাব ও স্বরবিক্ষেপ শুনে সুদীপ বুঝল, এ গানখানি হচ্ছে কার্ফা তালের প্রচলিত একখানি আধুনিক গান—

আমি চাঁদেরই ও-দেশ হতে এসেছি,
মেঘেরই ও-দেশ হতে এসেছি,
নবারুণ রঙ নিয়ে, রামধনু রঙ নিয়ে
খুশীর খেয়াতে যে ভেসেছি ॥

আমি পাহাড়ের চূড়া হতে এসেছি
ঝরণার তান নিয়ে এসেছি,
কুসুমের দেশ হতে ঘনবন দেশ হতে এসেছি।
খুশীর খেয়াতে যে ভেসেছি ॥

আমি বিহগের গান নিয়ে এসেছি,
আমি ভ্রমরের গান নিয়ে এসেছি।

আমি ফাগুনের ফাগ নিয়ে এসেছি,
সুখের স্বপ্ন নিয়ে এসেছি,
তোমাদের ভালবাসা যা চেয়েছি তারও বেশী পেয়েছি ॥
খুশীর খেয়াতে যে ভেসেছি
আমি খুশীর খেয়াতে আজ ভেসেছি।

কুসুম নিবিষ্টচিত্তে তানপুরায় অঙ্গুলী সঞ্চালন করে কণ্ঠের মাধুর্য্য ছড়িয়ে চলেছে আর সুদীপ বিস্ময়ে ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে ভাবছে—এ কুসুম নয়, এ যেন কোন বনতাপসী ঋষিকন্যা গৃহমধ্যে বন্দিনী হয়ে একমনে সুরের মায়াজাল বিস্তার করে চলেছে আর স্তব্ধ বিস্ময়ে ঘরের ইট-কাঠ-পাথর ও প্রতিটি আসবাবপত্র সেই সঙ্গীতসুধা পান করে চলেছে। সুদীপের মনে হয়, এখনই বুঝি ঘরের মধ্যে সব কিছু প্রাণ পেয়ে কথা বলতে শুরু করবে। সে ভাবতে লাগল, এই রকম সঙ্গীতের সুরের ধারায় উতলা হয়েই মানুষ ঘর ভুলে যায়, ভুলে যায় আপনজন; ভুলে যায় আপন কর্ত্তব্য। একি সুর! একি সঙ্গীত! না, অন্য কিছু! নিজের মনেই বার-বার প্রশ্ন করেও সুদীপ এর ঠিক উত্তর যে কি তা স্থির করতে পারে না। ক্রমশই সে সঙ্গীতের সুরমাধুরীতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, এ-রকম মধুর কণ্ঠের সুধা ঢেলে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে স্থাণুর মত বসিয়ে

রাখা যায়। সঙ্গীতের সুরের বিহ্বলতা কেন যে মানুষকে সব ভুলিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে সুদীপ এই মুহূর্ত্তে তা বেশ বুঝতে পারে আর সে এও বুঝতে পারে যে, সারা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী-ইতর-ভদ্রনির্ব্বিশেষে সবাই 'কুসুম বাঈ'-'কুসুম বাঈ' করে কেন পাগল। কুসুমের প্রথম গান শেষ হ'ল। এবার ধরল দ্বিতীয় গান—এ-গানখানি দাদরা তালের আর একখানি আধুনিক গান—

মনের দুয়ারে আঘাত করিয়া খুলিতে পারি নি আমি,
দ্বার না খুলিয়া অবহেলা দিয়ে আমায় ফিরালে তুমি।

অভিমান মাঝে ফিরে যেতে গিয়ে
হৃদয়সাগরতীরে
তব ঢেউ প্রিয় ভাবনার স্রোতে
লাগে যে গো ধীরে ধীরে।
তোমারই ভাবনা ভরে মোর দিবাযামী
তবু আমায় ফিরালে তুমি॥

জীবনের এই নদীতটে প্রিয়, আমার সকল খেলায়
তব নামখানি লিখেছিনু আমি সিক্ত বালুকাবেলায়।

বসেছিনু একা বনপথ চেয়ে
তব দর্শনকামী,
দিলে নাক দেখা চলি তাই একা
হে মোর জীবনস্বামী,
আমায় ফিরালে তুমি॥

দ্বিতীয় গান শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কুসুম তৃতীয় গান ধরতেই সুদীপ বুঝতে পারে এ গানখানি একখানি ভজন গান। গানের "তুঁহ বিনা কোই নেই মেরা, জীবনমে তুঁহি সাহারা," কথার সঙ্গে কুসুম যেন ঈশ্বরকে প্রাণমন ঢেলে দিতে চাইছে। অপূর্ব্ব এক ছন্দময় আত্মনিবেদন যেন গানের কথার সঙ্গে-সঙ্গে সুরের মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঝরে পড়েছে। অশ্রুত-পূর্ব্ব সুমধুর সুরেলা কণ্ঠের যাদু যেন সুদীপকে স্থানকাল ভুলিয়ে নূতন এক জগতে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে, যে-জগতে আছে এক পরম পবিত্র স্বর্গীয় পরিতৃপ্তি। এক সময় কুসুমের গান থামল এবং তানপুরাটা যথাস্থানে রেখে কুসুম এসে সুদীপকে প্রশ্ন করল, 'কি ভাই, ভাল লেগেছে তো?' সুদীপ তখনও ছিল দূরমনস্ক,

সুরের জালে আবদ্ধ সে তখনও সুরের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তাই প্রথমটায় কুসুমের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু কুসুম যখন দ্বিতীয় বার তার হাতটা ধরে নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করল, "বলছ না যে? গান ভাল লাগে নি?" তখন সুদীপ ধীরে-ধীরে কুসুমের চরণ স্পর্শ করে হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "সত্যিই অপূর্ব্ব, না শুনলে বিশ্বাস হয় না যে, কোন মানবীর কণ্ঠ দিয়ে এমন অমৃতধারা গড়িয়ে পড়তে পারে।" সুদীপের কথায় কুসুম ঈষৎ হেসে বলল, "দিদির কথায় তোমার একটু বাড়াবাড়ি, এমন কিছু ভাল আমি গাই না।" এ-কথার জবাবে সুদীপ বলল, "গাছে সুগন্ধি গোলাপ ফুটে থাকে, কিন্তু গোলাপ কি জানে যে, তার সুরভি কতখানি মনোমুগ্ধকর, কতখানি পরিতৃপ্তি-প্রদায়ক? গোলাপ জানে না, কিন্তু গোলাপকে যে বিকশিত হতে দেখে, যে তার সুরভি আঘ্রাণ করে সে বোঝে গোলাপের রঙের আর তার সুরভির কতখানি মূল্য।"

সুদীপের এ-কথায় কুসুম নীরব হয়ে গেল এবং প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে নন্দী কোম্পানীর নূতন খাতার খবর জানতে চাইল। আচম্বিতে কুসুমের এই প্রশ্নে সুদীপ কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও ধীরে-ধীরে তাকে সব বলল এবং এও বলল যে, আগামীকাল থেকে সে আর নন্দী কোম্পানীতে যাবে না। সুদীপের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে কুসুম কিছুটা হতাশ হলেও বিস্ময়ান্বিতা হ'ল না, কারণ কুসুম জানে ভূপেন্দ্রবাবুর এ-ধরণের অপমানজনক কথার পর সুদীপ কিছুতেই আর নন্দী কোম্পানীতে ঢুকবে না অথচ সুদীপ নন্দী কোম্পানী ছেড়ে গেলে উপেন্দ্রবাবুর খুবই অসুবিধা হবে। কারণ এই সুদীপকে ভরসা করেই উপেন্দ্র-বাবু দিন-দিন কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করছিলেন। সুদীপ চলে গেলে উপেন্দ্রবাবু যে খুবই অসুবিধায় পড়বেন সে-কথা ভেবে কুসুম কিছুটা হতাশ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু তার মনের ভাব বাইরে প্রকাশ না করে এর পর সুদীপ কি করবে সে-কথা জানতে চাইলে সুদীপ বলল, "ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আর একটা দোকান ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সএর মালিক বল্লভবাবু অনেক দিন ধরে ডাকাডাকি করছেন, তাঁরই সঙ্গে আগামীকাল দেখা করে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করব।" কথায়-কথায় বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দেখে সুদীপ উঠতে চাইল আর কুসুমও তার এ-ইচ্ছায় প্রতিবাদ করল না। তার সঙ্গে-সঙ্গে সিঁড়ির ধার পর্য্যন্ত এসে তাকে এগিয়ে দিয়ে গেল এবং সেখানে দাঁড়িয়েই সুদীপ আবার কবে আসবে সে-কথা জানতে চাইল। কুসুমের কথায় একটু নীরব ব্যথা ঝরে পড়ল বুঝে তার প্রশ্নের উত্তরে ফিরে দাঁড়িয়ে সুদীপ খুব স্পষ্ট করে কুসুমকে বলল, "নন্দী

কোম্পানী ছাড়লেও তোমাকে ছাড়তে পারব না, সুতরাং তোমার ভয় নেই। মাঝে-মাঝে এসে তোমার এই ভাইটি তোমায় বিরক্ত করবে। দেখো তখন যেন আবার তাড়িয়ে দিও না।" সুদীপের এ-কথায় কুসুম ঈষৎ কোপান্বিত-কণ্ঠে বলল, "আঃ তুমি যে কি? তাড়িয়ে দিলেই হ'ল, এটা না তোমার দিদির সংসার?" কুসুমের এ-কথায় সুদীপ ও কুসুম দুজনেই হেসে ফেলল। এর পর খুশিমনে সুদীপ তড়তড় করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে মেসের দিকে যাত্রা করল।

মেসে ফিরে সুদীপ দেখল মেস ফাঁকা, হীরেনদা বা অন্য কেউ নেই। ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের ঘরের চাবি নিয়ে জামাকাপড় বদল করে একটা কেরোসিন লণ্ঠন জেলে সুদীপ 'সঞ্চয়িতা' নিয়ে বসল। বার-বার পড়ে-পড়ে কবিতাগুলো প্রায় মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল, তাই বইটা সামনে খোলা থাকলেও বেশীর ভাগ কবিতাই সে চোখ বন্ধ করে আপন মনে আবৃত্তি করে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কখন যে চুপিচুপি হীরেনদা তার ঘরে এসে ঢুকেছে সুদীপ তা টের পায় নি; টের পেল তখন যখন হীরেনের কণ্ঠনিঃসৃত "বাঃ সুন্দর! তুই এত ভাল আবৃত্তি করিস সুদীপ! কোনদিন তো বলিস নি!" কথাগুলি শুনল। হীরেনের কথায় সুদীপের যেন ধ্যানভঙ্গ হ'ল। সে সঞ্চয়িতা রেখে কাজের কথা পাড়ল এবং গতকাল অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ নন্দী কোম্পানীতে যা-যা হয়েছে অর্থাৎ কাঁটাতার-বেলচা চুরি যাওয়ার ঘটনা উপলক্ষ্য করে হরিপদর কীর্ত্তিকলাপ এবং ভূপেন্দ্রবাবুর তার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর উদ্দেশে অহেতুক অপমানজনক কথাবার্ত্তা সব কিছু খুঁটিয়ে বলল। অবশেষে নন্দী কোম্পানীর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ইণ্ডিয়া ট্রেডার্স-এ যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা জানানোতে হীরেন ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কিছুটা নীরব থেকে তার সিদ্ধান্তকে সমর্থনই করল। তাতে সুদীপ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার মন এক অনাগত গ্লানির সম্ভাব্য ক্লেশ হতে নিষ্কৃতি পেল।

পরদিন অর্থাৎ তেসরা বৈশাখ বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ সুদীপ ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সের মালিক বল্লভ ঘোষের নিকট গিয়ে উপস্থিত হতেই তিনি সুদীপকে সাদরে গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি নিজেই ইতিপূর্ব্বে নন্দী কোম্পানী হতে ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে নিয়ে আসবার জন্য বিভিন্ন লোক মারফৎ সুদীপকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কারণ যোগ্য লোক চিনে নিতে এবং তার উপযুক্ত মূল্য দিতে তাঁর কোনদিন ভুল হয় না। সুদীপ যখন আজ নিজে থেকেই তাঁর কাছে এসে নমস্কার করে সব কথা খুলে বলল এবং তাঁর কোম্পানীতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন বল্লভবাবু বাইরে মালিকোচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখলেও অন্তরে-অন্তরে খুশী হলেন,

কারণ তিনি জানতেন সুদীপ তাঁর কোম্পানীতে যোগ দিলে তাঁর কোম্পানীর কাজ-কর্ম্ম অনেক বেড়ে যাবে। আর এটাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না যে, সুদীপ মাত্র কয়েক বছরেই আপন কর্ম্মদক্ষতা ও মধুর ব্যবহারের গুণে এই বাজারের তার-জাল ব্যবসায়ের একজন সুদক্ষ সেলসম্যান হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সুদীপের প্রস্তাবে রাজী হয়ে বল্লভবাবু তাকে একেবারে সেলস-ম্যানেজার হিসাবে নিয়োজিত করলেন এবং তার বেতন প্রথমেই মাসিক ষাট টাকা নির্দ্ধারিত করলেন। ঠিক এতখানি সুদীপও আশা করে নি, কারণ নন্দী কোম্পানীতে সে কাজ করছিল মাত্র পনর টাকা বেতনে আর এখানে ষাট টাকা অর্থাৎ একেবারে চতুর্গুণ। সুদীপের কাছে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। তাই সে কাজের কথার শেষে বেশ প্রফুল্লচিত্তেই মেসে ফিরল এবং হীরেনকে সব খুলে বলল। হীরেনও সুদীপের এই পদোন্নতির কথা শুনে যারপরনাই আনন্দিত হ'ল।

পরদিন সকালে যথাসময়ে ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে গিয়ে সুদীপ কাজে যোগ দিল। দোকানে প্রবেশ করে সুদীপ দেখল সুপ্রশস্ত দোকানঘরটি বেশ সাজানো-গোছানো। দোকানের দুপাশের দেওয়ালের গায়ে কাঁচের পাল্লা দেওয়া শো-কেসে বিভিন্ন ধরণের দেশী-বিদেশী লোহা, তামা, পিতল, স্টেন্‌লেস্‌ষ্টীল জালের নমুনা ; তামা-পিতল-ব্রোঞ্জ-দস্তার পারফোরেটেড সীটের নমুনা। বিভিন্ন রকমের ধাতুর গোল, চৌকোণ, ষড়-কোণ পিতল-তামার রড, টিউব ইত্যাদির নমুনায় শো-কেশগুলি ভর্ত্তি। কিছু-কিছু জালের বাণ্ডিল, তারের বাণ্ডিল, বিভিন্ন ধরণের ভাল্‌ভ ও অন্যান্য মেসিন-পার্টস্‌ও দোকানে সাজানো। চতুর্দিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সুদীপ গিয়ে বল্লভবাবুর সামনে দাঁড়াতেই তিনি সামনে একখানা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে নির্দ্দেশ দিয়ে বললেন, "তোমার জন্য এই চেয়ার-টেবিলটা আনিয়েছি, এখানে বসেই তুমি সেলস্‌টা কণ্ট্রোল করবে। আর তোমাকে সহায়তা করবে বলরাম।" বলরাম বলে বল্লভবাবু যার দিকে ইঙ্গিত করলেন সুদীপের সঙ্গে আগে থেকেই তার মৌখিক আলাপ ছিল। আর সে-আলাপটা এক দোকানের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আর এক দোকানের কর্ম্মচারীর যেমন আলাপ থাকে ঠিক সেই রকম। আজ এই চেয়ারে বসার পর থেকে কিন্তু বলরাম সুদীপের সহকারী অর্থাৎ অধস্তন কর্ম্মচারী হয়ে গেল। সামগ্রিক পরিস্থিতিটার কথা চিন্তা করে সুদীপ উঠে গিয়ে বলরামের হাতটা ধরে বেশ উষ্ণভাবে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে তার কানে কানে চুপিচুপি বলল, "আমরা যেমন বন্ধু ছিলাম এর পরও কিন্তু ঠিক তেমনিই থাকতে চাই।" বলরামও ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে অনেক দিনের কর্ম্মচারী। তাই তাকে অতিক্রম করে সুদীপকে একেবারে সেলস্‌-ম্যানেজারের চেয়ার দেওয়ায় সে মনে-মনে

ক্ষুব্ধ হলেও সে-ভাব চেপে রেখে সেও সুদীপের হাতে হাত মিলিয়ে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই !" এর পর বলরাম নিজের কাজে চলে গেল এবং সুদীপ চেয়ারে বসে সব মালের প্রাইস-লিষ্ট, ক্যাটালগ ইত্যাদি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

সুদীপ যখন কাগজপত্রে চোখ বুলোচ্ছে তখন একজন বেয়ারা এসে কিছু বিল, চালান, রেলওয়ে রসিদ ইত্যাদি বল্লভবাবুর টেবিলে রাখতে গেলে তিনি সুদীপের টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। বেয়ারা কাগজপত্র সব সুদীপের কাছে রেখে চলে গেলে সুদীপ সেগুলো নিয়ে চেকিংএ মন দিল। বিল নম্বর-টম্বরগুলো দেখে নিয়ে চালানের মালের সঙ্গে বিলের মালের বিবরণ মেলাতে গিয়ে দেখল—চালানে লেখা ফ্রগ এণ্ড ফ্লাই ব্র্যাণ্ড একশ পঞ্চাশ মেস স্টেনলেশ ষ্টীল আর বিলে লেখা শুধু ফ্লাই ব্র্যাণ্ড একশ পঞ্চাশ মেস জাল। বিল ও চালানের এই অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে সুদীপ প্রাইস-লিষ্টটা পুনরায় উল্টে দাম দেখল ফ্রগ এণ্ড ফ্লাই হ'ল জার্ম্মান মাল, তার দাম সাত টাকা স্কোয়ার ফুট আর ফ্লাই ব্র্যাণ্ড মাল হ'ল ফ্রান্সের মাল যার দাম হ'ল তিন টাকা স্কোয়ার ফুট। ব্যাপারটা দেখে সুদীপের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। সে কাউকে কিছু না বলে বেয়ারাকে ডেকে আগের বছরের সমস্ত বিল ও চালানের কপি চেয়ে পাঠাল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব কাগজ ও খাতাপত্র তার টেবিলে এসে জমা পড়ল। তখন সুদীপ প্রত্যেকটি চালান ধরে ধরে বিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে মোট আঠাশখানা বিলে গরমিল খুঁজে বের করল যেগুলোর মধ্যে চালানের মালের বিবরণের সঙ্গে বিলের নির্দ্ধারিত দামের কোন মিল নেই। প্রত্যেকটি বিলেই চালান অনুযায়ী যা দাম হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম দাম। সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি আর একবার খুঁটিয়ে দেখছে সুদীপ, এমন সময় বেয়ারা ভরত এসে চেক-করতে-দেওয়া বিলটা চেয়ে বলল, "বড়বাবু বিলটা চাইছেন।" সুদীপ তাকে প্রশ্ন করল, "বড়বাবু কে?" কারণ তার ধারণা ছিল বড়বাবু তো তার পাশেই বসে রয়েছেন, কিন্তু বেয়ারার মুখে যখন শুনল কর্ত্তাবাবুর বড় ছেলে রণধীরই বড়বাবু তখন একবার মুহূর্ত্তের জন্য কি ভেবে নিয়ে বেয়ারাকে ফেরৎ পাঠিয়ে সুদীপ এবার কর্ত্তাবাবু অর্থাৎ বল্লভবাবুর টেবিলে খাতাপত্রগুলো নিয়ে গিয়ে হাজির হ'ল এবং প্রথমেই প্রশ্ন করে জানতে চাইল এই বিলগুলো কে চেক করে এবং কে তৈরী করে আর কোথায় বিল-চালান চেকিং বা টাইপ করা হয়।

নূতন লোক সুদীপের মুখ থেকে আজ প্রথম দিন এতগুলো প্রশ্ন এক সঙ্গে শুনে বল্লভবাবু প্রথমটা একটু বিরক্তি বোধ করলেও আপন অভিজ্ঞতালব্ধ ধৈর্য্যের গুণে প্রায় নিরাসক্ত কণ্ঠে উল্টে তাকেই প্রশ্ন করলেন, "কেন বলতো ? ব্যাপারটা কি ?" বল্লভবাবুর এই প্রশ্নে সুদীপ বিল-চালানের মধ্যে হিসাবের গরমিলের কথা জানাবার সুযোগ পেয়ে তাঁকে রেকর্ড থেকে সব দেখিয়ে দিল এবং এও বুঝিয়ে দিল যে, খরিদ্দারকে বিলে কম দাম লাগিয়ে নিশ্চয়ই তাদের ঘরে গিয়ে এই কোম্পানীরই কেউ কমিশনের পয়সা নিয়ে আসছে। সুদীপের কথাগুলো প্রথমটা বল্লভবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না, তাই এবার বেশ কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, "কি যা-তা বকছ !" বল্লভবাবুর একথায় সুদীপের যেন জিদ চেপে গেল, কারণ অতি সম্প্রতি তার একটা চুরি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু সে-চুরিটা ছিল নেহাৎই নিম্নস্তরের চুরি এবং সোজাসুজি চুরি আর এই চুরিটা বেশ উচ্চস্তরের চুরি এবং বিজ্ঞজনোচিত চুরি। তার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্য সুদীপ বল্লভবাবুকে বলল, "যিনি এই বিলগুলো করেছেন তাঁকে একবার ডাকুন।" বল্লভ-বাবু এবার বেশ স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, "কেন তাঁকে ডাকতে হবে ? আচ্ছা ঠিক আছে ; ভরত, বড়বাবুকে একবার ডেকে দাও তো উপরের অফিস থেকে !" বল্লভবাবুর কথার ধরণে সুদীপ বুঝতে পারে তিনি বেশ চটেছেন এবং আরও বোঝে যে, বিলের দায়িত্বটা তাঁরই বড়ছেলে রণধীরের হাতে ছেড়ে দেওয়া আছে। বড়-বাবুর কথা শুনে সুদীপ নিজেও একটু গোলমালে পড়ে যায়, সে মনে মনে ভাবতে থাকে, এও কি সম্ভব ? নিজেরই কোম্পানী থেকে নিজে টাকা সরাচ্ছে। সুদীপ যখন এই চিন্তায় মগ্ন, ওদিকে বল্লভবাবুর ডাক পেয়ে রণধীর তখন এসে তাঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছে। রণধীর আসতেই বল্লভবাবু অন্যান্য কর্ম্মচারীদের দোকানের বাইরে যেতে নির্দেশ দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে সুদীপকে বললেন, "ওকে বল তোমার কি বলার আছে।" সুদীপ একবার কিন্তু-কিন্তু করে রণধীরের দিকে চেয়ে আজকের বিলটা হাতে নিয়ে চালান আর বিলের গরমিল দেখিয়ে প্রশ্ন করতেই রণধীরের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সুদীপ বেশ লক্ষ্য করে এবং বল্লভবাবুরও দৃষ্টি এড়ায় না। সুদীপের কথা শুনে রণধীর একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে যে, নতুন লোক, সে তখন তার বাবাকে প্রশ্ন করল, "ইনি কে ?" বল্লভ বাবু বললেন, "উনি আজ থেকে আমাদের কোম্পানীতে সেলস-ম্যানেজারের পদে যোগ দিয়েছেন, আমিই নিয়োগ করেছি, ওঁর নাম সুদীপ দত্ত।" একথা শুনে রণধীর তখন ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে বক্র কথায় সুদীপকে অপমান করতে শুরু করল, "একজন মালিককে কি একজন সামান্য কর্ম্মচারীর কাছে কৈফিয়ৎ

দিতে হবে নাকি ?” বল্লভবাবু অভিজ্ঞ লোক, চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে বিভিন্ন ধরণের চুরি বা জুয়াচুরি, অসততা, অসংলগ্নতার কথা শুনেছেন এবং স্বচক্ষেও কিছু কিছু দেখেছেন, তাই আপন সন্তান হলেও রণধীরের এই বক্রোক্তিতে তিনি আরও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন এবং যে-জিনিষটা কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অর্থাৎ তাঁর নিজের ছেলেই তাঁর কোম্পানীর টাকা তছরূপ করছে সেই জিনিষটা জানবার জন্য রণধীরের দিকে বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি প্রশ্ন করলেন, “কৈফিয়ৎটা আমি চাইছি, উনি নন, আর তোমার উত্তরের সত্য-মিথ্যার উপর তোমার ভবিষ্যত নির্ভর করছে। নির্ভর করছে তুমি ব্যবসার পার্টনার থাকতে পাবে কিনা এবং বাড়ীতেও তোমার স্থান হবে কিনা। খুব ভাল করে সব দিক বিচার করে চিন্তা করে তবে জবাব দেবে। আর এই মুহূর্ত্তেই সেই জবাবটা চাই। আরও মনে রেখো তুমি মিথ্যা বললেও এই বিলটা যাঁদের তাঁদের অর্থাৎ খান সুগার ইণ্ডাষ্ট্রীজের মালিক আসগর খান সাহেবের কাছে আমি গিয়ে সব জেনে আসব এবং তারপর তোমার ব্যবস্থা করব। বল্লভবাবুর এ-ধরণের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুদীপ পরিচিত না হলেও রণধীর অত্যন্ত পরিচিত, তাই বাবার এই সব কথায় এবং সবশেষে খান সাহেবের নামের উল্লেখে রণধীর আর নিজেকে সামলাতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে বল্লভবাবুর পাদুটো জড়িয়ে ধরে অবলীলা-ক্রমে সব স্বীকার করল এবং হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে সুদীপের পাদুটোও জড়িয়ে ধরতে আসে দেখে সুদীপের অত্যন্ত মায়া হ'ল, ভাল করে চেয়ে সুদীপ দেখল রণধীর বয়সে ছোকরা, তার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে, কিন্তু তবু সে একজন মালিক, তাই তাড়াতাড়ি একটু সরে গিয়ে রণধীরের হাতদুটো ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে বলল, “ছিঃ ছিঃ, একি করছেন, উঠুন উঠুন ভুলত্রুটি সবারই হয়, আর আপনি তো অন্যায় করেছেন আপনার বাবার কাছে, তাঁর কাছে মাফ চেয়ে নিন, তাহলেই হবে। সুদীপের এ-কথায় রণধীর আর একবার বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল এবং মুখ গম্ভীর করে সজল নয়নে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লভবাবু বললেন, “শুধু একটা বিলেই নয়, গত এক বছরের কমপক্ষে আঠাশখানা বিলে এই একই ব্যাপার ঘটেছে এবং তাতে যোল হাজার টাকার মত হিসাবের গোলমাল হয়েছে। এত টাকা তুমি কি করলে ? তোমাকে মাসে দেড়শত টাকা করে হাত-খরচ দেওয়া হচ্ছে, তবু এ ধরণের কাজ তুমি করতে গেলে কেন ? বল টাকা কোথায় রেখেছ, কি করেছ।” বল্লভবাবুর রুদ্র-রোষের পরিণাম যে কোথায় যেতে পারে রণধীরের তা ভাল করেই জানা। তাই সে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলে, সব টাকাই

ব্যাঙ্কে আছে, আমি আগামী কালই তুলে এনে আপনাকে ফেরৎ দেব!" এর পর বল্লভবাবু আরও রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করেন, "কতদিন থেকে এসব হচ্ছে? আর কি-কি করেছ? দোকানের সব মাল পারচেজের বিলও তো তোমারই হাতে, সেখানে কেনার মুখে দাম বাড়িয়ে নিয়ে সাপ্লায়ারদের কাছেও কমিশন নিচ্ছ না তো?" বল্লভবাবুর এ-প্রশ্নের তীব্রতায় রণধীর আর একবার অস্থির হয়ে পড়ে এবং স্বীকার করে যে, সেক্ষেত্রেও কমিশন নিচ্ছে। রণধীরের স্বীকারোক্তি শুনে বল্লভবাবু গর্জ্জে ওঠেন, "এইবার এতদিনে বুঝলাম এত কাজ করে সারা বছর ধরে এত লেনদেন করেও আমার ব্যাঙ্কে টাকা জমে না কেন। কেনা-বেচা দুই মুখেই কমিশন খাচ্ছ! খাসা, কিন্তু এত বুদ্ধি তুমি পেলে কোথা থেকে? বাবার কোম্পানী থেকেই কমিশন! এ-যে আমার ভাবতেও অবাক লাগছে। ছিঃ ছিঃ, লোকের কাছে আমার ছেলে বলে এর পর তুমি মুখ দেখাবে কি করে! শোন, আগামী কাল বিকেল তিনটার মধ্যে গত তিন বছরে অর্থাৎ যে তিন বছর তুমি ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে বেরুচ্ছ সেই তিন বছরে হিসাবে যত গোলমাল করেছ এবং যত টাকা চুরি করেছ সমস্ত খুঁটিনাটি হিসাব তুলে আমার হাতে দেবে এবং ঐ খাতে নেওয়া যত টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছ তার সবটা এনে আমার হাতে দেবে আর যা খরচ করে ফেলেছ তার সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করবে। খরচ-করা টাকাটা তোমার মাসিক স্টাইপেণ্ডের দরুণ দেয় টাকা থেকে মাসে-মাসে একশত টাকা করে য়্যাডজাষ্ট করা হবে। যাও, সব খাতাপত্র নিয়ে গিয়ে এখন হিসাব তোল।"

বল্লভবাবুর এ-সব কথাবার্ত্তা ও সন্তানের প্রতি শাসনের নির্দ্দয়তা লক্ষ্য করে সুদীপ মনে-মনে ভাবছিল, "সত্যিই পুরুষের মত পুরুষ, যেমন গম্ভীর তেমনিই ন্যায় বিচারের ধারা, যে-বিচারবোধের কাছে আপন সন্তানেরও মার্জ্জনা নেই। সমস্ত ব্যাপারটার জন্য যেহেতু সে নিজেই দায়ী, সেজন্য সুদীপের একটু খারাপ লাগল। রণধীর খাতাপত্র গুছিয়ে নেবার পর সুদীপ তাঁর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বল্লভবাবুর এতক্ষণে বাস্তব অবস্থাটার কথা খেয়াল হ'ল। তিনি চেয়ার ছেড়ে ধীরে-ধীরে উঠে এসে সুদীপের কাঁধে নিজের ডান হাতটা রেখে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি সত্যিই যোগ্য ব্যক্তি, তোমার বেতন ষাট নয়, তোমার বেতন আমার বড় ছেলের স্টাইপেণ্ডের সমানই হবে অর্থাৎ তুমি মাসে দেড়শত টাকাই পাবে।" বল্লভবাবুর এ-কথায় সুদীপ হাঁ-হাঁ করে উঠল এবং বলল "না, না, ষাটই যথেষ্ট, আপনি আমার বেতন নিয়ে চিন্তা করবেন না, শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার পাশে থেকে আমি যেন কাজ শিখতে পারি।" সুদীপের কথায় বল্লভবাবু তার পিঠে স্নেহসূচক দু' একটি মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন,

"বছরে হাজার-হাজার টাকা আমার কোম্পানী হতে বেরিয়ে যাচ্ছিল তুমি এসে প্রথম দিনটিতেই সব ধরে ফেললে, আর এই সামান্য কটা টাকা বেতন যদি তোমায় বেশী না দিতে পারি তাহলে কি যোগ্য লোকের মান দেওয়া হয়? বল তুমিই বল। শুধু স্নেহ-ভালবাসা-প্রীতি আর মিষ্টি ব্যবহারেই কি মানুষের পেট ভরে? এই পোড়া পেটটা ভরাবার জন্য তো অর্থেরও প্রয়োজন রয়েছে সুদীপ। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তুমি আমার সন্তান তুল্য। আমার এই অনুরোধটুকু তুমি রাখ, আর কিন্তু করো না। এটুকু তোমার জন্য না করতে পারলে আমি নিজেই শান্তি পাব না।"

বল্লভবাবুর এ-কথার পর কোন অসম্মতি প্রকাশ করা অসমীচীন হবে বিবেচনা করে আর কোন কথা না বাড়িয়ে সুদীপ ফিরে এসে নিজের টেবিলে বসে হাতের বাকী কাজগুলো সেরে ফেলল এবং বেলা প্রায় পাঁচটা নাগাদ বল্লভবাবুর কাছ থেকে গোডাউন ও অফিসের সন্ধান জেনে নিয়ে জায়গাগুলো দেখবার জন্য দোকান থেকে বের হল। অফিসটা দোকানের ঠিক উল্টোদিকের ফুটপাথে আটান্ন নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের তিনতলায় আর গোডাউন উননব্বই নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ভিতরের দিকে সিগরেট গলির মধ্যে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে এসে সুদীপ দেখল ইতিমধ্যেই দোকান পরিষ্কার করে ধূনোগঙ্গাজল দেওয়া হয়ে গেছে, অন্যান্য কর্ম্মচারী সবাই চলে গেছে; বসে আছেন কেবল বল্লভবাবু। রতন নামে একটি বেয়ারা দোকান বন্ধ করে চাবিটা বাবুর হাতে তুলে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে বসে। সুদীপ দোকানে ঢুকতেই বল্লভবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন, "কেমন দেখলে?" সুদীপ ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "সবই ভাল, কিন্তু বড্ড এলোমেলো।" বল্লভবাবু বললেন, "ভাল অথচ এলোমেলো, তোমার কথাটা ঠিক বুঝলাম না, একটু পরিষ্কার করে বল।" উত্তরে সুদীপ বলল, "অমন সুন্দর অফিস, বিরাট জায়গা, কিন্তু ফাইলপত্র কাগজপত্র সব ছড়ানো-ছিটানো এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে, গোটা-দুই আলমারী আর ফাইলিং র‍্যাক কিনলে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে সব কিছু রাখা যায়। গোডাউনেও ঠিক একই অবস্থা। এত রকমের মাল, কিন্তু চট্ করে কোনটা খুঁজে পাবার উপায় নেই, কারণ কোন মালটাই ঠিকমত সাজানো নেই, একটার গায়ে একটা উল্টে পড়ে আছে, কোন-কোনটা আবার ভারী মালের চাপ পেয়ে নষ্ট হচ্ছে। আসলে দেখে মনে হল, যারা কাজ করে অফিসে বা গোডাউনে তাদের কারোই কোন জিনিষটার উপর দরদ নেই। সব কাজই যেন না হলে নয় এ-ধরনের হচ্ছে।" সুদীপের মুখে সব শুনে বল্লভবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমার বয়স হয়েছে, নিজে আর সব দিক দেখতে পারি না, আর বড় ছেলে রণধীর, যার উপর ভরসা করে দায়িত্ব দেব

বলে দোকানে এনে বসালাম সে নিজে কি রকম হচ্ছে তা তুমি স্বচক্ষেই দেখলে। এ কাজগুলোরও দায়িত্ব তুমি নাও এই আমার ইচ্ছা। তোমাকে সঙ্গে করে আগামীকাল সকালের দিকে অফিস ও গোডাউন আমি নিজে দেখতে যাব।"

একথায় সুদীপ খুশী হয়ে বলল, "অফিস ও গোডাউন আমি সুন্দর করে সাজিয়ে মালের স্টক ধরে প্রত্যেকটি মালের গায়ে মাপ অনুযায়ী টিকিট লাগিয়ে সব গুছিয়ে দেব, আপনি শুধু যারা অফিসে বা গোডাউনে কাজ করে তাদের বলবেন, সিস্টেমটা যেন ফলো করে।"

সুদীপের কথায় বল্লভবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তাই হবে, নাও চল, ওঠা যাক এখন।" এর পর বল্লভবাবু ও সুদীপ দোকান ছেড়ে বাইরে এলে রতন দোকানের দরজা বন্ধ করে বল্লভবাবুর হাতে চাবি দিল। বল্লভবাবুর বাড়ী বালীগঞ্জে, তাই সুদীপ তাঁকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে নিজে মেসের দিকে রওনা হ'ল। মেসে ফিরে সুদীপ দেখল সতীন্দ্রবাবুও বাঘাসন হতে এসে গেছেন। বাবার মুখটা গম্ভীর দেখে সুদীপ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই সতীন্দ্রবাবু বললেন, "এই যে সুদীপ এসে গেছ দেখছি।" সুদীপ বাবার কথা শেষ হতে না হতেই প্রায় অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে বসল, "বাবা, জমি রেজিস্ট্রী হয়েছে তো?" জমির কথায় সতীন্দ্রবাবুর মুখটা সাময়িক প্রফুল্ল হলেও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ম্লান হয়ে গেল। তিনি বললেন, জমিটা হয়েছে, কিন্তু প্রায় ডবল দামে। নিতান্ত জেদের বশে পড়েই সাড়ে ছয়'শ টাকায় জমিটা কিনতে হ'ল।" সুদীপ প্রশ্ন করল, "কি করে এমন হ'ল?" সতীন্দ্রবাবু বললেন, "বাড়ী গিয়েই শুনলাম, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে শুনে নিতাই আগে থেকেই ছয় শ' টাকা দাম দিয়ে রেখেছে।" সুদীপ চমকে উঠে বলল, "নিতাইদা? শেষকালে আমাদের নিতাইদাই শত্রুতা করল?" সতীন্দ্রবাবু বললেন, "হ্যাঁ নিতাইয়ের বড় ছেলে গদাধর গিরিডি থেকে নাকি অনেক টাকা নিয়ে এসেছে, এসে গ্রামের যেখানে যার যা বিক্রী হচ্ছে সবেতেই দাম দিচ্ছে। সেই-ই ঐ জমিটার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। সব শুনে কেঁয়েদের ছোট কর্তার কাছে যেতেই তিনি বললেন, 'কি করি সতীন্দ্রবাবু, আপনার মামা তো আমাদের এষ্টেটের উকিল আছেন, তাই তাঁর মুখ এড়াতে পারছি না, তবে কিছু বেশী টাকা যদি আপনি দেন তাহলে জমিটা আপনাকে দিতে পারি।" এর পর সব দিক ভেবে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশী দাম দিয়ে বাধ্য হয়েই জমিটা নিলাম, কারণ ভেবে দেখলাম হাঁয়দার বাকুরীর মত জমি তো আর বাঘাসনের মাঠে বার-বার পাওয়া যাবে না, তাই।" এতক্ষণ সুদীপ চুপ করে সব শুনছিল। এবার সে ধীরে-ধীরে বলল, "কার কাছে টাকা ধার নিলে?" সতীন্দ্রবাবু বললেন, "আমার বন্ধু বাবুনপুরের মণ্ডলদের মেজ

কর্তা জ্ঞান মণ্ডল মশাইয়ের কাছ থেকে। বলেছি সামনের দুর্গাপূজোর মধ্যে টাকাটা দিয়ে দেব।" বাবার এ-কথায় সুদীপ আবার প্রশ্ন করল, "কত করে সুদ লাগবে? সুদীপের এ-কথায় সতীন্দ্রবাবু চমকে সুদীপের মুখপানে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, "সুদ লাগবে না, টাকাটা এককালীন শোধ দিয়ে দিলেই হবে।" বাবার এ কথায় সুদীপ সত্যিই অবাক না হয়ে পারল না, টাকা ধার নিয়ে সুদ দিতে হবে না একথা সে ভাবতেই পারে না, কারণ সেই শিশুকাল থেকে জীবনটাকে দেখে-দেখে ঠেকে-ঠেকে এত শিখেছে যে, সুদ দিতে হবে না শুনে সত্যিই সে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হয়। মনে-মনে সে আরও ভেবে নেয় যে, আড়াই শ' টাকা ধারের মধ্যে ঘরে এক শত আরও মজুদ আছে, আর তার এ মাসের বেতনের টাকার সবটা অর্থাৎ দেড় শ' টাকা দিয়ে আগে জ্ঞানবাবুর টাকাটা শোধ করতে হবে। তা না হলে তাঁর মত মানুষের শুভেচ্ছার অপব্যবহার করা হবে, তাই সে বাবাকে বলল, তুমি এই মাসের শেষে গিয়ে ওনার টাকাটা দিয়ে এসো।" সতীন্দ্রবাবু বললেন, "ঘরে তো সবটা নেই, এ মাসে কি করে হবে?" সুদীপ বলল, "মাসের শেষে আমি তোমায় দেড় শ' টাকা দেবো, তুমি চিন্তা করো না।" সতীন্দ্রবাবু বললেন, তোমার বেতনের সব টাকা দিলেও তো মাত্র পনর টাকা, তাহলে সবে এক শ' পনর টাকা হচ্ছে, কিন্তু শোধ দিতে হবে মোট আড়াই শত টাকা, সুতরাং এ-মাসেই কি করে সম্ভব?" সুদীপ বাবার কাছে তার নূতন চাকরীর কথা সবটা ভাঙ্গল না, শুধু বলল, "ও তুমি ভেবো না, ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে।"

সুদীপের এ-কথায় সতীন্দ্রবাবু শুধু একটু শুষ্ক হাসি হাসলেন, কারণ তিনি ভালই জানতেন যে, সুদীপের ও তাঁর এ-মাসের বেতনের পুরো টাকাটা দিলেও আড়াই শ' টাকা হওয়া সম্ভব নয়, তাই এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলেন। কিন্তু আপাততঃ চুপ করে গেলেও তাঁর মনের মধ্যে একটা খট্‌কা থেকে গেল।

ওদিকে সুদীপ আসার পর ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সের সেল হু-হু করে বেড়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে সুদীপ অফিস, দোকান, গোডাউন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে গোডাউনের মালের স্টক-বই তৈরী করে দিয়েছে এবং সে স্টক-বুকের একটা কপি সব সময় থাকে বল্লভবাবুর কাছে এবং একটা সুদীপের কাছে। সুদীপের তৈরী করা এই স্টকের হিসাব-বই থেকে দোকানে চেয়ারে বসেই বোঝা যায় গোডাউনে কি কি মাল মজুদ আছে বা কি কি শেষ হয়ে আসছে বা কি কি একদম শেষ হয়ে গেছে। সব ছবির মত বল্লভবাবুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাই তিনি সুদীপের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ-রকম সুন্দর করে একটা স্টক-বুকের

মাধ্যমে মজুদ মালের হিসাব রাখা যায়—এতদিন ব্যবসা করেও এ-ধারণা বল্লভ-বাবুর ছিল না, বিক্রয়ের সময় খানিকটা আন্দাজে, খানিকটা গুনে-গেঁথে এতদিন বিক্রয় করতেন বা ক্রয় করতেন। কিন্তু সুদীপ যা করে দিয়েছে তাতে বছরের শেষে বা প্রথমে দু-একদিন মজুদ মালের ঠিকমত হিসাব নিয়ে দিনের দিন খরিদা মালের চালান জমা ও বিক্রীত মালের পরিমাণ খরচা লিখলে দিনের দিন স্টকের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং গোডাউনে কত মাল রইল না-রইল তার হিসাব দোকানে বসে রাখতেও কোন অসুবিধা নাই। তা ছাড়াও সুদীপ ক'দিন অক্লান্ত খেটে অফিসের হিসাব নিকাশের বা খাতাপত্র রাখার পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্ত্তন করল যাতে বাইরে স্বীকার না করলেও মনে মনে সবাইকে স্বীকার করতে হ'ল—হ্যাঁ, ছেলেটি কাজ জানে বটে। সব কিছু দেখে-শুনে বল্লভবাবু ধন্যবাদ দেন সুদীপকে আর সুদীপ ধন্যবাদ দেয় তার প্রথম কর্ম্মজীবনের গুরু নন্দী কোম্পানীর উপেন্দ্র নন্দীকে।

দেখতে-দেখতে মাস শেষ হ'ল এবং তার কথামত সুদীপ দেড় শত টাকা এনে বাবার হাতে দিল। সুদীপের হাত হতে এককালীন দেড় শত টাকা পেয়ে সতীন্দ্র-বাবু চমকে উঠলেন এবং প্রশ্নে-প্রশ্নে তাকে জর্জরিত করে তুললেন, জিজ্ঞাস্য এই যে, পনর টাকা বেতনের কর্ম্মচারী একসঙ্গে দেড় শত টাকা অর্থাৎ বেতনের দশ গুণ টাকা কোথায় পেল, কি ভাবে পেল।

বাবার কথায় এবং প্রশ্নের ধরন-ধারণ দেখে সুদীপ বুঝল যে, বড়বাজারে মারোয়াড়ীর দোকানে চাকরী করলেও বাবার মধ্য থেকে সেই সদাচারী ন্যায়-পরায়ণ সত্যবাদী সতীন্দ্র মাষ্টারটি আজও উধাও হয় নি, তাই হঠাৎ সুদীপের হাত থেকে এত টাকা পাওয়ায় সুদীপের সততা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ জেগেছে এবং তাকে বার-বার প্রশ্ন করে আসল সত্যের সন্ধানে তৎপর হয়ে পড়েছেন। বাবার ব্যবহারে সুদীপ মনে মনে সামান্য কৌতুক বোধ করলেও ঈষৎ দুঃখিতও হ'ল, কারণ কোন গরীব লোক যদি সৎপথে থেকেও অর্থ উপার্জন করে তাহলে এদেশে অনেক লোকের মনেই বিভিন্ন সন্দেহের উদ্রেক হয়। এক্ষেত্রে তার বাবা ন্যায়নিষ্ঠ বলে তার সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অপর লোকে আবার নেহাতই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর ও অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মিথ্যা সন্দেহ করে নানা মিথ্যা রটায়। সুদীপ বুঝল সন্দেহের বোঝাটা জিইয়ে রেখে লাভ নেই, তাই তাঁকে সব খুলে বলল। সব শুনে সতীন্দ্রবাবু আর কোন প্রশ্ন করলেন না বটে তবে তাঁর মনে কোথায় যেন খটকা লেগে থাকল এবং সে খটকা মেটাবার জন্য তিনি পরদিনই ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে গিয়ে বল্লভবাবুর সঙ্গে দেখা করে

সুদীপের বেতন সম্বন্ধে খোঁজখবর করলেন। বল্লভবাবু সমস্ত ব্যাপারটা শুনে ও বুঝে সুদীপ ও সতীন্দ্রবাবু সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতে লাগলেন। তিনি সতীন্দ্রবাবুকে চা খাইয়ে মাঝে-মাঝে আসতে ও দেখা করতে অনুরোধ করে বিদায় দিলেন। সতীন্দ্রবাবু চলে যাওয়ার পর বল্লভবাবু আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন, চিন্তা করতে-করতে তাঁর মন বলল, আসলে এঁরাই মানুষ, সুদীপের অমন বাবা বলেই সুদীপ এত ভাল ছেলে। সুদীপের পাশে নিজের বড় ছেলে রণধীরকে দাঁড় করিয়ে বিচার করতে গিয়ে লজ্জায় নিজের কাছে নিজের মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা তাঁকে যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। অনেক কষ্ট করে ছেলেগুলোকে মানুষ করবার এবং লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেও তিনি একমাত্র মেজ ছেলে অধীর ছাড়া কাউকেই হয়ত লেখাপড়া শেখাতে পারবেন না, কারণ এটা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন যে, বাপের পয়সা দেখে পাঁচটি ছেলের মধ্যে সব কটিই প্রায় নানা রকমের নেশা ধরেছে এবং পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে উঠেছে। নিজে এত বড় ব্যবসা সামলাতে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে মরেন, ছেলেদের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন না, তাই শাসনহীন অবস্থায় ছেলেরাও অমানুষ তৈরী হচ্ছে। তাঁর অবর্তমানে সংসার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল কি যে হবে সেই কথা ভেবে বল্লভবাবুর বুকের গভীর থেকে একটা লবণাক্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ল এবং নিজের এই অন্যমনস্কতা দূর করবার জন্য রতনকে ডেকে আর একবার চা দেবার নির্দেশ দিয়ে তিনি পুনরায় কাজে মন দিলেন।

দিন এইভাবেই মাসের দিকে, মাস বছরের দিকে গড়িয়ে চলছিল। বছর দুয়েক ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে কাটবার পর সুদীপেরই সহকারী অর্থাৎ বলরাম হাজরা যার সঙ্গে সুদীপের সম্পর্কটা ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে তুমি থেকে তুই পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল, সেই বলরাম হাজরা হঠাৎ খবর নিয়ে এল যে, নন্দী কোম্পানীর ঠিক সামনের এক শ' পনর নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটের একটা দোকান সাঁতরা এণ্ড কোম্পানী বিক্রয় হচ্ছে আর বিক্রয় হচ্ছে অত্যন্ত সস্তা দামে,—মাত্র ছয় শত টাকায়। বলরাম টিফিনের সময় দোকানের বাইরে সুদীপকে ডেকে নিয়ে কথাটা বলল, "এত সস্তায় বড়বাজারে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের উপর দোকান আর কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, সুতরাং এ সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না।" সব শুনে সুদীপ বলল, "কিন্তু টাকা? ছয় শত টাকায় শুধু দোকানটা নিলেই তো হবে না, চাই মাল, চাই চেয়ার-টেবিল, চাই ইলেক্‌ট্রিক, চাই গোডাউন, না হলে ব্যবসাটা চলবে কি দিয়ে?" সুদীপের এই হতাশাব্যঞ্জক কথায় বলরাম বলল, "আমি সব

ব্যবস্থা করব, তুই শুধু রাজী হয়ে যা সুদীপ, একা নামতে আমার সাহস হচ্ছে না, তা ছাড়া ব্যবসাটা তুই আমার থেকে অনেক ভাল বুঝিস, ইংরাজীতে কথা বলতে চিঠিপত্র লিখতে পারিস, সুতরাং তুই সঙ্গে থাকলে আমি নামতে পারি। তুই আর অমত করিস না। এখানে দোকানের কাজ মিটিয়ে চল সন্ধ্যেবেলা সাঁতরা কোম্পানীর মালিক ধীরেন সাঁতরার কাছে তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাড়ীতে যাই। বল সুদীপ, বল, আর ভাবিস না, কথা দে তুই আমার সঙ্গে থাকবি।" বলতে বলতে বলরাম সুদীপের হাত দুটো ধরে ফেলল।

বলরামের এরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সুদীপ ঠেলতে না পেরে সন্ধ্যার পরে ধীরেনবাবুর কাছে যাওয়া ঠিক করল। মনে-মনে ভাবল, দেখাই যাক ব্যাপারটা কত দূর গড়ায়।

এর পর সন্ধ্যায় কাজের শেষে বলরাম ও সুদীপ একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ধীরেন বাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। ধীরেনবাবু ও বলরামের কথাবার্ত্তা শুনে সুদীপ এতক্ষণে বুঝল বলরাম এমনিতে একটু বেশী কথা বললেও এবং আত্মপ্রচার একটু বেশী করলেও এ-খবরটা সে ঠিকই যোগাড় করেছে। এতক্ষণ সে চুপচাপ সব শুনছিল, এবার নিজে ধীরেনবাবুর সঙ্গে কথা বলে এখনই তাঁকে দোকানের দরুণ টাকা অগ্রিম দিতে চাইল। বেশী টাকা তারা কেউই সঙ্গে করে নিয়ে আসে নি, তাই দু'জনের পকেট কুড়িয়েবাড়িয়ে মোট আঠাশটি টাকা বেরুল। এর মধ্যে পঁচিশ টাকা অগ্রিম দিয়ে রসিদ নিয়ে দুই বন্ধুতে নিজ-নিজ গৃহমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে পথে এসে পড়ল। হাঁটতে-হাঁটতে গল্প করতে-করতে দু'জনে যখন মাণিকতলার মোড়ে এসে দাঁড়াল তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সুদীপ বলরামের জামার ডানদিকের পকেটের কাছটা ধরে তাকে থামিয়ে বলল, "কি রে বাকী টাকার কি হবে?" বলরাম বলল, "আমার মায়ের কাছে হাজার দুয়েক টাকা আছে, তার থেকে ঘরের দরুন বাকীটা দিয়েও চৌদ্দ শ' টাকার মত হাতে থাকবে, সেই দিয়ে মাল কিনে বেচাকেনা করে আস্তে-আস্তে মূলধন বাড়াব।"

বলরামের কথায় সুদীপ একটু হেসে বলল, "তা হলে আমি বিনা পয়সার পার্টনার।" সুদীপের এ-কথার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করবার মত বুদ্ধি বলরামের ছিল না। তাই কথাটার অর্থ তার মাথায় ঠিক পৌঁছবার আগেই সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু বলবার আগেই সুদীপ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোর ভয় নাই, যদি চৌদ্দ শ' টাকা দিস আমিও না-হয় চৌদ্দ শ' টাকা আর ঘরের দরুণ তিন শত টাকা দেব।" কথাটা বলবার সময় সুদীপ মনে-মনে একবার হিসাব করে নেয় যে তার গত দেড় বছরের মাইনের টাকা মোট সাতাশ-শ'

টাকার মধ্যে বড় জোর শ' তিনেক টাকা খরচা হয়েছে, বাকী প্রায় সব টাকাটাই বাবার কাছে মজুদ আছে, সুতরাং বলরামের অনুপাতে তারও টাকা দিতে কোন অসুবিধা নেই। সুদীপের একথায় বলরাম আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল এবং সুদীপকে বুকে জড়িয়ে ধরল আর বলল, "তাহলে আমাদের মূলধন তো বেড়ে প্রায় তিন হাজার টাকা হচ্ছে। ঠিক আছে, ঐ দিয়েই চলবে আপাততঃ, তাহলে আর দেরী নয়, কালই সকালে ঘরের টাকাটা মিটিয়ে ভাড়ার বিলটিলগুলো আমাদের নামে করাতে হবে।" সুদীপও বলরামের কথায় সায় দিল এবং দুই বন্ধুতে দু'জনের কাছে বিদায় নিয়ে বাসার দিকে যাত্রা করল।

মেসে ফিরে সুদীপ সব কথা সতীন্দ্রবাবু ও হীরেনকে খুলে বলল এবং তাঁদের মতামত চাইল। সতীন্দ্রবাবু মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ছেলের শুভকামনা করে ঈশ্বরের কাছে তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলেন।

পরদিন সকালেই সুদীপ ও বলরাম ধীরেনবাবুর কাছে গিয়ে টাকা মিটিয়ে দিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর মালিকের কাছে গিয়ে তাঁকে এক শত টাকা দিয়ে ভাড়ার বিলটা তাদের নামে করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বললেন, "কোম্পানীর নামে বিলটা করে নিন, কারণ পার্টনারদের নামে তো আর আলাদা-আলাদা বিল হবে না।" সুতরাং ঐখানে বসেই ঠিক করা হ'ল কোম্পানীর নাম হবে 'হাজরা এণ্ড কোম্পানী', সুতরাং বাড়ীওয়ালা বিদ্যাধর ঘোষ মশায় হাজরা এণ্ড কোম্পানীর নামে বিল কেটে দিলেন এবং ঘরের চাবি বলরামের হাতে দিলেন। এর পর মন্দিরে পূজা দিয়ে এসে দোকানের চাবি খুলে ঘরটা একটু পরিষ্কার-টরিষ্কার করে চাবি দিয়ে উভয়ে কর্ম্মস্থল ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে চলে গেল।

দোকানের কাজকর্ম্মের শেষে দুই বন্ধুতে এসে বল্লভবাবুর নিকট সব ঘটনা খুলে বলে তাঁর কাছে ছুটি চাইল। বলরাম ও সুদীপ দোকান নিয়েছে শুনে বল্লভবাবু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং ভিতরে এইটাই চিন্তা করে নিলেন এইবার হয়ত তাঁর ভাল ভাল খদ্দের এরা ভাঙ্গাবে। মনের ভিতরে এ চিন্তা করলেও বাইরে তিনি খুশীর ভাব দেখিয়ে বললেন, "তা বেশ তো, এ তো সুখের কথা, তোমরা যখন দোকান নিয়েছ তখন আমার এখানে চাকরী করতে বলাটা তো অন্যায়, যাই হোক এ-মাসের আর দিন আষ্টেক বাকী আছে। অন্ততঃ এ-কটা দিন কাজ করে যাও আর আমিও এর মধ্যে লোক দেখি।" বল্লভবাবুর এ-কথায় সুদীপ সঙ্গে-সঙ্গে রাজী হ'ল। কিন্তু বলরাম হ্যাঁ-না কিছুই বলল না, কারণ তার মনে তখন অন্য চিন্তা। সে তখন মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছে আগামী জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিন দোকান খুলতেই হবে এবং সেটার আর মাত্র দিন-পনর বাকী। সুতরাং এখন থেকে লেগে

না পড়লে দোকান ঝাড়া-মোছা, রঙ করা, মাল গস্ত করা, সাইন বোর্ড করানো, টেবিলচেয়ারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহু কাজ করে উঠবে কখন, তাই পরদিন সুদীপ এলেও বলরাম আর ইণ্ডিয়া ট্রেভার্সে এল না। সে নিজেদের দোকানের কাজে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে লেগে পড়ল। সন্ধ্যায় কাজের শেষে সুদীপ এক শ' পনর নম্বরে সাঁতরা কোম্পানীর ঘরে গিয়ে দেখল, সেখান থেকে সাইন বোর্ড নামানো হয়েছে এবং ভিতরটা ঝাড়া-মোছা-ধোয়া সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। কালী-ঝুল-ময়লা-আবর্জনামাখা হাতেই বলরাম আর একবার সুদীপকে জড়িয়ে ধরলে সুদীপ তাকে বলল, "ছাড়-ছাড় করছিস কি? নিজে তো সারা দিন ঝাড়ামোছা করে ভূত বনেছিস, আমাকেও কি ভূত বানাতে চাস নাকি?" সুদীপের কথায় বলরামের হাসি পেল এবং সে বলল, "সারাদিন কাজ করতে-করতে কিছুই খাওয়া হয় নি, আমায় কিছু মুড়ি, ছোলা-ভিজে আর বাতাসা এনে দে তো।" বলরামের কথায় সুদীপের মনটা আহা করে উঠল আর মুখে সে বলল, "সে কি রে, দোকান ঝাড়তে মুছতে খেতে ভুলে গেলি। এর পর দোকান সাজিয়ে বসলে খদ্দের আসতে লাগলে আর টাকা রোজগার হলে তুই যে সংসারই ভুলে যাবি? দেখিস বাবা দোকানের আনন্দে আমার বৌদিকে আর জ্যাঠাইমাকে যেন ভাসিয়ে দিস না।"

সুদীপের এই হাল্কা রসিকতায় বলরামও বেশ বুঝতে পারে যে, দোকানের ব্যাপারে সুদীপেরও আন্তরিক আনন্দ হয়েছে, না হলে তার মুখ থেকে এত হাল্কা কথা সচরাচর তো বের হয় না। সুদীপ বলরামের জন্য মুড়ি কিনতে চলে গেল বেতপটির গলির মুখে আর বলরাম হাতমুখটা কাছের চাপা কলে গিয়ে ধুয়ে এল। এর পর দুই বন্ধুতে বসে মুড়িছোলা খেয়ে দোকান বন্ধ করে যে-যার বাসায় চলে গেল। কয়েকদিন খেটেখুটে বলরাম দোকানের রঙটং করানো এবং আরো টুকি-টাকি কাজকর্ম্মগুলো সেরে রাখল। ইতিমধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিনটি গত হলে সুদীপও এসে দোকানের কাজে যোগ দিল এবং দুটি তরুণ বন্ধুতে মিলে কয়েক দিনের মধ্যে মালপত্র কিনে দোকানটাকে ভর্তি করে সাজিয়ে ফেলল। দু-একটা ছোট ছোট টেবিলচেয়ার নিয়ে এসে সামনেটায় দুজনের বসবার মত জায়গাও করে নিল। এর মধ্যে একজন ভাল উকিল ধরে একটা পার্টনারশিপ ডিড তৈরী করে রেজিষ্ট্রী করিয়ে নিল। কথা ছিলো অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক, কিন্তু হ'ল অন্য রকম, বলরাম ও বলরামের ভাই ঘনশ্যাম পাঁচ আনা পাঁচ আনা করে দশ আনা ও সুদীপ ছয় আনা অংশের মালিক হ'ল এবং সেই মতই যে-যার অংশের টাকা দিল। সুদীপ এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। স্নানযাত্রার ঠিক আগের দিন সাইন বোর্ড এসে গেল। একটা ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে দোকানের

দরজার মাথায় সাইনবোর্ডটাকে জায়গামত লাগিয়ে নিল এবং স্নানযাত্রার দিন সকালে দোকান উদ্বোধন করবার মত সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সেরে রেখে বাসায় চলে গেল। বলরামও সুদীপের সঙ্গে-সঙ্গে তার মেসে এসে রাত্রিটা কাটাল, কারণ পরদিন খুব ভোরে উঠেই কালীঘাট যেতে হবে। উৎসাহে উদ্দীপনায় দুই বন্ধুর চোখে সারারাত্রি ঘুম এল না। বিভিন্ন রকম কল্পনা ও পরিকল্পনায় রাত্রি গড়িয়ে যখন তিনটে বাজল তখন দু'জনে উঠে প্রসন্ন ঠাকুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরে এসে নতুন জামাকাপড় পরে খাতা পূজা করবার জন্য কালীঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। এর আগেও দুই বন্ধুতে বিভিন্ন সময়ে কালীঘাটে গিয়েছে এবং নতুন খাতা মহরতের জন্যেও গিয়েছে, কিন্তু আজকের ভোরের এই কালীঘাটে যাওয়াটা যেন তাদের কাছে নূতন আনন্দ নিয়ে এল। মনের আনন্দে টাঙ্গায় চড়ে সুদীপ গানই ধরে ফেলল গুনগুন করে— 'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার।'

কালীঘাটে এসে নন্দীবাবুদের পুরাতন পুরোহিত শ্রীকালীচরণ মুখুজ্জে মশায়ের খোঁজ করে তাঁর হাত দিয়ে খাতাপূজা করিয়ে মায়ের চরণে খাতা স্পর্শ করাল। তারপর দুই বন্ধু পুরোহিতের দক্ষিণা মিটিয়ে পুনরায় টাঙ্গায় চড়ে বড়বাজারে হাজির হ'ল, তখন চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। বড়বাজারে ফিরে দেখল তখনও কোন দোকানই খোলে নি। পয়লা বৈশাখের সময় এতক্ষণে সব দোকানে সাজ-গোজ আরম্ভ হয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু আজ পয়লা বৈশাখ নয়, বছরের মাঝখানের একটা শুভদিন মাত্র, সেইজন্য স্থানে-স্থানে বিপণ্যারম্ভ হলেও সার্বজনীনভাবে কিছু হচ্ছে না; তাই বাজার এই সাত সকালে বেশ ফাঁকা। দোকানের চাবি খুলে সিংহাসনে গণেশ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি রেখে খাতার বাণ্ডিল নামিয়ে প্রণাম করে বলরাম চলে গেল স্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডের পশ্চিমে গঙ্গার ধারে ফুলপটিতে ফুলমালা, আমশাখা ইত্যাদি কিনতে। বলরাম বেরিয়ে গেলে সুদীপ পা-হাত ধুয়ে ভক্তিভরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঠাকুরকে ও খাতার বাণ্ডিলে ধূনো দেখাল এবং কোঁচার খুঁটটা গলায় জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে মা-লক্ষ্মী ও গণেশের উদ্দেশ্যে প্রণাম করল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বর্ণের ফুলমালা নিয়ে বলরাম ফিরলে দুই বন্ধুতে মিলে দোকানের সামনেটা অর্থাৎ দরজার মাথাটা ও দুই পাশটাকে খুব ভাল করে সাজাল। রজনীগন্ধা ও বেলফুলের মালা দিয়ে সাইন বোর্ডের চারিদিকটা সাজিয়ে তুলল।

দেখতে-দেখতে বেলা বাড়তে লাগল। পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট সময়ানুযায়ী বলরাম স্বহস্তে খাতা পত্তন করল। সন তের শত সাতচল্লিশ সালের স্নানযাত্রার দিন হাজরা

এণ্ড কোম্পানীর নাম নিয়ে বড়বাজারে আর একটি তার-জালের দোকান জনসমক্ষে উপস্থিত হ'ল। অনেক আশা, অনেক স্বপ্নের সম্ভাবনা বুকে নিয়ে দুটি তরুণ সুদীপ দত্ত আর বলরাম হাজরা কাজে নামল। এবার আর অপরের জন্য কাজ করা নয়, নিজেদের জন্য কাজ করা। তাই সাধ্যানুযায়ী সকলের শুভেচ্ছা আর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে বাজারের বেশ কিছু লোককে পত্রমারফত নতুন দোকানের উদ্বোধনের খবরটা জানিয়ে তাঁদের উপস্থিতিও প্রার্থনা করেছিল।

খাতাপত্র পত্তন হতে-হতে বেলা প্রায় সাড়ে ন-টা বাজল। বাজারের অন্যান্য দোকানও একে-একে খুলতে আরম্ভ করল। এখন শুধু দুই বন্ধুর ভাবনা নূতন দোকানের প্রথম দিনটিতে বউনিবাট্টা হবে কিনা। দুই বন্ধুতে নিজেদের মধ্যে যদিও নানা গল্পগুজব করছিল তবুও তাদের অন্তরে তখন বউনীর ভাবনাটা ফল্গুস্রোতের মত বয়ে চলছিল। অবশেষে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ এক লালমুখো সাহেব এসে সামনের দরদালানে রাখা একটা চার মেস ষোল গেজ বাণ্ডিল আঙ্গুল দিয়ে টিপে প্রশ্ন করল, "গুড্ মর্নিং! হোয়াটস্ দ্য প্রাইস ফর ইট?" তখন সুদীপ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে সাহেবের কাছে এসে তার ডান হাতটা নিজের হাতে নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে বলল, "মর্নিং টু ইউ, প্রাইস ফর ইট ইজ সিক্স আনাস পার স্কোয়ার ফুট।" সাহেব তখন হেসে তার হাতের একটা নমুনা দেখিয়ে প্রশ্ন করল, "হোয়াটস্ দ্য প্রাইস্ ফর দিস?" সুদীপ বলল, "ও ইট ইজ এ থিনার ওয়ান। প্রাইস ফর দিস ইজ টু আনাস পার স্কোয়ার ফুট?" সাহেব তখন বলল, "ক্যান ইউ কাট এ পিস অফ স্যাম্পেল ফ্রম দিস ফর মাই এগজামিনেশন?" সাহেবের একথায় সুদীপ বলল, "উড ইউ মাইণ্ড টু হ্যাভ ইওর সীট ইনসাইড?" সুদীপের এই বলায় সাহেব খুশী হয়ে হাসতে-হাসতে উঠে ভিতরে বেঞ্চে বসলে সুদীপ একটা কাতুরী দিয়ে সেই ষোলর চার জালের বাণ্ডিলটা থেকে তিন ইঞ্চির মত এক টুকরো নমুনা কেটে সাহেবের হাতে দিতে গিয়ে কি ভেবে সেটা ফিরিয়ে এনে নিজের কোঁচার খুঁটে ভাল করে মুছে পরিষ্কার করে সাহেবের হাতে দিল। সুদীপকে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছতে দেখে সাহেব বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হাসতে-হাসতে প্রশ্ন করল, "এ বাবু এটা টুমি কি করিতেছ, এত ভাল ক্লথটা নষ্ট করিতেছ?" সাহেবের কথায় সুদীপও হাসতে হাসতে জবাব দিল, স্যাম্পেলটা ধুলোবালি লেগে ময়লা হয়ে আছে, তোমাকে পরিষ্কার করে না দিলে তোমার হাতে ময়লা লাগবে, তাতে তোমার দামী জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।" মুখে সুদীপ একথা বললেও সে মনে-মনে জানল নমুনা যদি ময়লা বলে পছন্দ না হয় তো মাল কিনবে কেন, তাইতো ওটার ধূলোবালি ঝেড়েমুছে রূপোর মত ঝকঝকে করে দিলাম।

এখন পছন্দ করা না-করা তোমার উপর নির্ভর করছে। সুদীপ একথা ভাবছে তখন তার মনের ভিতর আর একটা মন ভগবানকে ডেকে বলছে "হে ভগবান, মালটা যেন সাহেবের পছন্দ হয়।"

ওদিকে নমুনা হাতে পেয়ে সাহেব প্রথমে দুহাত দিয়ে ভাল দেখল এবং তারপর পকেট থেকে একটা ষ্টিলের ফিতে বের করে মাপল ও বলল, "হাউ মেনী রোলস হ্যাভ ইউ গট ইন স্টক?" দোকান সাজাবার জন্য ও-মাল তো কিনেছে মাত্র একটি, আছেও স্টকে সেটি। বলবার বেলায় সুদীপ বলল, "এইট রোলস।" একথা শুনে সাহেব বলল, "ওয়াণ্ট টুয়েন্টি রোলস, টুমি কতদিনে টুয়েন্টি রোলস দিতে পারবে?" সুদীপ করে কি ভেবে নিয়ে বলল, "আপটার ফোর ডেজ।" একথা শুনে সাহেব "মেক দ্য বিল এণ্ড টেক দ্য মানি। হামি চার দিন পড়ে আমার কোম্পানীর পাঠাইবে, টুমি সেই ভ্যানকে টুয়েন্টি রোলস ডেলিভারী দিয়া দিবে।" কথা বলতে বলতে সাহেব তার সার্টের বুকপকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে সুদীপের হাতে দিল। কার্ড পড়ে সুদীপ দেখল সাহেবের নাম মিঃ সি ডিগনাম ম্যানেজার, ব্রিটিশ পেণ্টস লিমিটেড। কার্ড দেখে সুদীপ একবার সাহেবের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে ক্যাশ মেমো খুলে প্রথম মেমো লিখতে বসল। ক্যাশ মেমো করতে বসে সুদীপ একটু মুস্কিলে পড়ল, কারণ যদিও সে চারদিনে মাল দেবে মুখে বলেছিল, কিন্তু সে ভাল করেই জানত চারদিনে মাল দিতে হলে বাজার থেকে মাল কিনে দিতে হবে। তখন আর কারখানা থেকে মাল করিয়ে এনে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ সে যা দাম দিয়েছে প্রায় সেই দামেই বাজারে মালটা কিনতে হবে। কারণ প্রথম দিনের প্রথম খরিদ্দার বলে সুদীপ খুব কম্পিটিটিভ প্রাইসই সাহেবকে দিয়েছিল। সাত-পাচ ভাবতে-ভাবতেই সুদীপ ক্যাশ মেমোটা করে টাকা নিল। মোট এগার শ' পঁচিশ টাকা গুনে দিয়ে সাহেব উঠতে যাচ্ছে এমন সময় সুদীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁকে আবার বসাল, "বলল, দিস সপ হ্যাজ বিন ওপেণ্ড ওনলি অন দিস মর্নিং এণ্ড ইউ আর আওয়ার ফার্ষ্ট কাষ্টমার, সো ইউ হ্যাভ টু টেক সুইটমিটস য়্যাণ্ড এ গ্রীন কোকোনাট।" সাহেবকে একথা বলে ক্যাশ থেকে টাকা বের করে বলরামের দিকে একটা পাচটাকার নোট এগিয়ে দিয়ে সাহেবের জন্য দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কিছু মিষ্টি আর বাজার থেকে একটা ডাব কাটিয়ে আনতে নির্দেশ দিল। চোখের নিমেষে বলরাম এগিয়ে গেল এবং আনন্দের আতিশয্যে মাত্র মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মিষ্টি ও ডাব নিয়ে সে ফিরে এসে সুদীপের হাতে ডাবটা ধরতে দিয়ে কাগজের বাক্সে আনা মিষ্টিগুলো সাহেবের

এণ্ড কোম্পানীর না‍ল, "প্লীজ টেক, টেক প্লীজ।" বাক্স থেকে দুটো সন্দেশ তুলে নিয়ে উপস্থিত হ'ল। ‌ রামের হাতে ফিরিয়ে দিতে গেলে বলরাম আবার বলল, "অল দত্ত আর বলরাম প্লীজ।" বলরামের ইংরাজী বলার ধরনে সাহেব ও সুদীপ একসঙ্গে নয়, নিজেদের হেসে ফেলল। সাহেব তখন বলরামের দিকে চেয়ে বলল, "হামি মিষ্টি আশীর্বাদ প্রাপারে না, থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর কাইণ্ড অফার।" মিষ্টি খাওয়া হলে উদ্বোধনের শটা একটা কাচের গ্লাসে ঢেলে সুদীপ সাহেবের হাতে দিলে এক নিঃশ্বাসে খাতায়ে সাহেব বলল, "ইট ইজ গুড, আই ওয়াজ ভেরী থার্সটি, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দোকানও এরপর সৌজন্যসূচক করমর্দ্দন করে ডিগনাম সাহেব বিদায় নিল।

দোকানে হেব বিদায় নিলে সুদীপ বলরামকে বলল, "দেখ দেখি বাজারে ষোলর চার যদিও র কি দাম?" বলরাম অতি উৎসাহের সহিত বের হয়ে গেল এবং ফস্তবেক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল, "এই সুদীপ, রাস্তায় নারকেলডাঙার যতীন লাঙ্গল মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, ষোলর আর জাল তাঁর কারখানায় নাকি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ রোল মত রেডি আছে। কে একজন অর্ডার দিয়ে মাল তোলে নি। আমি যতীনবাবুকে এখানে আসতে বলেছি, তিনি সরোজ এণ্ড সন্সে গেছেন, ওখান থেকে এক্ষুনি আসবেন।" বলরাম কথাগুলো বলতে-বলতেই যতীনবাবু হাজরা কোম্পানীতে এসে হাজির। যতীনবাবু আসতেই তাঁকে যথারীতি আপ্যায়ন করে বসিয়ে সুদীপ মালের দাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "পাঁচ আনা স্কোয়ার ফুটে বেচছি। আমার এক খরিদ্দার অর্ডার দিয়ে মাল তোলে নি। মালগুলো তো আমার ঘাড়ে পড়ে আছে, আপনারা যখন একসঙ্গে বিশ বাণ্ডিল নেবেন বলছেন তখন না হয় সাড়ে চার আনা করেই দেবেন।" যতীনবাবুর সঙ্গে সুদীপ ও বলরামের আগে থেকেই আলাপ ছিল, কারণ এই যতীনবাবু ও এঁর ভাই ক্ষুদিরামবাবু দু'জনেই নন্দী কোম্পানী ও ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে মাল তৈরী করে দেন। যতীনবাবু সাদাসিধে স্পষ্ট কথার মানুষ, তাই তাঁর এই খোলা কথায় সুদীপ ও বলরাম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিশ বাণ্ডিল জালের অর্ডার দিল। অর্ডার হাতে নিয়ে যতীনবাবু সুদীপকে প্রশ্ন করল, "পেমেণ্ট কিরূপ হবে?" সুদীপ হাসতে-হাসতে বলল, "আগামী কাল মাল দিয়ে আপনি বিল দেবেন, আগামী শুক্রবার পেমেণ্ট পেয়ে যাবেন, ভয় নেই আমরা নতুন নেমেছি বলে, কথার খেলাপ করব না, বিশ্বাস রাখতে পারেন।" বলরামকে ততখানি সুনজরে না দেখলেও যতীনবাবু সুদীপকে ভাল করেই জানেন, তাই সুদীপ নিজমুখে যখন একথা বলল তখন তাঁর আর কোন দ্বিধা রইল না। অর্ডার নিয়ে হাসিমুখে তিনি বের হয়ে গেলেন। যতীনবাবু বের হয়ে গেলে বলরাম ও সুদীপ নিজেদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন তুলে বলাবলি করতে

লাগল যে, "রাখে হরি মারে কে?" বলতে-বলতেই দু'জনেই সিদ্ধিদাতা গণেশের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল।

ভূপেন্দ্রবাবুর উষ্ণ কথাবার্তার জন্য সুদীপ দোকানের চাকরী ছেড়ে দিলে পর নন্দী কোম্পানীর অংশীদার উপেন্দ্রবাবুও খুব কমই দোকানে বেরুতেন। ভূপেন্দ্র-বাবুই নন্দী কোম্পানী চালাচ্ছিলেন। একজন বদরাগী পরশ্রীকাতর অব্যবসায়ী লোকের হাতে কোন ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব পড়লে যা হয়, নন্দী কোম্পানীর অবস্থাও দিনে-দিনে তাই হচ্ছিল অর্থাৎ উন্নতির পরিবর্তে অবস্থা দিন-দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। সেদিন অর্থাৎ ঐ দোকানের উদ্বোধনের দিন বেলা প্রায় বারটা নাগাদ সুদীপের লক্ষ্য পড়ল উপেন্দ্রবাবু এসে নন্দী কোম্পানীর সামনে ফিটন থেকে নামলেন। উপেন্দ্রবাবুর দোকানের ঠিক সামনেই হাজরা কোম্পানী, তাই উপেন্দ্রবাবুকে ফিটন থেকে নামতে দেখে সুদীপ চেয়ার ছেড়ে ছুটে এসে ঐ ফুটপাথেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হাজরা কোম্পানীতে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্য কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। সুদীপের শিশুর মত এই কাতর অনুনয়-বিনয় দেখে উপেন্দ্রবাবু কথা দিলেন যে, আড়াইটা-তিনটা নাগাদ তিনি অবশ্যই একবার হাজরা কোম্পানীতে যাবেন। উপেন্দ্রবাবুর মুখের কথা পেয়ে সুদীপ খুশী মনে আবার দোকানে গেল।

দোকানে ফিরে সুদীপ দেখল ইতিমধ্যে তার বাবা আর হীরেনদা এসে গেছেন সেখানে। সে তাড়াতাড়ি বাবাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল এবং হীরেনের সঙ্গে আলিঙ্গন করল। সুদীপের দেখাদেখি বলরামও সতীন্দ্রবাবুকে প্রণাম করল এবং হীরেনকে আলিঙ্গন করল। ইতিমধ্যে আর একজন খরিদ্দার এসে ময়ূর মার্কা হেক্সাগোনাল জাল চাইলে সুদীপ প্রশ্ন করল, "কি সাইজের মাল চাই?" তিনি বললেন, "এক ইঞ্চি ঘরের বিশ গেজ তারের জাল চাই।" পিকক ব্র্যাণ্ড জাল ইম্পোর্টেড জাল, তার স্টকিষ্ট একমাত্র সরোজ এণ্ড সন্স, তাই সুদীপ খরিদ্দারকে বসতে বলে চট করে সরোজ এণ্ড সন্সে গিয়ে সরোজ সামন্ত মশায়কে সঙ্গে এক ইঞ্চি বিশ গেজ জালের দাম জিজ্ঞাসা করলে সরোজবাবু দাম দিলেন চৌদ্দ টাকা বাণ্ডিল। দামটা শুনেই সুদীপ তাড়াতাড়ি দোকানে এসে খরিদ্দারকে সতর টাকা বাণ্ডিল হিসাবে দাম দিলে সে বলল, "সতর নয়, যোল টাকা হলে আমি পঞ্চাশ বাণ্ডিল জাল নিতে পারি। খরিদ্দারের কথায় সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। খরিদ্দার তখন পঞ্চাশ বাণ্ডিল জালের মেমো কাটতে বললে সুদীপ প্রশ্ন করল, "কি নামে মেমো হবে?" ভদ্রলোক বললেন, "গার্ডেন রীচ পোলট্রি ফার্ম, বত্রিশের দুই গার্ডেন রীচ রোড, এই নামঠিকানায় বিল হবে।" সুদীপ তাঁর কথামত ঐ নাম ও ঠিকানা লিখে মেমো কেটে দিল এবং

মালের দাম ও ঠেলাভাড়া বাবদ যথাক্রমে আট শত টাকা ও ছয় টাকা নিয়ে খরিদ্দারকে একটা ডাব খাইয়ে তবে ছাড়ল।

খরিদ্দার চলে গেলে সুদীপ আবার 'সরোজ এণ্ড সন্সে' সরোজবাবুর কাছে গিয়ে বলল, "জ্যাঠামশায়, আমরা আপনার স্বজাতি ও ছেলের মত। ক্ষেতুদা আমাদের বন্ধু, আপনি সহযোগিতা না করলে কি আমরা ব্যবসা করতে পারি?" সুদীপের একথা বলার কারণ ছিল, কারণ সুদীপ জানত সরোজবাবু তাদেরই স্বজাতি এবং সরোজবাবুর স্বজাতিপ্রীতির কথাও সে আগে থেকেই শুনেছিল। তা ছাড়া, সরোজবাবুর একমাত্র সন্তান ক্ষেত্রনাথবাবুর সঙ্গে সত্যিসত্যিই সুদীপের যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং সে ভালই জানত যে, সরোজ জ্যাঠার সেন্টিমেণ্টে একটু সুড়সুড়ি দিতে পারলে কাজ হবে। তাই প্রথমেই ঐ কথাগুলি বলে তাঁর টেবিলের সামনে একটা টুলে বসল। সরোজবাবু গম্ভীর হয়ে পালোয়ানের মত গোঁফজোড়াটায় একবার মোচড় দিয়ে নিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কি বলতো হে ছোকরা?" সুদীপ তখন সব খুলে তাঁকে বলল যে, সে আর বলরাম নূতন ব্যবসায়ে নেমেছে, সুতরাং নানা রকম মালের প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসতেই হবে, যেমন আজকে প্রথম দিনেই তাঁর কাছে হেক্সাগোনাল জালের জন্য আসতে হয়েছে। সুদীপের কথার ধরন এবং বলার মধ্যে নম্রতার আঁচ পেয়ে সরোজবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিশ্চয়ই আসবে, তোমরা আমার ক্ষেতুর বন্ধু, নতুন ব্যবসায়ে নেমেছ, সুতরাং প্রয়োজন হলে আসবে বৈকি বাবা।"

সরোজ জ্যাঠা খানিকটা নরম হয়েছেন দেখে সুদীপ এবার বলল, "জ্যাঠামশায় আজ যে পঞ্চাশ বাণ্ডিল জাল চাই, টাকা কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দিতে পারছি না, দু-চার দিন পরে দেব।" সরোজবাবু বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।" বলেই তিনি দোকানের এক কর্ম্মচারী অনাদি সামন্তকে লক্ষ্য করে বললেন, "অনাদি, যাও, গোডাউন থেকে এদের পঞ্চাশ বাণ্ডিল এক ইঞ্চি বিশ গেজ পিকক ব্রাণ্ড জাল দাও গিয়ে।" বলেই তিনি চালান বই টেনে নিয়ে চালান করতে থাকেন এবং সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন, "কি নামে চালান করব?" সুদীপ বলল, "হাজরা এণ্ড কোম্পানীর নামে।" চালানে রেটটা বসাবার আগে সুদীপ সরোজবাবুর হাতটা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে; সুদীপের এইরকম ব্যবহারে সরোজবাবু চালান বই থেকে মুখ তুলে তার চোখের দিকে চেয়ে দেখেন, সেখানে কি যেন এক কাতর মিনতি লুকিয়ে রয়েছে অভিজ্ঞ সরোজবাবু মুহূর্ত্তে বুঝে নেন সুদীপ কি বলতে চাইছে, তবু তিনি ছদ্মগাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "কি, আবার কি হ'ল?" সুদীপ কিছু না বলে শুধু তাঁর মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে সরোজবাবু বললেন, "মাল

চাইলে, মাল দিলাম, ধারে চাইলে, ধার দিলাম, আবার কি চাই? রেটটাও কি সস্তা করতে হবে?" সরোজবাবুর এ-কথায় সুদীপ সলজ্জ বিনম্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।" সরোজবাবু আর কিছু না বলে বাণ্ডিল পিছু আরও এক টাকা কমিয়ে তের টাকা বাণ্ডিল হিসাবে চালান করে দিলেন। সুদীপ ঠিক এতখানি আশা করে নি, সে ভেবেছিল সরোজবাবু হয়ত বাণ্ডিল প্রতি দু-আনা বা চার আনা কম করতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজে থেকেই যখন বাণ্ডিল পিছু এক টাকা কম করে দিলেন তখন সুদীপ নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে চালানখানি হাতে করে নিজের দোকানে ফিরে এল। চালান দেখে বলরাম তো অবাক, কারণ সরোজবাবুর কাছে দাম কম কমাতে পেরেছে এরকম কথা কেউ কোনদিন শুনেছে কিনা সন্দেহ। তার উপর বাণ্ডিল পিছু একেবারে এক টাকা! বলরাম তো ব্যাপারটা শুনেই সুদীপকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "তুই যাদু জানিস্, সত্যিই তুই যাদু জানিস্। তোর কাছে কোন খদ্দেরও যেমন ফেরে না, তেমনি কোন সাপ্লায়ারও দাম কম না করে পারে না।" বলরামের এ-কথায় সুদীপ শুধু সামান্য হাসল এবং তাকে ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে কিছু সন্দেশ-রসগোল্লা আনতে নির্দ্দেশ দিল, কারণ বেলা প্রায় গড়িয়ে বিকেলের দিকে এগোচ্ছে, সুতরাং উদ্বোধনী দিনে যাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাঁরা এইবার আসতে থাকবেন ভেবেই সুদীপ এ নির্দ্দেশ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিছু সন্দেশ ও একটা মাটির হাঁড়িতে বেশ কিছু রসগোল্লা নিয়ে দু'হাত ভর্ত্তি করে বলরাম এসে হাজির হ'ল। সন্দেশের বাক্স ও রসগোল্লার হাঁড়ি রেখে তাক থেকে কিছু মিষ্টি বের করে বলরাম হীরেন ও সতীন্দ্রবাবুকে দিয়ে বলল, "নিন কাকাবাবু, প্রথম দিনে সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করুন!" হীরেনকে বলল, "নিন ভাই নিন, বলরামের এই "নিন ভাই নিন" শুনে হীরেন তাকে বলল, "আমাকে তুমি বা তুই বললেই খুশী হব, অত আপনি, আজ্ঞে, নিন-টিন আমার ধাতে পোষাবে না।" হীরেনের কথায় বলরামও খুশী হয়ে বলল, "আচ্ছা তাই হবে। এবার থেকে 'তুমি' করেই বলব।" এর পর জলযোগান্তে হীরেন ও সতীন্দ্রবাবু বিদায় নেবার আগে সতীন্দ্রবাবু সুদীপ ও বলরামের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, আশীর্বাদের সময় তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সুদীপ, হীরেন ও বলরাম সকলেই বুঝল যে, এ অশ্রু আনন্দের অশ্রু। তাঁর সন্তান সুদীপ যে বন্ধু বলরামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটা কিছু করতে পেরেছে তারই আনন্দে তাঁর মনটা কানায়-কানায় পূর্ণ হয়েছে। তাই সেই পূর্ণতার প্রতীক ঐ অশ্রুবিন্দু তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

হীরেন ও সতীন্দ্রবাবু দোকান থেকে চলে গেলে যিনি দোকানে এসে প্রবেশ করলেন তিনি নন্দী কোম্পানীর মালিক এবং সুদীপের কর্ম্মজীবনের প্রথম গুরু উপেন্দ্রনারায়ণবাবু। উপেন্দ্রবাবুকে দোকানে ঢুকতে দেখে সুদীপ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁকে হাত ধরে টেনে নিজের চেয়ারে বসিয়ে দিল। উপেন্দ্রবাবু বসেই চারদিক লক্ষ্য করে বললেন, "বাঃ বাঃ, এরই মধ্যে সুন্দর সাজিয়েছ তো! অনেক মাল তুলেছ দেখছি, ভাল করেছ, দোকানের শোভা বা সৌন্দর্য্য যাই বল না কেন, তা হ'ল ঐ মালের মধ্যে অর্থাৎ ষ্টকের মধ্যে। ষ্টক থাকলেই দোকানটি দেখতে ভাল লাগে।" উপেন্দ্রবাবুর এই সহজ অন্তরঙ্গ কথা সুদীপ ও বলরামের খুবই ভাল লাগল। সুদীপ বলরামের সঙ্গে উপেন্দ্রবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলে, বলরাম তাঁকে সসম্মানে নমস্কার করে তাঁকে সমাদরে আপ্যায়ন করবার মানসে মিষ্টিমুখ করতে দিল। উপেন্দ্রবাবুও যথারীতি আপ্যায়িত হয়ে আনন্দিত হলেন এবং ওঠবার সময় বলে গেলেন, "যাক এতদিনে বড়বাজারে আড্ডা দেবার মত আর একটা জায়গা হ'ল, মাঝে-মাঝে তোমাদের কাছে এসে আড্ডা দেব, বুঝলে হে বলরাম।" বলে তিনি বিদায় নিলেন।

উপেন্দ্রবাবু বিদায় নেওয়ার পর সুদীপ উঠে, সোজাসুজি ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে গিয়ে বল্লভবাবুকে অনুনয়-বিনয় করে তাদের দোকানে পায়ের ধূলো দেবার জন্য ধরে নিয়ে এল। বল্লভবাবু যখন দোকানে ঢুকছেন তখন বলরাম চমকে উঠল, কারণ এরূপ ঘটনা বলরামের কল্পনারও অতীত। বল্লভবাবুর মত বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং বহুজনবিদিত ধনী ব্যক্তি তাঁরই কর্ম্মচারীদের দেওয়া দোকানে এসে ঢুকবেন একথা বলরাম স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই বল্লভবাবু দোকানে ঢুকতেই বলরাম ছুটে এসে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে টেবিলের কোণে মাথাটাই ঠুকে ফেলিয়ে ফেলল। উপেন্দ্রবাবুর মতই বল্লভবাবুকেও সুদীপ নিজের চেয়ারে বসিয়ে আপ্যায়ন করল। বল্লভবাবুও মিষ্টিমুখ করলে সুদীপ বলরামকে বলল তাঁর জন্য চা আনতে, কারণ সুদীপ জানত প্রত্যহই এ সময়টা তিনি কাপ দুয়েক চা খান। সুদীপের ব্যবহারে ও আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি না পেয়ে বল্লভবাবু খুশীমনেই তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গেলেন। এর পর আরও দু-একজন খদ্দেরকে টুকটাক জিনিষ বিক্রী করে এবং আরও দু-চারজন খরিদ্দার ও সাপ্লায়ারকে আপ্যায়িত করে সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করবার সময় হিসাব করে তারা দেখল প্রায় বাইশ শ' পঁচিশ টাকার মাল বিক্রী হয়েছে। প্রথম দিনে এরূপ বিক্রী সত্যিই অভাবনীয়, তাই দুই বন্ধুতে ক্যাশ গুনে ঈশ্বরকে প্রণাম করে ধূনো-গঙ্গাজল দিয়ে দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে গেল।

মেসে ফিরে স্নান করে' জামাকাপড় বদলে সুদীপ সামান্য কিছু মিষ্টি কিনে তার দিদি কুসুমের বাড়ীর উদ্দেশ্যে সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের দিকে পা বাড়াল। সুদীপ যখন কুসুমের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল তখন রাত্রি প্রায় আটটা। কুসুম দরজা খুলে একেবারে সামনে সুদীপকে দেখে তার হাতটা ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। সুদীপ তার হাতের সন্দেশের বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কুসুমের পায়ের ধুলো নিল। সুদীপের দিকে চেয়ে কুসুম দেখল বছর দুই আগে নন্দীবাবুর দোকানে কাজ করার সময় কুসুম যেভাবে জামাকাপড় কিনে দিয়ে সুদীপকে সাজিয়ে দিয়েছিল আজও সুদীপের সেই একই রকম পোষাক অর্থাৎ সেই হাফ-হাতা আদ্দির সার্ট আর ধুতি। সুদীপকে হঠাৎ প্রণাম করতে দেখে কুসুম বলল, "আরে আরে ব্যাপার কি, ওদিকে মিষ্টির বাক্স, আবার এদিকে প্রণাম, হ'লটা কি তোমার?" সুদীপ বলল, "সব বলছি, আগে তোমার ডানহাতটা একবার আমার মাথায় রাখ," বলে সুদীপ নিজেই কুসুমের ডানহাতের তালুটা নিয়ে মাথায় চেপে ধরছে দেখে কুসুম হেসেই খুন, বলল, "হাতটা মাথায় না দিলে বুঝি আশীর্ব্বাদ করা যায় না, পাগল কোথাকার। আসলে ব্যাপারটা কি বল দেখি। এত খুশী কেন?"

সুদীপ হাসতে-হাসতে বলল, "বলছি বাবা, সব বলছি, আগে চায়ের জল চড়াও তো দেখি।" সুদীপের কথায় কুসুম বলল, "তা হলে ও-ঘরে চল, আমি চা করব আর তুমি বসে-বসে-সব বলবে।" সুদীপ বলল, "তাই চল।" এর পর দু'জনে রান্নাঘরের কাছে এল এবং সুদীপ একটা বেতের মোড়া নিয়ে দরজার কাছটায় বসল। উনুনে তরকারী ফুটছিল, সেটা নামিয়ে রেখে কুসুম কেট্‌লীতে করে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। দু-কাপ মাত্র চায়ের জল, গনগনে আঁচে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জল ফুটে উঠলে কুসুম চা করে নিয়ে এসে আর একটা মোড়া নিয়ে সুদীপের মুখোমুখি বসল এবং বাঘাসনের জমি কেনা থেকে বড়বাজারে হাজরা কোম্পানীর পার্টনার হওয়া পর্য্যন্ত সব বৃত্তান্ত কুসুমকে বলল। সুদীপের কাহিনী শুনে কুসুম একটু অভিমানাহত স্বরে সুদীপকে বলল, "নন্দী কোম্পানী থেকে চলে যাওয়ার পর তুমি মাঝখানে মাত্র একটিবার এসেছিলে, তাও প্রায় বছরখানেক হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে যে ভিতরে-ভিতরে এত কাণ্ড করে বসে আছ সে-খবরটা তো দিদিকে দিয়ে গেলে পারতে।" সুদীপ বলল, "সেইজন্যই আজ এসেছি দিদি, সবেমাত্র আজই দোকানটার উদ্বোধন হয়েছে। এই আনন্দ-সংবাদটুকু তোমায় না দিয়ে পারলাম না বলেই তো সারাদিনের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে মেখে তোমার কাছে এই রাতেই ছুটে এসেছি। কি, তুমি খুশী তো?" সুদীপের কথায় কুসুম বলল, "হ্যাঁ ভাই, নিশ্চয়ই খুশী, এতদিনে অন্ততঃ নিজেকে দাঁড় করাবার

একটা পথ পেলে, এর পর তোমার আরও উন্নতি হোক এইটাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।" এ-কথার পর আরও দু-চারটি টুকিটাকি কথা বলে কুসুমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুদীপ মেসে ফিরল।

মেসে ফিরতেই হীরেন তার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল। খামটা খুলে হাতে নিয়েই সুদীপ বুঝল কার চিঠি। সঙ্গে-সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে খামটা খুলে চিঠিটা পড়তে শুরু করল—

শ্রীচরণকমলেষু

বাবাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিও, তুমি আমার প্রণাম নিও। আশা করি, বাবার শরীর ভাল আছে এবং তুমিও কুশলে আছ। গত ছয় মাস তুমি বাঘাসনে আস নি। যদি সময় পাও তো একবার এসে মাকে দেখে যেও। মায়ের শরীর ইদানীং ভীষণ ভেঙে পড়েছে। মাসে-মাসে ট্রেনভাড়া খরচ করে বাড়ী এসে বিলাসিতা করবার মত আর্থিক আনুকুল্য ঈশ্বর তোমায় দেন নি জানি, তাই আমিও বার-বার তোমায় আসতে লিখি না, কিন্তু এখন অন্ততঃ একবার এসে মাকে দেখে যেও। পার তো বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। মায়ের শরীরের অবস্থা দেখে আমার ও কমলার খুব ভয় হচ্ছে, তাই তোমায় বাড়ী আসতে বলছি। হীরেনদাকে প্রণাম জানাচ্ছি ইতি।

সুরমা

চিঠি পড়ে সুদীপ একটু চিন্তান্বিত হ'ল; কারণ যদিও সুরমা সংক্ষিপ্ত পত্র বার-বারই লিখতে অভ্যস্ত, কিন্তু এবারের পত্র যেন আরও সংক্ষিপ্ত। চিঠিখানা আর একবার পড়ে সুদীপ নিজের মনে বলে উঠে, "হ্যাঁ সুরমা, তুমি ঠিকই লিখেছ—সুদীপ দত্তর মত গরীব যারা, যারা সামান্য মাস-মাইনের কর্ম্মচারী তাদের পক্ষে মাসে-মাসে সপ্তাহে-সপ্তাহে প্রবাস থেকে গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া, মা-ভাই-বোনদের কাছে যাওয়া, স্ত্রীর কাছে যাওয়া এক ধরনের বিলাসিতা বৈকি। তবে চিন্তা নেই সুরমা, এবার বোধ হয় সুদীপ দত্তর কষ্টের সেই দিনগুলো শেষ হয়ে আসছে, এবার বোধ হয় দৈন্যের অন্ধকার গুহার বিশাল গহ্বর থেকে সাচ্ছন্দ্যের সামান্য আলোক-কণাবিচ্ছুরিত পথ তোমাদের দেখাতে পারব।" সপ্তাহে-সপ্তাহে না হলেও মাসে অন্ততঃ একবার হয়ত এবার থেকে বাড়ী যেতে পারব। আর একবার ভাল করে' চিঠিখানা পড়ে সুদীপ মনে-মনে সুরমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিল, কারণ সে বিবাহ করেছে প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তার একটি কন্যাও হয়েছে, কিন্তু সে অনিয়মিত বাঘাসন যাওয়ার জন্য সুরমার কোনদিন অভিমান বা অনুযোগের চিহ্ন নাই। অন্য মেয়ে

হলে হয়ত শুধু এই নিয়েই সুদীপকে অনেক কথা শুনতে হ'ত। সুদীপ বোঝে সুরমার বেদনা কতখানি, কারণ স্বামী থেকেও সে স্বামীসঙ্গ পাচ্ছে না, অথচ অত্যন্ত শান্ত ও সংযতভাবে সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ সে করে চলেছে। সুরমা সংসারে আসার পর থেকেই তার জীবনে উন্নতি আরম্ভ হয়েছে। প্রথম হয়েছে চাকরীতে উন্নতি। তারপর হয়েছে নিজের ব্যবসা। সুরমাকে সংসারে সবাই লক্ষ্মী বলে, আজ সুদীপেরও যেন তাই মনে হ'ল। মনে হ'ল সুরমা যথাসময়ে তার জীবনে না এলে এই সমস্ত উন্নতি হয়ত তার এত তাড়াতাড়ি ঘটত না। সুরমার কথা ভাবতে-ভাবতে এই এক শ' মাইল দূর থেকেই সে মায়ের ও সুরমার সুস্থতার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল।

"সুদীপ পরদিন দোকানে গিয়ে বলরামকে মায়ের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে বলল, আজ তো বৃহস্পতিবার, আসছে শনিবার আমি একবার বাঘাসন যাব। হয়ত সোমবার ফিরতে পারব না, তুই ভাই সে-দিনটা একটু কষ্ট করে চালিয়ে নিস।" বলরাম এ-কথায় সায় দিতেই সুদীপ একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

শনিবার সুদীপ ও সতীন্দ্রবাবু পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী বাঘাসন এসে পৌছল। মায়ের জন্য সুদীপ ফলমূল ও এক বোতল হরলিকস এবং ভাই-বোনেদের জন্য কিছু চানাচুর, বিস্কুট ও মারোয়াড়ীর দোকানের লাড্ডু এনেছিল। সব কিছু সমেত থলিটা এনে মায়ের পায়ের কাছে রেখে মাকে প্রণাম করতেই সুচন্দ্রা দেবী ছেলের চিবুক স্পর্শ করে স্বহস্তে চুম্বন করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, "ভাল আছিস তো?" সুদীপ বলল, "তুমি কেমন আছ মা? তোমার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না বলে তোমার বৌমা লিখেছে, কি কষ্ট হচ্ছে মা?" সুদীপের এই আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় চন্দ্রা দেবীর রোগক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখখানা-যেন কিছুটা সজীব হয়ে উঠল। তিনি ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁরে বাবা, তুই আর তোর বন্ধু বলরাম দু'জনে মিলে নাকি বড়বাজারে একটা দোকান নিয়েছিস?" মায়ের এ-কথায় সুদীপ বিস্মিত হয়ে প্রতি-প্রশ্ন করল, "তুমি কি করে জানলে মা?" চন্দ্রা দেবী হাসতে-হাসতে বললেন, "ওরে বোকা ছেলে, তুই ছাড়া কি কলকাতায় আমাদের আর কেউ নাই?" সুচন্দ্রার এই কথায় সুদীপ লজ্জা পেল এবং বুঝল মনের আনন্দ চাপতে না পেরে তার বাবা সতীন্দ্রবাবুই মাকে চিঠি দিয়ে থাকবেন। সুতরাং সে আর চেপে রাখতে পারল না; বলল, "হ্যাঁ মা, ছোট একটা দোকান নিয়েছি। জানি না চালাতে পারব কিনা?" চন্দ্রা দেবী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "কেন পারবি না? ঠিক পারবি, অন্যায় করবি না, অসৎ পথে যাবি না, লোকের সঙ্গে কথার খেলাপ করবি না, তা হলেই চলবে।" আমি

আশীর্ব্বাদ করছি তোদের দোকান একদিন খুব নাম করবে।" চন্দ্রা দেবীর এ-কথায় সুদীপ মনে-মনে বলল, তাই বল মা, তোমাদের আশীর্ব্বাদই যেন আমার জীবনের প্রধান পাথেয় হয়, আর কিছু চাই না। মুখে সে বলল, "বাবাও বাড়ী এসেছেন মা, একটু পিছিয়ে পড়েছেন, এক্ষুণি এসে পড়বেন।"

সুদীপ কাছে এসে বসতেই সুচন্দ্রার মনের ও দেহের গ্লানি অনেকটা কেটে গিয়েছিল। সতীন্দ্রবাবুও এসেছেন শুনে সুচন্দ্রা দেবীর রোগক্লিষ্ট পাংশুবর্ণ মুখখানি যেন স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে পেল, তখন তিনি মনে-মনে চিন্তা করতে লাগলেন, স্বামীকে কাছ-ছাড়া করে রাখতে হবে, এ-কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি, কিন্তু মানুষের জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে সংসারের সাচ্ছন্দ্যের তাগিদে পরম গুরু স্বামীকেই কাছ-ছাড়া করে দূরে রাখতে হয়েছে। না-জানি মেসের জীবনে কতই না কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ঠাকুর-চাকর কি আর বাড়ীর লোকের মত সেবাযত্ন করতে পারে? আসলে সুচন্দ্রা দেবী তখনও জানতেন না যে, মেসে ঠাকুর-চাকরও নেই, তারা নিজেরাই পালা করে রাঁধে ও হাটবাজার করে। সুচন্দ্রা দেবী জানেন না, তার কারণ সুদীপ বা সতীন্দ্রবাবু কেউ এসব কথা কোনদিন ভুলেও উল্লেখ করেন নি, আর তাঁরা উল্লেখ করেন নি এই কারণেই যে, সংসারে এমন অনেক কাজ আছে বাইরে প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষ মানুষকে অনেক সময়েই যা করতে হয়, কিন্তু ঘরের লোকের কাছে সে-সব কথা উল্লেখ করতে নেই। করলে তাঁদের মনঃকষ্টই বাড়ানো হয়। তা ছাড়া সতীন্দ্রবাবু বা সুদীপের মত দৈন্য-প্রপীড়িত মানুষের কাছে নিজের হাতে সামান্য কিছু গৃহকর্ম্ম করা বা হাটবাজার করা বা ভাত রেঁধে খাওয়াটা এমন কিছু বিরাট বা অসম্মানজনক কর্ম্ম নয়। তাছাড়া নিজের কাজ নিজের হাতে করায় অসম্মানটাই বা কোথায়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে মানুষকে বেশীর ভাগ সময়েই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ দিয়েই জীবনযাত্রা শুরু করতে হয়, এর মধ্যে কোন হীনতা নেই বা থাকা উচিতও নয়। মেসে ঝাঁট-পাট দেওয়া, হাট-বাজার করা বা ভাত রান্না করাটাকে আর পাঁচটা কাজের মতই সহজভাবে নিয়েছিলেন ওঁরা, তাই ও-কথাটা বলবার মত একটা কথাই নয় বলে আর কোনদিন বলা হয়ে ওঠে নি।

সুচন্দ্রা দেবী যখন মেসের চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখনই 'কমলা' 'কমলা' বলে' ডাকতে-ডাকতে সতীন্দ্রবাবু এসে বাড়ীতে ঢুকলেন আর সুদীপ মায়ের কাছ হতে উঠে হাত-পা ধুতে খিড়কীতে চলে' গেল। শ্বশুরের গলার স্বর শুনে সুরমা তাড়াতাড়ি আসন এনে বারান্দায় মায়ের বিছানার পাশে পেতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই সতীন্দ্রবাবু সেখানে বসলেন এবং সুচন্দ্রার মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন,

"কেমন আছ কমলার মা? চন্দ্রা দেবী ধীরে-ধীরে বললেন, "ভাল আছি", বলতে-বলতেই তাঁর দু' চোখের কোণ বেয়ে বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল। এ-অশ্রু যে কিছুটা বেদনার আর কিছুটা আনন্দের তা বুঝতে সতীন্দ্রবাবুর বিলম্ব হ'ল না। দিবাবসানের রক্তিম সূর্য্যালোকে তিনি স্পষ্টই দেখতে পেলেন অদূরবর্ত্তী আগামী চিরবিদায়ের ব্যথায় সুচন্দ্রা বেদনাতুর, কিন্তু বহু দিন অদর্শনের পর স্বামী-পুত্রকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে সাময়িকভাবে তিনি আনন্দিত, তাই একই সঙ্গে একটা ব্যথা ও সুখের সংমিশ্রণ তাঁকে বিচলিত করে তুলল, তিনি কেঁদে ফেললেন। চন্দ্রার অশ্রুতে সতীন্দ্রবাবুর মনটাও ব্যথায় ভরে গেল। তিনি মনে-মনে একবার ভেবে নিলেন যে, শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা, অভাব আর বেদনা ছাড়া এই নারী জীবনে কিই বা পেল। সংসারের জন্য প্রতিটি রক্তবিন্দু জল করে দিল যে, তাকে কি দিতে পারলেন তিনি, কিছুই না। ভাগ্যিস সুদীপের মত সন্তানের তিনি পিতা, না হলে এই রোগশয্যায় দুটো ফলমূলও জোটানো তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভব হত না। সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সতীন্দ্রবাবুরও চোখের কোণে অশ্রু ছলছল করে উঠল। তিনি গালে হাত দিয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে নীরবে শুধু চেয়ে রইলেন। তাঁর অশ্রুপূর্ণ দুটি চোখ যেন মিনতির সুরে বলতে লাগল, "চন্দ্রা, ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার যোগ্য হতে পারি নি, সারা জীবন তোমায় শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্যই উপহার দিয়ে গেলাম। বদলে এই পোড়া সংসারটার জন্য চিন্তা-ভাবনায় শারীরিক ক্লেশে তুমি তোমার জীবনটা শেষ করে ফেললে, তাই আজ বড় অসময়ে তোমায় যেতে দেবার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হচ্ছে।" চিন্তা করতে করতে সতীন্দ্রবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে চন্দ্রা দেবীর গালে পড়তেই চন্দ্রা দেবী রোগশীর্ণ ডানহাতখানি তুলে সতীন্দ্রবাবুর চোখের কোণ দুটো মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন? আমি তো বেশ ভালই রয়েছি আজ।" চন্দ্রা একথা বললেও অভিজ্ঞ সতীন্দ্রবাবু মনে-মনে বুঝলেন—এই ভাল থাকাটাই যে খুব শীঘ্র একদিন একেবারে না-থাকা হয়ে উঠবে সে-কথা চন্দ্রা মনে-মনে বুঝলেও হয়ত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলছে, "আমি ভাল আছি।"

সুদীপ উঠে হাত-পা ধুয়ে ফিরে এসে পুনরায় মায়ের কাছে ঐ আমতলা ঘরের দাওয়াতেই বসল। সুরমা একখানা তালপাতার হাতপাখা নিয়ে মায়ের মাথায় হাওয়া দিচ্ছিল। সুদীপ এসে বসতেই সুরমা সেখান থেকে উঠে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সতীন্দ্রবাবুর জন্য হাত-পা ধোয়ার জল এনে তাঁর পা ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে দিয়ে সুদীপ ও সতীন্দ্রবাবুর জন্য সামান্য জলখাবার এনে দিল। জলখাবার খেতে-খেতে সুদীপ দু-একবার ঘাড়টা তুলে সুরমার

মুখখানা দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু সুরমার মুখটা ঘোমটায় ঢাকা থাকায় তা দেখতে পেল না। তার মনে হতে লাগল ছুটে গিয়ে হাত দিয়ে ঘোমটা একটু সরিয়ে দিয়ে সুরমার মুখখানি একবার দেখে, কিন্তু হায়রে বরাত, যাদের একখানার বেশী দু'খানা ঘর নেই, একখানি ঘর আর বারান্দা যাদের সম্বল তাদের কাছে স্ত্রীর নিকট-সান্নিধ্য লাভের আশা করাটাও সুখস্বপ্ন দেখার মতই অবান্তর ব্যাপার।

জলখাবার খেয়ে সুদীপ একবার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজে বাড়ীর বাইরে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে দেখল মায়ের রোগশয্যার পাশেই বারান্দায় একেবারে পূবদিকের ধার ঘেঁষে অন্যান্য ভাই-বোনেরা সব বই খুলে বসেছে এবং ঐ বারান্দারই পশ্চিম দিকের কোণায় সুরমা ও কমলা রাত্রির আহারের জন্য রান্নার বন্দোবস্ত করছে। উনুনে আগুন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা বাড়ীটা ধোঁয়ায় ভরে গেল এবং সুদীপ চোখের সামনেই দেখতে পেল অসুস্থ মা উঃ আঃ করতে লাগলেন এবং পাঠরত ভাইবোনেরা ধোঁয়ার জ্বালায় চোখ রগড়াতে লাগল। সুদীপেরও চোখগুলো জ্বালা করে জল গড়িয়ে এল। এ-জল যতখানি না ধোঁয়া লাগার জন্য তার থেকেও বেশী এ-জলের মধ্যে দুঃখের লবণ মিশ্রিত ছিল। ঐ ধোঁয়ার মধ্যে অসুস্থ রুগ্ন মাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে; তাঁর যে কত কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে সুদীপের কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে মুখটা মায়ের মুখের কাছে নীচু করে প্রশ্ন করল, "মা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?" সুদীপের কথায় সুচন্দ্রা দেবী ডানহাত দিয়ে চোখ দুটো একটু মুছে নিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, "না বাবা, কষ্ট কিসের?" সুদীপ বুঝল, শত কষ্ট হলেও মা চিরকাল যেভাবে সব সহ্য করে হাসিমুখে সংসার করে এসেছেন, সেইভাবে আজ এই অসুস্থতার মাঝখানেও ধৈর্য্যহারা অস্থির হয়ে পড়েন নি এবং নিজের ক্লেশের কথা মুখ ফুটে বলতে চান না। সুদীপ মায়ের কাছে বসে ধীরে-ধীরে মায়ের পায়ে হাত বুলোতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রা দেবী ঘুমিয়ে পড়লে সুদীপ উঠে ভাই-বোনেদের কাছে গিয়ে বসে তাদের পড়াশুনা দেখিয়ে দিতে লাগে। অবশেষে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। একসময় কমলা খাবার জন্য ডাক দিল। আহারান্তে সুদীপ এসে খিড়কীতে হাত-মুখ ধুয়ে খিড়কীর দরজার কাছে দাওয়ায় বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতের কাজ শেষ করে খাওয়া-দাওয়া সেরে কমলা ও সুরমা বাসন ধুতে ঘাটে এসে দেখে সুদীপ খিড়কীর দরজায় একা-একা বসে আছে। সুদীপকে দেখে কমলা বলে, "একি দাদা, তুমি শুতে যাও নি! বড়মার ঘরে তোমার বিছানা করে দিয়েছি, যাও শুয়ে পড়গে।" একথা বলে কমলা সুরমার সঙ্গে গিয়ে ঘাটে নামল এবং কিছুক্ষণের

মধ্যে বাসনগুলো মেজেধুয়ে ঘাট থেকে উঠে এসে দেখল সুদীপ একই ভাবে সেখানে বসে আছে। তাকে দেখে কমলা আবার বলল, "একি, তুমি এখনও বসে আছ!" সুদীপ বলল, "ভাল লাগছে না রে, এখন শুলেও ঘুম আসবে না, তাই একটু বসে আছি!" কমলা কোন জবাব না দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে বাসনগুলো রেখে আঁচলে হাতটা মুছতে-মুছতে বাইরে দরজার কাছে এসে সুদীপকে বলল, "তোমার মন খারাপ লাগছে?" সুদীপ বলল, "তোদের খুব কষ্ট, না রে কমলা?" কমলা বলল, "কষ্ট কিসের দাদা? আমাদের থেকেও তো অনেক কষ্টে অনেক লোকই রয়েছে, তাদের থেকে তো আমরা অনেক ভাল আছি।" একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুদীপ স্বগতোক্তির মত বলল, "হ্যা, খুব ভাল আছিস; একখানা ঘরে আর বারান্দায় ভাল আছিস; ভাল আছিস বলেই তো রুগ্ন মাকে অসুস্থ শরীরে ঐ বারান্দাতেই রাত কাটাতে হচ্ছে, ঐখানেই রান্না, ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া, ঐখানেই পড়াশুনা, ঐখানেই সব।" কথাগুলো বলতে-বলতে সুদীপের গলাটা ধরে এল, আর কমলা এবার বুঝল দাদার ব্যথাটা কোথায়। কমলা জানে নিজের জন্য দাদা যতটা না ভাবে সংসারের জন্য সে সেই কোন্ ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা করে। দাদার কাছে-কাছে থেকে এবং বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়ে কমলাও বরাবরই দাদার ও মায়ের ভাবনার ভাগ নিয়ে এসেছে। কেমন করে কবে কোন্ শিশুকাল থেকেই তার যেন মনে হয়েছে যে, তাদের সংসার গরীবের সংসার, অভাবের সংসার, এ-সংসারকে গায়েগতরে খেটে কোনও রকমে দাঁড় করাতেই হবে। তাই কমলা অত্যন্ত শৈশবাবস্থা থেকেই এ সংসারের জন্য নীরবে শত কর্ম্ম করে যাচ্ছে। এখন অবশ্য তার কর্ম্মের সঙ্গিনী হয়েছে তার বৌদি সুরমা, যে তার কাজের বেশীর ভাগটাই তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে।

কমলা ও সুদীপের কথার মধ্যে কখন যে সুরমাও ঐ খিড়কীর দরজার কাছে এসে বসেছিল তা তারা কেউই টের পায় নি। টের পেল তখনই, যখন সুরমা তার স্বভাবসুলভ নম্রকণ্ঠে বলে উঠল, "ঠাকুরঝি, তোমরা ভাইবোনে সারারাত এখানে বসে কি দুঃখের কথাই কইবে? বাড়ীর ভিতরে যাবে না?"

সুরমার কথায় কমলার খেয়াল হয় যে, দাদা আজ বহু দিন পরে বাড়ী এসেছে আর বৌদি মিলনের ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে। বৌদির কথায় ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কমলা বলল, "হ্যা বৌদি, চল।" সুদীপেরও খেয়াল হল, সত্যিই অনেক রাত হয়েছে, তা ছাড়া পথশ্রমের ক্লান্তিটা এবার যেন পাকে-পাকে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সবাই উঠলে সুরমা খিড়কীর 'নাচ'টায় খিল তুলে দিল এবং গুটিগুটি পায়ে এসে বড়মার ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে সুরমা দেখল সুদীপ আগেই

এসে বড়মার তক্তাপোষের উপর টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। খুব ধীরে-ধীরে প্রায় নিঃশব্দে ঘরের খিলটা বন্ধ করে দিয়ে সুরমা এসে সুদীপের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তার পায়ে আস্তে-আস্তে হাত বুলোতে লাগল। পায়ে কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে সুদীপ চোখ মেলে চাইতেই ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা ছোট্ট কেরোসিনের ডিবের আলোতে পায়ের কাছে সুরমাকে দেখে এক ঝটকায় উঠে তার হাত দুটো ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "তোমার স্থান ওখানে নয় সুরমা, ওখানে নয়, এখানে," বলে বুকের উপর তাকে চেপে ধরল। সুদীপের এরূপ আচম্বিত আকর্ষণে সুরমা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল, ফিসফিস করে সে বলল, "আঃ ছাড়, কি যে কর, ছাড় না! মেয়েটা পাশে শুয়ে আছে দেখছ না, এক্ষুণি জেগে যাবে, ছাড় ছাড়।" সুরমা যতই বলতে লাগল 'ছাড় ছাড়' সুদীপ ততই তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরতে লাগল, অবশেষে হার মেনে সুরমা নিজেকে সুদীপের হাতে ছেড়ে দিল। দুঃখতপ্ত বিরহতপ্ত দুটি তরুণ-তরুণীর বুকে যেন সপ্ত সাগরের প্লাবন নেমে এল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সুদীপ পাশে হাত বাড়িয়ে দেখল সুরমা নেই, ঘুমিয়ে আছে শুধু কচি মেয়েটা; সুদীপ উঠে বাচ্চাটাকে একটু আদর করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে সুদীপ দেখল সুরমা দুয়োরে উঠোনে গোবর জলের ন্যাতা দেওয়া শেষ করে রান্নার চালা নিকোচ্ছে আর কমলা ইতিমধ্যেই দু-জাঁত ধান সিদ্ধ করে উঠোনে ঢেলে কোমরে আঁচল বেঁধে আর এক জাঁত ধান নামাতে ব্যস্ত। সাত সকালে ঘর থেকে বের হয়ে বৌকে ও বোনকে ঐ অবস্থায় দেখে সুদীপের মনটা আবার ব্যথায় ভরে গেল। সে মনে-মনে ভাবল, কার ভাগ্য কোথায় কাকে নিয়ে গিয়ে কোন্ ভাবে কি কাজ করিয়ে নেয়, কে জানে। না হলে যে সুরমা শিশুকাল হতে শহুরে মানুষ, সে নিকোচ্ছে উঠোন-চালা, আর কমলা যবগ্রামের যশবাড়ীর মত অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহবধূ হয়েও দুর্ভাগ্যের ফেরে বাপের বাড়ীতে ফিরে এসে কোমর বেঁধে ধান সিদ্ধ করছে। নিঃশব্দে দু'জনে কাজ করে যাচ্ছে। সুদীপ আমতলা ঘরের বারান্দায় এসে মায়ের দিকে চেয়ে দেখে মা তখনও ঘুমুচ্ছে। সুদীপ খিড়কীর দরজাটা খুলে পুকুরপাড়ের নিমগাছ হতে একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে ভাবতে থাকে সব আগে একটা বাড়ী চাই, বাস করবার মত দু'খানা ঘর চাই। ভাবতে-ভাবতে সুদীপের মনে হয় অনেক কিছুই তাদের চাই, আসলে ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে মানুষের জীবনে যা-যা প্রয়োজন তার কিছুই তাদের নেই, শুধুমাত্র সম্প্রতি কেনা চার বিঘা জমির ভাগের ধান ছাড়া। সংসারের এই অনেক কিছু না থাকাটাকে সামান্য কিছু থাকায় পরিণত

করতে গেলেও সুদীপকে অনেকখানি করতে হবে অর্থাৎ অনেক খাটতে হবে। কুসুমদিদির ভাষায় যাকে বলে ভাগ্যের চাকাটায় কাঁধ লাগিয়ে জোরসে ঠেলতে হবে। একথা-সেকথা ভাবতে-ভাবতে সুদীপ খিড়কীতে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে দেখে ইতিমধ্যেই সুরমা হাতের কাজ শেষ করে চা তৈরী করেছে এবং হাতে একেবারে আনকোরা কাপ-ডিসে চা নিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে-হাসতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। সুরমার হাতে চায়ের কাপ-ডিস দেখে সুদীপ বুঝতে পারে নিশ্চয়ই তার বাবা চায়ের ব্যবস্থা করিয়েছেন এবং শিশুকাল হতে নগরজীবনে অভ্যস্তা সুরমা বিয়ের পর এত বছর বাদে তার শ্বশুরালয়ে চায়ের ব্যবস্থা হতে দেখে আনন্দিতই হয়েছে। সুদীপ সুরমাকে বলল, "মাকে দিয়েছ ?" সুদীপের কথায় সুরমা জবাব দেবার আগেই চন্দ্রা দেবী বললেন, "না বাবা, তোরা খা, আমাকে আর এ-অবস্থায় নতুন করে চায়ের নেশা ধরাস না।" একথা বলেই চন্দ্রা দেবী সুরমার দিকে চেয়ে বললেন, "বৌমা, তুমিও একটু খাও না মা।" শাশুড়ীর কথায় সুরমা নিম্ন কণ্ঠে "না মা, আমি চা খাই না," বলে সুদীপের হাতে চায়ের কাপটা দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। "আমি চা খাই না," কথা শুনে সুদীপ একটু বিস্মিত হলেও চন্দ্রা দেবী তাঁর লক্ষ্মী পুত্রবধূটির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে লাগলেন, "জানিস বাবা, তিন বছর হ'ল তোর বিয়ে হয়েছে, বৌমা ঘরে এসেছে, কিন্তু আমাদের অতি-বড় শত্রুও বৌমার নামে কোনদিন কোন নিন্দে করতে পারে নি। এই তো সেদিন চাটুজ্জ্যেদের সেজ গিন্নী যিনি কারো না কারো নিন্দে না করে জল খান না তিনিও বৌমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বললেন, "অমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে নাকি এ-গাঁয়ে একটিও নাই। আহা, মুখে কথা নেই, সারাদিন মুখ বুজে কত কাজই না করে, রাস্তায় ঘোমটা দিয়ে চলে, আজ পর্যন্ত কেউ তার মুখটি পর্যন্ত দেখতে পায় নি, শহরের মেয়ে অথচ কি সুন্দর কথাবার্ত্তা, কত নম্র, গুরুজনে কত ভক্তি। দত্ত-বৌ, তুমি ভাগ্যি করেছিলে বটে, তাই অমন বৌ পেয়েছ।"

মায়ের মুখে সুরমার প্রশংসার কথা শুনে' সুদীপ মনে-মনে খুশীই হ'ল, কিন্তু খুশীর ভাবটা চেপে গম্ভীরভাবেই সে মাকে বলল, "ও আর কি এমন করছে মা, এ তো ওর কর্ত্তব্য। তুমি তো এই সংসারটার জন্য খেটে-খেটে জীবনটাই নষ্ট করে' ফেললে। কমলাও তো সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে এই সংসারের জন্য প্রাণপাত করছে।"

সুদীপের কথায় চন্দ্রাদেবী দরদভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন, "ও-কথা বলিস না বাবা, হীরেনের মুখে তো শুনেছি সুরমা-মা আমার বেয়াই-মশায়ের কত আদরের মেয়ে, কত যত্নে মানুষ, এখানে আমাদের সংসারে তার আদরের কথা, স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তো দূরে থাক, সব দিন দু'বেলা পেট ভরে সামান্য দু'মুঠো ভাতও

দিতে পারি না। মায়ের আমার অনেক গুণ, তাই আমাদের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে, মুখের হাসি বজায় রেখে সংসারের সব কাজ করে। সত্যিই রে সুদীপ, এ-রকম লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না।" মায়ের কথা শুনে সুদীপের অন্তরটা আনন্দে ভরে উঠল। আপন গুণে সুরমা মায়ের এবং আশপাশের পরিবার-পরিজনের সকলের মন জয় করে নিতে পেরেছে বুঝে সুদীপের বুকটা অনেক হাল্কা হ'ল। শত দুঃখের মধ্যেও এইটুকুই তার সান্ত্বনা। এই মুহূর্তে সুদীপের বিয়ের আগে হীরেনের বলা কথাগুলো মনে পড়ল। হীরেন বলেছিল, "এইরকম গুণবতী মেয়ে লাখে একটিও মেলে কিনা সন্দেহ।" আজ মায়ের কথা শুনে সুদীপের আরও মনে হ'ল সত্যিই সুরমা তার জীবনে আসার পর থেকেই তার চাকরীর উন্নতি হয়েছে এবং চাকরী ছেড়ে ব্যবসায় নামতে পেরেছে অর্থাৎ মা যা বলেছেন হয়ত তাই, সুরমা হয়ত সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে যার সুলক্ষণের গুণে দৈন্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সংসারটায় সত্যি-সত্যিই হয়ত একদিন স্বাচ্ছন্দ্যের আলো ফুটবে। কে জানে এই সংসারে কার ভাগ্যে কে খায়।

সকালে মায়ের কথা শুনে সুদীপ যখন সুরমা সম্পর্কে এই সব কথা ভাবছিল ঠিক তখনই বাইরে থেকে কে যেন 'সুদীপ' 'সুদীপ' বলে তাকে ডাক দিল। সুদীপ বাইরে এসে দেখল ভট্টাচার্যদের অনিমেষ। অনেক দিন পরে অনিমেষের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুদীপ খুব খুশী হ'ল, অনিমেষও সুদীপের ডানহাতখানা ধরে সৌহার্দ্দের উষ্ণ স্পর্শে প্রকম্পিত করে তুলল। এর পর দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করে রাস্তায় এসে পৌঁছলে অনিমেষ বলল, "চল সুদীপ, ঢেঁড়ে-ডাঙ্গার পাড় দিয়ে একটু ঘুরে আসি।"

সুদীপ বলল, "হ্যাঁ চল, আমিও ভাবছিলাম মুখ-হাত ধুতে যাব, একাই যেতে হ'ত, তোমায় পেয়ে ভালই হ'ল।" ঢেঁড়ে-ডাঙ্গার উদ্দেশে পশ্চিমমুখী হাঁটতে-হাঁটতে দুই বন্ধুতে সামন্ত-পুকুরের কাছে বাঁশতলায় এসে পৌঁছতেই অনিমেষ বলল, "বাবা আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ কাজে।" "কি কাজ"? সুদীপ প্রশ্ন করল। "কাজটা আর কিছুই নয়, আমাদের কিছু জমিজায়গা, বাড়ীঘর, পুকুর-বাগান ইত্যাদি বিক্রয় করবার ইচ্ছা আছে। তোমার কাছে লুকোবার তো কিছুই নেই, তুমি তো জানই বাবার ভীষণ মর্য্যাদাজ্ঞান, তাই এই বিক্রয়ের ব্যাপারটা তিনি চুপিচুপি সারতে চান, অর্থাৎ বেশী লোক-জানাজানি যেন না হয়। তাছাড়া তুমি তো কিছুদিন আগেই হাঁয়দার বাকুরী কিনেছ বেশ দাম দিয়েই, তাই বাবা ভেবেছেন তোমার কাছে উচিত মূল্যও পাওয়া যাবে অর্থাৎ ছ'কড়ায় ন'কড়ায় বিক্রয় করতে হবে না; তুমি একবার সন্ধ্যে বেলায় বাবার সঙ্গে দেখা করো. বাবার বিশেষ অনুরোধ।" অনিমেষের কথায় সুদীপ একেবারে থ,

কারণ ভটচাজদের রমেনবাবু বিক্রয় করবেন সম্পত্তি আর সেই সম্পত্তি কিনবে সুদীপ! সুদীপ মনে-মনে ভাবতে লাগল, "হায় ভগবান, একি পরিহাস, না, সত্য! যদি সত্যিই হয় তাহলেও তো সুদীপ নাচার, কারণ সুদীপের এত পয়সা কোথায়। হাতে যা ছিল তার সবটা দিয়েই তো দোকান দিয়েছে। এখন অন্ততঃ বেশ কিছুদিন না কাটলে তো হাতে কিছুই জমবে না। তা ছাড়া ভটচাজদের সব সম্পত্তিই তো ভাল-ভাল সম্পত্তি এবং বেশ দামী সম্পত্তি। তার ছিটে-ফোঁটা নেবারও ক্ষমতা যে সুদীপের নেই একথা সে অনিমেষকে এই মুহূর্ত্তে বোঝায়ই বা কি করে?" মনে-মনে যাই-ই ভাবুক, সুদীপ অনিমেষকে বলল, "তুমি কি ক্ষেপেছ অনিমেষ? আমার পয়সা কোথায়? যা ছিল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বড়বাজারে একটা দোকান করেছি পার্টনারশিপে, হাত একেবারে খালি, এখন তোমাদের সম্পত্তি তো দূরের কথা, এখন যদি পাঁচ কাঠা জমির কথা কেউ বলে তাও নেবার আমার ক্ষমতা নেই।" সুদীপের কথায় অনিমেষ বলল, "তোমাকে তো এক্ষুণি নিতে হচ্ছে না বা একবারে নিতে হচ্ছে না, তুমি ধীরে-ধীরে দু-চার বিঘে করে নাও, জমি না নাও তোমার তো ভদ্রাসন বাড়ী নেই, আগে আমাদের নতুন বাড়ীটা নাও, পরে জমি বা পুকুর নিও। আসলে বাবার ইচ্ছা এখান থেকে সব বিক্রী-বাটা করে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে যাবেন।" অনিমেষের কথায় সুদীপ চমকে উঠল, "নতুন বাড়ী! তোমরা নতুন বাড়ীও বিক্রী করবে! আচ্ছা কি ব্যাপার বলত অনিমেষ? সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তোমরা কি সত্যিই কলকাতাবাসী হতে চাও? না, না, অনিমেষ, এটা ভাল নয়, জ্যাঠামশায়ের মত একজন কড়া মানুষ এ-গ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। লোকে এক কথায় বাঘাসন বলতে রমেন ভটচাজকেই চেনে। সেই রমেন ভটচাজ না থাকলে কি বাঘাসন মানায়!" আবেগের বশে কথাগুলো বলে ফেললেও সুদীপ এও জানে যে, তার জ্যাঠামশায়ের প্রতি বিশেষ দুর্ব্বলতা থাকতে পারে, কারণ তিনি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু অনিমেষের বাবা। কিন্তু আবার ঐ মানুষটাই এ-গ্রামের বা আশপাশের অনেক গ্রামের নিকট নৃশংস অত্যাচারী মামলাবাজ জমিদার।

জমিদার কথাটা মনে আসতেই সুদীপের একবার মনে হ'ল জমিদার কথাটা সৃষ্টি হল কোথা থেকে কে জানে। যার টাকা আছে সে টাকার জোরে বিস্তর জমি কিনে ফেলে রাতারাতি জমিদার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই কি উচিত? জমি তো প্রকৃতির সৃষ্টি, ঈশ্বরের সম্পদ, তার উপর মানুষ কেন যে যুগে-যুগে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করে 'আমার জমি' 'আমার জমি' করে ঝগড়াঝাঁটি, মামলামোকর্দ্দমা থেকে রক্তারক্তি কাণ্ড পর্য্যন্ত করে ফেলে তার উত্তর কে দেবে?

মানুষ যতই জমি-জায়গা, বাড়ীঘর, পুকুর-বাগান ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, লড়াই করে, প্রকৃতি আড়াল থেকে ততই হাসেন। কারণ বরাবরই দেখা যায় পুরুষানুক্রমে কোন সম্পত্তিটাই কারো অধিকারে থাকে না। হাতবদল হয়ই। অথচ জমিজায়গা একেবারে কিছু না থাকলে মানুষের নিজেকে হীন বলে মনে হয়, মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত মেলে না। প্রকৃতি ও মানুষের এ যেন এক লুকোচুরি খেলা। কবে কোন্ অনাদি কালে যে এ-খেলার শুরু আর কবে যে এ খেলার শেষ তা হয়ত স্বয়ং ঈশ্বরও বলতে পারেন না।

সুদীপ যখন আপন মনে এই সব ভাবছে অনিমেষ তখন আবার তার হাত-খানা ধরে বলল, "কি ভাবছ? তুমি নিতে পার বা না পার সন্ধ্যেবেলায় বাবার সঙ্গে অন্ততঃ একবার দেখা করো—এইটুকু আমার অনুরোধ।" সুদীপ বলল, "আচ্ছা সন্ধ্যেবেলায় আমি নিশ্চয়ই যাব।" এর পর দুই বন্ধু ঢেঁড়ে-ডাঙ্গার পাড় থেকে ঘুরে গল্প করতে-করতে পুনরায় গ্রামে প্রবেশ করে যে-যার বাড়ী চলে গেল।

বাড়ীতে এসে সুদীপ একবার ভাবল বাবাকে সব কথা খুলে বলবে, কিন্তু অনিমেষ নিষেধ করেছে কথাটা পাঁচ কান করতে। তাই কথাটা আপাততঃ সতীন্দ্রবাবুর কাছ থেকেও সে আড়াল করে রাখল। সারা সকাল-দুপুর নানা কাজে কাটিয়ে সুদীপ বিকেলের দিকে কেঁকের পাড় দিয়ে কাঁদরের দিকে বেড়াতে বের হল। ধীরে-ধীরে পায়ে-পায়ে কাঁদরের ধারে এসে একেবারে কিনারা ঘেঁষে বসে কাঁদরের দিকে তাকিয়ে দেখল কাঁদর একদম মরা, মাঝখান দিয়ে ক্ষীণ সামান্য একটু ধারা অত্যন্ত মৃদু গতিতে বয়ে চলেছে। সুদীপের একবার মনে হল হঠাৎ যদি কোন জায়গা থেকে বিরাট এক জলরাশি এসে কাঁদরটাকে ভরে তুলত আর তার দু'কূল ছাপিয়ে কলকল খলখল করে জলের স্রোত বইতে আরম্ভ করত তাহলে বেশ ভাল লাগত দেখতে, কিন্তু তা তো হবার নয়। প্রত্যেক বছরে এ সময় কাঁদর মরাই থাকে আর ফুলগাঁ, বেলেগুা প্রভৃতি ভিন্-গাঁয়ের মানুষ অনায়াসে হেঁটে কাঁদর পারাপার করে। সুদীপের আবার মনে হল কোথাও থেকে জল নিয়ে এসে হঠাৎ যদি সে কাঁদরটার ঐ ক্ষীণ ধারার মধ্যে প্রচণ্ড একটা গতি এনে দিতে পারত তাহলে দেশের মানুষ অবাক হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা তো আর হয় না, তাই যেমন এই মুহূর্তে সে কাঁদরের ধারায় গতি সঞ্চারিত করতে পারে না, তেমনি নিজের জীবনের দৈন্যের এই অন্ধকার খাদগুলোকেও সে রাতারাতি সাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের আলো দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারে না। নদীর স্রোতে গতি আনতে গেলে যেমন সময়কে এগিয়ে যেতে দিতে হয়, বর্ষাকে আসতে দিতে হয়, তেমনি জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার

জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। বিনা পরিশ্রমে বা আচম্বিতে কিছুই হয় না, কিন্তু সুযোগ এলে তার যদি সদ্ব্যবহার না করা হয় তা হলে সে-সুযোগ জীবনে পুনরায় নাও আসতে পারে; তাই অনিমেষের সকালের কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে সুদীপ মনে-মনে ভেবে স্থির করল সত্যিই যদি জ্যাঠামশায় কিছু সম্পত্তি তাকে দিতে চান তো এ-সুযোগ কিছুতেই হাত-ছাড়া করা চলবে না। যেভাবেই হোক নিতে হবে। সে মনে-মনে ভেবে ঠিক করে নিল প্রয়োজন হলে কুসুমের কাছে গিয়ে সে হাত পাতবে বা কমলার গহনা বাঁধা রেখে অন্য কোথাও টাকা ধার নিয়েও কিছু সম্পত্তি বিশেষ করে ঐ নতুন বাড়ীটা নিতেই হবে। ওরকম ভিটে হাত-ছাড়া হয়ে গেলে এ-জীবনে আর কোনও দিন এ-সুযোগ নাও আসতে পারে। মনে-মনে কি ভেবে সুদীপ তক্ষুণি কাঁদরধার হতে বাড়ী ফিরবার জন্য উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই সুদীপের নজরে পড়ল বিকেলের অস্তগামী সূর্য্য যেন রক্তিম আলোর হাসির ইশারায় তাকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করতে চাইছে। সে ক্ষণকালের জন্য সূর্য্যের দিকে চেয়ে হাত জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে মনে-মনে বলে উঠল, "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্, ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।" সে আরও বলল, "হে ব্রহ্মাণ্ডের আলোকের আধার, তুমি আমায় আলো দাও, বল দাও, শক্তি দাও, পথ দেখাও।" সূর্য্যপ্রণামান্তে পূর্ব্বমুখী হয়ে হেঁটে আসতে-আসতে পথে তিরুলীর পাড়ে উঠবার সময় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অশ্বত্থতলায় হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা জাতসাপ বামদিক থেকে সর-সর করে ডানদিকে চলে যাচ্ছে। মুহূর্ত্তের জন্য সুদীপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিরাট ঐ কেউটে সাপটা আস্তে-আস্তে গিয়ে তিরুলীর জলে নামল এবং সাঁতার দিয়ে জল পেরোতে লাগল। বামদিক থেকে সাপটার ডানদিকে যাওয়ার ব্যাপারটাকে শুভ লক্ষণ ভেবে নিয়ে মা মনসার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে সুদীপ বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

বাড়ী এসে সুদীপ দেখল ইতিমধ্যেই তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো হয়েছে এবং ধুনুচি নিয়ে সুরমা আরতির ভঙ্গীতে তুলসীমঞ্চে ধুনো দেখাচ্ছে। ধুনো দেখানো হলে ধুনুচিটা পাশে নামিয়ে শাঁখ নিয়ে সুরমা পরপর তিনবার শঙ্খধ্বনি করল এবং সব শেষে গলায় আঁচল জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করল। দাওয়ায় বসে সুরমার সন্ধ্যে দেখানো দেখে সুদীপের আর একদিনের কথা মনে পড়ল যেদিন নবস্থা থেকে আসার সময় মায়ের জন্য একখানা লালপাড় শাড়ী এনে মাকে দিয়ে বলেছিল, "এই শাড়ীটা পরে তুমি সন্ধ্যে দেখাও মা।" সেদিনের সেই ছবিটা হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে সুদীপের চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল।

সেদিন সুদীপের কথায় মা লালপাড় শাড়ী পরেই সন্ধ্যে দেখিয়েছিলেন আর ঠিক সেই রকমই একখানা অল্প দামের লালপাড় তসরের শাড়ী প'রে সুরমা তুলসীতলায় সন্ধ্যে দেখাচ্ছে। সেদিন মা আর আজ তার স্ত্রী এই দুটো ছবিকে পাশাপাশি দেখতে গিয়ে সুদীপের অন্তরটা তৃপ্তিতে ভরে গেল; হঠাৎ মায়ের প্রতি একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করে সে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "এ-বেলায় কেমন আছ মা?" ছেলের প্রশ্নের জবাবে মা বললেন, "ভালই আছি বাবা।" সুদীপ বলল, "বর্দ্ধমান থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে দেখাই? এ-ভাবে তোমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে মা।" ছেলের এ-কথার উত্তরে সুচন্দ্রা দেবী বললেন, "বর্দ্ধমান থেকে বড় ডাক্তার এনে তোর মামা তো কয়েক বারই দেখালেন, কিন্তু উপকার তো কিছুই হল না বাবা, তুই আর মিছিমিছি খরচ করবি কেন? যে কটা দিন বাঁচি আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দে বাবা, শুধু-শুধু একগাদা টাকা খরচ করে ঝুড়ি-ঝুড়ি ওষুধ আর ইঞ্জেকশানদিয়ে কি হবে বল? এতদিন তো ওষুধ খাচ্ছি, ভাল হবার হলে নিশ্চয়ই এতদিনে কমে যেত।"

একথার উত্তরে সুদীপ বলল, "তাই বললে হয় মা! মামা তো শৈলেনবাবুকে দেখিয়েছেন, আমি একবার না হয় অন্য ডাক্তার নিয়ে এসে দেখাই। তুমি আপত্তি করো না মা! আমি একবার পাঁচুবাবুকে নিয়ে এসে দেখাই।"

সুদীপের কথায় চন্দ্রা দেবী বললেন, "যে ডাক্তারই দেখাস, আমার আর কোন উপকার হবে না, আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার আর খুব বেশীদিন নাই; গোনা দিনে পড়েছে।"

মা যাই-ই বলুন, সুদীপ তক্ষুণি মেজভাই প্রদীপকে ডেকে বলল, "সকালে উঠেই বর্দ্ধমান গিয়ে ডাঃ পঞ্চানন রায়কে নিয়ে আসবি ও মাকে দেখাবি। তাঁর ফিজের টাকা ও গাড়ী ভাড়ার টাকা আমি মায়ের কাছে দিয়ে যাচ্ছি!" দাদার কথা শুনে প্রদীপ বলল, "পাঁচুবাবু তো মন্তেশ্বরে চেম্বার খুলেছেন আর প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে এখানে আসেন। সকালে গিয়ে নাম লিখিয়ে দিলে উনি মন্তেশ্বর থেকে এখানে এসে মাকে দেখে যাবেন।" প্রদীপের মুখে পাঁচুবাবুর মন্তেশ্বরে আসার খবর পেয়ে সুদীপ আশান্বিত হয়ে বলল, "তাহলে তুই ভোর-ভোর গিয়ে পাঁচুবাবুকে আনবার ব্যবস্থা করবি, ভুল যেন না হয়।" সুদীপের কথায় সায় দিয়ে প্রদীপ বলল, "না দাদা, ভুল হবে না, তুমি দেখো আমি তাঁকে ঠিক ধরে আনব, তবে পাঁচুবাবুর ফি বড্ড বেশী, ভিন্ন গাঁয়ে যেতে উনি আজকাল চার টাকা করে নেন।" প্রদীপের কথায় সুদীপ বলল, "আমি মায়ের হাতে পনর টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তুই খরচের কথা ভাবিস না, সকালেই গিয়ে পাঁচুবাবুকে কল দিয়ে রাখিস।"

সুদীপের কথায় সায় দিয়ে প্রদীপ নিজের বইপত্র নিয়ে দাওয়ার এক কোণে পড়তে বসল। প্রদীপের বই নিয়ে পড়তে বসা দেখে এবং বড়দা সামনে বসে আছে দেখে অধীপ ও নির্ম্মলাও বই নিয়ে বসে উঁ উঁ করতে লাগল।

সন্ধ্যাটা কাটলে পথঘাট একটু অন্ধকার হলে সুদীপ কাউকে কিছু না বলে অনিমেষের নির্দ্দেশ মত ভটচাজবাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছতেই দেখতে পেল যে, সেখানে রাস্তার ধারে উঁচু দাওয়ায় অনিমেষ একলা চুপটি করে বসে আছে। সুদীপ আসতেই অনিমেষ তাকে বলল, "এখানেই একটু বস, বাবা এখন আহ্নিক করছেন।" অনিমেষের কথায় সুদীপ সেখানে বসলে দুই বন্ধুতে দুই সংসারের কথা সুখদুঃখের টুকিটাকি কথা হতে লাগল। অনিমেষেরও বিবাহ হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল, অথচ তার সন্তানাদি না হওয়ায় তার মনে সবসময় একটা বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। কথায়-কথায় সেই কথা তুলে অনিমেষ বলল, "মাঝে-মাঝে জীবনটাকে ভীষণ বিস্বাদ লাগে ভাই। একটা সন্তানের জন্য দেবলা দিনরাত কান্নাকাটি করে অথচ ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে আমাদের সন্তান হোক, কি যে করি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না।" সুদীপ যদিও জানত অনিমেষ সন্তানাদি না হবার জন্য বহুবার ডাক্তার দ্বারা নিজেকে ও তার স্ত্রী দেবলাকে পরীক্ষা করিয়েছে তবুও সান্ত্বনা দেবার জন্য আর একবার বলল, "তুমি আর একবার কোন ভাল ডাক্তারকে দেখাও যদি কিছু হয়।" সুদীপের কথায় অনিমেষ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "বিধি যেখানে বাদ সেধে বসে আছেন সেখানে ডাক্তার আর কি করবে বল, আমি কি আর ডাক্তার দেখাতে কসুর করেছি?"

দু'জনে কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময় ভটচাজবাড়ীর বিশ্বস্ত চাকর রঞ্জন এসে অনিমেষকে বলল, "বড়বাবু আপনাকে ডাকছেন।" অনিমেষ সুদীপকে একটু বসতে বলে ভিতরে গিয়ে ঘুরে এসে বলল, "চল, বাবার আহ্নিক হয়ে গেছে, তোমাকে ডাকতে যেতে বলছিলেন, তাই আমি বললাম সুদীপ বাইরে এসে বসে আছে। চল ভাই বাবার কাছে চল।"

অনিমেষের সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপ বৈঠকখানায় উঠে এসে দাওয়ায় পেতে-রাখা একখানা সতরঞ্চের উপর বসলে মুহূর্ত্তের মধ্যে রমেনবাবুও এসে পাশে-রাখা আরাম কেদারায় বসলেন। তিনি আসতেই সুদীপ দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে পায়ের ধূলো মাথায় ঠেকিয়ে আবার সতরঞ্চের উপর বসল। সুদীপের সম্মান জানানোর এই ভঙ্গীটি বরাবরই রমেনবাবুর বেশ ভাল লাগে। তাই তিনি বরাবরের মত আজও সুদীপের মাথায় হাত রেখে খুশী মনে আশীর্ব্বাদ করলেন। এরপর সামান্য কিছু পারিবারিক কুশল সংবাদ বিনিময়ের পর তিনি আসল কথাটা

পাড়লেন, বললেন, "সকালে অনিমেষের মুখে সব শুনেছ তো?" সুদীপ ছোট্ট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।" "তাহলে তুমি পারবে তো?" জ্যাঠামশায়ের কথা বলার ভঙ্গীতে সুদীপ বুঝল অনিমেষ তাঁকে হয়ত এমনভাবে বলেছে যে, তিনি মনে করেছেন সুদীপ তাঁর সম্পত্তি নিতে রাজী হয়েই এসেছে, তাই তাঁর ভুলটা ভাঙবার জন্য সুদীপ অত্যন্ত বিনয়নম্র কণ্ঠে বলল, "জ্যাঠামশায় আপনি তো আমাদের অবস্থার কথা সবই জানেন, আপনার কাছে তো লুকোবার কিছুই নেই। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এমন আমাদের অবস্থা, আমি সম্পত্তি কিনব কি করে?"

সুদীপের এ-কথায় রমেনবাবু বললেন, "ছাখ বাবা, আমি সবই জানি, এও জানি যে, তোমার হাতে পয়সা নেই, তবু তোমায় বলছি এই কারণে যে, তুমি আমার অনিমেষের ছোটবেলাকার বন্ধু, আর ও আমার বড় আদরের সন্তান, ওর ইচ্ছা আমাদের সম্পত্তির কিছু-কিছু তোমাকে দিই।"

সুদীপ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝল যে, রমেনবাবুর আসল দুর্বলতাটা কোথায়। তাই সে বেশ পরিষ্কার করে বলল, "কিন্তু জ্যাঠামশায়, পয়সা যার নেই, আপনি ভালবেসে বা স্নেহের বশে তাকে সম্পত্তি বিক্রয় করতে চাইলেও সে নেবে কি করে? বুঝলাম আপনি অনিমেষকে যে-দৃষ্টিতে দেখেন আমাকেও সেই-দৃষ্টিতেই দেখেন, কিন্তু আমি যে নাচার জ্যাঠামশায়, আমার যে কানাকড়িও সম্বল নেই?" বলতে-বলতে সুদীপের চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসে, তার গলাটা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। রমেনবাবু সুদীপের কণ্ঠস্বরে বোঝেন যে, এত বড় একটা সুযোগ তার সামনে অথচ তার হাতে পয়সা নেই, কেনবার সামর্থ্য নেই বলে আবেগে বুক ঠেলে তার কান্না এসে গেছে। রমেনবাবু পাকা সংসারী লোক, ঝানু জমিদার, তাই সুদীপের এই মুহূর্তের মানসিক দ্বন্দ্বের কথা চিন্তা করে ধীরে-ধীরে বললেন, 'ছাখ বাবা, কিছু জমি, ঢেঁড়ে ডাঙ্গা পুকুর আর নতুন বাড়ী আমি তোমাকেই দেব। তুমি সব কিছু মিলিয়ে দাম ঠিক করে নিয়ে একটা কোবালা করে নাও। যখন যেমন টাকার যোগাড় করে উঠতে পারবে তখন সেইটা রেজিষ্ট্রী করে দেব। এতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

রমেনবাবুর এ-কথায় সুদীপ চোখ বড়-বড় করে একবার তাঁর দিকে তাকালে, রমেনবাবুও লক্ষ্য করলেন। মুহূর্ত্ত কয়েক আগে চুপসে-যাওয়া ছেলেটি তাঁর এ-কথায় যেন হাতে চাঁদ পেল, তাই আনন্দে বিহ্বল হয়ে তার চোখের উজ্জ্বলতা বেড়ে গেল। এর পর সুদীপ ধীরে-ধীরে উঠে জ্যাঠামশায়ের পায়ের তলায় গিয়ে তাঁর পা দুটোকে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলে উঠল, 'আপনি দেবতা জ্যাঠামশায়, আপনি

দেবতা, এ-রকম সুযোগ আমি জীবনে পাব এ-কথা কোনদিন ভাবতেও পারি নি। এ-রকম সুযোগ যদি আপনি দেন আর আপনার আশীর্বাদ যদি থাকে তো আমি নিশ্চয়ই পারব।'

সুদীপের এ-কথায় রমেনবাবু খুব গম্ভীর ভাবে আবার বললেন, "তুমি তো বাবা আমায় যথেষ্ট সম্মান কর, আশপাশের দু-দশখানা গ্রামে আমার মর্য্যাদা সম্বন্ধেও তুমি ওয়াকিবহাল। দেখ আবেগের বা উচ্ছ্বাসের বশে কথাটা যেন পাঁচকাণ না হয়ে যায়। বুঝতেই তো পারছ আমাদের পারিবারিক মর্য্যাদাটাও কম নয়, কাজটা আমি খুব গোপনে সারতে চাই, তাই তোমাকে এ-কথাটা বলা।"

এ-কথার উত্তরে সুদীপ বলল, "আমি কথা দিচ্ছি জ্যাঠামশায়, এ-কথা আমার মুখ থেকে কেউই শুনতে পাবে না, এমন কি, আপনার বৌমাও না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি কাউকে বলব না। কিন্তু বাবাকে তো বলতেই হবে, তাঁর সঙ্গে যুক্তি না করে এত বড় একটা কাজ আমি করবই বা কি করে আর আপনিই বা আমায় বিশ্বাস করতে পারবেন কি করে?"

"না বাবা, তোমাকে আমার বিশ্বাস আছে। তোমার বাবাকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই। পরে বললেই হবে। আগে দামদস্তুর ঠিক করে কোবালা রেজিষ্ট্রি করে নাও, পরে সতীন্দ্রকে সব বুঝিয়ে বলো। আমি চাই না কথাটা পাঁচকাণ হোক, জানলাম শুধু আমি আর অনিমেষ, আর জানলে তুমি, অপর কেউ জানুক এটা আমি চাই না।"

জ্যাঠামশায়ের এ-কথায় সুদীপ কিঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিত হলেও সে কথা দিল, 'ঠিক আছে, বাবাকেও বলব না, আপনি যা বলেছেন তাই হবে।' এরপর রমেনবাবু বললেন, "তা হলে পরের শনিবারে তুমি বাড়ী এসো এবং দরদস্তুর ঠিকঠাক করে নিয়ে যেও।" সুদীপ রমেনবাবুর কথাতেই সায় দিল এবং আরও কিছু কথাবার্ত্তা বলে বাড়ী চলে গেল, অনিমেষ সুদীপকে সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিল।

বাড়ী এসে সোজা খিড়কীর দরজাটা খুলে দরজার একপাশে বসে সুদীপ ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা কি! নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করবেন তো এত লুকোচুরির কিই বা আছে, আর এত তাড়াতাড়িই বা কেন, তাও আবার ধারে বিক্রয় করাই বা কেন। তবে কি কাক পক্ষীকে টের পেতে না দিয়ে তার জমিজায়গার দামদস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বলে বেশী দামে সম্পত্তিগুলো তাকে গছাতে চান? সতীন্দ্রবাবু জানতে পারলে হয়ত বেশী দামে গছাতে পারবেন না তাই তাঁকে পর্য্যন্ত বলতে নিষেধ করে দিলেন! নাকি, শুধু পারিবারিক মর্য্যাদার কথা ভেবেই এত গোপনীয়তা! নাকি, শুধুমাত্র স্নেহপরবশ হয়ে সুদীপের প্রতি দাক্ষিণ্য

প্রদর্শন! অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেও সুদীপ কিছুই ঠিক করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে উঠে পড়ল এবং ভোর বেলাতেই কলকাতা যেতে হবে বলে সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

কলকাতায় ফিরে সুদীপ হাওড়া স্টেশন থেকে একেবারে দোকানে এসে উঠল এবং দেখল ইতিমধ্যেই দোকানে খরিদ্দারের ভিড় লেগে গেছে। সুদীপকে দোকানে ঢুকতে দেখে বলরাম সামনের চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলে সুদীপ নিজের চেয়ারে বসে হাতে একটু গঙ্গাজল নিয়ে গায়ে মাথায় ছিটিয়ে গণেশ প্রণাম করে কাজে মন দিল। সুদীপ দেখল সামনে বেঞ্চে বসে এক ভদ্রলোক, হাতে খানিকটা তামার জালের নমুনা। তাঁর কাছ থেকে নমুনাটা চেয়ে নিয়ে সুদীপ দেখল সেটা বিশ মেস তিরিশ গেজ জাল। জালটা কতটা চাই প্রশ্ন করতেই ভদ্রলোক বললেন, "জালটা চারফুট চওড়া, এক হাজার ফুট চাই। লাগবে ফোর্ট উইলিয়ামে মিলিটারী ক্যাম্পের জানালায় মশামাছি আটকাবার জন্য।"

অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে সুদীপ দাম দিল বার আনা স্কোয়ার ফুট। খরিদ্দার সুদীপের মুখপানে চেয়ে বার-বার বলতে লাগল, "দামের জন্য কিছু নেই, কিন্তু মাল যেন হুবহু স্যাম্পলের মত হয়, না হলে আমার সমস্ত বিল আটকে যাবে, আমি মশায় ফোর্ট উইলিয়ামের কণ্ট্রাক্টার। মাল সাপ্লাই করে কেটে-কুটে জানলায় লাগিয়ে দেওয়ার পরে ঐ লালমুখো মিলিটারী অফিসারদের যদি পছন্দ না হয় তা হলে সর্বনাশ হবে। খুব ভাল করে ভেবে দেখুন এবং দাম দিন। ভদ্রলোকের কথায় সুদীপ এবার ধোঁকায় পড়ে গেল, ভাবল তা হলে কি দামটা কম দিয়ে ফেলেছে, তাই ভদ্রলোক এত করে বলছেন? সে চট করে ভদ্রলোককে বলল, "আপনি এক মিনিট বসুন, আমি তামার তারের দামটা একটু জেনে নিয়ে আপনাকে একেবারে পাকা দাম দিচ্ছি।" সুদীপ জানত এ মাল ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সে বাণ্ডিল-বাণ্ডিল রেডি থাকে, তাই সে চট করে বল্লভবাবুর নিকট গিয়ে দাম জানতেই তিনি বললেন, "ছয় আনা স্কোয়ার ফুট, কিন্তু মাল তো নেই।" সুদীপ বুঝল, এখন আর সে বল্লভবাবুর কর্মচারী নয়, দস্তুরমত তাঁর কম্পিটিটার, তাই দামটা বলে ফেলেই সঙ্গে-সঙ্গে মাল না দেবার ইচ্ছাটাও ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন। সুদীপও দমবার পাত্র নয়, সেও সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "এই তো মাত্র কদিন আগেও আপনার প্রায় দু'হাজার ফুট মাল রেডি ছিল, এরই মধ্যে সব মাল বিক্রী হয়ে গেছে?"

সুদীপের এ-কথায় বল্লভবাবু বুঝলেন যে, মাত্র কদিন আগেই সুদীপ তাঁর চাকরী ছেড়েছে, তাই ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সের গোডাউনে কি মাল আছে না আছে তা এখনও

তার নখ-দর্পণে, তাই দু-একবার গুঁই-গাঁই করে তিনি একজন কর্ম্মচারীকে ডেকে বললেন, "নরেন, দেখতো গোডাউনে তামার বিশ-ত্রিশ মাল চার ফুট চওড়া কিছু আছে কিনা।" কথাটা বল্লভবাবু এমন ভাবে বললেন, নরেন ফিরে এসেই যেন বলে যে, "নাঃ কিস্সু নেই, সব মাল বিক্রী হয়ে গেছে।" কিন্তু সবাই তো আর সুদীপের মত তুখড় কর্ম্মচারী নয়, তাই নরেন ফিরে এসেই বলল, "এজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, গুদামে আঠারটা একশ ফুটের চার ফুট বাণ্ডিল আছে।" নরেনের কথায় বল্লভ-বাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল কিন্তু চতুর ব্যবসাদার তাঁর বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে সুদীপকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কটা চাই?" সুদীপ বলল, "দশটা বাণ্ডিল চাই।" দশটা বাণ্ডিল শুনে বল্লভবাবু বললেন, "তা নিয়ে যেও, কিন্তু টাকাটা নগদ লাগবে বাপু, পারবে তো দিতে? জানই তো আমি বাজারের কোন দোকানদারের সঙ্গে ধারে কারবার করি না।"

চিবিয়ে-চিবিয়ে বলা বল্লভবাবুর কথাগুলো শুনে সুদীপ একবার ভেবে নিল, কত অল্প সময়ে মানুষের কত পরিবর্তন! যে বল্লভবাবু মাত্র কয়েকটা দিন আগেও সুদীপ বলতে অজ্ঞান সেই বল্লভবাবুই সুদীপ যেই দোকান করেছে অমনি তার শত্রু হয়ে উঠেছেন। সুদীপ বুঝল এর পিছনে মাত্র একটাই কারণ, আর সেটা হল ঈর্ষা। এই বাঙলায় বোধ হয় কোন বাঙালীই চায় না যে আর একজন বড় হোক। বল্লভবাবুর মুখের পানে চেয়ে সুদীপের মনটা ঘৃণায় রি রি করে উঠল। তার সেখান থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা হল, কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত কণ্ঠে বলল, "হাঁ, নিলে ক্যাশ টাকা দিয়েই মালটা নেব। এখন তো শুধু দাম দেবার আছে, দাম দিই, পরে আপনাকে খবর দেব।"

ইণ্ডিয়া ট্রেডার্স থেকে বের হয়ে হাজরা কোম্পানীতে এসে সুদীপ দেখল ভদ্রলোক উঠে গেছেন, বলরামকে প্রশ্ন করতেই বলরাম বলল, "আসছেন এক্ষুনি, রসা পটিতে রসা কিনতে গেছেন, এক্ষুনি আসবেন বলে গেছেন।" ইতিমধ্যে দু-একজন খুচরা খরিদ্দারকে মাল দিতে-দিতেই ভদ্রলোক এলেন এবং দামের প্রশ্নে সুদীপ বলল, "ঠিক আছে, আপনি ঐ দামেই পাবেন, ভাল মালই পাবেন।"

সুদীপের কথায় ভদ্রলোক এক বাণ্ডিল নোট বের করে হিসাব করে দাম মিটিয়ে দিয়ে মালটা "চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী, কণ্ট্রাক্টার, ওয়াটার গেট, ফোর্ট উইলিয়াম" এই ঠিকানায় পাঠাতে নির্দ্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। কণ্ট্রাক্টার মিঃ চ্যাটার্জ্জী চলে যাওয়ার মিনিট পনর বাদে সুদীপ গিয়ে বল্লভবাবুকে হিসাব মত টাকা দিয়ে পনর বাণ্ডিল জাল নিয়ে এল। খরিদ্দারকে দশ বাণ্ডিল পাঠিয়ে পাঁচ বাণ্ডিল স্টকে রেখে দিল।

সুদীপ মাল নিয়ে চলে যেতে বল্লভবাবু মনে মনে সুদীপের প্রশংসা না করে পারলেন না, তিনি ভাবলেন সত্যিই ছেলেটির উদ্যমের প্রশংসা করতে হয়। না আছে কোন ক্যাপিটাল, না আছে কোন স্টক, সামান্য দু-হাজার টাকা নিয়ে নেমে একেবারে নগদ টাকা দিয়ে মুখে যা বলল নেবার সময় তার দেড়া মাল কিনে নিয়ে চলে গেল। আসলে বল্লভবাবু একবারও ভাবলেন না যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টাকাটাই প্রধান ক্যাপিটাল নয়, ক্যাপিটাল দোকানদারের মুখের কথার মিষ্টতা, ক্যাপিটাল দোকানদারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্যাপিটাল বাজারের বিভিন্ন দোকানদারের ঘরের মজুদ মাল সম্বন্ধে ধারণা এবং নিয়মিত খবরাখবর রাখা। শুধু মাত্র টাকা থাকলেই ব্যবসা হয় না, সঙ্গে-সঙ্গে আরও অনেক কিছু জানতে হয়, যেমন—কোন মালটার কোন সময় বাজারে অভাব পড়তে পারে, কোনটা বাজারে সবারই কাছে আছে, কোনটা বাজারে কারও কাছে একেবারেই নেই, কোন বিদেশ হতে কি কি মাল আসছে, কার-কার মাল আসছে, দেশে কি কি মাল তৈরী হচ্ছে, কে কি ধরণের কাজ করছে, কোন কারখানাওয়ালার কাজের মধ্যে গুরুত্ব আছে, কোন কারখানাওয়ালা কথার ঠিক রাখতে পারে না, সময়মত মাল দিতে পারে না। এইরূপ বহু কিছু খবর জানতে হয়, তবেই মাল কেনাবেচা করে দু'পয়সা রোজগার করা যায়। বল্লভবাবু মনে-মনে প্রশংসা করলেন বটে, তবে এই কথাগুলো একবারও খেয়াল না করে খানিকটা অভ্যাসের বসেই যেন প্রশংসাটা করলেন। আসলে সুদীপের উপরোক্ত গুণের সব কটিই আছে এবং ঐগুলিই তার মস্ত ক্যাপিটাল এ-কথাটা বল্লভবাবুর চিন্তাস্রোতে ধরা পড়ল না, তাই তিনি ভাবলেন বিনা ক্যাপিটালেই সুদীপ ব্যবসায়ে নেমেছে। এ-ছাড়াও সুদীপের আর একটা গুন ছিল, আর সে গুণটা হল আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি। কোথায় গোডাউনের কোন কোণায় কোন্ মালটা আছে, র‍্যাকের উপর ডান দিকে কিংবা বাম দিকে, উপরে কিম্বা নীচুতে কি-কি মাল আছে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেই সারা বছর সে-কথা তার মনে থাকত, সচরাচর যেটা সাধারণ সেলসম্যান বা দোকানদারের মনে থাকে না। এটাও সুদীপের একটা ক্যাপিটাল। আসলে সব মিলিয়ে সুদীপের উপর ঈশ্বরের খানিকটা আশীর্ব্বাদও ছিল। না হলে ঐ মিঃ চ্যাটার্জ্জী ঠিক পরের দিনই এসে আবার চার বাণ্ডিল মাল চাইবেন কেন? পরের দিন জাল চাইতেই সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে দোকানের মাচা থেকে চার বাণ্ডিল মাল নামিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিল।

দিন এগিয়ে চলেছে। সারা সপ্তাহ ধরে সুদীপ ও বলরাম বেশ ভাল বেচাকেনা করল এবং নূতন দোকানের পক্ষে বেশ মোটা টাকাই লাভ করল। দেখতে-দেখতে শনিবার এসে গেল আর সুদীপ বাড়ী যাবার কথা বলতেই বলরাম হেসে পরিহাস করে বলল, "বৌটা যখন নতুন ছিল তখন বাড়ী যাসনি আর যত পুরনো হচ্ছে তত বাড়ীর দিকে টান বাড়ছে। ব্যাপারটা কি বল দেখি? এই গত সপ্তাহে বাড়ী গেলি, আবার এ সপ্তাহে যাবি?" এ-কথার জবাবে বিশেষ কিছু না বলে সুদীপ বলল, "মায়ের শরীরটা খুব খারাপ দেখে এসেছি, তাই মনটা ছটফট করছে। তা ছাড়া অন্য একটা কাজও আছে।" বলরাম কি বুঝল ভগবান জানেন, সে শুধু সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বলে উঠল, "থাক বাবা হয়েছে, বাড়ী যাবি যা, শুধু-শুধু কাকীমার শরীর খারাপের অজুহাতটা কেন দিচ্ছিস। তার থেকে বল না ছবির মাকে দেখতে যাবি।"

"ছবির মা বলে বলরাম যে সুরমাকে ইঙ্গিত করতে চায় বুঝে সুদীপও মনে মনে একটু হেসে—"তোর আর কি বল, মা-বউ সব এখানে, মন কেমন করলে বাড়ী গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গেই দেখতে পাবি, সুতরাং ঠাট্টা করতে তো গায়ে লাগে না," বলে বলরামের ইঙ্গিতটাকেই একটু উসকে দিল যাতে বলরাম আর একটু মজা পায়। এরপর আর বিশেষ সময় নষ্ট না করে সুদীপ বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হল। হাওড়া স্টেশনে যাবার পথে রাজাকাটরায় ঢুকে মায়ের জন্য কিছু ফলমূল ও দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কিছু মিষ্টি কিনে নিল এবং যথাসময়ে গিয়ে ট্রেনে চেপে বসল।

রাত্রি যখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর তখন সুদীপ এসে 'মা, মা' 'কমলা, কমলা' বলে ডাক দিতেই বাড়ীশুদ্ধ সবাই সজাগ হয়ে গেল, কারণ গরমটাও পড়েছিল প্রচণ্ড, তাই কারো চোখে গভীর নিদ্রা ছিল না। এত রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে সুদীপের কণ্ঠস্বর শুনে সব থেকে বেশী যার আনন্দ হল সেইই ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। সুদীপের গলার আওয়াজে সুরমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছিল, কারণ হঠাৎ এ-রকমটা ঘটবে অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যেই সুদীপ আবার বাঘাসন আসবে এ-কথা সুরমা ভাবতেই পারে নি। তা ছাড়া অন্য খারাপ খবরও কিছু থাকতে পারে যেজন্য হয়ত বাধ্য হয়েই সুদীপকে আসতে হয়েছে, তাই একটা শঙ্কা ও অদ্ভুত আনন্দের দোলা বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে সুরমা যখন দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল তখন ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় সারা পৃথিবী আনন্দে ঝলমল করছে, সুদীপের ছোট্ট বাড়ীর আরও ছোট্ট উঠোনটি সাদা ধবধব করছে। বাড়ীতে প্রবেশ করবার মুখে সুদীপ ডান হাতের তর্জ্জনীটা দিয়ে সুরমার দু-গালে দুটো টোকা মেরে তাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।

বাড়ীতে ঢুকে হাতের থলি নামিয়ে হাত-পা ধুয়ে এসে মাকে প্রণাম করে মায়ের কাছে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সুদীপ তাঁর শারীরিক সংবাদ নিল এবং অন্যান্য সকলের খবরাখবর নিল। যখন সকলের সংবাদ নিচ্ছিল ঠিক তখনই কমলা এসে বলল, "দাদা, তুমি মুড়ি খাবে ত? না, কি খানকতক রুটি করে দেব?" সুদীপ কমলাকে রুটি করতে নিষেধ করে মুড়ি দিতে বলল। কমলা বলল, "তোমার কষ্ট হবে না? সেই কখন সকালে কলকাতায় দুটি ভাত খেয়ে বেরিয়েছ।" সুদীপ বলল, "না, না, কষ্ট কিসের? এক রাত্রি বই তো নয়, মুড়িই দে"। এরপর কমলা আর কথা না বাড়িয়ে ঐখানে মায়ের পাশেই সুদীপকে একটা থালায় করে কিছু মুড়ি ও গুড় এনে দিলে সুদীপ একটা কাঁচা লঙ্কা চাইল। সুরমা একটা কাঁচা লঙ্কা এনে দিল। রাত্রি অনেক হয়েছিল তার উপর প্রায় চার ক্রোশ পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সুদীপের নিকট ঐ গুড়মুড়িই তখন অমৃতের মত মনে হচ্ছিল। সুরমা, কমলা ও মা চন্দ্রা দেবী দেখলেন সুদীপ পরম তৃপ্তির সঙ্গেই মুড়িতে জল ঢেলে গুড় মাখিয়ে সেগুলো খেয়ে নিল। মুড়ি খাওয়া হলে হাত ধুয়ে সুদীপ আবার মায়ের কাছে বসতে এলে চন্দ্রা দেবী বললেন, "অনেকটা রাত হয়েছে, এখন শুয়ে পড়গে যা, কাল সকালে আবার আমার কাছে বসিস।"

আসলে সুদীপের মায়ের কাছে বসার আরও একটা কারণ ছিল। কারণটা হল সে জানত যে, তার বিছানা তো একটা মাদুর-বালিশ, তাও আবার ঐ বারান্দাতেই পাতা হবে, তাই অপেক্ষা করছিল, কিন্তু যখন সে দেখল অনেকক্ষণ বসার পরেও মাদুর-বালিশ পাতা হল না তখন কমলাকে বলল, "কি, আমার বিছানা করলি না?" কমলা বলল, "তুমি বড়মার ঘরে তক্তাপোষে শোও গা, আমি সব ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে দিয়েছি।" সুদীপ প্রশ্ন করল, "বড়মা কি এখনও বেলেণ্ডা থেকে ফেরেন নি নাকি?" কমলা বলল, "বুধবার ফিরেছিলেন আবার গতকাল শীতলাদির বাড়ী নবগ্রামে গেছেন।" সুদীপ বরাবর দেখে আসছে তার বিয়ের পর থেকেই শনি-রবিবার হলেই বড়মা হয় বাপের বাড়ী, নয়তো মেয়ের বাড়ী কোথাও না কোথাও চলে যান। বড়মা অন্তর থেকে সুদীপকে ও সুরমাকে কতখানি স্নেহ করেন তা বুঝতে সুদীপের বাকী থাকে না। কারণ তাদের শোবার মত পৃথক ঘর নেই বলেই হয়ত বড়মা নিজের ঘর ছেড়ে 'বেলেণ্ডা' বা 'ন'গাঁ' চলে যান। এই মুহূর্তে বড়মার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় সুদীপের মাথাটা নত হয়ে আসে। মনে-মনে সে ভাবতে থাকে, "বড়মা" নামটা তাঁর সার্থক। কত বড় মন হলে লোকে এ-কাজ করতে পারেন, পরের ছেলে-বৌয়ের জন্য নিজের ঘর ছেড়ে

অন্য জায়গায় চলে যান। বড়মার কথা ভাবতে-ভাবতেই সুদীপ এসে বড়মার ঘরে প্রবেশ করে তক্তাপোষে ওঠে। তক্তাপোষে উঠে দেখে সেখানে ছবি নেই, ছবিকে না দেখে সুদীপ মনে-মনে একটু বিস্মিত হয়। বিস্ময়ান্বিত চিত্তেই সে টান হয়ে শুয়ে পড়ে এবং শুয়ে-শুয়েই বাইরের বাসন-কোসনের আওয়াজে বুঝতে পারে কমলা ও সুরমার বাসন-কোসন ধোয়া, গোছগাছ করা হয়ে গেল। এবার সুরমা এসে ঘরে ঢুকবে বুঝে সুদীপ ঘুমের ভান করে নিঃশব্দে পড়ে থাকল, সুরমা ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকল এবং তার স্বাভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খুব আস্তে আস্তে ঘরের খিলটা তুলে দিল। ঘরের খিল আটকানোর শব্দ শুনে সুদীপের দুষ্টুমি একটু বেড়ে গেল, সেও অমনি আস্তে-আস্তে নাক ডাকাতে শুরু করে দিল। সরলমতি সুরমা সুদীপের এত ছল-চাতুরী বুঝতে না পেরে পাছে সুদীপের ঘুম ভেঙ্গে যায় তাই ভয়ে ভয়ে পা টিপে-টিপে খুব আস্তে পায়ের দিক দিয়ে তক্তাপোষে ওঠে সুদীপের বুকের কাছে বসে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে তাকে বাতাস দিতে শুরু করল। আবহাওয়া এত গুমোট যে, ঘরে ঢোকার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুদীপের সারা দেহ ঘামে ভিজে জবজব করছিল। পাখার হাওয়াটা গায়ে লাগতেই সুদীপ একটু নড়ে-চড়ে উঠল এবং উঁ আঁ করতে-করতে একখানা হাত এমনভাবে সুরমার কোলে রাখল যাতে সুরমা ভাবল হয়ত ঘুমের ঘোরেই সুদীপের হাতখানা তার কোলে উঠে এসেছে। ঘুমের ঘোরেই আসুক আর ইচ্ছা-কৃত ভাবেই আসুক সুদীপের হাতখানা কোলের উপর আসতেই সুরমাও তার বাম হাত দিয়ে হাতখানা ধরে মৃদু-মৃদু চাপ দিতে লাগল এবং ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলে পর সুদীপের ডান হাতখানা সুরমার কটিদেশে এসে ঠেকল। সুরমার কটিদেশে সুদীপের হাতখানা ঠেকতেই সুরমা একটু অস্থির হয়ে পড়ল। কটিদেশে আপনজনের হস্ত স্পর্শে সুরমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়ে উঠল। সুরমার দেহের কম্পনে সুদীপের শরীরেও রক্তস্রোত যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘুমের ভান করে চুপচাপ পড়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না, দু'-হাতে জড়িয়ে ধরে সুদীপ সুরমাকে বুকের উপর টেনে নিল। আবেগে উত্তেজনায় সুরমা তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। সুদীপের টানে তার বুকের উপর পড়ে সুরমা বলল, "ওরে দুষ্টু, তুমি ঘুমোওনি তাহলে?" সুদীপ হাসতে-হাসতে বলল, "ইস, ঘুমোবো বইকি? বলেই আবার প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, ঠিক করে বল তো, ঘুমোলে তুমি খুশী হতে?"

সুদীপের এ-কথায় সুরমা সলজ্জভাবে বলে' উঠল "এ মা ছিঃ ছিঃ, কি যে বল, আমার যেন লজ্জা করে না?" সুরমার এই সলজ্জ ভাবটা সুদীপের খুব ভাল লাগল,

সে মজা পেয়ে সুরমার নরম গাল দুটো দু'হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে প্রশ্ন করল, "বল না, বল না, ঘুমোলে তুমি খুশী হতে কিনা ?" সুদীপের এ-কথায় সুরমা দ্বিগুণ লজ্জা পেয়ে তার বুক থেকে মাথাটা তুলতে চেয়ে বলল, "জানি না, যাও।" সুরমা মাথাটা তুলতে চায় বুঝে সুদীপ তার দৃঢ় বাহুবন্ধনে সুরমাকে আবদ্ধ করে দু-হাতে নিজের বুকে সুরমাকে চেপে ধরল, সুরমাও আর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল না, কারণ সেই মুহূর্তে দুটি যুবক-যুবতীর তৃষাতপ্ত হৃদয়ের প্রত্যাশা একই ব্যাকুলতায় পূর্ণ। প্রার্থিত বস্তু হাতের কাছে পেয়ে দু'জনেই তখন আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে সুখের সাগরে ভাসতে লাগল।

আগের সপ্তাহের কথামত পরদিন অর্থাৎ রবিবার দ্বিপ্রহরে সুদীপ গিয়ে রমেন বাবুর সঙ্গে দেখা করল এবং কথাবার্তা শুরু করল। কথাবার্তার মধ্যে অনিমেষও এসে গেল। অনিমেষ একটা কাগজ সুদীপের হাতে দিয়ে বলল, "তুমি দ্যাখ, এগুলো ঠিক আছে কিনা বা এই হিসাবে তুমি নিতে পারবে কিনা।" কাগজটায় চোখ বুলিয়ে সুদীপ দেখল নতুন বাড়ী তের শতক, দেড়শ টাকা শতক হিসাবে সাড়ে উনিশ শ' টাকা, ঢেড়ে-ডাঙ্গা পুকুর তিন বিঘা, দেড় হাজার টাকা বিঘা হিসাবে সাড়ে চার হাজার টাকা এবং আউশ ধানের জমি দশ কাঠা, হাজার টাকা বিঘা হিসাবে পাঁচশত টাকা ও নোনা মাঠের তিন বিঘা জমি, ছয়শত টাকা বিঘা হিসাবে আঠার শ' টাকা ; মোট আট হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকার হিসাব। সব দেখে বুঝে সুদীপের চক্ষু স্থির। কাগজ থেকে চোখ তুলে সে রমেনবাবুকে বলল, "কিন্তু জ্যাঠামশায়, এত টাকার সম্পত্তি আমি নেব কেমন করে ? দামের দিক দিয়ে অবশ্য কোনটাই অসঙ্গত হয় নি। কিন্তু………"

রমেন বাবু বললেন, "কোন কিন্তু নয় বাবা, তুমি রাজি হয়ে যাও, তোমার এতে ঠকা হবে না।"

"না জ্যাঠামশায়, ঠকার কথা নয়, বরং এ-আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি সম্পত্তিটা আমাকেই বিক্রয় করবেন বলে ঠিক করেছেন, আসল কথাটা হল আমি টাকার জোগাড় করব কেমন করে ?"

সুদীপের এ-কথায় অনিমেষ বলল, "আরে টাকাটা তুমি দু'বছরে দিও ধীরে-ধীরে, তা হলে হবে তো ?" অনিমেষের কথায় সুদীপ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল, "ঐখানেই তো ভয়, যদি কথার ঠিক না রাখতে পারি, যদি কোন কারণে কথার খেলাপ হয়ে যায় সে বড় লজ্জার কথা হবে, তা হলে জ্যাঠামশায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারব না অনিমেষ।"

সুদীপের এ-কথায় রমেনবাবু বললেন, "তোমার জ্যাঠামশায় তাঁর প্রজাদের সঙ্গে মামলামোকর্দ্দমা করেন বলে কি টাকার জন্য তোমার সঙ্গেও মামলা করবেন ভাবছ?" রমেনবাবুর এ-কথায় সুদীপ লজ্জা পেল এবং কিছু বলতে গিয়েও সে থেমে গেল। তার জিভের ডগায় এসেই গিয়েছিল যে, "সে ইতিহাসও তো অতি সাম্প্রতিক, এই তো সেদিন দত্তদের সঙ্গে হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চালিয়েও তিকুলী পুকুর ও অন্যান্য অনেক সম্পত্তি ছাড়তে হয়েছে আপনাকে।" কিন্তু বলতে গিয়ে সুদীপ থেমে যায় এই কারণে যে, সে জানে "স্বকার্য্যম্ উদ্ধারয়েত প্রাজ্ঞঃ।" কার্যোদ্ধার আগে, তর্কাতর্কি পরে। তা ছাড়া অনিমেষের বন্ধু বলে নিতান্ত স্নেহের বশেই তিনি সম্পত্তিটা তাকে দিতে চাইছেন, না হলে কি গাঁয়ে, কি ভিনগাঁয়ে, অবস্থাপন্ন লোকের অভাব ছিল! সুতরাং কোন কটু ভাষণে না গিয়ে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে সুদীপ বলল, "না জ্যাঠামশায়, আমি সে-কথা বলছি না, আমি বলতে চাইছি আপনি স্নেহপরবশ হয়ে সম্পত্তিটা আমায় বিক্রয় করতে চাইছেন, কিন্তু যদি স্বীকৃত হয়েও যথাসময়ে আপনার টাকা না দিতে পারি?"

"তোমায় অত ভাবতে হবে না, যদিও দলিলে একটা সময়সীমা নির্দ্ধারিত থাকবে তবু দু-চারমাস দেরী হলেও তোমার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই আমি নেব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

রমেনবাবুর এ-কথার পরে আর কথা বাড়ানো মূর্খতার কাজই হবে বুঝে সুদীপ এবার রাজী হয়ে গেল এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে ঠিক হল পর দিন অর্থাৎ সোমবার সকালেই মন্তেশ্বরে গিয়ে দলিল করিয়ে রেজিষ্ট্রি করা হবে। কথাবার্ত্তার শেষে সুদীপ ধীরে ধীরে জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দশটাকার দুটো বাণ্ডিল বের করে অনিমেষের হাতে দিতে গেলে অনিমেষ বলল, "এখন টাকা কেন? আগামী কালই দিও, যা দেবে।" সুদীপ বলল, "মাত্র দু-হাজার টাকা আছে, এনেছি, আবার ফেরৎ নিয়ে যাব, টাকাটা তুমি রেখেই দাও না ভাই। বাড়ীতে তো আমাদের অভাবের সংসার।"

সুদীপের এ-কথায় অনিমেষ একবার বাবার দিকে চাইতেই তিনি বললেন, "আচ্ছা, সুদীপ যখন টাকাটা আজই দিতে চাইছে তখন নিয়েই রাখ।" এরপর আরও সামান্য কথাবার্ত্তার পর সুদীপ গৃহাভিমুখী হলে রমেনবাবু অনিমেষকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি হয়ত থাকব না সেদিন; কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে সতীন্দ্রের এই ছেলেটি একদিন চরম উন্নতি করবে, ছেলেটিকে দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। সত্যিই ছেলেটি বড় ভাল ছেলে, ভীষণ কর্ম্মঠ ছেলে, না হলে দেখ কানাকড়ি সম্বল যার নেই সে কিনা কলকাতার বড়বাজারে দোকান করে ফেলল।"

বাবার কথায় অনিমেষের বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে, কারণ একমাত্র সুদীপই শিশুকাল হতে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই তার প্রশংসায় গর্ব্ববোধ হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সময়মত পরের দিন মন্তেশ্বরে রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে রমেনবাবু যেমন যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি-তেমনি ভাবেই সব সম্পত্তির দলিল তৈরী হয়ে রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল এবং কর্ম্ম সমাপনান্তে রমেনবাবুর পাল্কী বাড়ী ফিরে গেলে অনিমেষ ও সুদীপ গিয়ে চৌধুরীদের মিষ্টির দোকানে ঢুকে জলখাবার খেয়ে বাড়ী ফিরল। ফিরবার পথে সুদীপ অনিমেষকে বলল, "একটা অনুরোধ কিন্তু রাখতে হবে তোমায়, বল রাখবে তো?" অনিমেষ বলল, "আরে তুমি কিন্তু করছ কেন, বলই না কি তোমার অনুরোধ।" সুদীপ বলল, "অনুরোধটা হল, যতদিন সমস্ত টাকা আমি মিটিয়ে দিতে না পারছি ততদিন আমি কোন সম্পত্তির ধারেকাছে যাব না, তোমরা যেমন জমি চাষ করছ তেমনিই করবে, পুকুরের মাছ যেমন খাচ্ছ তেমনিই খাবে।" সুদীপের কথা শুনে অনিমেষ হেসেই অস্থির, "বলল তুমি তো আচ্ছা ছেলে, অধিকার না থাকলেও অনেক লোক জোরজবরদস্তি করে সম্পত্তি ভোগ করতে চায়, আর অধিকার থাকা সত্বেও তুমি কিনা এই কথা বলছ!" সুদীপ চমকে উঠে বলল, "অধিকার? কিসের অধিকার ভাই? আমি তো সবে তোমাদের পাওনা টাকার ভগ্নাংশ মাত্র দিয়েছি আর ভোগ করব কিনা পুরো সম্পত্তি? না, সে আমার দ্বারা হবে না, আগে তোমাদের ঋণ মেটাব, তারপর তোমরা যা বলবে তাই হবে। তা ছাড়া জ্যাঠামশায় আমার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে সম্পত্তিটা দিয়েছেন বলেই আমি এক্ষুনি গিয়ে সম্পত্তির উপর অধিকার ফলাব? না, অনিমেষ, আমার জীবন থাকতেও তা হবে না। তুমি জ্যাঠামশায়কে গিয়ে একথা বলো, যত-দিন না আমি পুরো টাকা দিয়ে দিচ্ছি ততদিন কেউ জানতেই পারবে না যে সম্পত্তি আমাদের।" সুদীপের কথার শেষে অনিমেষ বলল, "আচ্ছা সুদীপ, সম্পত্তিটা তুমি নিজের অথবা সুরমার নামে রেজিষ্ট্রি না করে তোমার বাবার নামে করলে কেন?" সুদীপ বলল, "বাবার নামে থাকলে ভাইরাও ভাগ পাবে, তাই।" সুদীপের এ-কথায় অনিমেষ দু-হাত দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, "সুদীপ তুমি এত বড়! এত মহৎ! সত্যিই তোমার তুলনা হয় না।" অনিমেষের কথা শুনে সুদীপ বলল, "এতে আর মহত্বের কি আছে ভাই, এ তো আমার কর্ত্তব্য।" অনিমেষ বলল, "কর্ত্তব্যই বা এ সংসারে ক'জন করছে বল, স্বার্থকে ওজন দাঁড়িতে মেপে লোকে নিজের মত করে আজকাল কর্ত্তব্য পালন করছে। আজকে যে ভাইদের কথা ভেবে তুমি বাবার নামে বাড়ী-জমি ইত্যাদি নিলে সেই

ভাইরাই একদিন দেখবে হয়ত তোমার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবহেলা দেখাচ্ছে।"

সুদীপ বলল, "সে যা হ'বার হ'বে, ভবিষ্যতের উপর তো কোন কালেই মানুষের নিয়ন্ত্রণ চলে না, সুতরাং ভবিষ্যতে ভাইরা কেমন হবে না-হবে সে-কথা ভেবে এখন থেকে আমি তাদের প্রতি কঠোর হই কি করে বল?" অনিমেষ বলল, "ঠিক তোমার মত ছেলের কাছে আমি এই উত্তরই আশা করেছিলাম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। শুধু ভাইদেরই নয়, আশপাশের অনেক মানুষের উপকার করে একদিন তুমি সকলের প্রীতিভাজন হবে ভাই। ঈশ্বর তোমায় যেন সেই মন ও শক্তি দুটোই দেন এই প্রার্থনা করছি।" এই কথা বলার পর অনিমেষ সুদীপের কাঁধটায় প্রীতিসূচক একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বাড়ী চলে গেল এবং সুদীপও নিজের বাড়ীর দিকে গেল।

সুদীপ বাড়ী এলে সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে সে কোথায় গিয়েছিল, কি করছিল ইত্যাদি প্রশ্নে চন্দ্রাদেবী তাকে বিব্রত করে তুললে সে ধীরে-ধীরে বলল, "আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর খুব অসুখ, তাই তাকে দেখতে মন্তেশ্বরে গিয়েছিলাম।" মাকে মিথ্যে কথাটা বলতে মন সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু না বলে উপায়ও নেই, কারণ সব বলে আনন্দ করবার মত কাজ সে এখনও করতে পারে নি অর্থাৎ অনিমেষদের টাকা পুরোপুরি দিতে পারে নি। তা ছাড়া অনিমেষকে সে কথাও দিয়েছে যে, সম্পত্তিক্রয়ের ব্যাপারটা টাকা না মেটা পর্য্যন্ত কাউকেই সে বলবে না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে মিথ্যা কথাটা বলতেই হ'ল। মাও সুদীপের কথায় বিশ্বাস করে চুপ করে গেলেন এবং সুদীপকে কিছু খেতে দেবার জন্য কমলাকে হাকাহাকি করতে লাগলেন। মায়ের ব্যস্ততা দেখে সুদীপ বলল, "অসুস্থ শরীরে তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? আমি ওখান থেকে খেয়ে এসেছি, পরে খাব।" সে-রাত্রিটাও বাঘাসনের বাড়ীতে কাটিয়ে সুদীপ পর দিন ভোরে কলকাতা যাত্রা করল।

মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতায় পৌছে দোকানে এসে সুদীপ দেখল আজও খরিদ্দারের ভিড় লেগেছে বেশ। খরিদ্দারের মধ্যে জন তিনেক ছিলেন ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সের বাঁধা খরিদ্দার ও একজন নন্দী কোম্পানীর। তাঁদের দেখে সুদীপ বলল, "একি! আপনারা এখানে? এ দোকানে? কি ব্যাপার?" খরিদ্দারদের মধ্যে মিত্র ইঞ্জিনীয়ারিংএর মালিক সুধারঞ্জন মিত্র মশায় বললেন, "আরে ভায়া, লুকিয়ে-লুকিয়ে দুই বন্ধুতে দোকান করেছ, আর আমাদের মিষ্টি খাওয়াতে হবে বলে খবর দাও নি, কিন্তু দেখলে তো আমরা ঠিক খুঁজে-খুঁজে বের করেছি, মিষ্টি

খাওয়াও আর না খাওয়াও জাল কিন্তু এবার থেকে আমরা এখান থেকেই নেব। আজ হতে মিত্র ইঞ্জিনীয়ারিংএর সাপ্লায়ার "হাজরা এণ্ড কোম্পানী," বুঝলে ?" মিত্র মশায়ের সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ কথাবার্তায় বলরাম ও সুদীপ দুজনেই খুশী। সুদীপ বলল, "দেখুন, ওখানে চাকরী করতাম, তাই ওঁদের কোন খরিদ্দারকেই আমরা কোনদিন বলি নি যে, আমরা দোকান করছি, কারণ সেটা শুনতে খারাপ লাগে আর বল্লভবাবু শুনলে হয়ত ভাববেন যে, আমরা খরিদ্দার ভাঙ্গাচ্ছি—সে ব্যাপারটাও বিশ্রী হবে। তাই আমরা কাউকেই কিছু বলি নি।" সুদীপের কথায় বাধা দিয়ে মিত্রবাবু বললেন, "আরে রেখে দাও তোমার বল্লভবাবু, আমি গত দশ-বার বছর ধরে ইণ্ডিয়া ট্রেভার্সে মাল কিনেছি, কোনদিন দাম পর্য্যন্ত যাচাই করি নি অন্য কোথাও, কিন্তু গতকাল কি করেছে জান ? গতকাল বেনারসে তৈরী একটা পিতলের জালকে ফ্রান্সের তৈরী বলে চালান করেছে এবং শুধু তাই নয়, দেশী জালের কাগজ খুলে পুরানো বিলাতী মালের একটা কাগজে ভাল প্যাক করে মালটা পাঠিয়েছে। আরে মশায়, বিলাতী কাগজে প্যাক করলেই কি আর মালটা বিলাতী হয়ে যাবে ? কাজ করতে গিয়ে দেখি জালের ভিতর দিয়ে মোটা পাউডার বেরুচ্ছে, তাই সন্দেহ হওয়ায় বাণ্ডিলটা অফিসে আনিয়ে আইগ্লাস লাগিয়ে দেখি ঘরগুলো আঁকা-বাঁকা, অসমান, ছোট-বড়, সে একেবারে জঘন্য ব্যাপার। খবর পাঠিয়ে বললাম, মালটা বোধ হয় ভুল হয়েছে বদলে দিতে,' তাতে ওনার বড়ছেলে বলল কি জানেন ? বলল, আমরা নাকি ও-রকম জাল জীবনে দেখিনি, প্রথম দেখছি, তাই ও-রকম মনে হচ্ছে।"

সুদীপ এতক্ষণ অবাক হয়ে মিত্রবাবুর কথা শুনছিল। মিত্রবাবুর কথা শুনে সে হাসতে-হাসতে বলল, "ওসব কথা এখন ছাড়ুন, আমাদের এখানে আজ প্রথম এসেছেন, মিষ্টিমুখ তো করুন, তারপর সব শুনব।" এই কথা বলে সুদীপ বলরামকে মিষ্টি আনতে বললে বলরাম ক্যাশ-বাক্স থেকে টাকা নিয়ে মিষ্টি এনে সবাই মিলে জলযোগ করল। জলযোগ চলাকালে সুদীপ দেখল, ভূপেন্দ্রবাবু নন্দী কোম্পানী থেকে চেয়ারে বসে বসে সব দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তাঁর দোকানের খরিদ্দারটিকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে গেলেন। ভূপেন্দ্রবাবুর মনের অবস্থাটা বুঝে সুদীপ শুধু একবার মনে-মনে হাসল। তারপর সব খরিদ্দারকে মিলিয়ে একুনে হাজার তিনেক টাকার মাল বিক্রয় করল। ভূপেন্দ্রবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন তাঁর খরিদ্দারও হাজরা কোম্পানী থেকে দশ বাণ্ডিল জাল নিয়ে গেল।

যত দিন যেতে লাগল তত দেখা গেল ইণ্ডিয়া টেডার্সের ও নন্দী কোম্পানীর বহু খরিদ্দার এসে হাজরা কোম্পানীতে ভিড় জমাচ্ছে। সুদীপ মনে-মনে বুঝল যে,

ভূপেন্দ্রবাবু অব্যবসায়ী, তাই তাঁর কাছে খরিদ্দার টিকছে না, আর বল্লভবাবু ভীষণ দাম্ভিক ও তাঁর বড় ছেলে রণধীর অত্যন্ত লোভী ও অসৎ, তাই তাঁরও বহু খরিদ্দার ভেঙ্গে তাদের হাজরা কোম্পানীতে আসছে। সুদীপ ও বলরাম দুই বন্ধুতে যুক্তি করে নন্দী কোম্পানী ও ইণ্ডিয়া টেডার্স থেকে চলে আসা খরিদ্দারদের সঙ্গে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতে লাগল যাতে তাঁরা আর কোনদিন ফিরে পুরানো মহাজনদের কাছে যেতে না পারেন।

ব্যবসা সুদীপ খুব ভালই চালাচ্ছিল। মাস চারেকের মধ্যে হাজরা কোম্পানীর কাজ অনেক বেড়ে গেল এবং কাজের সুবিধার জন্য দু'জন কর্ম্মচারীও রাখতে হ'ল। কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন হল বলরামের ভাগ্না ও আর একজন হিন্দুস্থানী, রাম খেলামন সিং। দুজনেই খুব বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ। বলরাম ও সুদীপ যখন হাজরা কোম্পানীর কাজকর্ম্ম নিয়ে মশগুল ঠিক তখন হঠাৎ পূজার আগে লোক মারফৎ খবর এল চন্দ্রা দেবী আর ইহলোকে নেই। মা মারা গেছেন শুনে সুদীপ দোকানে চেয়ারে বসেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বলরাম তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু মায়ের এমন আচম্বিত মৃত্যুতে সুদীপ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার বড় আশা ছিল রমেনবাবুদের বাকী টাকা মিটিয়ে এই বছরের শেষে নূতন বাড়ীতে মাকে নিয়ে গিয়ে তুলবে, বলবে, "ত্যাখ মা, তোমার জন্ম কি রকম বাড়ী কিনেছি।" কিন্তু হায়, ঈশ্বর তার সেই সাধে বাদ সাধলেন। তার মনের সাধ মেটাবার জন্মই দিবারাত্র এত কঠিন পরিশ্রম করে দোকানটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে চলেছে সুদীপ। পিছনে তার একটাই ভাবনা, আর সে ভাবনা হ'ল—কি করে মায়ের জীবনের শেষের কটা দিন তাঁকে একটু আরামে রাখা যায়, আনন্দে রাখা যায়, কি করে সুরমার মুখে হাসি ফোটানো যায়, কি করে বিধবা বোন কমলার নামে আলাদা কিছু জমিজায়গা কিনে দিয়ে তার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা যায়। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রথম আশাটাই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই কথা ভেবে সুদীপ দোকানে চেয়ারে বসে-বসেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল আর বলরামের শত সান্ত্বনাতেও সে-কান্না কিছুতেই থামতে চাইল না। সুদীপ অঝোরে কাঁদছে দেখে বলরাম একটা রিক্সা ডেকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে মেসের দিকে রওনা হ'ল। রিক্সায় বসিয়ে আনতে আনতে সুদীপের কান্না দেখে বলরামেরও কান্না পেয়ে গেল। বলরামও মাকে ভীষণ ভক্তি করত, তাই মাতৃহারা সুদীপের ব্যথাটা বলরামের বুকেও আঘাত করল এবং সহানুভূতিতে তার চোখে জল এল।

সুদীপকে বাসায় রেখে বলরাম ভালোটিয়া রতনলাল এণ্ড সন্সে এসে সতীন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে মেসে এসে তাঁকে খবরটা দিল। খবরটা পেয়ে সতীন্দ্রবাবুর

চোখে যেন সর্ব্বহারার দৃষ্টি নেমে এল, দু-চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বড় বড় বিন্দু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এর মধ্যে বৈকাল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়। আজ আর বাড়ী যাওয়ার গাড়ী পাওয়া যাবে না। চন্দ্রা দেবী মারা গেছেন ভোর রাত্রে, এতক্ষণ মৃতদেহ হয়ত সৎকারই করা হয়ে গেছে, সুতরাং সব দিক ভেবে বলরাম-হীরেন দুজনে যুক্তি করে ঠিক করল যে, পর দিন ভোরবেলাতেই সতীন্দ্রবাবু ও সুদীপ বাঘাসন রওনা হয়ে যাবেন এবং সেই মতই ব্যবস্থা করা হ'ল। সুদীপ বড় ছেলে, তাই মায়ের মৃত্যুর পর তার অনেক কাজ আছে, সেই দিকটার কথা চিন্তা করে হীরেন কিছু টুকিটাকি বাজার করবার জন্য একটা থলে নিয়ে বের হয়ে গেল। মেসে সুদীপ ও সতীন্দ্রবাবুর কাছে থাকল বলরাম। বলরাম জামা-কাপড় ছেড়ে দুটো বালতি নিয়ে নীচে কলতলায় গিয়ে জল ভরে রেখে এসে সতীন্দ্রবাবুকে নিয়ে গিয়ে স্নান করাল এবং তাঁর জামা-কাপড় স্বহস্তে কেচে নিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে হীরেন কাচা-কাপড় ও চাদর নিয়ে এলে সুদীপ বলরামের সঙ্গে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে কাচা পরে মেসে ফিরল। বলরামের নির্দেশ মত সুদীপ সবই করে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চোখের জল ঝরা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় নি, তার কারণ অন্তরের কোণের সুপ্ত গভীর বাংলাটুকুর কথা এই মুহূর্তে সে কাউকেই খুলে বলতে পারছিল না, মনে-মনে মায়ের কথা ও সঙ্গে-সঙ্গে তার নিজের ইচ্ছার কথাটা যতই ভাবছিল ততই নীরবে দু-চোখের কোল বেয়ে তপ্ত অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছিল। এ এক অসহনীয় অবস্থা। আপন জনকে সুখী করবার জন্য অন্তরে যদি কেউ কোন গোপন বাসনা পোষণ করে আর তার সেই বাসনা যদি বিধির বিধানে অকালে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তাহলে বাসনাপোষণকারীর অন্তরের গোপনতম ও কোমলতম স্থানে যে বেদনা বোধ হয় তার মর্ম্ম বোঝা পৃথিবীতে ঠিক ঐ রকম অবস্থা যার কোনদিন না হয়েছে তার পক্ষে অসম্ভব। বলরামেরও এখন সেই অবস্থা। বাইরে থেকে সুদীপকে দেখে বলরাম অন্য রকম অর্থাৎ কঠোর কঠিন ভাবত, কিন্তু আজ তার এত কান্না দেখে সুদীপের ঠিক কতটা লেগেছে বা কোন জায়গায় লেগেছে তার সবটুকু না বুঝলেও অন্ততঃ এটুকু বুঝেছে যে, জগতে মাতৃভক্ত একমাত্র সেইই নয়, তার মত অনেকেই জন্মদাত্রী মাকে ভক্তি করে এবং সেই ভক্তিটা তারা করে অত্যন্ত নীরবে, অত্যন্ত গোপনে। ঠিক অদৃশ্য কোন দেবতা বা দেবীর উপর মানুষ যেমন ভিতরে-ভিতরে একটা গোপনভক্তি তার জীবনের সাথে-সাথে বয়ে চলে এ যেন সেই রকমই একটা মাধুর্য্যমিশ্রিত আন্তরিক ভক্তি।

সুদীপকে গঙ্গাস্নান করিয়ে মেসে নিয়ে এসে কিছুক্ষণ পাশে বসে আরও কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে বলরাম তার বাসায় চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে হীরেন সামান্য কিছু

ফলমূল কেটে সুদীপ ও সতীন্দ্রবাবুর রাতের আহারের ব্যবস্থা করে দিল, কিন্তু ফলমূল কাটাই হ'ল, সুদীপ ও সতীন্দ্রবাবু কেউই প্রায় কিছুই খেলেন না। দুজনে দুখানা কম্বল ও মাদুর নিয়ে দুটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। মেসের টুকটাক দুচারটি কাজকর্ম্ম সেরে হীরেনও এসে সুদীপের পাশে তারই মাদুরে শুয়ে পড়ল। হীরেনকে একান্তে নিরালায় পেয়ে সুদীপ আর একবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে ফেলল। হীরেন মুখে কিছু না বলে আস্তে-আস্তে সুদীপের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে সুদীপ বলল, "এবার আমি তো কলকাতায় একলা হয়ে গেলাম হীরেন-দা। আর তো বাবাকে চাকরী করতে দেওয়া চলবে না, এবার তো তাঁকে বাড়ীতে থাকতে হবে, না হলে সেখানে সব কিছু দেখবে কে? এতদিন মা ছিলেন, বিছানায় শুয়ে-শুয়েও তিনি বাড়ী আগলে ছিলেন। কিন্তু এবার? আমি কি করব হীরেন-দা?" বলতে-বলতে সুদীপ আবার ডুকরে কেঁদে উঠল। হীরেন ধীরে-ধীরে সুদীপকে বলল, "বাবা-মা কি চিরকাল কারও থাকে ভাই? কাকাবাবু বাড়ীতে থাকলেও তুই তো নির্ব্বান্ধব নোস, তোর কোন ভয় নেই সুদীপ। আমি যতদিন বাঁচব ততদিন তোর কাছেকাছেই থাকব, তুই নির্ভাবনায় নিজের কাজ করে যা ভাই, তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। এত ভেঙ্গে পড়লে কি চলে! মনটাকে একটু শক্ত কর ভাই, এরপর তো তোর উপরেই পুরো সংসারটা নির্ভর করবে আর তুই যদি ভেঙে পড়িস তো কাকাবাবুকে, সুরমাকে ভাইবোনেদের কে দেখবে? এত শোক কি তোর সাজে?" হীরেনের কথাগুলো শুনে সুদীপ মনে-মনে ভাবল, "হীরেনদা ঠিকই বলেছে, জীবনের পথে বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়াবার জন্য যে-ব্যক্তি সংগ্রামরত হয় তার কি এত কান্না সাজে? বসে-বসে কাঁদলে লড়াই করবে কখন? বস্তুজগতের সংগে সংগ্রাম করে রূঢ় বাস্তবকে বিধ্বস্ত করে মরুর বুকে ফুল ফোটাবে কি করে? কথাগুলো ভেবে কঠিন হতে গিয়েও সুদীপ বার-বার কেঁদে ফেলল এবং শেষে ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরবেলায় ট্রেনের সময় হলে, হীরেনের ডাকে।

ভোরে হাওড়ায় ট্রেনে চেপে বেলা দুপুর নাগাদ সতীন্দ্রবাবু ও সুদীপ বাঘাসনে এসে পৌছল। সতীন্দ্রবাবু ও সুদীপকে দেখে বাড়ীতে আবার একবার কান্নার রোল পড়ে গেল। কমলা, সুরমা, প্রদীপ, অধীপ, নির্ম্মলা সবাই একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। ছেলেমেয়েদের কান্নায় বক্ষের অবরুদ্ধ আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে সতীন্দ্রবাবুর আঁখির কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুদীপও আমতলার ঘরের দাওয়ায় বসে-বসে কাঁদতে লাগল। এর মধ্যে সুদীপের মামা মনমোহন বাবু ও বড়মা প্রভাতী দেবী বাঘাসনে এসে পৌছেছিলেন। তাঁরা ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দিতে

লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর বাড়ীটা আবার একসময় নিঝুম হয়ে গেল। কেবল কমলা মাঝে-মাঝে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠতে লাগল আর তার কান্না দেখে সুরমারও চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরতে লাগল।

কয়েকদিনের মধ্যে মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে সুদীপ আবার কর্ম্ম স্থলে এসে পৌছল, সতীন্দ্রবাবুও কলকাতায় এলেন। এতগুলি ছোটছোট ছেলে-মেয়েকে গ্রামের বাড়ীতে অভিভাবকহীন রাখা ঠিক হবে না ভেবে সুদীপ, হীরেন, বলরাম সকলে মিলে যুক্তি করে সতীন্দ্রবাবুকে চাকুরী ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে থাকবার অনুরোধ করলে তিনি প্রথমটা রাজী না হলেও শেষে সকলের পীড়াপীড়িতে রাজী হলেন, কারণ সুরমা তখন পুনরায় সন্তানসম্ভবা, আর তার শরীরটাও তেমন ভাল যাচ্ছিল না। আজকাল মাঝে-মাঝে তার মাথায় একটা এমন তীব্র যন্ত্রণা হয় যে, তা যেন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। সুরমা ছটফট করে, এমন কি যন্ত্রণা হতে নিস্কৃতি পাবার জন্য দেওয়ালে মাথা পর্যন্ত ঠোকে। বৌমাকে সতীন্দ্রবাবু অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাই বৌমার কথা এবং বিধবা মেয়ে কমলার কথা ভেবে, তা ছাড়া সংসারের নিত্য প্রয়োজনেও একজন বয়স্ক বুদ্ধিমান লোকের পরিচালনার প্রয়োজন আছে এ-কথা চিন্তা করে সতীন্দ্রবাবু চাকরী ছেড়ে বাঘাসনে গিয়ে থাকতে রাজী হলেন। বাবা বাঘাসনে গিয়ে থাকতে রাজী হওয়ায় সুদীপ কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

সতীন্দ্রবাবু ভালোটিয়া রতনলাল এণ্ড সন্সে গিয়ে রতনলাল ভালোটিয়াকে নিজের চাকরীতে ইস্তফা দেবার কথা জানাতে তিনি ভীষণ দুঃখিত হলেন, কারণ তিনি জানতেন সতীন্দ্রবাবুর মত সৎ একনিষ্ঠ বিচক্ষণ কর্ম্মচারী পাওয়া আজকালকার দিনে খুবই মুস্কিল। তিনি সতীন্দ্রবাবুকে চাকরী না ছাড়ার জন্য বার-বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু সতীন্দ্রবাবু নিজের পরিবারের কথা ভেবে তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। রতন লালজী যখন বুঝতে পারলেন যে, সতীন্দ্রবাবুকে আর কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না, তখন তাঁর প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির পরিচয়সূচক কিছু উপহার দিতে চাইলে সতীন্দ্রবাবু তা নিতে কিছুতেই রাজী হলেন না, কিন্তু রতনলালজী ছাড়বার পাত্র নন। অনেক কষ্টে অনেক বুঝিয়ে একটি কাগজের প্যাকেটে করে তিনি মোট আড়াই হাজার টাকা সতীন্দ্রবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতার উপহার হিসাবে দিলেন এবং এও বলে দিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন সময়ে কোন বিপদাপদে পড়লে সতীন্দ্রবাবু যেন কোন দ্বিধা না করে তাঁর কাছে সিধে চলে আসেন, কারণ তিনি সতীন্দ্রবাবুকে কোনদিন ঠিক কর্ম্মচারীর মত দেখেন নি, দেখেছেন তাঁরই এক-

জন বড় ভাইয়ের মত করে। একে চন্দ্রা চলে যাওয়ায় ব্যথা-বেদনায় সতীন্দ্রবাবুর বুকটা তখন খালি হয়ে আছে, অন্তরে সর্ব্বদা একটা হাহাকার জেগে রয়েছে, তার উপর আবার আজ বিদায়ের মুহূর্ত্তে তাঁর অন্নদাতা ভালোটিয়াজীর এই আপন জনের মত মধুর ব্যবহারে কৃতজ্ঞতায় ও বিচ্ছেদের ব্যথায় সতীন্দ্রবাবুর চোখে জল এসে গেল। তাঁর চোখে জল দেখে রতনলালজীও নিজেকে হারিয়ে ফেললেন এবং বললেন "হ্যাঁ সতীন্দ্রবাবু, ভাবিজী মারা যাওয়ায় হামাদেরও বহু দুখ হইল। সবহিকে ভগবান মালিক, কি আর কোরা যাবে বোলেন। আপুনি কাঁদবেন না, রোনেসে কি হোবে বোলেন? মনকে শান্ত কোরেন, ঘরে গিয়ে ছেলা-মেইয়াদের দেখ্ভাল কোরেন, মন ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া আপনার বড় লেড়কা তো এখানে থাকলই, হামি মাঝে মাঝে আপনাদের খবরও লিব। কোনও চিন্তা নেই, সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

বাবাকে দেশে পাঠিয়ে সুদীপ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যবসায় মনোযোগ দিল এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে দিনে-দিনে আর্থিক উন্নতি করতে লাগল। সে নিয়মিত দোকানে আসে, কাজ করে, কিন্তু মনের এক কোণে কোথায় যেন একটা ব্যথার কীট সুদীপকে সব সময় কুরেকুরে খায়। সকল ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে-মাঝে তার মনে হয় মায়ের জীবনটা দাওয়ায় শুয়েই কেটে গেল, এমন কি, শেষ শয্যাও তাঁকে ঐ আমতলার ঘরের দাওয়াতেই নিতে হল। একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে, একটু ভাল বিছানায়, নরম বালিশে মাথা রেখে শেষ সময়ে মা একটু আরামের স্পর্শও অনুভব করতে পারলেন না। তা হলে কি হবে ছাই এত খেটে; কার জন্য খাটব। মাঝে-মাঝে যখন কথাগুলো মনে হয় তখন সুদীপ ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু সে পুরুষ মানুষ, তাই কাঁদতেও পারে না। বুকের ব্যথাকে নিঃশব্দে বুকেরই গভীরে সমাধিস্থ করতে হয়। আবার কখনও কখনও নিজের মনেই চিন্তা করে—মা তো গেছেনই কিন্তু আর যারা আছে তাদের প্রতি তো তার একটা কর্ত্তব্য আছে। তারাও তো কেউই তার অবহেলার পাত্র নয়। তার বৃদ্ধ বাবা, বিধবা বোন কমলা, অন্যান্য ভাইবোনেরা, সুরমা, ছবি, এমন কি, সুরমার গর্ভে আবার যে আসছে এদের সবারই প্রতি তার একটা কর্ত্তব্য আছে। সংসারের বাকী সবাই একমাত্র তারই মুখের পানে চেয়ে আছে। এক-এক সময় নিরালায় বসে চিন্তা করতে গিয়ে সুদীপের মনে হয় সবাই যেন তারই মুখের দিকে আগ্রহাকুল নয়নে চেয়ে প্রহর গুণছে, কবে তারা একটু সুখের স্বাদ পাবে, একটু সাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবে। এই চিন্তাটাই সুদীপকে মায়ের মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে

কর্ম্মক্ষেত্রে দ্বিগুণ উদ্দীপনায় কাজ করায়। নিজেকে ভুলে দোকানের কাজের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে পড়ে। খরিদ্দারই তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠে।

দেখতে-দেখতে বছর ঘুরে যায়। পুনরায় নববর্ষের সময় আসে। চৈত্রমাসে আখেরির সময় বলরাম ও সুদীপ হিসাবনিকাশ করে দেখল দোকান থেকে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তখন দুই বন্ধুতে যুক্তি করে এই তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে বিশ হাজার টাকা ভাগ করে নিয়ে বাকী টাকা থেকে কিছু দিয়ে দুটো গোডাউন ভাড়া নিল এবং উদ্বৃত্ত টাকায় মাল কিনে স্টক করল। নিজের অংশের টাকা হাতে পেয়েই সুদীপ সর্ব্বাগ্রে রমেন-বাবুদের নিকট জমিজায়গা ও পুকুরের দরুণ যে টাকা বাকী ছিল তা পরিশোধ করে এল স্কট লেনে তাঁদের বাসায় গিয়ে। দু-বছরের জায়গায় মাত্র মাস আষ্টেকের ভিতর পুরোপুরি টাকা পেয়ে রমেনবাবু খুব খুশী। তিনি সুদীপকে সস্নেহে মিষ্টি খাওয়ালেন এবং তাকে নতুন বাড়ী, ঢেড়েডাঙ্গা পুকুর ও আউশ জমিগুলি দখল নেবার পরামর্শ দিলেন। আর সেই ভাবেই গ্রামের বাড়ীর নায়েব মশায়কে পত্রও লিখে দিলেন। সুদীপ সেই পত্রখানি নিয়ে তার সঙ্গে নিজের আর একখানি পত্র লিখে বাঘাসনে সতীন্দ্রবাবুর নিকটে পাঠিয়ে দিল।

কলকাতা থেকে বাঘাসনে ফিরে দীর্ঘ সময় আলস্যে অতিবাহিত করা সতীন্দ্র বাবুর মত কর্ম্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে খুবই মুস্কিল হল। যদিও বয়স তাঁর পঞ্চান্ন, তবু তিনি যথেষ্ট কর্ম্মঠ ছিলেন। বাড়ীর কাজকর্ম্ম ও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার তদ্বির-তদারক করা ছাড়াও নিজে প্রচুর পড়াশুনা করতে লাগলেন। বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত এই তিনটি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ধীরে ধীরে আবার তাঁর যুবাকালের স্কুল মাষ্টারির দিনগুলো যেন নতুন করে ধরা দিতে লাগল। কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে অবসর পেলে পড়াশুনা নিয়েই তিনি সময় কাটাতে লাগলেন। নিজের আর্থিক সামর্থে কুলোত না বলে দু-তিন-চার ক্রোশ দূরের স্কুল লাইব্রেরী বা বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে বই আনিয়ে পড়তে লাগলেন।

বৈশাখের এক রৌদ্রতপ্ত দুপুরে সতীন্দ্রবাবু এক খণ্ড সেক্সপীয়ার নিয়ে পড়ছেন, এমন সময় "চিঠি-চিঠি" বলে পিয়ন ডাকতেই কমলা একখানা চিঠি নিয়ে গিয়ে বাবাকে দিল। সতীন্দ্রবাবু খামটা ছিঁড়ে দেখলেন সুদীপের পত্র আর তার সঙ্গে জমিদার রমেন-ভট্টাচার্য্য মশায়ের আর একখানা পত্র। পত্র দু-খানি বার কয়েক পড়ে মনে হল শুয়ে শুয়ে পড়ার জন্য বোধ হয় মর্ম্মোদ্ধার করতে পারছেন না, তাই মাদুরের উপর উঠে বসে চশমাটা চোখে ভাল করে লাগিয়ে পত্র দু-খানি আবার

মন দিয়ে পড়লেন, কিন্তু তাতেও তাঁর যেন বিশ্বাস হল না। সুদীপ ভিতরে-ভিতরে এই গ্রামেরই জমিদার রমেন ভট্টাচার্য্য মশায়দের জমি কিনেছে, বাড়ী কিনেছে, পুকুর কিনেছে যে ভট্টাচার্য্যরা এই কয়েক বছর আগেও এই দত্তদেরই সর্বনাশ করতে মহামামলা লাগিয়ে দিয়েছিল। এ যে অবাক কাণ্ড, এ যে তাজ্জব ব্যাপার। বার-বার পড়েও তিনি ব্যাপারটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই ঐ দুপুরের রোদ মাথায় করেই তিনি ভট্টাচার্য্যদের কাছারীতে ছুটলেন নায়েব মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। নায়েবমশায় তখন সবে নিদ্রা ত্যাগ করে একটু ধূমপান করছিলেন। সতীন্দ্রবাবুকে কাছারীতে ঢুকতে দেখে তিনি বেশ আদর-আপ্যায়ন করলেন। "আরে আসুন, আসুন, দত্তমশায় আসুন।"

ভট্টাচার্য্য বাড়ীর নায়েবের, বাবুদের থেকেও যাঁর তর্জ্জন বেশী সেই, নায়েবের এমন সহজ সাগ্রহ আপ্যায়ন শুনে সতীন্দ্রবাবু একটু বিস্মিত হলেন, কিন্তু তিনি কিছু প্রশ্ন করবার বা কিছু বলবার আগেই নায়েব মশাই নিজেই বলতে শুরু করলেন, "কি দত্ত মশায়, আপনিও চিঠি পেয়েছেন তো? বড়-বাবু আমায় চিঠি দিয়েছেন এবং তাতে লিখেছেন নতুন বাড়ী, ঢেড়েডাঙ্গা পুকুর, ঘোষালদের দরুণ আউস ধানের জমিগুলোর দখল আপনাকে ছেড়ে দিতে। সম্পত্তিগুলো যখন আপনি কিনেছেন তখন আপনি যে মুহূর্ত্তে চান সব দখল নিন। এই নিন নতুন বাড়ীর চাবি," বলে পাটের দড়িতে বাঁধা একটা লোহার চাবিকাঠি সতীন্দ্রবাবুর হাতে তুলে দিলেন। আসলে সুদীপের জমি কেনার ব্যাপারটা সত্যি কিনা এবং নায়েব-বাবু এ সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা সেই খবরটুকু মাত্র নেবার জন্য সতীন্দ্রবাবু নায়েব মশায়ের কাছে এসেছিলেন এবং আসার সময় রাস্তায় দশবার ভাবতে-ভাবতে আসছিলেন যে, প্রসঙ্গটা নায়েব মশায়ের নিকট তিনি উত্থাপন করবেন কিভাবে। কিন্তু তিনি কিছু প্রশ্ন করবার আগেই তাঁর হাতে নতুন বাড়ীর চাবি পর্য্যন্ত উঠে এল দেখে তিনি ভাবলেন একি যাদু, না ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ! ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সব কিছুর পশ্চাতে যে তাঁর স্নেহের সন্তান সুদীপের কঠোর পরিশ্রম ও কর্ম্মদক্ষতা আছে সে-টুকুর কথা ভেবে এখানে দাঁড়িয়েই মনে-মনে দু-হাত তুলে এক হাতে ঈশ্বরকে প্রণাম ও আর এক হাতে সুদীপকে আশীর্ব্বাদ করলেন। এরপর নায়েব মশায়ের সঙ্গে সৌজন্যসূচক আরও কিছু আলাপান্তে সতীন্দ্রবাবু বাড়ী ফিরে দরজা থেকে, "বৌমা". "বৌমা" করে হাঁক পাড়তেই শ্বশুরের গলা শুনে সুরমা হাতের কাজ ফেলে প্রায় হাঁফাতে-হাঁফাতে দোরগড়ায় হাজির হল। পুত্রবধু সুরমা কাছে আসতেই তিনি আনন্দসংবাদটি তাকে পরিবেশন

করলেন এবং এর পর 'কমলা', 'কমলা' করে ডাক দিতে লাগলেন। আসলে সতীন্দ্রবাবু নিজের মনের আনন্দটা যেন সবারই মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইছিলেন, তাই পুত্রবধূ সুরমা ও কন্যা কমলাকে খবরটা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁর মনটা ছটফট করছিল। কমলাকে খবরটা দিতে-দিতেই একবার বললেন, "আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকত—!" কথাটা বলতে-বলতেই তাঁর বুকের গভীর থেকে একটা তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হয়ে এল। স্বামীর সম্পত্তিক্রয়ের সংবাদে যার সব থেকে বেশী আনন্দ হওয়া উচিত অর্থাৎ সুরমার মনে তখন যেন আনন্দের এক ঝর্ণা ধারা ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। সে গলায় আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি তখনই তুলসীতলায় একটা প্রণাম করে ও শ্বশুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি মাথায় ঠেকাল। কমলাও বৌদির দেখাদেখি তুলসীতলায় ও বাবাকে প্রণাম করল এবং আগামী পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণের কথা দেবে বলে মানত করল। সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে সবার মনে যেন একটা অনাবিল আনন্দের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। যদিও ইতিপূর্বে বহু কষ্টে চার বিঘা ধানজমি কেনা হয়েছিল তবুও যাদের দেড় কাঠা ভিটের উপর একখানা চার চালের খড়ের ঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাদের একসঙ্গে পুকুর, বাড়ী ও দো-ফসলী জমি হয়েছে শুনলে একেবারে চরম শত্রু ছাড়া কার না আনন্দ হয়। সেই আনন্দের স্রোতটাই সতীন্দ্রবাবুর পরিবারের সকলের মধ্যে বয়ে যেতে লাগল। খুশীর মেজাজে সতীন্দ্রবাবু কমলাকে এক কাপ চা করে দিতে বললেন। চাটুকু কোন রকমে খেয়েই ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে এক হাতে ছড়িটা নিয়ে সতীন্দ্রবাবু তাঁর সব থেকে প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বাবুনপুরের মণ্ডলদের মেজ কর্ত্তা জ্ঞান মণ্ডল মশায়কে খবরটা দেবার জন্য বের হয়ে গেলেন।

বড়বাজারের হাজরা কোম্পানীর দোকানে বসেই সুদীপ একদিন নবস্থা থেকে মাসীর চিঠি পেল। চিঠিতে স্নেহসম্ভাষণান্তে মাসী লিখেছেন, "বাবা সুদীপ, তুই এখান থেকে চলে যাওয়ার পর গত সাত-আট বছরে আমার দুর্ভাগ্যের শেষ নাই, ছেলেরা কেউই লেখাপড়া শিখছে না, বড় ছেলে ভোলানাথ পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে খদ্দর পরে কংগ্রেস করে বেড়াচ্ছে আর ছোট ছেলে কোন রকমে স্কুলটা কোনও কোনও দিন যদিও যায় স্কুল থেকে লোকের কুল-বেল পেড়ে ঝগড়া মারামারি করে বাড়ী ফিরে আসে। লোকের সঙ্গে ঝগড়া মেটাতে-মেটাতে আমার নাকালের একশেষ। তা ছাড়াও মেয়েরা বড় হচ্ছে। বিয়ের বয়স হচ্ছে। এদিকে সংসারের রোজগার কিছুই নাই। বাড়ীতে সমর্থ ও উপযুক্ত পুরুষ মানুষ না থাকলে যা হয় আমার সংসারের অবস্থাও সেইরূপ। দেখাশুনার অভাবে জমিজায়গা থেকেও বিশেষ কিছুই আয় হচ্ছে না, বরং প্রতি বছরেই

প্রায় দু'এক বিঘা করে বিক্রি করতে হচ্ছে। এমত অবস্থায় তুইই আমার একমাত্র ভরসা। যদি সম্ভব হয় ভোলানাথের জন্য কলকাতায় কোথাও একটা চাকরীবাকরী যদি করে দিতে পারিস তা হলে অন্ততঃ আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হই।" মাসীর চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে সুদীপ ব্যাপারটা নিয়ে বলরামের সঙ্গে একটু আলোচনা করল এবং দু'জনে যুক্তি করে ঠিক করল মাসীর ছেলে ভোলানাথ, প্রদীপ আর সুদীপের মামাতো ভাই বিজয়কে নিয়ে 'সোম, সামন্ত এণ্ড দত্ত কোম্পানী' নামে একটা কোম্পানী করে দেবে। যে কথা সেই কাজ। পরদিন থেকেই দালাল লাগিয়ে ঘর খোঁজা শুরু হল। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে হ্যারিসন রোডের উত্তর দিকে রাজার চকের সামনে দুই নম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে একজন মুসলমান ডিমওয়ালার দোকান খালি পাওয়া গেল। দু'হাজার টাকা সেলামী দিয়ে ঘরটা নেওয়া হল এবং যথারীতি দোকানও করে দেওয়া হল। 'সোম, সামন্ত এণ্ড দত্ত কোম্পানী' লোহার কাঁটা তার, হুপ আয়রণ, পেরেক ইত্যাদি দ্রব্যের কারবার করতে লাগল। মেজভাই প্রদীপটা ম্যাট্রিক পাশ করে বসে ছিল, তাই ভোলানাথ ও বিজয়ের সঙ্গে তাকে কারবারে লাগাতে পেরে সুদীপও কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'ল। সুদীপের ব্যবস্থাপনা ও নির্দ্দেশে 'সোম, সামন্ত এণ্ড দত্ত কোম্পানী'ও বেশ ভালই চলতে লাগল, কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল ভোলানাথের ব্যবহারের জন্য কারও সঙ্গেই তার বনিবনা হচ্ছে না। তার নানারূপ কটূক্তি ও দুর্ব্যবহারের জন্য প্রদীপ ও বিজয়ের সঙ্গে তার বার-বার মতভেদ ও মনোমালিন্য হতে লাগল এবং সুদীপের মীমাংসায় জোড়াতালি দিয়ে কোনও রকমে কোম্পানী চলতে লাগল।

হাজরা কোম্পানীর দোকানে বসেই সুদীপ আর একদিন আর একখানি পত্র পেল। পত্রলেখক সতীন্দ্রবাবু জানিয়েছেন,—"সুরমার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে, শিশু ভাল আছে, প্রসূতি খুবই দুর্বল, ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন, তুমি একদিন বাড়ী আসিলে ভাল হয়।" বাবার পত্র পেয়ে সুদীপ বাড়ী এসে সুরমার অবস্থা দেখে খুবই চিন্তিত হল। কোথায় সেই অনুপম লাবণ্য, কোথায় সেই সুন্দর মুখশ্রী। মাত্র মাস দুয়েক আগে দেখা সুরমাকে যেন চেনা যায় না। থাকবার মধ্যে আছে রুগ্ন শীর্ণ মুখের মধ্যে পদ্মকোরকের মত দীঘল ঢলঢল দুটি চোখ। সুরমার এই শ্রীহীন অবস্থা দেখে সুদীপ পরদিন ডাক্তার আনিয়ে পরীক্ষা করাল। দেখেশুনে ডাক্তার বললেন "এখানে কিছু করবার নেই, পারেন তো কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোন বড় হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে দেখান।" সুদীপের অনেক পীড়াপীড়িতেও সুরমার

রোগটা যে কি তা কিছুতেই ডাক্তারবাবু বললেন না। অর্থের অভাবে দারিদ্র্যের পীড়নে প্রায় বিনা চিকিৎসায় ও হতযত্নে সুদীপ মাকে হারিয়েছে, তাই সুরমার বেলায় আনন্দাশৌচান্তে সুরমাকে কলকাতায় আনা ঠিক করল। কিন্তু কলকাতায় চিকিৎসার জন্য সুরমাকে রাখতে হলে তো মেসবাড়ীতে আনা যায় না, তাই অনেক ভেবেচিন্তে হীরেনদা ও বলরামের সঙ্গে যুক্তি করে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে কারফর্মা লেনের বারর-এ নম্বর বাড়ীর দোতলার তিনখানা ঘর ভাড়া নিল। ভাড়া মাসিক আঠাশ টাকা। বারর-এ কারফর্মা লেনের দোতলায় মোট তিনখানি ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে অর্থাৎ বাড়ীর দক্ষিণাংশে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বার ফুট চওড়া আর বিশফুট লম্বা বেশ বড় একখানা ঘর যার দরজা উত্তরমুখী এবং ঘরখানিতে জানালা আছে মোট আটটি, তার ঠিক উল্টোদিকে বাড়ীর উত্তরাংশে প্রায় দশফুট চওড়া ও বিশ ফুট লম্বা আর একখানি ঘর যার দরজা দক্ষিণ মুখী, জানালা মোট চারটি আর দু'টি ঘরকে যুক্ত করেছে চার ফুট চওড়া আর বিশ ফুট লম্বা এক চিলতে বারান্দা। ঐ বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় দশ ফুট চওড়া ও বার ফুট লম্বা আর একখানি ঘর যার জানালা মোট দুটি ও দরজা দুটি, দুটি দরজাই পূর্বমুখী, সামনে একটুকরো স্নানঘর, কল-পায়খানা ইত্যাদি আর এই ঘরের পার্শ্বে বাকী অংশটুকু রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা। অসুবিধার মধ্যে হল রান্না ঘরখানি ছাদে অর্থাৎ দোতলায় থাকা আর তিন তলায় রান্না ও খাওয়া-দাওয়া। বাড়ীতে গঙ্গাজল ও পরিস্রুত জল মিলিয়ে জলেরও প্রাচুর্য আছে। ঘরগুলিতে প্রচুর আলো-বাতাস ও জলের প্রাচুর্য আছে দেখে এবং ভাড়া মাসে মাত্র আঠাশ টাকা শুনে সুদীপ তক্ষুণি ঘরগুলি ভাড়া নিল এবং ছমাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে বাড়ীওয়ালা জীতেন মল্লিকমশায়ের কাছে রসিদ নিল।

বাড়ীভাড়া নেওয়া হলে মেসবাড়ী থেকে হীরেন ও প্রদীপ সুদীপের ও নিজেদের টুকটাক জিনিসপত্র নিয়ে এসে একে-একে গোছগাছ করতে লাগল আর সুদীপ পর দিনই সুরমাকে আনবার জন্য বাঘাসন রওনা হল। ঠিক তার পর দিনই সুরমাকে বাঘাসন থেকে নিয়ে এসে সুদীপ বারর-এ কারফর্মা লেনের দোতলায় তুলল। বিছানা বলতে তখনও পর্য্যন্ত নূতন বাসায় সবারই একটা করে মাদুর আর কাঁথা, তার বেশী কিছু ব্যবহারের কথা কেউ কোনও দিন চিন্তাই করে নি, কারণ মেস জীবনে বোধ হয় এর বেশী কারোরই কিছু প্রয়োজন পড়ে নি। কিন্তু সুরমা আসতেই অসুবিধা দেখা দিল। সুরমার শরীর মাত্র কিছু দিনে এমনই শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে শরীরে ঐ শক্ত মাদুরে শুয়েই সে যন্ত্রণায় উ-অঁা করতে লাগল। সুদীপ সুরমার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে, "কি হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে নাকি," প্রশ্ন

করতেই সুরমা একটা হাত তুলে মাদুরটা দেখিয়ে বলল, "বিছানাটা বড্ড শক্ত, পিঠে লাগছে।" সুস্থ লোকের পক্ষে যা সম্ভব অর্থাৎ বিছানাটা শক্ত হল কি নরম হল বা কতখানি শক্ত বা কতখানি নরম এ-নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন বোধ হয় নি, তাই, সুদীপ, হীরেন বা প্রদীপ কারোরই এ-ব্যাপারে আগে খেয়ালই হয়নি, কিন্তু সুরমার যন্ত্রণাকাতর মুখের পানে চেয়ে এবং বলরামের ধমক খেয়ে সুদীপ তক্ষুণি হীরেনকে দিয়ে বড়বাজারের তুলাপট্টি থেকে তোষক, বালিশ ইত্যাদি ও দোকান থেকে চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি কিনিয়ে আনল এবং ভালভাবে বিছানা করে সুরমাকে শোয়াল।

পরদিনই সুরমার জন্য সুদীপ বড় ডাক্তারকে কল দিল। ডাক্তার সুরমাকে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন এবং সেই ব্যবস্থা মত কিছুদিন চিকিৎসা চলল, কিন্তু সুরমার কোনও উন্নতি হল না। এরপর সুদীপ পর-পর কলকাতার বেশ কয়েকজন সুখ্যাত ডাক্তারকে কল দিল এবং তাঁদের নির্দেশ মত চলতে লাগল। কিন্তু সুরমার কোনও উন্নতি নাই, বরং দিনে-দিনে তার অবনতিই ঘটতে লাগল। দু-দিন ভাল থাকে তো চারদিন খারাপ থাকে। এইভাবে মাস তিনেক কাটার পর ভোলানাথের যুক্তিতে সুদীপ ডাঃ রায়কে কল দিলে তিনি এসে প্রথমেই সিঁড়ির ডান দিকে বাড়ীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত বড় ঘরখানিতে ঢুকেই মন্তব্য করলেন, "বাঃ কলকাতায় এ-পাড়ায় এত আলো-বাতাসযুক্ত ঘরও আছে তা হলে!" বেশ হাল্কা মেজাজেই তিনি সুরমাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, কিন্তু পরীক্ষা শেষে তাঁর মেজাজটা আর হাল্কা রইল না, বরং বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি সুদীপ ও ভোলানাথকে বাইরে ডেকে বললেন, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে বাবা, মাস দুয়েক পরে আবার আসব, আপাতত এই ওষুধগুলো তোমরা ওকে খাওয়াও, যদি দু'মাসের মধ্যে কোনও উন্নতি না হয় তা হলে আর একবার আমায় খবর দিও, মাকে আমি আর একবার এসে দেখে যাব।" ডাঃ বিধান রায় ওষুধপথ্যের সঙ্গে আর একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা বলেছিলেন, বললেন, "রোজ সকালে যখন ওর মাথার যন্ত্রণা হবে তখন মাথা না টিপে একটা শুকনো ফিতে বা কাপড় মাথাটার চারদিকে জড়িয়ে বেশ কষে বেঁধে রাখবে কিছুক্ষণ, তাহলে উনি কিছুটা আরাম বোধ করবেন।"

ডাঃ রায়ের কথা মত চিকিৎসা চলতে লাগল, কিন্তু সুরমার কোনও উন্নতি নাই। মাঝে-মাঝে সে যেন বেশ ভাল থাকে আবার কখনও-কখনও মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করে এবং চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। প্রথম-প্রথম বিছানায় উঠে বসে ঠাকুরকে রান্নাবান্না সম্বন্ধে বলে দিত, কোলের ছেলেটাকেও মাঝে-মাঝে আদর করত, বাসার সবার খাওয়া-দাওয়া ঠিক

সময়ে হল কিনা খোঁজ-খবর নিত, কিন্তু ইদানীং মাস দুয়েক আর সে কিছুই পারে না, এমন কি, বিছানায় উঠে বসতেও পারে না। ছেলে অনির্ব্বাণকে নিজের হাতে কোলে তুলে নিতেও পারে না। ছেলেটা প্রায় পাঁচ মাসের হয়েছে, দামাল হয়েছে, গোটা ঘরময় সে ছটফট করে বেড়ায়, মায়ের কোলে-বুকে উঠতে চায়, খিলখিল করে হাসে, কিন্তু সুরমাকে কেউ বসিয়ে দিলে শুধু দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে-বসে সতৃষ্ণ অশ্রুকাতর নয়নে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। দিন-দিন সুরমার অবস্থাটা খারাপের দিকেই যাচ্ছে এবং ছেলেটার বড় অযত্ন হচ্ছে দেখে সুদীপ বোন কমলাকে বাঘাসন থেকে ঐ বাসায় নিয়ে এল। কমলাকে কাছে পেয়ে সুরমা তাকে জড়িয়ে ধরে কেবল কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল, "তুমি যেন আমার অনিকে দেখো ঠাকুরঝি, ওকে যেন তুমি মানুষ করো।" সুরমার কান্নায় ও তার শরীরের অবস্থা দেখে কমলারও বুক ভেঙ্গে অশ্রুর ঢল নামল, সব সময় সে অনির্ব্বাণকে কোলেপিঠে করে ঘুরতে লাগল এবং বৌদির সেবাযত্ন করতে লাগল। কমলার সেবাযত্নে কয়েক দিনের মধ্যে সুরমা যেন একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল। কদিন মাথার যন্ত্রণাটাও একটু কম। সবাই দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল কিন্তু তখনও কেউই টের পায়নি যে, নিভবার আগে দীপ মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় দু-মাস হয়ে যায় দেখে সুদীপ আবার ডাঃ রায়কে কল দিল। ডাঃ রায় এসে সুরমাকে পরীক্ষা করে বললেন, "এই তো মা তুমি তো সেরে গেছ।" ডাক্তারের কথা শুনে সুরমা অঝোরে কেঁদে ফেলল এবং বন্যার জলে ভাসমান প্রাণের সম্বন্ধে হতাশ মানুষ যেমন স্রোতের সাথে ভেসে যাওয়া সামান্য খড়কুটোকে মস্ত অবলম্বন বলে মনে করে সুরমাও ডাঃ রায়ের কথাকটিকে তার শেষ অবলম্বন ভেবে নিয়ে বলল, "ডাক্তার-বাবু, আমি আবার ভাল হয়ে যাব? ডাক্তার-বাবু, আমায় বাঁচিয়ে দিন, আমার অনির্ব্বাণ যে বড্ড ছোট ডাক্তার-বাবু। ওর জন্মের পর থেকে ওকে একদিনও ভাল করে কোলে করতে পারলাম না, বুকের দুধ দিতে পারলাম না, ডাক্তার-বাবু, আপনি আমায় বাঁচান ডাক্তার-বাবু···ডাক্তার-বাবু"···বলতে বলতে সুরমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। অনির্ব্বাণকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সুরমার ঐ ভাবে কান্না দেখে ভারতবিখ্যাত অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ চিকিৎসক ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের মত ধীর, স্থির, গম্ভীর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষও আর স্থির থাকতে পারলেন না। সুরমার মাথায় হাত দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাঁর হাতটা কেঁপে গেল, হয়ত চোখের জল সামলাবার জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এলেন। এই রোগিনীর ব্যাপারে তিনি নিজেই বিশেষ দুর্ব্বল ছিলেন, কারণ একদিন মাত্র তিনি এঁকে দেখেছেন, কিন্তু প্রথম দিনেই

তিনি বিছানার কাছে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সুরমা তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল, তা ছাড়া সুরমার কথাবার্ত্তা ও আচরণে এমনই একটা সুমিষ্টতা ও সহজ সাচ্ছন্দ্য ছিল যে, প্রথম দিনই তাকে দেখে ডাঃ রায়ের মনে হয়েছিল যেন তিনি তাঁর নিজেরই কোন ভগ্নীকে পরীক্ষা করছেন। তাই সুরমাকে পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন হয়ত এই তাঁর শেষ পরীক্ষা। তারপরে সুরমার শিশুটাকে বুকে জড়িয়ে আকুল ক্রন্দন শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, হঠাৎ তাঁর মনে হল ডাক্তার হলেও তিনিও একজন মানুষ। অসহায় মৃত্যুপথযাত্রী আর একটি প্রাণ বাঁচবার জন্য আকুল হয়ে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, অথচ রোগ কি জেনেও তাঁর করবার কিছু নেই, কারণ এদেশে এ-রোগের চিকিৎসার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির পক্ষেও বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়াও প্রায় অসম্ভব। নিজের আবেগ সংবরণ করতে বাইরে এসে ডাক্তার সুদীপকে বললেন, "দু-সপ্তাহ পরে তুমি আর একবার আমায় খবর দিও।" বলে তিনি সুদীপের হাতটা ধরে একটু সান্ত্বনা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই সুদীপ তাঁকে ফীসের টাকাটা দিতে গেলে তিনি বললেন, "না ভাই, ওটা দিয়ে আমায় আর লজ্জা দিও না।" সুদীপ অনেক করে অনুরোধ করলেও তিনি ফীসের টাকা কিছুতেই নিলেন না এবং সবশেষে যা বললেন তা শুনে সুদীপকেও বাধ্য হয়ে ডাঃ রায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হল। তিনি বললেন, "ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে রোগী পরীক্ষা করে কি দাদা পয়সা নিতে পারে?" এরপর কিছু বলা নেহাৎই অন্যায় হবে বলে সুদীপ আর কিছু না বলে তাঁর ব্যাগটা নিয়ে বড় রাস্তার ধারে তাঁর গাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিল এবং প্রশ্ন করল "তাহলে সুরমার বাঁচবার আর কোন আশাই নাই?" সুরমাকে যাই-ই বলুন সুদীপকে ফাঁকি দিতে ডাঃ রায়ের মন চাইল না, তিনি স্পষ্টতই বললেন "বড় জোর দিন দশেক আর বাঁচবে। যাই হোক, অন্তত, এই কটা দিন সেবা দিয়ে শুশ্রূষা দিয়ে ওর জীবনটা ভরিয়ে দিও। য়াট লিষ্ট লেট হার ডাই ইন পিস্ এণ্ড স্যাটিশফ্যাকশন।" বলে ডাঃ রায় গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন আর সুদীপ একেবারে শূন্য মন নিয়ে বাসার দিকে হাঁটতে লাগল। গলির মোড় থেকে বাড়ীর দোতলা খুব বেশী হলেও একশ পা রাস্তা, কিন্তু ঐটুকু হাঁটতেই সুদীপের মনে হল, সে যেন যুগ-যুগান্তর ধরে অফুরন্ত এক পথের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, যে-পথের কোন শেষ নেই, কোন সীমা নেই, যে-পথে আলো নেই, হাওয়া নেই, যে-পথে শুধু অন্ধকার, শুধু অন্তহীন অন্ধকার। বাড়ীতে ঢুকে বিষাদগ্রস্ত সুদীপ ক্লান্ত ছন্দহীন পায়ে ধাপেধাপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে

উঠার সময় তার মনে হল যেন সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, তাই দুহাতে সিঁড়ির রেলিংগুলোকে চেপে-চেপে ধরে উঠতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই, সুদীপ ভাবতে লাগল আর মনে-মনে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উদ্দেশে বলতে লাগল, "হে ভগবান, কোথায় শান্তি? কোথায় আনন্দ? দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি যদিও তুমি দিলে তো পর-পর শ্রদ্ধার ধন মাকে ও ভালবাসার ধন স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে সর্বহারার ব্যথা কেন দিতে চাও? এ কি কঠিন পরীক্ষা তোমার? এই পরীক্ষাই যদি করবে তবে মানুষের মনগুলোকে এমন নরম করে কেন গড়লে? কি প্রয়োজন ছিল তোমার মানুষকে সব দিয়ে আবার সব কেড়ে নেবার?" চিন্তা করতে করতে সুদীপ নিজের অজান্তেই কখন কেঁদে উঠেছিল। সুরমার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণামের কথা ভেবে, দুঃখে-বেদনায় তার অন্তরটা যেন আপনা-আপনিই ককিয়ে উঠেছিল আর তার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই অস্ফুটে একটা আওয়াজ বের হয়ে এসেছিল। পিছনে সিঁড়ির কাছে আওয়াজ শুনে বারান্দায় দণ্ডায়মান হীরেন চট করে পিছন ফিরে দেখল সুদীপ সিঁড়ির রেলিংটা চেপে ধরে যেন নিজেকে সামলাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বারান্দা থেকে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে হীরেন সুদীপকে জড়িয়ে ধরে উত্তর দিকের ঘরে নিয়ে এল এবং একটা মাদুর পেতে তাকে বসিয়ে দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে তার মাথায় মুখে জলের ছিটে দিয়ে মুখটা মাথাটা মুছিয়ে দিয়ে বাকী জলটুকু তাকে খেয়ে নিতে নির্দ্দেশ দিল। হীরেনের কথায় যন্ত্রচালিতের মত সুদীপ জলটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নিল। ডাঃ রায়ের শেষ কথাগুলো শুনে ও সুরমার অনিবার্য্য পরিণতির কথা ভেবে তার শুধু গলাটাই নয়, সারা দেহটাই যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, তাই হীরেনদার দেওয়া জলটা খেয়ে সুদীপ একটু সুস্থ হল এবং ধীরে-ধীরে হীরেনকে, ডাঃ রায় যা বলেছেন তার সবটুকুই বলল। সুদীপের কথা শুনে হীরেন মুখে কিছুই বলল না, কারণ সুদীপ যা শুনেছে হীরেনও এতক্ষণে তা বুঝেছে, তাই মুখে কিছু না বলে বেদনাক্লিষ্ট সুদীপের মাথায় পিঠে ধীরে-ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ডাঃ রায় বলেছিলেন, "দিন দশেক", কিন্তু দেখা গেল দিন আষ্টেক না যেতেই সুরমা একেবারেই বিছানার সঙ্গে মিশে গেল। ধীরে-ধীরে তার গোটা শরীর ও মুখটার রং পরিবর্ত্তিত হয়ে কালসিটে পড়ার মত কালচে হয়ে গেল এবং তীব্র যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল। নবম দিন সকাল বেলাতেও সুরমা একই রকম; মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, উঃ আঃ করছে আর অনির্ব্বাণকে বুকে টেনে নিয়ে 'আমার খোকা' 'আমার খোকা' বলে কাঁদছে। সুরমার এই অসহনীয় যন্ত্রণা, কাতোরক্তি

ও ছটফটানি দেখে সুদীপ, হীরেন সবাই প্রায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিল, নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। সুদীপও মাঝে-মাঝে কাঁদছে দেখে হীরেনই তাকে কোনও রকমে বুঝিয়েসুঝিয়ে বড়বাজারে পাঠাল, আসলে তাকে তার নিজের স্ত্রীর যন্ত্রণাক্ত অন্তিম পরিণতি দর্শনের হাত থেকে কিছুটা রেহাই দেবার জন্যই হীরেন বড়বাজারে পাঠাল। কিছুটা হীরেনের কথায় আর কিছুটা নিজেকে সামলাবার জন্যই সুদীপ বড়বাজারে গিয়ে হাজরা কোম্পানীতে উঠে একটা চেয়ারে বসল। চেয়ারে বসল বটে, কিন্তু কোন কাজই সে করতে পারল না। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ কাটার পরে বসে আছে—এমন সময় 'সুদীপ' 'সুদীপ' বলতে-বলতে হীরেন ছুটে এল, বলল "শীঘ্র চল, সুরমা অজ্ঞান হয়ে গেছে, আর কথা বলছে না।" হীরেনের কথায় সুদীপ ত্রস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠল এবং ভাগিনেয় মধুসূদনের উপর দোকানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বলরাম ও সুদীপ হীরেনের সঙ্গে বারর-এ কারফর্ম্মা লেনে বাসায় এল। বাসায় পা দিয়ে ওরা শুনতে পেল কমলা 'বৌদি গো' 'বৌদি গো' বলে কাঁদছে, সঙ্গে ছোট ছেলেটাও প্রাণপণে কেঁদে চলেছে।

কমলার কান্না শুনে সবাই ভাবল যা হবার তা এতক্ষণে হয়ে গেছে এবং পড়ি-মরি করে সিঁড়ি কটা ভেঙ্গে সবাই দক্ষিণ দিকের বড় ঘরে এসে ঢুকল। বলরাম সুরমার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে দেখল, নাড়ীটা তখনও চলছে, তবে খুবই অসংলগ্ন ও ক্ষীণভাবে। সে তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে হীরেনকে বলল, "হীরেন চট্ করে একজন ডাক্তার নিয়ে আয়, সুরমা এখনও বেঁচে আছে।" হীরেন কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় ডাক্তার দাশগুপ্তকে নিয়ে এল এবং তিনি এসে একটা ইঞ্জেকশন দিতেই কিছুক্ষণের মধ্যে সুরমা একবার চোখদুটো খুলল। সামনেই সুদীপকে দেখে সে কিছু বলতে চাইল। সুদীপ সুরমার মাথার কাছে মুখটা নীচু করে বলল, "কিছু বলবে? সুরমা, কিছু বলবে?" বলতে বলতে সুদীপের চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সুরমার গালে ঝরে পড়ল। সুদীপ কাঁদছে দেখে সুরমা তার রোগশীর্ণ অস্থিসার হাতদুটো নিয়ে সুদীপের চোখের কোল দুটো মুছে দিতে গেল, কিন্তু পারল না। দারুণ দুর্ব্বলতায় তার হাত দুটো কেঁপে নিজেরই বুকে পড়ে যায় দেখে সুদীপ নিজের হাতে সুরমার ডান হাতখানা নিয়ে তার হাতের স্পর্শ দিয়েই নিজের চোখের কোণগুলো মুছল, চোখ মুছতে মুছতেই সুদীপ লক্ষ্য করল সুরমার ঠোঁটগুলো কাঁপছে, সুদীপ বুঝল সুরমা কিছু বলতে চায়। সে তার ডান কাণটা সুরমার মুখের কাছে নিয়ে গেল, সুরমা ফিসফিস করে কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, "দেখো আমার ছবি ও অনির্ব্বাণের যেন কোন অযত্ন না হয়, তুমি ওদের যেন অবহেলা করো না। আমার অনিকে যেন লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করো," বলে

সুরমা সুদীপের পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই সুদীপ বুঝল যে, সুরমা শেষ বিদায়ের আগে তার পদধূলি চায়। তাই সুদীপ নিজের বুকটা ভেঙ্গে গেলেও সুরমার ডান হাতখানা ধরে নিজের পায়ে ছুঁইয়ে হাতখানা সুরমার কপালে ঠেকিয়ে দিল। কপালে হাতটা ঠেকতেই মৃত্যুপথযাত্রিনী সুরমার মুখে এক অপুর্ব্ব তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল, মনে হল যেন ঐ তৃপ্তির হাসি দিয়ে সুরমা বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, মরণেও আর তার কোন ভয় নেই, এবার সে সচ্ছন্দে নিশ্চিন্তে মরতে পারে। সুরমাকে ঐ রকম করতে দেখে কমলা আর থাকতে না পেরে "বৌদি," "বৌদি" করে তার বুকের উপর পড়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল। কমলাকে কাঁদতে দেখে সুরমা তার মাথাটা নিজে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "কাঁদছ কেন দিদি, তোমায় তো অনেক কাজ দিয়ে গেলাম, আমার ছবিকে আমার অনিকে তুমি মানুষ করবে, আজ থেকে তুমি ওদের মা, তুমিই ওদের দেখো, যেন ওদের অযত্ন না হয়। তুমি আছ বলেই আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারছি।" কথাগুলো বলতে-বলতেই সুরমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। তার মুখের দিকে চেয়ে সবাই বুঝতে পারল যে, অসহ্য একটা যন্ত্রণা সে বুকের ভিতর চাপবার চেষ্টা করছে, কিন্তু না, পারল না। সুরমা সহ্য করতে পারল না, এদিকে স্বামী-পুত্র-পরিজন আর ওদিকে সর্বনিয়ন্তা বিধাতার অসীমের প্রতি আহ্বান। দু-দিকে দুটো টান। একপক্ষ সুরমার চার পাশে ভিড় করে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে চাইল, "না যেয়ো না, তুমি আমাদের," আর এক অদৃশ্য পক্ষ চোখের আড়াল থেকে সুরমাকে ইশারায় ডেকে বলল, "না থেকো না, তুমি ওখানে থেকো না, তুমি আমার। তুমি অমৃতের সন্ততি, চল তোমায় অমৃতলোকে নিয়ে যাই।" সম্ভবত অদৃশ্য পক্ষের ডাক ছিল প্রবল, তাই অমৃতের সন্ততি সুরমা অবহেলা করতে পারল না সে-ডাক, মুহূর্ত্ত কয়েক একটু নড়েচড়ে তার দেহ হতে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হয়ে মরলোক থেকে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করল। পিছনে পড়ে রইল রোরুদ্যমান আত্মজন, বন্ধুজন যাদের অসহায় হাতগুলো তখন নিজেদের বুক চাপড়ে চলেছে, অসহায় বোবা দৃষ্টিগুলো ঝাপসা হয়ে অবিরল বেগে বারিবর্ষণ করে চলেছে। সুরমার দেহটা শেষবারের মত নড়ে-চড়ে স্তব্ধ হওয়ার পর সবাই বুঝল যে, সুরমা আর নেই।

সুরমার মৃত্যুর পর কিছুদিন কমলা কলকাতার বাসায় থেকে দাদার ছেলে অনির্ব্বাণকে দেখাশোনা করতে লাগল, কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই সতীন্দ্র বাবুর পত্রমারফৎ নির্দেশ অনুযায়ী কমলাকে বাঘাসনে পাঠাতে হল। পত্রে বাবার নির্দেশ অনুযায়ী অনির্ব্বাণকেও কমলার সঙ্গে দিতে হল, কারণ সতীন্দ্রবাবু লিখেছিলেন "মাত্র ছমাসের শিশুপুত্রকে মানুষ করতে হলে মায়ের মত যত্ন দিয়ে স্নেহ

দিয়ে তাকে মানুষ করতে হবে আর সে কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব পালন করবার মত যোগ্য লোক একমাত্র কমলা, তাই বাবার একথার কোন প্রতিবাদ না করে সুদীপ অনির্ব্বাণকে কমলার হাতেই তুলে দিল। বোনকে হাওড়া ষ্টেশনে তুলে দিতে এসে সুদীপ অনির্ব্বাণকে বুকে চেপে ধরে আদর করে কপালে স্নেহচুম্বন দান করে কমলাকে বলল, "দেখিস বোন, ওকে তোর হাতেই তুলে দিলাম—ওকে মানুষ করার দায়িত্ব তোর।" সুদীপের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। আসন্ন বিদায়মুহূর্ত্তের কথা ভেবে কমলার চোখেও জল এল। এরপর গাড়ী ছেড়ে দিল, সুদীপ বাসায় ফিরে এল।

কমলার সঙ্গে অনির্ব্বাণকে পাঠিয়ে দিলেও সুদীপ অনির্ব্বাণের জন্য ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই ফুলের মত মুখখানা, কচিকচি তুলতুলে হাতগুলো, মাখনের মত নরম কচিকচি পাগুলো, তার সেই হাসি, সেই কান্না সব মনে পড়তে লাগল এবং সুদীপকে মাঝে-মাঝে অস্থির করে তুলতে লাগল। অনির্ব্বাণ ব্যতীত আরও একজন অর্থাৎ কন্যা ছবির মুখখানাও সুদীপকে মাঝে-মাঝে বিভ্রান্ত করে তুলতে লাগল। মেয়েটা তো হুবহু একেবারে তার মায়ের আদল পেয়েছে। গায়ের রঙ, ঢলঢলে দু'খানা চোখ, কথা বলার ভঙ্গী সব কিছুই যেন সুরমার মত। ওদের কথা ভেবে সুদীপ ভীষণ কষ্ট পায়, রাত্রে ঘুম হয় না, বার-বার বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় পায়চারী করে, একা-একা চুপ করে ছাদে বসে থাকে। তার এই অস্থিরতা দেখে কখনও কখনও হীরেন তার সঙ্গে ছাদে এসে বসে। সব কাজকর্ম্ম সব সান্ত্বনা সত্ত্বেও সুদীপের মন কি যেন একটা খোঁজে, কাকে যেন ফিরে পেতে চায়।

এদিকে কমলার সঙ্গে অনির্ব্বাণকে পাঠিয়ে সুদীপের বাসাটা খালি হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কমলার বুকটা ভরে গিয়েছিল। পতিহীনা কমলা যেন বাঁচবার একটা নতুন প্রেরণা খুঁজে পেল। তার মনে তখন একটাই কথা,—বৌদি ও দাদা অনির্ব্বাণকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন মানুষ করবার জন্য। সংসার করতে গেলে ধানসিদ্ধ করা, মুড়িভাজা, ঘরনিকানো, বাসনমাজা, রান্নাকরা ইত্যাদি হাজার রকম কাজের ভিড় লেগেই থাকে। কিন্তু সহস্র কাজের ভিড়ে ঘুরে ফিরে বৌদির একটা কথা যেন সবসময় কমলার কাণে বাজে—"ঠাকুরঝি, অনিকে আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, ওকে যেন তুমি দেখো, ওকে যেন তুমি মানুষ করো, দেখো ও যেন বড় হয়ে মানুষ হয়।" কমলা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বৌদির কথাগুলো ভাবে আর সব কাজে যেন দ্বিগুণ উৎসাহ পায়; কে যেন সাতগুণ শক্তি তার শরীরে প্রবিষ্ট করে দেয়, কমলার মনে হয় কার যেন অদৃশ্য দুটি হাত

তাকে সবকাজে সাহায্য করে চলেছে। এখন সংসারের অনেক কাজ। অধীপ এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। তার হাইস্কুলের সময়ে ভাত রান্না, ঘরে পাটঝাঁট, বিছানাপত্র গোছগাছ ছাড়াও আরও একটি কাজ কমলার বেড়েছিল। সেটি হল মাতৃহারা অনির্ব্বাণকে থাওয়াবার জন্য দুধের প্রয়োজনে ইদানিং একটি ছাগল পোষা হয়েছিল, তাকে খেতে দেওয়া, যথাসময়ে তার দুগ্ধ দোহন করে গরম করে শিশুকে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ নিয়ে সেই ভোরবেলা থেকে দুপুর পর্যন্ত সময়টা কিভাবে কোথা দিয়ে যে কেটে যেত তা কোনদিনই কমলা বুঝতে পারত না। এত কাজ, এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কমলার মুখে কেউ কোনদিন কোন বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে নি। দাদার ছেলেমেয়েকে কমলা নিজের ছেলেমেয়ের মত করেই অতি-যত্নে মানুষ করে তুলছিল। রাত্রে শোবার সময় ভবি আর অনি দুজনকে দুপাশে নিয়ে নিজে মাঝখানে শুত। দুজনেই শিশু, তাই রাত্রে নানা প্রয়োজনে কমলাকে বার-বার বিছানা ছেড়ে উঠতে হত। একদিন রাত্রিশেষে ধান সিদ্ধ করতে-করতে অনির কান্না শুনে ছুটে এসে কমলা দেখল ঘুম ভেঙে উঠে বসে সে কাঁদছে। সে তাড়াতাড়ি অনির্ব্বাণকে বুকে তুলে নিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শিশু কিছুতেই ভুলছে না দেখে কমলা বুঝল নিশ্চয়ই তার খিধে পেয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি ছোট ভাই অধীপকে উঠিয়ে ছাগলটা দুয়ে দিতে বলল। অধীপ একটা এলুমিনিয়ামের বাটী নিয়ে ছাগলের কাছে গিয়ে দেখল উঠোনে ছাগল নেই, দড়ি খুলে পালিয়েছে। ঐ ভোরবেলার অন্ধকারে হাতে একটা কেরোসিন ল্যাম্প নিয়ে অধীপ ছাগল খুঁজতে বের হল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন ছাগল নিয়ে এসে বেঁধে তাকে দোয়ার চেষ্টা করেও কিছুই পেল না তখন কমলা অধীপের দিকে চেয়ে বলল, "কি হবে ভাই, ছেলেটাকে কি করে চুপ করাব?" বলতে-বলতে কমলার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। ওদিকে শিশু তখনও সমানে চিৎকার করে চলেছে। হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে কমলা উদভ্রান্তের মত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আপন স্তন্যদানের চেষ্টা করল, কিন্তু হায়, সেখানে "হা হতোস্মি," কমলার স্তনে দুধ কোথায়? বিবাহের পরেই সে বিধবা, গর্ভধারণের সুযোগই হয় নি, তাই স্তনেও দুধ নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপন ভুল বুঝতে পেরে এবং শিশুকে কিছুতেই ভোলাতে না পেরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই কমলা ডুকরে কেঁদে উঠল; আর ঠিক তেমনি সময় অধীপ বাইরে থেকে ডেকে উঠল, "দিদি, এই দিদি, উঠে আয়, আমি অনির জন্যে খাবার তৈরী করেছি।" অধীপের কথা শুনে কমলা বাইরে এসে দেখল অধীপের হাতে এক বাটি জল। অধীপ বলল, "আমি ছুটে

গিয়ে শক্তিদাকে উঠিয়ে দোকান থেকে মিছরি এনে ধান সিদ্ধ করা উনুনে বসিয়ে এই মিছরির জল করেছি। দে, ওকে এটা খাইয়ে দে।" অধীপের এ-কথায় কমলা যেন হাতে চাঁদ পেল। সে তাড়াতাড়ি গোঁদল নিয়ে ঐ গরম মিছরি জলটুকু অনিকে খাওয়াতে বসে গেল। মনে-মনে অধীপকে সে আশীর্ব্বাদ করল তার বুদ্ধির কথা ভেবে। মিছরির জলটুকু খেয়ে অনির্বাণ চুপ করল, কিন্তু ছাগলদুধ না পাওয়ায় অধীপের মনে একটা সন্দেহ থেকেই গেল। সে কমলাকে বলল, "দেখ দিদি, নিশ্চয় পাঁচিল টপকে বাড়ীতে ঢুকে ছাগলটাকে রাত্রে কেউ দুয়ে নিয়ে গেছে আর খিড়কীর দরজা খুলে ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়েছে। না হলে ছাগলের দুধই বা নাই কেন, আর ওটা বাইরেই বা গেল কি করে?" অনির কান্নায় এতক্ষণ কমলার আর কিছু ভাববার যেন অবকাশই ছিল না, কিন্তু অধীপের কথায় এবার তারও খেয়াল হল, সত্যিই তো ছাগলটা বাইরে গেল কি করে? বাড়ীর ভিতরে খোঁটায় ওটা বাঁধা ছিল, অথচ এদিকে খিড়কির দরজাটাই বা খুলল কে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল, কিন্তু সন্দেহটা কিছুতেই মন থেকে ঘুচল না। অবশেষে দুই ভাইবোনে মিলে ঠিক করল রাত জেগে ছাগলটাকে পাহারা দিতে হবে এবং দেখতে হবে ব্যাপারটা কি।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে কমলা ও অধীপ ছাগলটার প্রতি কড়া নজর রাখতে লাগল, কিন্তু রাত্রি গভীর হতেই দুজনে সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত শরীরে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল। অনির কান্নায় দু-ভাইবোন কমলা ও অধীপের হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না, কারণ ছাগলঘটিত ব্যাপারটা ঠিক পূর্ব রাত্রির মত একইভাবে ঘটল এবং পূর্ব রাত্রির মত সে রাত্রেও অনিকে যথারীতি মিছরির জল খাইয়ে চুপ করাতে হল।

পর দিন শনিবার। সকাল থেকেই বড়বাজারে দোকানে বসে সুদীপের মনটা খারাপ লাগছিল। সুরমা মারা গেছে মাস দুয়েক হল। এই মানসিক বিপর্য্যয়ের সময়ে হাজরা কোম্পানীই সুদীপের প্রাণ হয়ে উঠল। দোকানের কাজকর্ম্ম ছাড়া সংসারের আর কিছুই যেন সুদীপের কাছে মহার্ঘ নয়। দেখতে-দেখতে এই কয় মাসেই দোকানের অনেক উন্নতি সাধিত হল। দোকানের কাজকর্ম্ম বেড়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে আরও দু-জন কর্মচারী নিয়োজিত হয়েছিল। বঙ্গীয় বিক্রয় ও কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন মোতাবেক দোকান বিক্রয়কর কর্তৃপক্ষের সংগে রেজিষ্ট্রী করবার জন্য দরখাস্তও করা হয়েছিল। দোকানে আসার পর থেকেই সুদীপ আজ বাঘাসন যাবার কথা ভাবছিল, এমন সময় বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ একটি ব্যাগ হাতে করে এক ভদ্রলোক এসে দোকানে প্রবেশ করতেই

সুদীপ অভ্যাসবশতঃই প্রশ্ন করল, "কি চাই আপনার বলুন?" ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, "জাল চাই না, দোকানের মালিককে চাই।" "ভদ্রলোকের কথায় সুদীপ বুঝল, ভদ্রলোক বেশ সুরসিক, তাই সেও আগ্রহ 'সহকারে তাঁকে সামনের বেঞ্চ দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করে বলল, "অনুগ্রহ করে এবার বলুন।" ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন, "আমার নাম শ্রীনাথ মণ্ডল, সেল্‌স-ট্যাক্স ইন্সপেক্টর, আপনাদের খাতাপত্রগুলো একটু দেখব।" কথাগুলো বলে ভদ্রলোক পকেট থেকে নিজের আইডেণ্টিটি কার্ড বের করে দেখাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দিয়ে সুদীপ বলল, "আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট স্যার, আইডেণ্টিটি কার্ড দেখে আমি কি করব? আপনি দয়া করে একটু বসুন, আমি এক্ষুণি সমস্ত খাতাপত্র দেখিয়ে দিচ্ছি।" এর পর মিঃ মণ্ডলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দোকানের ট্রেড লাইসেন্স থেকে শুরু করে ক্যাশ খাতা, লেজার বুক, বিল-বুক, বিল-কপি, ক্যাশ মেমোর কপি, চালান-বই, স্টক-বুক ইত্যাদি সমস্ত একের পর এক দেখানো শেষ হলে মিঃ মণ্ডল বললেন, "বাঃ আপনাদের নতুন দোকান, কিন্তু কাজকর্ম্ম তো বেশ পরিষ্কার। আপনাদের খাতাপত্র কে লেখেন?" উত্তরে সুদীপ বলল, "আমাদের খাতা লেখেন বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক।" মিঃ মণ্ডল এবার মৃদু হাসতে-হাসতে বললেন, "তা তাঁর সঙ্গে যে আমার একটু দরকার, এখন তিনি কি এখানে নেই?" ইন্সপেক্টরের এ-কথায় সুদীপ ও বলরাম একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল এবং বলরাম জবাব দিল, "না স্যার, তিনি তো পার্টটাইম কাজ করেন, সন্ধ্যার পর এসে আমাদের খাতা লেখেন। এখন অন্য জায়গায় চাকরী করেন।" মিঃ মণ্ডল একথা শুনে দুবার 'কিন্তু' 'কিন্তু' করলেন এবং বসেই রইলেন দেখে সুদীপ বুঝল—নিশ্চয়ই এঁর অন্য কিছু মতলব আছে। তাই বলরামকে উদ্দেশ্য করে' সুদীপ বলল, "বলরাম, তুই স্যারের জন্য কিছু জলখাবার নিয়ে আয়, এখন বাজে একটা, স্যারের নিশ্চয়ই টিফিন করার সময় হয়েছে এতক্ষণে।" সুদীপের কথা শুনে বলরাম বের হয়ে গেল। টিফিনের কথা শুনে' কিছুটা উৎসাহ পেয়ে মিঃ মণ্ডল সুদীপকে বললেন, "শুধু টিফিন খাওয়ালেই হবে না স্যার, আমার কিছু খরচাও দিতে হবে, কারণ আপনাদের প্রথম রেজিষ্ট্রেশন হচ্ছে, অনেক খাটনি আছে, আমায় পুরো রিপোর্ট তৈরী করে দিতে হবে, ভুলচুক হয়ে গেলে আপনাদেরই অসুবিধা।" মিঃ মণ্ডলের ইঙ্গিতটা বুঝে মনে-মনে সুদীপ একবার ভাবল খাতাপত্র ঠিক আছে, তবুও ঘুষ দিতে হবে, কিন্তু আবার ভাবল, কি জানি না দিলে রিপোর্টে কোথায় কি লিখে দেবে, কাজটাই হয়ত আটকে যাবে, এই ভেবে সুদীপ সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাশ থেকে পঁচিশটি টাকা বের করে একটা সাদা

থামে ভরে মিঃ মণ্ডলের হাতে দিল এবং মণ্ডল থামটি তাড়াতাড়ি নিয়ে পকেটস্থ করে উঠে পড়লেন। মিঃ মণ্ডল উঠে পড়েছেন দেখে সুদীপ বলল, "আরে বসুন বসুন, আপনার জন্য যে খাবার আনতে পাঠালাম......" সুদীপের কথায় মণ্ডল বললেন, "ওঃ হোঃ দেখেছেন একেবারে ভুলে গেছি" হাসতে-হাসতে আবার বসে পড়লেন এবং বললেন, "সেলস্ ট্যাক্স নিয়ে আপনাদের কোন দিন কোন গোলমাল হলে সোজা আমার কাছে চলে আসবেন। অফিসে গিয়ে বলবেন, এম. আর. চার্জ্জের ইন্সপেক্টর মিঃ মণ্ডলকে চাই। সাধারণতঃ বেলা দুটোর পর আমরা অফিসে ফিরে গিয়ে বসি। সকালের দিকটা ইন্সপেকশন করে বেড়াই।" এরপর জলপানান্তে মিঃ মণ্ডল বিদায় নিলে সুদীপ বলরামকে, "আমিও আজ বাড়ী যাব, সুতরাং এখন বাসায় যাচ্ছি," বলে উঠে পড়ল। বাসায় ফেরবার পথে ছেলে অনির্ব্বাণ ও মেয়ে ছবির জন্য কয়েকটা জামা-প্যাণ্ট ও দু-একটা খেলনা কিনল এবং বাসায় ফিরে একটা থলিতে সেগুলো ভরে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে বর্দ্ধমানের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসল।

বাড়ীতে এসে পৌছতে রাত্রি প্রায় বারটা বাজল। সদর দরজা থেকে দু-একবার ডাকাডাকি করাতেও কমলা বা অধীপ শুনতে পেল না, কিন্তু সুদীপের মনে হল বাড়ীর ভেতরে যেন কারও পায়ের শব্দ ও চাপা গলায় কে যেন "চল্ চল্" বলে একটা আওয়াজ করছে। সুদীপ একবার ভাবল তবে কি বাড়ীতে চোর ঢুকেছে ? যেই এ-কথা ভাবা সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুটে গিয়ে খিড়কী পুকুরের পাড় দিয়ে পাঁচিল টপকে বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজাটা খোলা আর একটা লোক পাঁজাকোলা করে দুহাতে কালো মত একটা কি নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সুদীপ লোকটাকে দেখে, "কে রে" বলে এক ধমক দিয়ে উঠতেই তাড়াতাড়ি লোকটা হাতের কালো মত বস্তুটাকে ধড়াস করে উঠানে ফেলেই ছুটতে যাবে এমন সময় সুদীপ দরজা আটকে দাঁড়িয়ে তাকে জাপটে ধরে ফেলল, আর ছাগলটা ততক্ষণে উঠোনে পড়েই "ম্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ" করে চেঁচিয়ে উঠেছে। লোকটাকে জাপটে ধরে সুদীপ তখন অধীপের নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে। বার কয়েক চিৎকার করতেই অধীপ ও কমলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে তারা এত রাত্রে দাদাকে দেখে অবাক। অন্ধকারে কিছুই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, তাই সুদীপ কমলাকে বলল, "চট্ করে একটা হ্যারিকেন জ্বাল তো।" দাদার কথায় কমলা হ্যারিকেন জ্বালাতে গেল আর লোকটা ধস্তাধস্তি করতে লাগল কোন রকমে সুদীপের হাত ফসকে পালাবার জন্য। কিন্তু সুদীপের গায়ের জোরের কাছে সে

শিশু, তাই শেষ পর্য্যন্ত সে কেঁদে ফেলল, বলল, "বড় খুড়ো, আমায় ছেড়ে দাও, এমন কাজ আর কোনদিন হবে না, আর কক্ষণো হবে না।" ওদিকে কমলা ততক্ষণে হ্যারিকেন নিয়ে এসেছে; হ্যারিকেনের আলোয় লোকটার মুখ দেখে সবাই অবাক, কারণ লোকটা ছিল নিতাইদার ছেলে গদাধর।

গদাধরকে দেখেই অধীপ তাড়াতাড়ি এসে তাকে মারতে যায় দেখে সুদীপ প্রশ্ন করে, "এত রাত্রে এখানে তুমি কি করছিলে গদাধর?" গদাধর তখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো। অধীপ তাড়াতাড়ি এসে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, "শয়তান, তা হলে তুই রোজ এই কাজ করিস, ছাগল খুলে নিয়ে গিয়ে তার দুধ দুয়ে নিস্, আজ তোকে মেরেই ফেলব।" অধীপের সঙ্গে-সঙ্গে কমলাও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে "একরত্তি মা-মরা ছেলে, একটু ছাগল দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি আর তাও কিনা রোজ চুরি করে খেয়ে নেবে, জান দাদা", বলে সুদীপকে সম্বোধন করে। গত দু-রাত্রের ঘটনা সবই কমলা সুদীপের নিকট বিবৃত করল। কমলার মুখ থেকে সব শুনে সুদীপেরও ভীষণ রাগ হচ্ছিল, মনে-মনে তার ইচ্ছা করছিল এক্ষুণি একটা ঘুষিতে গদাধরের গোটা পাঁচেক দাঁত উড়িয়ে দেয়, কিন্তু যতই হোক, সে তো আর অধীপ নয়, তাই গদাধরের মাথায় সজোরে একটা চাঁটা মেরে তাকে খিড়কীর দুয়ার দিয়ে বের করে দিল এবং বলে দিল, "ফের এ-রকম করলে নিতাইদাকে সব বলে দেব।" সুদীপের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গদাধর এক দৌড়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গদাধর চলে যাওয়ায় পর বেশ কিছুক্ষণ সুদীপ তার গমনপথের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, এও সম্ভব? একটা ছ-মাস বয়সের মাতৃহারা দুগ্ধপোষ্য শিশুর খাবার চুরি করে খেয়ে তাকে কষ্ট দেওয়ার কথা মানুষের মাথায় আসে? ভাবতে-ভাবতে সুদীপ এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌছল যে, মানুষের চেয়ে মানুষের বড় শত্রু আর কেউ নেই, মানুষের বুকেই শয়তানের বাসা, তাই হয়ত এ-রকমটা সংসারে ঘটে থাকে।

বাড়ীতে এসে মাত্র রবিবার দিনটি সুদীপের থাকার কথা। কিন্তু কিসের যেন একটা দোটানায় পড়ে সোমবার তার কলকাতা যাওয়া হ'ল না, আরও দুদিন থেকে গেল। বাড়ীতে যেখানটায় বসছে দাঁড়াচ্ছে সেখানটাতেই সুরমার স্মৃতি; তার হাতের কর্মনিপুণতার ছাপ যেন সমস্ত সংসারটায় ছড়িয়ে রয়েছে। মাস কয়েক হ'ল বাঘাসনের বাড়ীতে সুরমা নেই, তবু সামান্য এই গৃহস্থালীতে যেন কোন অসংলগ্নতা নেই, নেই কোন পরিচর্য্যার অভাব। চারদিকে তাকিয়ে সুদীপ বেশ বুঝতে পারে সুরমার কাছে থেকে কমলাও বেশ সুন্দরভাবে সমস্ত কাজ করতে শিখেছে এবং সামান্য পল্লীর এক দরিদ্র পরিবারের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে

যতটুকু সংলগ্নতা ও সুরুচির ছাপ রাখা সম্ভব কমলা তা রেখে চলেছে। দেখে-শুনে সুদীপের মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে এবং সুরমার কথা মনে পড়ে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সোম, মঙ্গল দুটি দিন বাঘাসনে কাটিয়ে বুধবার সকালে সুদীপ কলকাতা রওনা হবার জন্য কাপড় পরছে এমন সময় ছবি এসে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং তার ঢলঢলে দুটি চোখ দিয়ে সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত কন্যা ছবির মুখের দিকে চেয়ে সুদীপের আর বুঝতে বাকী রইল না যে, সেই কচি দুটি চোখের তারায় কিসের মিনতি মাখা। এ যেন সেই রবিঠাকুরের "যেতে নাহি দিব।" ছবির বিষণ্ণ নয়ন দুটির পানে চেয়ে সুদীপ তাকে দু-হাত দিয়ে টেনে বুকে তুলে নিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছবি তার কচি দুটি হাত দিয়ে সুদীপের বুকে দুটি কিল মেরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠল, "আজ তুমি যাবে না বল, বল না ? বল না ?" ছবির এই কাতর মিনতি-মাথা অনুরোধটাকে হঠাৎ সুদীপের মনে হ'ল যেন তার মা তাকে আজ না যাবার জন্য হুকুম করছেন। এই মুহূর্তে একবার তার মা সুচন্দ্রাদেবীর ও একবার তার হারানো প্রিয়া সুরমার কথা মনে হল এবং তার মনের ভিতরটায় কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেল। সুদীপের একবার মনে হল কার জন্য আর কলকাতায় যাবে, কার সুখের জন্য আর টাকাই বা রোজগার করবে ? মায়ের ও সুরমার কথা ভেবে তার বুকের ভিতরের সুকোমল সত্তাটি হঠাৎ যেন আর্ত্তস্বরে হাহাকার করে উঠল। এ হাহাকারের মর্ম্মবাণী বুকের উপরে থেকেও ছয় বছরের শিশু কন্যা ছবি কিছুই বুঝল না, ছবি শুধু দেখল, বাবা কেমন যেন আনমনা হয়ে কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে জামাকাপড় খুলে আলনায় গুছিয়ে রাখল এবং আস্তে-আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল।

সেদিন দুপুর বেলায় সতীন্দ্র-বাবু ও সুদীপ আহারান্তে দাওয়ায় বসে বিশ্রামরত, এমন সময় কলকাতার দোকানের কর্ম্মচারী মধুসূদন এসে হাজির। এই ভর দুপুরে মধুসূদনকে বাড়ী ঢুকতে দেখে পিতা-পুত্র একই সঙ্গে যেন চমকে উঠল। সুদীপ দাওয়া থেকে উঠে উঠোনে মধুসূদনের কাছে এসে রৌদ্রতপ্ত রাঙা জবার মত লাল চোখের পানে চেয়ে চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার মধুসূদন, খবর সব ভাল তো ?" সুদীপের এই প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব অনাবিলহৃদয় মধুসূদন সুদীপের দিকে হাত নেড়ে বলল, "দাঁড়ান মামা, আগে দাদা মশায়কে প্রণাম করি, তারপর বসে সব বলছি।" মধুসূদন বলরামের ভাগ্না, সুদীপ বলরামের বন্ধু বলে তাকে মামা বলেই সম্বোধন করে। সুদীপ ভালই জানে যে মধুসূদন ছেলেটি কাজেকর্ম্মে তুখোড়, সদাচারী ও একনিষ্ঠ, কিন্তু দোষের মধ্যে সে একটু বক্তা বেশী, তার অতিপরিচিত হাত নাড়ার ভঙ্গীটি দেখে সুদীপ তাকে দাওয়ায়

একটা আসন পেতে দিয়ে কমলাকে সরবৎ করতে বলে মধুসূদনের পাশে এসে বসে। মধুসূদন দাদামশায়কে প্রণাম করে আসনে বসে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলতে শুরু করে—"গতকাল থেকে তো দোকান বন্ধ, আপনি চলে এলেন শনিবার, সোমবার কলকাতায় পড়ল বোমা, আর আপনার বন্ধু তো ভয়ে সবাইকে নিয়ে পোঁটলা বেঁধে দপ্তর গুছিয়ে সাক্ষী গোপালের মত আমায় রেখে দিয়ে দেশের বাড়ীতে চম্পট। মধুসূদনের কথায় মুহূর্তের মধ্যে গত কয়েক দিন আগের খবরের কাগজে-পড়া খবরগুলোর কথা সুদীপের মন ছুঁয়ে গেল, তার বুঝতে বাকী রইল না যে, যুদ্ধের ঢেউ তা হলে কলকাতা পর্যন্ত গড়াল। মনে-মনে সে সুভাষ বোসের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম জানিয়ে বার কয়েক উচ্চারণ করে নিল, "সাবাস সুভাষ বোস, সাবাস।" এর পরেই মধুসূদনের দিকে ফিরে সুদীপ বলল, "ঠিক আছে, যাক গে তোর মামা। আমি কালই ভোরে কলকাতা যাব, আমাদের দোকান খোলা থাকবে।" এরপর মধুসূদনের খাওয়া-দাওয়া হলে সতীন্দ্র-বাবুর বার-বার অনুনয়ের উত্তরে মধুসূদন যা বলল, তাতে বোঝা গেল যে, কলকাতায় শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ দোকানপাট বন্ধ। প্রাণের ভয়ে লোকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে শহরের বাইরে যাবার চেষ্টা করছে, কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট চলছে। এ সমস্ত কথার কিছুই সতীন্দ্র বাবু জানতেন না, কারণ এই নগণ্য গ্রামে রেডিও তো দূরের কথা, একখানা সংবাদপত্রও আসে না। মধুসূদনের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিয়ে সতীন্দ্রবাবু এ সময়ে সুদীপ ও মধুসূদনের যে কলকাতায় থাকা নিরাপদ নয় সে সম্বন্ধে বার বার বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু সুদীপ বাবার কথায় কোন উত্তর করল না এবং বেলা প্রায় পড়-পড় দেখে মধুসূদনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামটা ঘুরে দেখাতে বের হ'ল। যাওয়ার সময় মধুসূদন অনির্ব্বাণকে কমলার কাছ থেকে চেয়ে কোলে তুলে নিল এবং ছবি ছুটে এসে সুদীপের ডান হাতের আঙ্গুল ধরল।

পর দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার খুব ভোরে সতীন্দ্র বাবু ওঠবার আগেই সুদীপ ও মধুসূদন কলকাতার পথে রওনা হ'ল। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বড় লাইনের ট্রেনে উঠেই সুদীপ দেখল গোটা কামরাটা প্রায় ফাঁকা। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে বুঝে নিল যে, বোমার ভয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রীর সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই হ্রাস পেয়েছে। যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে এসে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে সুদীপ পড়ল মহামুস্কিলে। কারণ কলকাতা হতে বহির্গামী যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার হুড়োহুড়িতে সুদীপ ও মধুসূদন বাধা পেয়ে নামতেই পারল না। এই বর্দ্ধমান লোকাল ছাড়বে বিকেল তিনটায় আর এখন বাজে মাত্র বারটা, তবু হাজার হাজার মানুষ বোঁচকাবুঁচকি পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এক্ষুণি ট্রেনে উঠতে চায়,—ভাবখানা এই, বর্দ্ধমান লোকালে কোনও

রকমে একটু উঠতে পারলেই যেন এ-যাত্রা তাদের প্রাণটা জাপানী বোমার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। সন্ত্রস্ত যাত্রীসাধারণের চিৎকারে, হৈহল্লায়, কুলিদের হাঁকডাকে বাক্স-প্যাঁটরা ধুপধাপ করে ফেলার শব্দে সারা হাওড়া ষ্টেশন যেন এক নতুন ধরণের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। সব দেখেশুনে সুদীপ ও মধুসূদন প্ল্যাটফরমের বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে দু' লাইনের মাঝখানে নেমে লাইন পার হয়ে অপর দিকের প্ল্যাটফরমের উপর হাতের ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে ষ্টেশনের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রতিটি প্ল্যাটফরমেই মানুষ গিজগিজ করছে। বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, উড়িয়া, রাজস্থানী, কাবুলী মেয়েপুরুষ বৃদ্ধবৃদ্ধা ছেলেমেয়ে কচিকাঁচা মিলিয়ে অগুণতি মাথা। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ গাড়ীর অপেক্ষায় সতরঞ্চ বিছিয়ে শুয়ে। সুদীপ মধুসূদনের সঙ্গে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে আর লক্ষ্য করতে থাকে যে, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মুখেচোখে কি যেন এক নিদারুণ উদ্বেগের ছাপ। সুদীপ আপন চরিত্রানুগ কাঠিন্যের সঙ্গে মৃদু হাসতে হাসতে কলকাতার দিকে এগোয়। প্ল্যাটফরমটা কোন মতে পার হয়ে গেটে আসতেই সুদীপ দেখল রেলের প্ল্যাটফরমের গেটে একজন লালমুখো টিকিট চেকার। সাহেব চেকারের হাতে টিকিটটা দিতেই সে সবিস্ময়ে সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "ইয়েস জেন্টলম্যান, টুমি কি কালকাটায় ঠাকিবে বলিয়া আসিলে?" সুদীপ সাহেবকে বলল, "ও ইয়েস, আই মাষ্ট স্টে য়্যাট ক্যালকাটা।" সাহেব আবার প্রশ্ন করল, "নাউ য়্যাট দি টাইম অব সাচ এ ক্রাইসিস?" সুদীপ এবার সাহেবের দিকে ভাল করে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট করে জবাব দিল, "ইয়েস, য়্যাট দ্য টাইম অফ সাচ এ ক্রাইসিস। আই অলসো ওয়্যান্ট টু পারফরম মাই ডিউটিস য়্যাজ ইউ আর ডুয়িং হিয়ার মাই ফ্রেণ্ড।" বলেই সুদীপ পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, সাহেব তাড়াতাড়ি ঘুরে সুদীপের সামনে এসে তার পথ আটকে নিজের ডান হাতটা দিয়ে সুদীপের ডান হাতটা তুলে বেশ জোরে করমর্দন করে বলল, "রিয়েলি আই য়্যাম ভেরী গ্ল্যাড টু সি ইওর ব্রেভনেস্ য়্যাণ্ড বোল্ডনেশ, যখন টুমার ডেশের লোক সব ক্যালকাটা ছেড়ে ভয়ে পলাইটেছে টখন টুমি ক্যালকাটায় ঠাকিবে বলিয়া আসিয়াছ, রিয়েলি ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান। আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ।" সুদীপ হাসতে হাসতে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ" এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্মস্থল বড়বাজারের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, ষ্ট্রাণ্ড রোড পার হয়ে ক্লাইভ ষ্ট্রিটের উপর হাজরা কোম্পানীর সামনে না আসা পর্য্যন্ত সুদীপ চারদিক বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে মধুসূদনের উদ্দেশে বলল, "আরে এ যে দেখছি সব গড়ের মাঠ হয়ে গেছে,

সার দিয়ে সব দোকানপাট বন্ধ, লোকজন, ভিড়ভাট্টা সব গেল কোথায় ? জাপানী বোমার এত ভয় ?" ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে সুদীপ আপন মনে হেসে ফেলল এবং তার এই হাল্কা মেজাজে সরস ভঙ্গীতে উচ্চারিত কথাগুলো শুনে সুরসিক মধুসূদনও সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ মামা, বীরপুরুষেরা সব ঘরে ঢুকে গেছে, আর তাই তো আমার মামা মামীকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাড়ীতে পালিয়েছে।" মধুসূদনের কথায় সুদীপ উচ্চৈঃস্বরে হেসে ফেলল এবং চারদিক একবার দেখে নিয়ে তাকে বলল, "নে দোকানটা খোল।" সুদীপমামার অনুমতি পেয়ে মধুসূদন দোকানের চাবি খুলল এবং যথারীতি দোকান সাজাতে লেগে গেল। মধুসূদন দোকান সাজাচ্ছে এমন সময় গুটিগুটি পায়ে মুটে মউজীরাম, যে ইতিমধ্যে নন্দী কোম্পানী ছেড়ে হাজরা কোম্পানীর কাজে যোগ দিয়েছিল সে এসে দোকানে ঢুকল। হঠাৎ মউজীকে ঢুকতে দেখে সুদীপ ও মধুসূদন সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল, "কি মউজী, তুমি পালাও নি ?" উত্তরে মউজী ডান হাতের তালু দিয়ে নিজের কপালটায় একটা চাপড় বসিয়ে, "হায় রাম" বলে ফতুয়ার পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে টেবিলে রাখল। চাবির গোছাটা দেখে সুদীপ চকিত কণ্ঠে বলে উঠল, "একি ? এ-যে সব গোডাউনের চাবি ? তুমি পেলে কি করে ?" জবাবে মউজী বলল, "বড়াবাবু খোদ আপনা হাতসে শনিচার দোকান ঔর গুদামকা চাভিয়া বন্ধ কিয়েথে, লেকিন গুদাম কা চাভিয়া গুদামকা তালামেই লাগা হুয়া থা, সব ঘর চলা যানেকা বাদমে হাম গুদাম দেখনে গিয়া তো চাভিয়া হামারা নজরমে আয়া, বড়াবাবু তালা বন্ধ কিয়া লেকিন চাভিয়া লেনেমে ভুল গিয়া. চাভি তালা পর ছোড় কর চলা গিয়া।" মউজীর এ-কথায় সুদীপ ও মধুসূদন দুজনেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে বড়বাবু অর্থাৎ বলরামের অকর্ম্মণ্যতা ও অন্যমনস্কতার বহর দেখে যুগপৎ বিস্মিত হল। পকেট থেকে টাকা বের করে মউজীকে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কিছু খাবার আনতে নির্দেশ দিয়ে সুদীপ মধুসূদনকে চট করে গোডাউনটা দেখে আসতে নির্দ্দেশ দিলে সে গোডাউন দেখে এসে বলল, "নাঃ সব ঠিক আছে, যেমনটি সাজানো ছিল ঠিক তেমনটিই আছে, কোথাও কোন মালের একটু নড়চড় পর্য্যন্ত হয় নি।" মধুসূদন গোডাউন থেকে ফেরার মিনিট পাঁচেক পরে মউজীও খাবার নিয়ে দোকানে ঢুকল এবং খাবারগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে সুদীপের দিকে চেয়ে জোড় হাত করে বলল, "বাবু, একবার আপনা গুদাম তো দেখ লিজিয়ে, সব ঠিক হ্যায় কি নেই ? হামরা কুছ কসুর নেহি হ্যায় বাবু, চাভিয়া খাতির হাম ঘর ভি যানে নেই সাকা, আপ গুদাম দেখ লিজিয়ে, ঔর হামে ছুট্টি দে দিজিয়ে, হাম ঘর যায়েঙ্গে।"

মউজীর এ-কথার জবাবে সুদীপ বলে, "গোডাউন হাম দেখ লিয়া, সব ঠিক হ্যায়, লেকিন তুম্ ঘর কিঁউ যানে মাংতা হ্যায়?" সুদীপের এ-কথায় মউজী তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে কপালে ডান হাতের তালুটা ঠেকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "হায় রাম, চারো তরফ বোম্ গিড়তা হ্যায়, হামারা দেশওয়ালে যিত্না লোক্ থে সব চলা গিয়া ইধারসে, অর হম্ ক্যাসে র'হু, আরে বাপরে ভগওয়ান না করে লেকিন যদি বড়িবাজারমে বোম্ গিরে তো?'' তার কথার সূত্র ধরে সুদীপ হাসতে-হাসতে বলল, "তো কেয়া হোগা, মউজী? হাম লোকভি তো রহেঙ্গে, হাম ঔর মধুসূদনবাবু? হাম লোক যদি জিন্দা রহে তো তুম্ ভি জরুর জিন্দা রহেগা, কোই ডর নেই, যাও মধুবাবু কা সাথ কাম্মে লাগ যাও।" সুদীপের শেষের কথাগুলোর মধ্যে এমনই ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য্যের যাদু ছিল যে, মউজীর এ-সময় কলকাতায় থাকার ইচ্ছা না থাকলেও সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে যেন কিছুটা নিমরাজী হয়েই থেকে গেল এবং দোকানের কাজকর্ম করতে লাগল।

বোমার ভয়ে কলকাতা প্রায় ফাঁকা। জরুরী সংস্থা ব্যতীত ছোট-বড় সব রকমের সংস্থা হয় বন্ধ, নয় কার্য্যতঃ অচল। তাই দোকানেও প্রায় সারাদিন কোন খদ্দেরপত্র নেই। অন্যান্য দোকানের মতই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জালের দোকানগুলোও প্রায় সব কটাই বন্ধ। দু-তিন দিন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার পর মধুসূদন এক সময় বলল, "মামা, মনে হচ্ছে সবার মত আমাদেরও ছুটি করা উচিত ছিল।" উত্তরে সুদীপ বলল, "সে কিরে? দোকানে গুদামে এই এত টাকার মাল রয়েছে, সেগুলো কোন্ ভরসায় ফেলে রেখে ছুটি করে চলে যাব বল্? দেখছিস্ না বোমার ভয়ে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। এ তো যা অবস্থা, দিনের বেলাতেই যদি চোর-গুণ্ডারা দোকান ভাঙ্গে বা গোডাউন ভেঙ্গে মাল চুরি করে তা হলেও কিছু করার নেই বা কেউ বাধা দেওয়ার নেই। এই অবস্থায় কি সব ছেড়ে এখান থেকে চলে যাওয়া যায়? তা ছাড়া তুই তো জানিস্ কত কষ্ট করে কি ভাবে তোর মামা আর আমি এই দোকানটুকু করেছি।"

সুদীপের এ-কথায় মধুসূদন বলল, "আমার মামার কথা বলবেন না, আপনি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এখানে থাকছেন আর আমার মামা? মামা আমার এতক্ষণে গায়ে জামা চড়িয়ে মল্লারপুরের জমিদার সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" তার স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গোক্তিতে না হেসে সুদীপ বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলল, "সবার দায়িত্বজ্ঞান কি সমান হয়, না কি সবার সাহস সমান হয়? তা যদি হত তা হলে তো এই বাঙালী জাতটাই আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাত বলে পরিগণিত হত।"

সুদীপের গাম্ভীর্যদীপ্ত কণ্ঠস্বরে মধুসূদন কেমন যেন থিতিয়ে গেল, নিজের মামা বলরামের সম্বন্ধে তার আরও যেন কিছু বলবার ছিল, কিন্তু সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলতে সাহস করল না, বরং এক শ্রদ্ধাভরা বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে সুদীপ মামার মুখের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে চুপচাপ কাটার পর সুদীপ দেখল একজন লালমুখো সাহেব এদিক ওদিক দেখতে দেখতে তাদের দোকানের দিকেই এগিয়ে আসছে। সে মনে মনে ভেবে নিল নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রয়োজনে সাহেব কোন জিনিষ খুঁজছে। সাহেব দোকানে ঢুকতেই সুদীপ তার সাথে হ্যাণ্ডশেক করে তাকে বসতে বলে প্রশ্ন করল তাঁর কি চাই। উত্তরে সাহেব বলল, "চারশ" বাণ্ডিল ডু-ইঞ্চি ঘরের উনিশ গেজ তারের চার ফুট চওড়া জাল চাই। সুদীপ ষ্টকের খাতা খুলে দেখল শ' দেড়েক বাণ্ডিল তার গোডাউনে আছে, তাই সাহেবকে বলল, "দেড়শ বাণ্ডিল এখন দিতে পারি আর বাকিটা আগামীকাল।" সাহেব দাম জিজ্ঞাসা করায় সুদীপ মনে মনে একবার চিন্তা করে দাম বলল, "বত্রিশ টাকা বাণ্ডিল।" সুদীপের এই দাম দেওয়া দেখে মধুসূদন একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখল, যে, সেখানে কোন বিকৃতি নেই। সুদীপের কথায় সাহেব হিসাব করে চার শ' বাণ্ডিলের টাকা মিটিয়ে গাড়ী ভাড়া দিয়ে পরদিন সব মাল একই সঙ্গে কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে লিখিয়ে দিয়ে বিদায় নিলে মধুসূদন ছুটে এসে সুদীপের পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল আর মুখে বলল, "মামা, সত্যিই আপনি গুরুদেব লোক, ছাব্বিশ টাকার মাল বত্রিশ টাকা দাম বলায় আমি ভাবছিলাম সাহেব পালাল বলে।" তার কথায় সুদীপ বলল, "আরে দূর বোকা, এইরকম পরিস্থিতিতে নেহাৎ প্রয়োজন না থাকলে কি ঐ লালমুখো সাহেব মাল কিনতে বেরোত?" বলতে-বলতেই একজন মুসলমান খরিদ্দার দোকানে ঢুকল এবং ঐ একই জিনিষ অর্থাৎ ডু-ইঞ্চি উনিশ গেজ চার ফুট চওড়া মাল দশ বাণ্ডিল চাইলে সুদীপ তাকে দাম দিল ছাব্বিশ টাকা। তাঁর কাছ থেকেও হিসাব করে দাম নিয়ে গোডাউন থেকে তাঁকে মাল দিয়ে দেবার জন্য সে মধুসূদনকে নির্দেশ দিল। সে তাঁকে মাল দিয়ে ফিরে এসে কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে সুদীপকে প্রশ্ন করল, "এ যে উল্টো হল মামা! পাইকারী খরিদ্দার যে কিনা চারশ বাণ্ডিল মাল নিল তার বেলায় দাম বেশী আর খুচরা খরিদ্দার অর্থাৎ যে মাত্র দশ বাণ্ডিল মাল নিল সে পেল কম দামে?" মধুসূদনের এই মন্তব্যে সুদীপ তার চোখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে তারই উদ্দেশ্যে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার জায়গায় তুই হলে বিদেশী লালমুখো ঘৃণ্য সাহেবটা যারা আমাদের বছরের পর বছর পরাধীনতার শেকল পরিয়ে রেখেছে, আমাদের দেশের লোককে অত্যাচারে জর্জরিত করে আমাদের

সম্পদ লুট করে নিজেদের দেশে নিয়ে চলে যাচ্ছে তাকে খাতির করে সস্তায় মাল দিতিস আর আমারই এক ভাই এই ভারতেরই সন্তান ঐ খুচরা খরিদ্দারের কাছ থেকে দাম বেশী নিতিস?" কথাগুলো বলতে বলতে সুদীপের মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। মধুসূদন স্পষ্টই বুঝতে পারছিল তার কথার খোঁচাটা সুদীপ মামার কোথায় লেগেছে! তার আবেগের সঙ্গে কথা বলার ধরণ দেখে যে-কোন বিবেচক লোকই বুঝতে পারবে কথাটা সুদীপের হৃদয়ের কোন গভীর প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে উঠে এসেছে। সুদীপের বুকের গভীর অন্ধকারে যে এমন সুন্দর একটা দেশপ্রেম, স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ লুকিয়ে আছে তা হয়ত তার ঘনিষ্ঠ লোকেরাও জানেন না। সামান্য এক খোঁচায় সুদীপের অন্তরের এ দিকটা আচম্বিতে উন্মোচিত হওয়ায় মধুসূদনের মনটা সুদীপ-মামার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল। দুচোখের গভীর প্রশান্ত দৃষ্টি দিয়ে সে এই মুহূর্তে তার সুদীপ মামার চরণযুগলে সহস্র প্রণতি জানিয়ে ক্ষণেকের জন্য মনে-মনে নিজের মামা বলরামের সঙ্গে সুদীপের তুলনা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই ক্ষুদ্র দোকানের উপার্জ্জনের সামান্য অর্থ নিয়ে তার মামা অর্থাৎ বলরাম ইতিমধ্যেই আলস্যে বিলাসিতায় দিন কাটাতে শুরু করেছে, বন্ধুবান্ধব ইয়ারদোস্ত নিয়ে হোটেল-রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে নেশাভাঙ পর্যন্ত করতে শুরু করে দিয়েছে, এমন কি, মাঝে-মাঝে এই সুদীপ মামাকে দোকান থেকে হটাবার মতলব করে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। গ্রামের ভব বিলাস পাল, আর মামার মদের আসরের প্রাইভেট সেক্রেটারী পুঁটিরাম মণ্ডল এই দু-জনে এখন তার মামার নিত্য সঙ্গী। মধুসূদন বলরামের বাড়ীতেই থাকে, খায়, তাই ছুটির দিনে বা রবিবারে ইয়ার-দোস্তদের আড্ডায় আলোচিত কথার অনেকাংশই তার কাণে আসে, বিশেষতঃ যখনই সুদীপ মামার সম্বন্ধে অহেতুক ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা তার কাণে আসে তখন তার অসহ্য হয় কিন্তু বলরামের আপন ভাগ্না হলেও বরাবর সামান্য কর্ম্মচারীর মত ব্যবহারটুকুই পেয়ে আসছে বলে সে দারুণ অসহ্য হলেও এ-সব কথায় প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না, কারণ সে ভালই জানে যেদিন এসমস্ত কথার প্রতিবাদ করবে সেদিনই তার কলকাতার অন্ন উঠবে, তার মত গরীবের মাত্র আশী টাকা মাইনের এই চাকরীটুকু চলে যাওয়াও যে কতবড় দুর্ঘটনা হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তাই সব জেনেবুঝেও তাকে চুপ করেই থাকতে হয়। প্রতিবাদ করার কণ্ঠস্বরটুকুও মাত্র আশী টাকার ভরসার তরীর তলায় ডুবে যায়।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে সুদীপ বল্লভবাবুর বালীগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে তিনশ বাণ্ডিল দু-ইঞ্চি উনিশ গেজ চারফুট চওড়া জাল নিয়ে দোকানে এল এবং গোডাউন

থেকে একশ বাণ্ডিল বের করে মোট চারশ বাণ্ডিল মাল সাহেবের নির্দ্দেশ মত স্যাক্সবী ফারমার কোম্পানীর উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিল। তারপর বাসায় গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে পুনরায় দোকানে এল। এসে দেখল মধুসূদন ও মউজীরাম দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দোকান খুলে মধুসূদন দেখল দোকানের ঝাঁটপাট দেওয়া সমাপ্ত এবং দোকানটা বেশ তকতক্ ঝকঝক করছে। মধুসূদন ও মউজী বুঝতে পারল যে, এর মধ্যেই সুদীপ দোকানে এসে সব পরিষ্কার করে রেখেছে। শুধু ধূনোগঙ্গাজল দেখিয়ে মধুসূদন প্রশ্ন করল, "মামা, সাহেবের জালের ডেলিভারীর ব্যবস্থা কি হবে? আমাদের তো জাল নেই।" তার কথার উত্তরে সুদীপ রোড চালান বইটা খুলে সামনে ধরলে চালানের লেখা দেখে মধুসূদন বুঝল জাল ইতিমধ্যেই চলে গেছে। সে তার সুদীপ মামার কর্ম্মকুশলতা দেখে আর একবার মুগ্ধ হল এবং মনে-মনে তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারল না।

দু-চারখানা ছাড়া বাজারের বেশীর ভাগ দোকান বন্ধ, তাই কয়েকদিনের মধ্যে হাজরা এণ্ড কোম্পানীতে বিভিন্ন ধরণের জালের জন্য যেন গোটা বাংলাদেশেরই খরিদ্দার ভেঙ্গে পড়ল। দোকান ও গোডাউনের মজুত মাল ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের জাল তৈরী করিয়ে সুদীপ যথাসময়ে ডেলিভারী দিতে লাগল। প্রত্যহ ভোর পাঁচটায় উঠে সুদীপ নারকেলডাঙ্গা এলাকায় জালকারখানাগুলি ঘুরে ঘুরে অর্ডার দিয়ে মাল তৈরী করাতে লাগল আর দশটার মধ্যে দোকানে এসে বিক্রয় করতে লাগল। এইভাবে মাত্র দু-তিন মাসের মধ্যে দোকানে প্রায় লাখ পাঁচেক টাকার মাল বিক্রয় হল। সুদীপকে যেন কাজের নেশায় পেয়ে গেল। স্নান-খাওয়ার ঠিক নেই, ভোর থেকে উঠে রাত্রি পর্য্যন্ত শুধু কাজ আর কাজ। রাত্রি দশটার পর বাসায় ফিরে খাতাপত্র নিয়ে হিসাবনিকাশের কাজটাও তাকেই সারতে হচ্ছিল কারণ দোকানের পার্টটাইমের খাতা লেখার লোক বাঁড়ুয্যে মশায়ও বোমার ভয়ে তাঁর বাকুড়া জেলার পৈতৃক বাড়ী বামরিয়া গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। দোকানটা পার্টনারশিপের, তাই যাতে অন্য পার্টনাররা কিছু বলবার সুযোগ না পায় সেজন্য সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও ঐ রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরে সুদীপ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত খাতাপত্রের কাজটাও স্বহস্তে সেরে রাখত। ওদিকে মল্লারপুরে ফিরে বলরাম তার স্কুলজীবনের ইয়ারদোস্তদের নিয়ে বেজায় হৈহল্লা আনন্দস্ফূর্তি করে কাটাতে লাগল। সঙ্গে জুটল সুরা আর সুরতের নেশা। মাস তিনেক নিজের মেজাজে চলার পর কলকাতা হতে নিয়ে যাওয়া খরচের টাকায় টান পড়তে হঠাৎ একদিন দুপুর বারটা নাগাদ কলকাতায় গোবিন্দ ঘোষাল লেনের বাসায়

এসে মধুসূদনকে দেখতে না পেয়ে বাসা তালা বন্ধ দেখে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই বড়বাজারে দোকানে এসে হাজির হল এবং প্রথমেই মধুসূদনের উদ্দেশ্যে বাসা পাহারা না দিয়ে দোকানে বেরুনোর জন্য কৈফিয়ৎ তলব করল। মধুসূদনও যেন উত্তর দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "আমায় দোকানে কাজ করবার জন্য এনেছেন, না, মেয়েছেলের মত বাসায় বসে থাকবার জন্য কলকাতায় এনেছেন?" এখানে সুদীপ মামা একা দোকান চালাবেন আর আমি বাসায় বসে-আরাম করব?" মধুসূদনের এরূপ উত্তরে বলরাম কিছুটা থিতিয়ে গিয়ে এবার সুদীপের উদ্দেশে প্রশ্ন করল, "দোকান কি গত তিন মাস যাবৎ রোজই খোলা ছিল?" সুদীপ এতক্ষণ নিজের আসনে বসে-বসে বলরামের মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল আর ভাবছিল যে, বলরাম তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, একসঙ্গে কত সিনেমা-বায়স্কোপ দেখেছে, খেলার মাঠে কত খেলা দেখতে গিয়েছে, কত গল্পগুজব আনন্দ-আহ্লাদ করেছে; অথচ গত তিনমাস অসাক্ষাতের পর, শুধু অসাক্ষাতই নয়, সুদীপ নিজে এত বিপদ মাথায় করে জীবনকে হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে এই যে বড়-বাজারে বসে দোকানের সমস্ত কাজ একা করে চলেছে তার জন্যও দোকানে ঢুকেই কোন কুশল প্রশ্ন করা বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা তো দূরে থাক, বরঞ্চ যে-রকম জমিদারী মেজাজে কথাবার্ত্তা বলছে তাতে মনে হচ্ছে বলরাম যেন মনুষ্যত্বের হাট থেকে অনেক-অনেক দূরে অবস্থিত কোন কবরখানার গলিত বিজারিত শবের স্তূপ পার হয়ে আসা এক মানুষ, যার গায়ে পোষাকে-পরিচ্ছদে এখনও পচা শবের দুর্গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলরামের মুখের দিকে সুদীপ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে বলরাম সুদীপকেও প্রায় ধমকের সুরেই প্রশ্ন করল "কি জবাব দিচ্ছিস না যে? ও, আমি হঠাৎ এসে পড়ায় তোদের খুব অসুবিধা হয়ে গেল বুঝি?" উপহাসাত্মক কণ্ঠে উচ্চারিত বলরামের এই শেষের বাক্যটি হঠাৎ যেন সুদীপকে সপাং করে এক চাবুক কষিয়ে দিল আর এ চাবুক যেন শুধুমাত্র পাটের দড়ি দিয়ে তৈরী চাবুক নয়, এ যেন শঙ্কর মাছের চর্ম্মনির্ম্মিত চাবুক যার মধ্যে অনেক কাঁটা ও খোঁচার যন্ত্রণাদায়ক বিষ। বলরামের এ-কথার উত্তর দেওয়া ঠিক এই মুহূর্ত্তে সুদীপের সম্ভব ছিল না, কারণ গত তিন মাস যাবৎ উদয়াস্ত পরিশ্রমে তার শরীর তখন যথেষ্ট ক্লান্ত, তার উপর মাত্র কয়েক মাস আগেই সুরমা সংসার ছেড়ে অনন্ত লোকে চলে গেছে। সেই চিন্তায় সুদীপের মনটাও বিশেষ অবসন্ন, তাই বলরামের কড়া মেজাজের প্রশ্নের উত্তরে সুদীপ শুধু ছোট্ট করে উত্তরে দিল, "হ্যা রোজই দোকান খোলা ছিল, এমন কি রবিবারেও।"

সুদীপের এই শান্ত নিষ্প্রাণ কণ্ঠের নিরুত্তাপ উত্তরে বলরাম প্রত্যক্ষভাবে আর বিশেষ কিছু বলার সুযোগ না পেয়ে তাকে প্রশ্ন করল, "তা এই ক'মাসে ক'লাখ টাকার কারবার করলি ?" বলরামের প্রশ্নটা যে বক্রোক্তি এবং দারুণ অবমাননাকর সেটা বুঝেই মনের মত জবাবটা দেবার জন্য সুদীপ ধীরে-ধীরে দোকানের ক্যাশ-খাতাখানা তার দিকে এগিয়ে দিল। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি মাখিয়ে নিয়ে বলরাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খাতাটা ওলটাতে লাগল। খাতাটা দেখতে-দেখতে ক্রমে বলরামের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল এবং টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে সে নিজে হিসাবনিকাশ করে যখন দেখল পাঁচ লাখ টাকার কাজে প্রায় আশী হাজার টাকা লাভ হয়েছে তখন কিছুটা সাচ্ছন্দ্যের ভাব মুখে এনে সুদীপের উদ্দেশে বলে উঠল, "সত্যি, আমি ভাবতেই পারি নি।" এরপর সোজাসুজি সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁরে এই কমাস একা এত কাজ সামলাতে তোর খুব কষ্ট হয়েছে, না ?" বলরামের এ-কথায় আন্তরিকতা কতটুকু ছিল তা বলরামই জানে, কিন্তু সুদীপের কাণে কথাগুলো বায়স্কোপে অভিনয়রত কোন অভিনেতার কথা বলেই বোধ হ'ল, তাই এ-কথারও কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন সে অনুভব করল না, বরং সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়ে নি এ-কথা মনে হওয়ায় সুদীপ ধীরে-ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে সুদীপ এসে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে উঠল এবং এক কোণে একটা বেঞ্চের কিনারায় বসে এক পোয়া দই ও চারটি সন্দেশের অর্ডার দিল। অর্ডার মত দই-সন্দেশ হাতে এলে দুটি সন্দেশ খেতে না খেতে একটু আগে দোকানে বলা বলরামের কথাগুলো মনে পড়তেই তার গাটা গুলিয়ে উঠল এবং হঠাৎ খাওয়ার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হল। কেমন যেন তার বমিবমি বোধ হতে লাগল। দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে বাকী সন্দেশ দুটো ও দইটা একটা ভিখারীকে দিয়ে দিল এবং হাত ধুয়ে বলরাম ও মধুসূদনের জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে দোকানে ফিরে এল।

দোকানে ফিরতে না ফিরতেই বলরাম বলল, "সুদীপ, একটা কথা অনেক দিন ধরেই তোকে বলব বলব করেও বলিনি, আজ তা হলে বলি শোন।" বলরামের এ-কথারও সুদীপ কোন জবাব দিল না, কারণ সুদীপ ভালই জানে যে, বলরাম কিছু বলতে আরম্ভ করলে যার উদ্দেশে বলছে, সে শুনছে কি না শুনছে সেদিকে খেয়াল না করে যতক্ষণ না তার বলা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই থামবে না, তা সে প্রয়োজনেই হোক আর অপ্রয়োজনেই হোক। বলরামের কথা শুনতে শুনতেই

সুদীপ হাতের খাবারগুলো মধুসূদনকে দিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বলল "তোর মামাকে দিয়ে বাকীটা তুই খেয়ে নে।" বলরাম বলল, "ভবানীপুরে বেলতলা রোডে একটা বাড়ী দেখে রেখেছি, অনেকদিন ধরেই কিনব কিনব ভাবছি, কিন্তু এতদিন তো হাতে টাকা ছিল না, তাই কেনা হয় নি। এবার বাড়ীটা কিনে ফেলি, কি বলিস? এত টাকা কোম্পানীর লাভ হয়েছে, এর থেকে আমার ও ঘনশ্যামের শেয়ারের লভ্যাংশ তুলে নিলে বাড়ীর দামটা হয়ে যাবে।"

বলরামের এ সমস্ত কথায় সুদীপ হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না, কারণ তার মতলব ছিল অন্যরকম। সুদীপ ভেবে রেখেছিল এত টাকা লাভ হয়েছে, এবার আর একটা গোডাউন নিয়ে বেশ ভাল করে নানারকম মালের স্টক রাখবে, কিছু কিছু জাপানী ও ইংলিশ জালও কিনে রাখবে, তাহলে আর মালের জন্য কথায়-কথায় বল্লভ ঘোষ বা সরোজ সামন্তর কাছে ছুটতে হবে না, কিন্তু লভ্যাংশের অঙ্ক দেখেই বলরাম যা স্থির করে ফেলেছে সেভাবে কাজ হলে দোকানের অবস্থা যা ছিল তাই-ই থাকবে অর্থাৎ অল্প স্টক নিয়ে সেই কষ্টেসৃষ্টে টেনেটুনে চালাতে হবে। এখন বলরামের মাথায় বাড়ী কেনার কথাটা যখন একবার ঢুকেছে তখন সেটাকে থামাবারও আর কোন উপায় সুদীপ দেখতে পেল না। সুতরাং বলরামের এ-প্রস্তাবের উত্তরে সে হ্যাঁ কি না কিছুই বলল না, শুধু শান্ত ও আর্ত্ত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে একবার তাকাল। সুদীপকে চুপ করে থাকতে দেখে বলরাম আবার প্রশ্ন করল, "কি রে কিছুই বললি না যে?" এরপরও উত্তর না দেওয়া নেহাৎই অভদ্রতা হবে বুঝে সুদীপ বলল, "এ ব্যাপারে আর আমার বলার কি আছে? তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে।" সুদীপের এই সংক্ষিপ্ত জবাবে বলরাম বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তেই তার মুখের দিকে চায় এবং স্নানের জন্য সিন্দুকপটির মিশ্র মশায়ের মেসের উদ্দেশে রওনা হয়।

বলরাম স্নানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলে সুদীপ কিছু বলবার আগেই মধুসূদন মন্তব্য করে ওঠে, ভাত দেবার কর্ত্তা নয়, কিল মারবার গোঁসাই। বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন আবার এখন টাকা দেখে সঙ্গে-সঙ্গেই ধান্দা! না, সুদীপ মামা, আপনি কিছুতেই এ প্রস্তাবে সায় দেবেন না। ব্যবসাদার মানুষ, কোথায় দোকানটার ক্যাপিট্যাল বাড়াবে, না, তিন বছর যেতে না যেতেই কলকাতায় বাড়ী কিনবে। আরে বাবা, নিজের দ্বারা তো জন্মেও হত না। পরের ঘাড় দিয়ে ভবানীপুরে বাড়ীটা হয়ে গেলেই এবার একেবারে পুরোপুরি সায়েব; চাই কি, এর পরে নিজের বাড়ীতে বেশ মজা করেই স্ফূর্তির আসর বসাতে পারবেন।" কথাগুলো সুদীপকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলে মধুসূদন নিজের মামার প্রতি খানিকটা

গায়ের ঝাল মেটাল। তার কথা বলার ভাবভঙ্গী দেখে সুদীপ হেসে ফেলল এবং নেহাৎই কৌতুক করার উদ্দেশ্যে বলল, "বল্লভ ঘোষ বড়বাজারে দোকানের মালিক এবং বালীগঞ্জে বাড়ী কিনেছেন আর তোর মামাও এখন বড়বাজারের দোকানের মালিক সুতরাং বালীগঞ্জে না হোক নিদেনপক্ষে বালীগঞ্জের কাছাকাছি ভবানীপুরে বাড়ী না কিনলে তোর মামার ইজ্জত থাকে কি করে বল?"

সুদীপের এ-কথায় মধুসূদন ফুঁসে উঠে বলল, "আপনি থামুন তো মামা, আপনার সব কথাতেই রসিকতা। এত পরিশ্রম করে দোকানটাকে একটু দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন; কোথায় একটা গোডাউন নেবেন, বিলাতী জাল স্টক করবেন, দেশী মালেরও স্টক বাড়াবেন, তা না, এরই মধ্যে বাবুর একটা বাড়ী না হলেই নয়। নিজের তো কিছু করবার মুরোদ নেই, বসে-বসে শুধু প্ল্যান ভাঁজছেন, হুঁঃ যত্তো সব।"

মধুসূদনের বলা কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট শ্লেষ ও ঘৃণা মিশ্রিত ছিল, তাই আর রসিকতা করে সুদীপ তাকে চটাতে সাহস করল না, বরং তার মনটা ঠাণ্ডা করবার মতলবেই ক্যাশ থেকে একটা টাকা বের করে দিয়ে চা আনতে নির্দ্দেশ দিল, কারণ সুদীপ জানে সে চায়ের ভীষণ ভক্ত, দিনের মধ্যে দশ বার হলেও তার চায়ে অরুচি নাই, তাই নিজের ইচ্ছা না থাকলেও যখনই মধুসূদন রেগে যায় তখনই সুদীপ চা খাইয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে।

মধুসূদন চা আনতে গেলে বলরাম আবার এসে দোকানে ঢুকল এবং সুদীপ লক্ষ্য করল তার বেশবাসে যথেষ্ট পারিপাট্য, মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো পর্য্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই বেশ একটু বাবুয়ানা ভাব। এই মুহূর্ত্তে বলরামকে দেখে আর একজনের কথা সুদীপের মনে এল। তিনি হলেন নন্দীদের ছোটবাবু। উপেন্দ্র-বাবুর সাজ-সজ্জায়ও সবসময় বেশ একটা বাবু-বাবু ভাব থাকে, সব সময় তাঁর গায়ের পোষাক থেকে বিলাতী এসেন্সের গন্ধ ওড়ে, পায়ের চকচকে পাম্পসুতে মুখ দেখা যায় আর উপেন্দ্রবাবু রৌদ্রে হেঁটে গেলে হীরের আংটি, গলায় সোনার চেন ও মুক্তোবসানো পাঞ্জাবীর বোতামগুলো থেকে সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হয়ে ঝিলিক মারে। এই মুহূর্তে বলরামকে দেখে সুদীপের মনে হয় বলরামও নন্দী-বাবুর মত আভিজাত্যের স্তরে উঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তা কি সম্ভব! নন্দী-বাবুরা পাঁচ পুরুষের জমিদার আর বলরাম কয়েকদিন আগেও ছিল জালের দোকানের সামান্য কর্ম্মচারী। বলরামের সর্বাঙ্গে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার পোষাক-আষাক সাজ-সজ্জার দিকে চেয়ে তড়িৎগতিতে তার আভিজাত্যের চিলে কোঠার দিকে অগ্রসর হওয়াটাকে কেমন যেন নির্বুদ্ধিতা ও হাস্যকর মতিভ্রম

বলেই সুদীপের মনে হ'ল। তার মনে হ'ল বলরামের এই প্রয়াসটা আমাদের দেশের সংস্কারবোধসম্পন্ন সমাজের কাছেও হাস্যকর ও অসহনীয়, তাই বলরামের মত যে সমস্ত মানুষ নিজেদেরকে রাতারাতি বদলে ফেলতে চায় তারা যথার্থ অভিজাত সম্প্রদায়ের, এমন কি, অনেক সময় সাধারণ মানুষদের কাছেও উপহাসাস্পদই হয়ে থাকে। তাদের অবস্থাটা হয় ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মতই। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বলরাম উঠে দোকান থেকে বের হয়ে গেল। পরদিন দোকানে এসে কিছুক্ষণ কাজকর্মের পর বলরাম একসময় সুদীপকে বাইরে ডেকে এনে সিন্দুকপট্টির গলির মুখে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা পোষ্ট কার্ডের চিঠি বের করে সুদীপের হাতে দিতেই সুদীপ দেখল চিঠিটা বলরামকে লেখা সতীন্দ্র-বাবুর চিঠি। চিঠিটা পড়ে সুদীপ বুঝল বলরামের গ্রামের নিকট সেরপুর গ্রামের প্রখ্যাত খাঁ পরিবারের নিত্যেশ খাঁ মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে সুদীপের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এর মধ্যেই কনে দেখা ও অন্যান্য কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। এখন শুধু সুদীপের মতামত ও দিনস্থির করাটাই বাকী। চিঠিটা পড়ে সুদীপ তক্ষুণি কিছু মন্তব্য না করে শুধু বলল, "পরে ভেবে বলব।" তার অনুত্তেজিত নির্লিপ্ত কণ্ঠের "পরে ভেবে বলব" কথাটুকুকেই তার সম্মতি ভেবে নিয়ে বলরাম এর পর সুদীপের দ্বিতীয় বিবাহের জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল, এবং দেখা গেল সুদীপ বিশেষ কিছু ভাববার বা বুঝবার আগেই তার বিয়ের দিনস্থির হয়ে গেছে। বলরামের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েও শুধু বাবার কথার সম্মানদানের জন্য সুদীপকে দ্বিতীয় বিবাহের সম্মতি দিতে হল। সুদীপের বাড়ী থেকে কনের বাড়ীর দূরত্বের কথা ভেবে সময় সংক্ষেপের জন্য বিবাহের সকল ব্যবস্থা বলরামের বাড়ী মল্লারপুর থেকেই করা হল। অনাড়ম্বর বিবাহ লগ্নে ছাদনাতলায় কনের মুখদর্শন করে সুদীপ বুঝল—সুরমার সঙ্গে লতার অনেক তফাৎ অন্ততঃ, চেহারার জৌলুসে তো বটেই।

সুদীপের বিবাহকার্য সমাধা হতে-না হতেই বলরাম পুনরায় কলকাতায় এসে ভবানীপুরে বাড়ী কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল এবং মাসখানেকের মধ্যেই দোকানের কষ্টার্জ্জিত অর্থ নিয়ে বলরামের বাড়ীও কেনা হল। ইতিমধ্যে কলকাতায় বোমার ভয় কিছুটা কমেছে, তাই বলরাম দেশের বাড়ীতে না ফিরে নূতন কেনা বেলতলা রোডের পুরাতন বাড়ীটাকে কিছু রদবদল করে বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে তৎপর হল। বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগিয়ে বাড়ীর কাজ করতে গিয়ে দোকানে আসা তার প্রায় বন্ধই হয়ে গেল, কেবল অর্থের জন্য মধুসূদনের হাত দিয়ে প্রায়ই সুদীপের নিকট চিরকুট আসতে লাগল। টাকা দিতে দিতে হিসাব করতে গিয়ে

একদিন সুদীপ দেখল গত কয়েক মাসের রোজগারের প্রায় পুরো টাকাটাই বলরামের চিরকুটের নির্দ্দেশে তার বেলতলা রোডের বাড়ীর ইট-চুন-সুরকী-সিমেন্ট-পাথরে ঢুকে গেছে। সুদীপ মনে-মনে যা ভেবে রেখেছিল অর্থাৎ বেশ ভাল বড় সাইজের গোডাউন নেবে, তা আর হল না। কেবল যেটুকু অর্থ অবশিষ্ট রইল তাতে কিছু ফাইন মেস বিদেশী তামাপিতলের জাল কিনে রাখল এবং হতাশার সঙ্গে ভাবতে থাকল এত বিপদ এত ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে এতদিন ধরে এত পরিশ্রম করে যে-টাকা উপার্জ্জিত হল তার সবটাই চলে গেল বলরামের জিদের জন্য। সুদীপ মনে-মনে ভাবল, বলরামের মত মানুষদের খামখেয়ালীপনার জন্য আখেরে ফল কিছু ভাল হয় না। তাদের হঠকারিতা অগ্রবর্তী মানুষকেও দশ পা পিছনে টেনে ধরে ; তাদের পূর্বপশ্চাতবিবেচনাহীন কর্ম্মের জন্য সংসারের অন্য মানুষকেও অনেক ঝামেলা অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। এ-রকম মানুষ নিয়ে কাজকর্ম্মে শান্তি থাকা বা একাগ্রতা নিয়ে গভীরভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। সুদীপ যখন বলরামের অদূরদর্শিতার কথা ভেবে আরও একাগ্রতা নিয়ে পরিশ্রম করছে দোকানের জন্য—কারণ কলকাতায় বাড়ী তো দূরের কথা, দেশে যে ভট্টাচার্যদের নূতন বাড়ী কিনে রেখেছে সেখানে মাথা গোঁজবার মত দু'খানা ঘরও এখনও করে উঠতে পারে নি—ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় বলরাম দোকানে এসে বলল, "সুদীপ, দীক্ষা নিবি ?" বলরামের এ-কথায় সুদীপ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল এবং অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে প্রতিপ্রশ্ন করল, "দীক্ষা ? দীক্ষা নেব কি রে ? দীক্ষা নেবার মত বয়স হয়েছে কোথায় ?" সুদীপের এ-কথায় বলরাম এবার বিজ্ঞজনোচিত গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, "দীক্ষায় আবার বয়স কি ? মন চাইলে গুরু করা যায়।" সুদীপ বলল, "মন চাইলে যা খুশী করা যায় ? কই আমার তো তা মনে হয় না ; তা ছাড়া মন্ত্রদীক্ষা নিলেই হল না, গুরুর নির্দ্দেশ পালন করবার মত মানসিক অবস্থা বা পরিবেশ থাকা চাই......" বলে সুদীপ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলরাম হঠাৎ তার চেয়ার ছেড়ে সুদীপের চেয়ারের সামনে উঠে এসে বলল, "যাঁকে গুরু করব ঠিক করেছি তিনি নিজেই বলেছেন সব পরিবেশেই সব অবস্থাতেই দীক্ষা নেওয়া যায়।"

বলরামের এ-কথায় সুদীপ এতক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেছে যে, এটাও তার একটা খেয়াল, তাই তার মুখের দিকে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে প্রায় হতাশাস্তব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তা তোর হবু গুরুটি কে ? এমন সৌভাগ্য কোন্ ব্রাহ্মণসন্তানের, যিনি তোর মত একজন রসজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিষ্য পাবার জন্য অন্তরে-অন্তরে ব্যাকুলতা অনুভব করছেন তাঁর গুরুগিরি সার্থক প্রমাণ করবার জন্য ?"

সুদীপের উপহাসের-সুরে-বলা কথার খোঁচায় বলরাম কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হল এবং সে বলল, "সব কিছুতেই তোর ঠাট্টা, বচন না দিয়ে চল আমার সঙ্গে, দেখবি আমার হবু গুরুকে।" নেহাৎই মজা উপভোগের জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে সুদীপ প্রশ্ন করল, "তোর গুরুর কাছে পৌঁছতে গেলে কত দূর যেতে হবে?" সুদীপ চেয়ার ছেড়ে উঠতে-না-উঠতেই বলরাম তার ডান হাতটা নিজের বাম হাতের মুঠোয় ভরে হাঁটতে শুরু করে দিল এবং টানতে-টানতে সুদীপকে সিন্দুকপটির গলির ভিতর নিয়ে যেতে লাগল। সুদীপ বলরামের এ-ব্যবহারে কিছুটা অবাক ও তদধিক বিরক্ত হল এবং প্রশ্ন করল, "তা তোর গুরু কি সিন্দুকপটিতে লুকিয়ে আছেন?" বলরাম মুচকি হেসে জবাব দিল, "আয় না আমার সঙ্গে।" এরপর আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে সুদীপ বলরামের সঙ্গে সিন্দুকপটির মিশ্রবাবুর মেসে এসে উঠল। মেসের তিনতলায় একটি ঘরে ঢুকতে গিয়ে সুদীপের হঠাৎ খেয়াল হল বলরাম তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। সে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আরে এ-যে বাঁড়ুয্যেমশায়ের ঘর?" উত্তরে বলরাম শুধু একবার তাৎপর্য্যপূর্ণ হাসি হাসল। ঘরের ভিতরে পা দিতেই বাঁড়ুয্যেমশায় অর্থাৎ তাদেরই হাজরা এণ্ড কোং-এর য়্যাকাউন্টান্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাগ্রহে তাদের আহ্বান জানালেন এবং মেঝেয় বিছান একখানা মাদুর দেখিয়ে বসতে নির্দ্দেশ করলে বলরাম ও সুদীপ সেই মাদুরে বসল। উপবেশনান্তে সুদীপ কিছু বলবার আগেই বলরাম বলে উঠল, "গুরুদেব, সুদীপও দীক্ষা নেবে বলে এসেছে।" শুনে বাঁড়ুয্যেমশায় গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বেশ বেশ ভাল কথা, তা তোমরা বেশ ভাল করে ভেবে মনস্থির করে এসেছ তো?" বাঁড়ুয্যেমশায়ের এ-কথার উত্তরে সুদীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কণ্ঠস্বর চাপা দিয়ে বলরাম বেশ উচ্চ কণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ গুরুদেব আমরা তৈরী হয়েই এসেছি, এখন আপনি শুধু দিনটা সময়টা ঠিক করে বলুন কবে দীক্ষা দেবেন।"

বলরামের এ-কথায় বেশ খুশী হয়েই বাঁড়ুয্যেমশায় তৎক্ষণাৎ পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে দীক্ষার দিন-ক্ষণ স্থির করে দিলেন। দেখতে-দেখতে যথাসময়ে সেইদিন উপস্থিত হলে বলরামের ইচ্ছায় বলরাম ও তার স্ত্রীর সঙ্গে সুদীপ ও তার দ্বিতীয়া স্ত্রী লতার দীক্ষা হয়ে গেল।

ওদিকে মাসী চারুবালা বার-বার অনুরোধ করায় সুদীপ মাসতুতো ভাই ভোলানাথকে কলকাতায় নিয়ে এসে রাজাকাটরার সামনে এক মুসলিম ভদ্রলোকের ডিমের দোকান ক্রয় করে ভোলানাথ, মেজভাই প্রদীপ ও মামাতো ভাই বিজয়কে

নিয়ে পার্টনারশিপে 'সোম, সামন্ত এণ্ড দত্ত কোম্পানী' নামে এক নূতন ব্যবসার পত্তন করে দিয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই নূতন কোম্পানী যখন সচ্ছল হয়ে উঠল ঠিক তখনই ভোলানাথ কারণে-অকারণে প্রদীপ ও বিজয়ের সঙ্গে ব্যবহারে এমনই তিক্ততার সৃষ্টি করে তুলল যে, বিজয় ও প্রদীপের দশা হল "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" তারা একে-একে ঐ দোকানের অংশ ত্যাগ করে সরে পড়ল। ভোলানাথ দেখল সে যা মতলব করেছিল অর্থাৎ পার্টনারদের পিছনে লেগে তাড়ানো সেটা সফল যখন হয়েছে তখন গ্রামের বাড়ী নবস্থা থেকে ভাই শিবনাথকে নিয়ে এসে পার্টনার করে নিয়ে দোকানের নাম বদলে রাখল 'শিবনাথ সামন্ত এণ্ড কোং।' এদিকে দোকানে ঝগড়া করে প্রদীপ ও বিজয়কে তাড়ালেও নিজে তখনও সুদীপের বাসাতেই বাস করছে এবং ভাই শিবনাথকে এনে তুলেছে। তাই বেশ কয়েক মাস পরে হয়ত লজ্জা বোধ হওয়ায় ভোলানাথ এগার নম্বর কারফর্ম্মা লেনের দোতলায় নূতন বাসা নিল।

ভোলানাথের সমস্ত আচার-আচরণ সুদীপ দেখল, বুঝল, কিন্তু মুখে তাকে কিছুই বলল না, বরং মাসী ও স্বর্গীয় মেসোর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবশতই ভোলানাথের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করতে লাগল।

এদিকে সুদীপের পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় হাজরা এণ্ড কোম্পানী দিনে দিনে বেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। এর মধ্যে সুদীপ কোম্পানীর লভ্যাংশ থেকে নিজ অংশের কিছু টাকা নিয়ে বাঘাসনের নূতন বাড়ীতে একটা দোতলা বাড়ী তৈরী করতে শুরু করল। বাড়ীর ভিৎপূজার সময় সকলের পরামর্শক্রমে স্থির হল যে, মাটির দোতলা বাড়ী হবে, কারণ গ্রাম্য দেবতা বাবা বাঘেশ্বরের মাথায় খড়ের চাল, সুতরাং পাকা বাড়ী করা চলবে না। যাই হোক, গ্রামের লোকের বিধান মেনে এবং সতীন্দ্রবাবুর কথা শুনে শেষ পর্য্যন্ত নূতন বাড়ীতে মাটির দোতলা বাড়ী তৈরী হল। বাড়ীর কাজ শেষ হল শ্রাবণ মাসে এবং স্থির করা হল একেবারে দুর্গাপূজার সময় আশ্বিন মাসে গৃহপ্রবেশ করা হবে। দুর্গাপূজার সময় বাঘাসনের বাড়ীতে বলরাম, গুরুদেব বাঁড়ুয্যেমশায় ও অন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গুরুদেবের নির্দ্দেশমতই সপ্তমীর দিন সকালে সকলের উপস্থিতিতে সুদীপ গৃহপ্রবেশ-পর্ব্ব সমাধা করল। গৃহপ্রবেশের পুণ্যলগ্নে মা ও সুরমার জীবনকালের কথা ভেবে সুদীপের বুকটা তীব্র ব্যথায় টনটন করে উঠল। সামান্য একখানা শয়নঘরের অভাবে মাকে চিরকাল বাইরে দাওয়ায় শুতে হয়েছে, এমন কি, শেষসময়টুকুও ঐ দাওয়াতে শুয়েই মাকে তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। মা ও সুরমার অশেষ কষ্টের কথা ভেবে সুদীপের চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আজকের

এই দুঃখের অনুভূতির মধ্যে তার একটাই সান্ত্বনা যে, অন্ততঃ বাবা বৃদ্ধ-বয়সে চার দেওয়ালের উপর মাথায় করোগেটেড সীটের চালের নীচে আশ্রয় পাবেন। এতদিন পরে অন্ততঃ বাবা জীবিত থাকতে-থাকতে যে মাথা গোঁজবার মত একটা আশ্রয় করে দিতে পেরেছে এই ভেবে সুদীপ কিছুটা তৃপ্ত হল।

গৃহপ্রবেশপর্ব সমাধা হওয়ার পর পূজার দুদিন সকলে মিলে হৈ-হৈ করে আনন্দেই কাটাল এবং অন্যান্য বছরের মত যথারীতি বিজয়া দশমীর পর সুদীপ লতাকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হল। কলকাতায় পৌঁছে পূর্ব্ববৎ দোকানের কাজকর্ম্ম করতে শুরু করে দিল। কিন্তু কাজ করতে-করতে সুদীপ লক্ষ্য করল যে, বলরাম যেন ঠিক আগের মত ব্যবহার করতে পারছে না, সব সময় তার যেন একটা রাগ-রাগ ভাব। অথচ রাগের কারণটা যে কি তা বুঝে উঠতে পারল না। ইতিমধ্যে সতীন্দ্রবাবু গ্রামের মহাদেব মাঝিলা মশায়ের কন্যা বরুণার সঙ্গে প্রদীপের ও মৃতা পুত্রবধূ সুরমার ভাই ডাঃ মণিময় সাঁইয়ের সঙ্গে ছোট মেয়ে বিমলার বিবাহ দিয়েছিলেন। সংসারও বেশ সচ্ছন্দেই চলে যাচ্ছিল। অবস্থাটা যখন এই রকম চলছে ঠিক তখনই সুদীপ নূতন বাড়ীর কিছু আসবাবপত্র তৈরী করবার জন্য হাজার পাঁচেক টাকা চাইলে বলরাম হঠাৎ বেশ উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল, "আর টাকাকড়ি হবে না, ঐ অত বড় বাড়ী করতে কোম্পানী থেকে তুমি অনেক টাকা নিয়েছ, আগে চৈত্র মাস আসুক, হিসাবপত্র হোক, তারপর তোমার য়্যাকাউন্টে পাওনা হলে টাকা পাবে, না হলে নয়। বলরামের এই কথাগুলো শুনে সুদীপও একটু কড়া সুরেই বলল, "তোমার কি মনে হয় হিসাবনিকাশ আমি কিছুই বুঝি না, কত পাব বা পেতে পারি তার কোন আন্দাজও আমার নেই? তা ছাড়া তুমি যখন ভবানীপুরে বাড়ী করলে, জিনিষপত্র কিনে বাড়ী সাজালে তখন তো কই একটি দিনের জন্যেও আমি কোন আপত্তি করি নি। তোমার বাড়ীতে খরচা হয়েছে সত্তর হাজার টাকা। আমার বাড়ীতে খরচা হয়েছে মোট পনর হাজার টাকা। আর মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আপাততঃ চাইছি বাবার এবং ভাইবোনদের বিছানাপত্র ও কিছু বাসনকোসন কেনবার প্রয়োজনে, তাও পাব না?" সুদীপের গাম্ভীর্য্যের সহিত উচ্চারিত কথাগুলো শেষ হতে না হতেই বলরাম হঠাৎ টেবিলে ডান হাতের তালু দিয়ে চাপড় মেরে চিৎকার করে ওঠে, "আলবৎ না, হিসাব ছাড়া একটি পয়সাও আর কাউকে দেব না। বলরামের এইরূপ অসমীচীন ও উগ্র ব্যবহারে সুদীপ বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল এবং স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মিনিটখানেক নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, "ক্যাশ যখন তোমার কাছে টাকা তুমি নাও দিতে পার, কিন্তু হিসাবনিকাশ আগামী কাল

থেকেই শুরু করা চাই এবং হিসাব করে যদি দেখা যায় আমার অংশের টাকা পাওনা আছে তাহলে যতটুকু পাওনা আছে তার সবটাই আমি তুলে নেব।" সুদীপের এ-কথায় বলরাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে আর একটা থাপ্পড় মেরে বলে উঠল, "হিসাব এখন হবে না, চৈত্র মাসের আগে কিছুতেই হিসাব হবে না।"

বলরামের এই অন্যায় জেদ ও উচ্চৈঃস্বরে আস্ফালন দেখে আপাততঃ চুপ করে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে সুদীপের মনে হল। সে চুপ করে গেল এবং ধীরে-ধীরে দোকান ছেড়ে বের হয়ে বাইরে তারাপদ দত্তর সিগারেটের দোকান থেকে এক প্যাকেট ক্যাপষ্টান সিগারেট কিনে সিন্দুকপটির গলির মুখে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগল। সিগারেট খেতে খেতে সুদীপের মনের গভীরে হাজার চিন্তার ঢেউ এসে দোলা দিয়ে তার প্রশান্ত অচঞ্চল মনটাকে অশান্ত ও চঞ্চল করে তুলল। সে মনে-মনে ভাবতে লাগল সবেমাত্র দোকানটা যখন কিছুটা স্বনির্ভর হয়েছে ঠিক তখনই বলরাম এভাবে ঝগড়া করতে চাইছে, তবে কি তাদের পার্টনারশিপের আর বেশী দিন নাই। এ-কথা তার মনে হওয়ার কারণ বলরামের মত পরশ্রীকাতর বিচারশক্তিহীন শতসহস্র মানুষ, যাদের নিজেদের আর্থিক দিকটা যতই উন্নত থাকুক না কেন, পরের সামান্য উন্নতি দেখলেই রক্ত গরম হয়ে ওঠে এবং সে-মানুষ যদি নিজেদের পরিধির মধ্যে হয় তাহলে তার ক্ষতি করবার চেষ্টার ত্রুটি করে না। সুদীপের অবস্থিতি বলরামের পরিধির মধ্যেই। সুতরাং এরপর যে বলরাম তার যথেষ্ট ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে এ-কথা সুদীপ বেশ বুঝতে পারে। সুদীপ এও বোঝে যে, এরপর কিছুতেই সেই পুরাতন প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে দোকানের কাজকর্ম্ম করা সম্ভব নয়; গত কয়েক মাসে বলরামের বহু অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে এটুকু বুঝতে সুদীপের আর বাকী নেই।

ঐখানে দাঁড়িয়ে নানা কথা ভাবতে-ভাবতে বেলা গড়িয়ে যখন তিনটে বাজে তখন সুদীপ 'কে. ডি. গাঙ্গুলী এণ্ড কোম্পানী'র সেজবাবুর আচমকা ধাক্কায় চমকে ওঠে, সেজবাবুকে দেখে তার বিষাদক্লিষ্ট মুখে এক টুকরো মলিন হাসি ফুটে ওঠে এবং সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চায়। সেজবাবু তাঁর বুকপকেট থেকে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের চ্যারিটি ম্যাচের দু-খানা টিকিট দেখিয়ে হাসতে-হাসতে সুদীপের হাতটা ধরে টানতে-টানতে তাকে নিয়ে একেবারে নিজের মরিস গাড়ীতে এসে উঠে স্টার্ট দেন। ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে ডান দিকে বেঁকে উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট গড়িয়ে পুনরায় বাঁ-দিকে টার্ন নিয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে গাড়ী সোজা একেবারে আকাশবাণী ভবনের কাছে আসে। সেখানে সেজবাবু গাড়ী দাঁড় করিয়ে গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ করে

সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে তাকে কিছুটা বিষণ্ণ ও গম্ভীর দেখে বুঝতে পারেন নিশ্চয়ই তার একটা কিছু হয়েছে, কারণ সদা-প্রফুল্ল সদা-পরিহাস্যপরায়ণ বন্ধু এই সুদীপ তো কোনও দিন এতখানি গম্ভীর হয়ে বিষণ্ণভাবে একেবারে নিস্তব্ধ থাকে না। এই এতক্ষণ গাড়ীর মধ্যে সুদীপ তো একটি কথাও বলে নি। সুদীপের এই মৌনতা দেখে সেজবাবু তার ডান হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন, "কি হয়েছে সুদীপ? তুমি এত গম্ভীর কেন? বাঘাসন থেকে কি কোন চিঠিপত্র এসেছে? কাকাবাবুর শরীর ভাল তো?" সেজবাবুর একসঙ্গে বলা এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে সুদীপ শুধু বলল, "কিছু না, চল মাঠে যাওয়া যাক।" সুদীপের এই অতি-সংক্ষিপ্ত জবাবে সেজবাবু বেশ তৃপ্ত হতে পারেন না, তাঁর মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও কোন একটা বিশেষ গণ্ডগোল হয়েছে, না হলে অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে সুদীপ এত গম্ভীর হয়ে কথা বলত না, তাই ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "বাড়ীর সব ভাল আছেন তো?" প্রশ্নটা করেই তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল উত্তরটা হয়ত এমন কিছু যেটা তাঁকেও বলা চলে না। কলকাতার সিমলার উচ্চরুচিসম্পন্ন ও আভিজাত্যে-ধনে-মানে-শিক্ষাদীক্ষায় গরীয়ান বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের সন্তান সেজবাবু। যদিও সুদীপের সঙ্গে বড়বাজারেই ব্যবসাসূত্রে তাঁর আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা তবু ব্যাপারটা হয়ত সুদীপের নিতান্ত ব্যক্তিগত, তাই সুদীপের মুখ থেকে কোন কথা বের করবার জন্য তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। সুদীপের ব্যথার কথা জানবার জন্য অন্তরটা তাঁর অত্যন্ত উন্মুখ হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুরুষসুলভ সংযমের পরিচয় রেখে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেয়ে খেলার কথা পাড়তে গেলেন। সুদীপও যথেষ্ট বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণধী, তাই এই মুহূর্তে সেজবাবুর মনের অতল তল পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে সে আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না, বাড়ীর সব ভাল, ব্যাপারটা অন্য। আজকে আমি না বললেও অবশ্যই তুমি কয়েকদিনের মধ্যে জানতে পারবে। জানতে যখন পারবেই তখন এত তাড়াতাড়ি জেনে লাভ কি? থাক না কয়েকটা দিনের সাসপেন্স।" কথাগুলো ধীরে-ধীরে স্বভাবনম্র কণ্ঠে উচ্চারণ করেই সুদীপ এবার সহজভাবে হেসে ফেলল এবং আবার সেজবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "বল এবার খেলার কথা কি বলছিলে বল?" সুদীপের এ-কথায় সেজবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন এবং আর অন্য প্রসঙ্গে না গিয়ে সেদিনের চ্যারিটি ম্যাচের আলোচনায় মশগুল হয়ে দুজনে মাঠে ঢুকলেন। খেলা ভাঙলে সুদীপকে তার বাসার কাছে কারফর্মা লেনের মুখে নামিয়ে দিয়ে গাঙ্গুলী বাবু তাঁর ডব্লু. সি. ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

খেলার মাঠে কিছুক্ষণ খেলা দেখার পরই স্মুদীপের মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গিয়েছিল এবং বাসায় ফিরেও সেই ভাবটাই বজায় ছিল। দোকানে যে আজই একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে স্মুদীপের মুখ দেখে এ-কথাটা লতা বুঝতেই পারল না, পারার কথাও নয়, কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের অন্তরে বিরাট কালবৈশাখী হয়ে গেলেও তাদের বাইরেটা দেখে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। লতা তো নিতান্তই সাধারণী, তাই স্মুদীপের অন্তরের অন্দর-মহলের ঝড়টার কোন আভাসই সে পেল না, তাই হয়ত বুঝতে পারল না সামনে কত বড় একটা বিপদের খাঁড়া তাদের সংসারের শিরে ঝুলছে। স্মুদীপের হাত-মুখ ধোয়া হলে তাকে জলখাবার দিয়ে চা করে দিল এবং রোজ যেমন সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে, শাড়ীগয়না নিয়ে পাঁচ রকম আব্দার করে সেই রকম করতে লাগল। লতার নানা কথার উত্তরে স্মুদীপ শুধু গম্ভীরভাবে একবার বলল, "আজ শরীরটা ভাল নেই, আজ ওসব কথা থাক।" স্মুদীপের এ-কথায় এতক্ষণে লতার সম্বিত ফিরলে সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে স্মুদীপের কপালে বুকে হাত বুলিয়ে দেখল তার গায়ে জ্বরটর কিছু নেই, তাই ঈষৎ অভিমানাহত কণ্ঠে বলল, "আমার কথা শুনতে হলেই তোমার শরীর খারাপ হয়।" এ-কথা বলে কিছুটা বিরক্ত-ভাবেই অন্য ঘরে চলে গেল। স্মুদীপ একখানা চেয়ার টেনে "সঞ্চয়িতা"খানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল, "বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ-নহে মোর প্রার্থনা।"

পরদিন সকালে যথারীতি স্নান-খাওয়া সেরে স্মুদীপ বেলা প্রায় নটার সময় দোকানে গেল। সেখানে দেখল বাইরে ফুটপাথে মউজীরাম দাঁড়িয়ে আছে। গত সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে চাবি কেন স্মুদীপের বাসায় দিয়ে আসে নি প্রশ্ন করতেই মউজী বলল, "বড়বাবু চাবি নিয়ে ভবানীপুর চলিয়ে গেল আর বোল দিয়ে আজসে চাবি উনকে পাশই থাকবে।" ব্যাপারটা মুহূর্তে বুঝে নিয়ে স্মুদীপ আর তাকে কিছু বলল না, একটু সরে এসে সিন্দুকপটির গলির মুখে দাঁড়িয়ে চিন্তান্বিত মনে সিগারেট খেতে লাগল। স্মুদীপকে এইভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে দেখে চেনাশুনা অনেকেই প্রশ্ন করল, "কি এখনও দোকান খোলেন নি ?" কেউ বলল, "চাবি আনতে ভুলেছ নাকি হে ?" কেউ বলল, "বাইরে যাবে বুঝি ?" কেউ প্রশ্ন করল, "বাইরে থেকে মাল আসবে বুঝি ?" নানা জনের কৌতূহল নিবারণ করতে-করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়-দুই যখন কেটেছে তখন বেলা এগারটায় চাবি নিয়ে হেলতে দুলতে বলরাম এল। এতদিন যেখানে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে বেলা নটায় দোকান খোলা হত সেখানে আজ একটা রাতের ব্যবধানে দু-ঘণ্টা লেট, অর্থাৎ নটার পরিবর্তে

বেলা এগারটায় হাজরা এণ্ড কোম্পানীর গেট খোলা হল। সুদীপ মনে-মনে ভেবে দেখল আশপাশের লোকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কারণ সুদীপের নিয়মানু-বর্তিতার কথা এ-বাজারের সকলেরই জানা। তা ছাড়া গতকাল দুপুরে বলরামের উচ্চকণ্ঠের অস্ফালনগুলো দোকানের কর্ম্মচারীরা ছাড়াও অনেকেই শুনে থাকবে। তাই সকলে তাকে বাইরে ঐভাবে খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কৌতূহল চরিতার্থ করবার মানসে আপন-আপন অভিসন্ধিপ্রসূত প্রশ্নে তাকে জর্জ্জরিত করছিল। বলরামের নিকট চাবি নিয়ে মউজী দোকান খুললে দোকানে ঢুকে সুদীপ হাঁফ ছাড়ল। দোকানের মাল সাজানো হয়ে গেলে সুদীপ তারাপদর দোকান থেকে মউজীকে পাঠিয়ে পান ও সিগারেট আনিয়ে নিয়ে একটা পান মুখে দিয়ে ভাবতে লাগল বড়বাজারের পরিবেশে মানুষগুলি প্রায় শ্মশানগৃধ্নু শকুনের জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। যেই শুনেছে কোথাও ভাগাড় পড়েছে অমনি ঝাঁক বেঁধে ভোজসভা বসিয়ে দিয়েছে। সুদীপ মনে মনে বেশ বুঝতে পারে এদের এই ইতরামি ও নোংরামী এবং একের প্রতি অন্যের বিরূপতা ও ঈর্ষাপরায়ণতাকে কাজে লাগিয়ে অন্য সম্প্রদায় ধীরে-ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা সবই কুক্ষিগত করে নেবে। দোকানে ধুনো-গঙ্গাজল দেওয়া হয়ে গেলে একসঙ্গে প্রায় দশ-বারজন খরিদ্দার এসে ভীড় করে দাঁড়াল। কেউ বলল, "বাবুদের আজ দোকান খুলতে এত দেরী যে?" কেউ বলল, "সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি", কেউ বলল, "এইবার অন্য দোকানে যাব ভাবছিলাম।" সকলের জন্য একটা একটা কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করে সুদীপ বলল, "চাবিটা আনতে ভুলে গিয়েছিলাম ভাই, তাই লোক পাঠিয়ে চাবি আনতে গিয়ে আজ একটু দেরী হয়ে গেছে, সত্যি আপনাদের কষ্টের জন্য আমি লজ্জিত। বলুন এবার কার কি চাই।" এরপর যথারীতি সুদীপ দোকানের কাজে মন দিল এবং যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে সারাদিন কাজ করে যেতে লাগল। কর্ম্মপরায়ণ নিয়মানুবর্ত্তী মানুষের ধরনই এই, অন্তরের সকল সংঘাতকে সুপ্ত ও তন্দ্রিত রেখে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ও আর্থিক উন্নতিতে অনেক সময়েই হয়ত চরমতম শীর্ষে উন্নীত হতে সক্ষম হয় না কিন্তু মানুষের সমাজে এঁদেরকেই আদর্শ মানুষ বলা হয়। সুদীপও এমনই একটি চরিত্র, তাই হাতের কাছে যে মুহূর্ত্তে কাজ উপস্থিত হয় সেই মুহূর্ত্তেই সে সব ভুলে কাজকে সঙ্গী করে জীবনের খেয়া বেয়ে চলে আলস্যের গলা টিপে।

মাস দুয়েক এই ভাবে কাটলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একদিন সকালে দোকানে এসে কিছুক্ষণ বসার পরই সুদীপ শারীরিক অস্বস্তি বোধ করে এবং চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে তার পা দুটো কেঁপে যায়। টাল সামলে কোন রকমে উঠে সিন্দুক-

পটিতে বাথরুম গিয়ে ফিরে এসে দোকানে উঠতে গিয়ে আর পা তুলে সিঁড়িতে উঠতে পারে না, পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে এবং সুদীপ বুঝতে পারে তার হাতের জোরটাও যেন ধীরে-ধীরে কমে আসছে। পড়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি দুপাশে জালের বাণ্ডিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে "মউজী-মউজী" বলে ডাক দেয়। সুদীপের ডাক শুনে মউজী ও মধুসূদন ছুটে এলে সুদীপ তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিতে বলে। তারা দুজনে মিলে সুদীপকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। চেয়ারে বসেও সুদীপ অনুভব করে তার দুটো পা তিরতির করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ পরে একজন খরিদ্দার এলে তাকে মাল দিয়ে পাঁচশ টাকা নিয়ে ক্যাশ ড্রয়ারে রেখে দেবার সময় অনুভব করে তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোও বেশ কাঁপছে। ক্যাশমেমো করতে গিয়ে সুদীপ লিখতে পারল না। ইতিমধ্যে পায়ের কাঁপুনিটা কমল বটে, কিন্তু শুরু হল পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় তীব্র যন্ত্রণা। যন্ত্রণার তীব্রতা অসহ্য হওয়ায় ধরাধরি করে সুদীপকে একটা রিক্সায় তুলে মধুসূদন ও মউজী বাসায় এনে পৌছে দিল। সুদীপ তখন একজন ডাক্তার আনতে বলল। সুদীপের কথায় মধুসূদন বলল, "ডাঃ কমলেন্দু দাশগুপ্তকে ফোন করে দিয়ে তবে আমি এসেছি আর আপনার মাসতুতো ভাই ভোলানাথকেও খবর দিয়েছি। তিনিও এক্ষুনি এসে পড়বেন।

দোকান থেকে সুদীপকে পাঁজাকোলা করে তুলে যখন রিক্সায় তোলা হল তখনও পর্য্যন্ত বলরাম একটি কথাও বলল না, এমন কি হঠাৎ কি হল, কেন শরীর খারাপ লাগছে ইত্যাদি কোন প্রশ্নই করল না, অথচ তারই আপন ভাগ্না মধুসূদন সুদীপের জন্য এর মধ্যেই এতখানি করেছে শুনে ঐ অত যন্ত্রণার মধ্যেও সুদীপ মনে-মনে একবার ভাবল, মানুষে-মানুষে কত প্রভেদ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভোলানাথ ও আরও কয়েক মিনিটের মধ্যে কারমাইকেল হোষ্টেল থেকে ডাঃ দাশগুপ্ত এসে সুদীপের বিছানার পাশে উপস্থিত হলেন।

সুদীপকে পরীক্ষা করতে-করতে পিঠের একটা জায়গায় ডাক্তারের হাত পড়তেই সুদীপ যন্ত্রণায় একেবারে ককিয়ে উঠল, তৎক্ষণাৎ সবাই মিলে ধরে তাকে পাশ ফিরিয়ে দিল। ডাক্তার ভালভাবে সুদীপের বুক ও পিঠ পরীক্ষা করে দেখে বললেন, "আমি একবার অরথো-সারজেন ডাঃ চন্দ্রর সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাই।" ভোলানাথ ও সুদীপের সম্মতি পেয়ে ডাক্তার সুদীপের জন্য ঘুমের ওষুধ ও আরও টুকি-টাকি ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে সে-রাত্রির জন্য বিদায় নিলেন।

পরদিন সকালে প্রায় নটার সময় ডাঃ চন্দ্রকে নিয়ে ডাঃ দাশগুপ্ত এসে হাজির হলেন। ওষুধের ঘোরে সুদীপ তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন, সেই অবস্থাতে পরীক্ষা করে দেখতে

দেখতে পিঠের সেই জায়গায় হাত পড়তেই সুদীপ সজাগ হয়ে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। ডাঃ চন্দ্র, ডাঃ দাশগুপ্তকে বুক ও পিঠের এক্স-রে করবার পরামর্শ দিলেন, ঐ সঙ্গে রক্ত, মল ও থুথু পরীক্ষা করাতে বলে প্রেস্ক্রিপশনে সব লিখে কিছু নূতন ওষুধের নির্দ্দেশ দিয়ে, ফিস্ নিয়ে বিদায় নিলেন।

ডাঃ চন্দ্র চলে গেলে ভোলানাথকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে ডাঃ দাশগুপ্ত বললেন "সম্ভবত এটা এক ধরনের অস্থিযক্ষ্মা রোগ।" ডাক্তারের কথা শুনে ভোলানাথ একবার চমকে উঠল, কারণ সে সুদীপেরই কাছে শুনেছিল তার বাবা শোকনাথ ঐ রোগেই আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। ভোলানাথের মনে বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্য উঁকি দিল—তবে কি বাবার সেবা করতে গিয়েই সুদীপদারও শেষে এই অবস্থা হ'ল? হতেও পারে। যেই এই কথা মনে-হওয়া সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথ ডাঃ দাশগুপ্তকে প্রশ্ন করল, "তা হলে উপায়?" এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডাক্তার তাকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা ভোলানাথ, বলতে পার সুদীপের পূর্ব্বপুরুষদের কারো এই রোগ ছিল কি কোনদিন?" ভোলানাথ বলল, "না, এরকম কথা শুনি নি তো কোনদিন।" ডাক্তার তখন চিন্তান্বিত হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা সুদীপ কি তার জীবনে এমন কোন লোকের সংস্পর্শে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছে যার এই ধরনের রোগ ছিল?" ডাক্তার দাশগুপ্তের এ-কথায় ভোলানাথ মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থেকে প্রায় কান্না-ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল, "ডাক্তার, তুমি দাদাকে বাঁচাও, যত টাকা লাগে আমি দেব, তোমার কাছে লুকাব না, জান ডাক্তার, মায়ের কাছে শুনেছি আমার বাবার বোন-টি. বি. ছিল, আর শেষের দিকে দাদা প্রায় বছর তিনেক তাঁর সেবা করেছেন।" ভোলানাথের কথায় ডাক্তার চমকে উঠে বলল, "এঁ্যা, সে কি? জেনেশুনে পরের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া? এ যে কি দারুণ অপরাধ তা কেমন করে তোমায় আমি বোঝাই, ছিঃ ছিঃ এ কি করেছ তোমরা! এ তোমাদের ভীষণ অন্যায়।" ডাক্তারের ভৎর্সনার-স্বরে-বলা এই কথাগুলো ভোলানাথের বুকে শেলের মত তীব্র আঘাত দেয়, তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবসা থেকে এই সুদীপদারই ভাই প্রদীপদাকে হটিয়ে দিলেও ভোলানাথ মনে-মনে জানে তার যা কিছু উন্নতি তার মূলে পিতৃপ্রতিম তার এই সুদীপদা। সকলের অজান্তেই সুদীপ-দাকে তার বাবার সেবা করানোর নামে অকাল মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বুঝে ভোলানাথ ডাক্তারের হাতদুটো ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল, পাছে রান্নাঘর হতে লতা শুনতে পায়। বহুদিনের পারিবারিক বন্ধু হলেও এ-খবর লতাকে এই মুহূর্ত্তে দেবার মত

মনের জোর ডাক্তারেরও নাই। ভোলানাথ ডাক্তারের হাত ধরে শুধু কাতর মিনতি করতে লাগল, "যা করতে হয় তুমি সব কর ডাক্তার! দাদাকে বাঁচাতেই হবে। কোন্ ছোটবেলায় আমাদের বাবা মারা গেছেন। মায়ের মুখে শুনেছি এই দাদা না থাকলে আমাদের গোটা সংসারটাই ভেসে যেত। শিশুকালে অজ্ঞান অবস্থায় যে-পাপ আমাদের লেগেছে আজ সজ্ঞানে সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুটা করতে দাও। বল ডাক্তার, দাদার জন্য আর কোন্ ডাক্তার আনতে হবে, কি করতে হবে।"

ভোলানাথের মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তারেরও চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করে উঠল। ডাক্তার নিজেও সুদীপকে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবেই বরাবর দেখে এসেছে কারণ তার নিজের ছাত্রজীবনের চিন্তাভাবনার, সুখদুঃখের দিনগুলির স্মৃতিতে যে-নাম সর্ব্বাগ্রে জড়িত সে-নাম এই সুদীপের। কমলেন্দু সুদীপের প্রথমা পত্নী স্বর্গতা সুরমার ভাই মণিময়ের বিশেষ বন্ধু। মণিময় ও সে একই সঙ্গে একই কলেজে ডাক্তারী পড়ত এবং হোষ্টেলের একই ঘরে দুজনে থাকত। মণিময়ের খোঁজখবর করতে সুদীপ প্রায়ই তাদের হোষ্টেলে যেত। সেই থেকে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতা যে কখন অনাত্মীয়তার বেড়া টপকে নিবিড় বন্ধুত্বে পর্য্যবসিত হয়েছিল তা সুদীপ ও কমলেন্দু কেউই বুঝতে পারে নি। আজ সুদীপের রোগাক্রান্ত অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে গিয়ে ডাক্তারেরও চোখের কোণ চিক্‌চিক্ করে উঠল। ডাক্তারও মানুষ, তাই আপনজন বা বন্ধুজনের রোগে-শোকে তাদেরও যথেষ্ট কষ্ট হয় এবং চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বজায় রাখতে গিয়ে এই ডাক্তারদেরও মাঝে-মাঝে কঠোর এবং কঠিন হতে হয়। বাইরের মানুষ হয়ত এর সবটুকু ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে তাঁদের সাথে অসংলগ্ন ব্যবহার করে। এই মুহূর্ত্তে সুদীপের চিন্তায় মগ্ন ডাক্তারকেও তাই সব আবেগ, সব নম্র অনুভূতির কথা ভুলে উঠতে হয় এবং সুদীপের এক্স-রের সব ব্যবস্থা করতে হয়।

ডাক্তারের নির্দ্দেশে ভোলানাথ তার সানবীম ট্যালবট গাড়ীটা নিয়ে এসে সুদীপের বুক-পিঠের এক্স-রে ফটো তুলতে ধর্ম্মতলার জনসেবা এক্স-রে ক্লিনিকে তাকে নিয়ে গেল এবং ডাঃ চন্দ্রের নির্দ্দেশমত সুদীপের বুক ও পিঠের খানআষ্টেক ছবি তোলা হল। ছবি তোলার পর ভোলানাথ সুদীপকে নিয়ে ফিরে এল এবং ডাক্তার সুদীপের রক্ত নিয়ে অন্য এক ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করাতে দিতে গেল।

বিকেলে ডাক্তারের আসতে দেরী দেখে ভোলানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং অস্থির হয়ে নিজে একসময় গাড়ী নিয়ে ডাক্তার চন্দ্রের চেম্বারের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

এক্স-রে রিপোর্ট ও ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্ত অনেক আগেই সেখানে এসে ডাঃ চন্দ্রের সংগে পরামর্শ করতে বসে গেছে দেখে ভোলানাথ কিছুটা আশ্বস্ত হল। সব দেখে-শুনে ডাঃ চন্দ্র অপারেশনের মত দিলেন এবং বলে দিলেন বাড়ী গিয়ে কন্‌সাল্ট করে দু-একদিনের মধ্যেই জানাতে, কারণ এ-ব্যাপারে বেশী দেরী হলে রোগটা অন্যান্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা। ডাঃ চন্দ্র যথেষ্ট খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চেম্বার থেকে বের হয়ে ডাঃ দাশগুপ্ত ও ভোলানাথ আর একজন বড় ডাক্তারের অভিমত নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে ডাঃ শিব ভট্টাচার্য্যের সংগে দেখা করে তাঁকেও পরদিন সকালে রোগী দেখবার জন্য কল দিল।

ডাঃ শিব ভট্টাচার্য্য যথাসময়ে এসে সব রিপোর্ট দেখে বললেন, "অপারেশন ছাড়া কোন উপায়ই নেই, সুতরাং অপারেশান করাই ভাল।" দু-জন ডাক্তারের একই মন্তব্য জেনে সুদীপকে ডাঃ চন্দ্রর নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করে অপারেশন করানো হল। প্রায় দু-মাস নার্সিং হোমে থেকে সুদীপ কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরল বটে, কিন্তু ধীরে-ধীরে তার পিঠটা বেঁকে যেতে লাগল এবং যন্ত্রণাটাও আবার একটু-একটু শুরু হল। আবার ডাঃ চন্দ্রকে কল দিলে তিনি এসে সুদীপের পিঠটা প্লাস্টার করে দিলেন এবং ছ-মাস পরে প্লাষ্টার কাটবেন বলে স্থির করে গেলেন।

রোগের যন্ত্রণা ও মানসিক ক্লেশে সুদীপ দিন-দিন কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ছিল। তার বিমর্ষতার আরও কারণ ছিল। কারণটা হল ইতিমধ্যে সুদীপ মেজ ভাই প্রদীপকে হাজরা কোম্পানীতে বের হতে বলেছিল এবং সুদীপের নির্দেশ মত প্রদীপ হাজরা কোম্পানীতে দু-একদিন গিয়েওছিল। সেখানে গিয়ে তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে-কথা বিস্তারিতভাবে না বলে মাত্র আসল সত্যটুকু সে সুদীপকে চুপিচুপি বলেছিল। সে সত্যটুকু হল যে, বলরাম বলেছে—পার্টনার ছাড়া সে কাউকে দোকানে ঢুকতে দেবে না। প্রদীপের ঐটুকু কথা হতে সুদীপ অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছিল অর্থাৎ সে বুঝেছিল যে, তার এই রোগগ্রস্ত অসহায় অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ বলরাম নিতে চায়। এ-ছাড়া ডাক্তারের মুখ থেকেও সুদীপ শুনেছিল যে, বলরাম প্রায়ই হাসপাতালে ডাক্তারের নিকট সুদীপের খোঁজখবর নেয় এবং প্রায়ই উপহাস করে প্রশ্ন করে, "বন্ধুকে কতদিনে বার করতে পারবেন, ভাল করে দিতে পারবেন না টাঁসিয়ে দেবেন" ইত্যাদি।

ডাক্তারের কাছে এসব খবর শুনে বলরাম যে নিত্য তার মৃত্যু কামনা করছে এ-কথা বুঝে সুদীপের মনটা ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে। এতদিন সে এ-রকম একটা অর্থগৃধ্নু পরস্বাপহারী মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করে এসেছে, পাশাপাশি বসেছে,

গল্প করেছে, থিয়েটার দেখেছে, খেলার মাঠে ফুটবল খেলা দেখেছে এসব মনে করে নিজের প্রতি ক্ষোভে-দুঃখে-ঘৃণায় নিজেরই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মনে-মনে ভাবে সামান্য কয়েক হাজার টাকা ফাঁকি দেবার জন্য মানুষ এমন নৃশংস চিন্তাও করতে পারে। মাঝে-মাঝে সুদীপ নিজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা চিন্তা করে কাতর ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এমনই এক কাতরতার মুহূর্তে গুরুদেব বিভূতিবাবু সুদীপকে দেখতে এলে সুদীপ তাঁর হাত দুটো ধরে তাঁর কাছে সব বলল এবং দোকানটার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করল।

সব শুনে বিভূতিবাবু বিরক্তির সুরেই বললেন, "বলরাম কি আমার কথা শুনবে? আজকাল তার পুরো ব্যবহারটাই অন্যরকম হয়ে গেছে, সে-বলরাম আর নেই, আজকাল তাকে দেখলেই মনে হয় শামুকের খোলের ভিতর থেকে যেন কোন বে-তাজরা সাপ বেরিয়ে পড়েছে। আজকাল বলরামকে বিশেষ কিছু বলতে বেশ ভয় হয়।"

গুরুদেবের স্বরে ও সুরে হতাশার কথা শুনে সুদীপ বেশ কিছুটা চিন্তান্বিত হয়, তবু তার শেষ ভরসা এই গুরুদেব, কারণ বলরামেরও গুরুদেব তিনিই আর ঐ বলরামই একদিন তাকে ওঁর কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে দীক্ষা নেওয়া করিয়েছিল। তাই সে আবার অনুরোধ করল ব্যাপারটা কোনও রকমে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। কোন কিছু গোপন না করে সুদীপ সকলের অলক্ষ্যে গুরুদেবকে বলল, "আপনার নিকট লুকোবার কিছু নাই, বাড়ীতে ভীষণ টানাটানি চলছে, কয়েক মাসের রোগের দাপটে, নার্সিংহোম-ডাক্তার-ওষুধপত্রে হাতে যা ছিল তা সব শেষ। দু-এক মাসের মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা না হলে এবার আপনার বৌমার গহনায় হাত পড়বে। গুরুদেব, আপনার দুটি পায়ে পড়ি এ-অবস্থা থেকে যেমন করে হোক আপনি আমায় বাঁচান।"

সুদীপের অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠের কাতরোক্তির জবাবে গুরুদেব শুধু বললেন, "দেখি কি করতে পারি।" এই কথা বলে গুরুদেব কারফর্মা লেনের বাসা থেকে বের হয়ে বেশ চিন্তান্বিত মনে সিন্দুকপটির মেসের দিকে চলতে-চলতে আপন মনে সুদীপের কথার সত্যতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন। তিনি নিঃস্বার্থ-ভাবেই এতদিন দোকানের খাতা লেখেন, সুতরাং সুদীপের বকেয়া পাওনাগণ্ডা সম্বন্ধে তাঁর সব কিছুই জানা। সুদীপ বেহিসাবী হয়ে কোনদিন দোকানের ক্যাশ থেকে নিজের য়্যাকাউণ্টে টাকাকড়ি নেয় নি, বরং এতদিন মাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সংসার-খরচের জন্য সামান্যই টাকা নিয়েছে। ঠিকমত হিসাব করলে নগদে ও মজুত মালের মূল্য ধরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা তার পাওনা হবে। এরপর আছে গুড

উইলের মূল্য ও পার্টনারস্ ভলাণ্টারী রিটায়ারমেণ্ট কম্পেনশেসন। গুডউইল, রিটায়ারমেণ্ট কম্পেনশেসনের কথা বাদ দিলেও ঐ দু'লক্ষ টাকাই কি বলরাম দেবে? নিজের মনের নিকট এ-প্রশ্ন রেখে সব দিক বিচার করতে গিয়ে অধুনা বলরামের কর্ম্মপদ্ধতি ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বিভূতিবাবুর মনে ভাসতে লাগল। বলরামের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু এখন ভববিলাস পাল। সে-লোকটি যথেষ্ট বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত নিম্নমনোবৃত্তির মানুষ, আর পুঁটিরাম মণ্ডল, সেও তো একটা অসৎ, লম্পট, মদের গ্লাসের বন্ধু ও বলরামের বিশেষ ধামাধরা। এদেরই প্ররোচনায় বলরাম দিনের পর দিন সুদীপের সঙ্গে বেইমানী করে চলেছে। ঐ পুঁটিরামেরই অসৎ পরামর্শে বলরাম প্রদীপকে দোকানে ঢুকতে বারণ করেছে, বলেছে, "পার্টনার ছাড়া কাউকে দোকানে ঢুকতে দেব না।" এদের কারও কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়া পাপের আরাধনা করারই সামিল, সুতরাং যা করতে হবে তা তাঁকে একলাই করতে হবে। কিন্তু তাই বা তিনি করবেন কি করে? গুরুদেবের সম্মান তাঁর অনেক দিনই গেছে, এখন হাজরা কোম্পানীতে তাঁর অস্তিত্ব শুধু মাত্র দেড় শত টাকা বেতনের খাতা-বাবু হিসাবেই। এ সব কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উদ্গত হয় এবং আপন মনেই বলে উঠেন, "দেখা যাক, ঈশ্বর কি করেন!"

মাস ছয়েক কেটে গেছে। ডাক্তার সুদীপের প্লাস্টার কেটে দিয়েছেন। সুদীপ লাঠি ধরে ধীরে-ধীরে হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে এবং গুরুদেব বিভূতিবাবুর চেষ্টায় অনেক কষ্টে হাজার দশেক টাকাও হাজরা কোম্পানী থেকে সে পেয়েছে। ঐ টাকাটা হাতে পেয়েই সুদীপ সর্ব্বপ্রথমে কন্যার বিবাহের যোগাযোগ করার চেষ্টা করল ও বড়বেলুন গ্রামের সম্পন্ন পরিবার কুমারদের বড়কর্ত্তা চন্দ্রমোহনবাবুর তৃতীয় পুত্রের সঙ্গে সে কন্যার বিবাহকার্য্য সমাধা করে ফেলল। সামান্য পরিচয়ের সূত্রে চন্দ্রমোহনবাবু ও তাঁর পঞ্চম ভ্রাতা তারাপদবাবু একদিন যে-কথা দিয়েছিলেন সে-কথা যে তাঁরা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবেন তা সুদীপ বা সতীন্দ্রবাবু স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সতীন্দ্রবাবু ও সুদীপ দেখল মানুষ আজও আছে এবং এই পৃথিবীতে যেমন আছে একদিকে বলরামের মত নিষ্ঠুর, ক্রূরমনা অসৎ, স্বার্থপর মানুষ যারা সামান্য স্বার্থের জন্য অসহায় রোগজর্জ্জর মানুষের স্বস্তি অপহরণ করবার প্রয়াস পেতে আদৌ দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, তেমনি আছে অপর দিকে চন্দ্রমোহনবাবু ও তারাপদবাবুর মত অসংখ্য সৎ, পরোপকারী এক কথার মানুষও। বিবাহকার্য সমাধা হওয়ার পর সুদীপ ভাবতে থাকে এইরূপ সৎ ও উদারহৃদয় মানুষেরা নিদারুণ অসহায় মানুষদের সব সময় দুঃখের হাত থেকে বাঁচিয়ে চলেছেন বলেই

সুদীপের মত দুঃখক্লিষ্ট সাধারণ মানুষদের নিকট পৃথিবীর সব আলো একেবারে নিভে যায় না, তাই বেদনার্ত্তের মুখেও সময়ে-সময়ে হাসি ফোটে, কষ্টের কাঁটার মধ্যে থেকে সুরভিত গোলাপ হেসে ওঠে। আপন মনে ভাবতে-ভাবতে সুদীপ চন্দ্রমোহনবাবু ও তারাপদবাবুর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

এদিকে কন্যার বিবাহের জের মিটতে না মিটতেই আর এক বিবাহের প্রস্তাব আসে। সে প্রস্তাব ছোট ভাই অধীপের বিবাহের। সুদীপ ও সতীন্দ্রবাবু সে প্রস্তাবেও সায় দেন এবং মাস কয়েক পরেই অধীপেরও বিবাহ সমাধা হয়।

অধীপের বিবাহের পর কলকাতায় ফিরে সুদীপ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে, আবার ডাক্তার এল এবং পুনরায় সুদীপকে প্লাষ্টার করে বিছানায় ফেলে রাখল। বিছানায় ঐ অবস্থায় পড়ে পড়ে সুদীপ মাঝে মাঝে গুরুদেব মারফৎ দোকানের খবরাখবর সংগ্রহ করতে লাগল। মাঝে-মাঝেই লোক মারফৎ সুদীপ খবর পাচ্ছিল দোকানের অনেক খরিদ্দার নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে হাজরা কোম্পানী ছেড়ে অন্যান্য দোকানে মাল নিচ্ছে, অনেকে আবার বাড়ীর ঠিকানা খোঁজ করে বলরামের দুর্ব্ব্যবহারের কথা সুদীপকে বলে যাচ্ছে। বিছানায় পড়ে থেকে নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া সুদীপ আর কিই-বা করতে পারে। সুদীপ চোখের জল ফেলে আর ভাবে সে কত কষ্ট করে সমস্ত জীবনযৌবন পাত করে ঐ দোকানটাকে দাঁড় করিয়েছে আর আজ মাত্র কয়েকটা মাসেই সেই দোকানের কি অবস্থা হতে চলেছে। এই ভাবেই দিন গড়িয়ে চলছিল, এমন সময় চৈত্র মাসে একদিন সন্ধ্যার দিকে বিভূতিবাবু এসে বেশ উত্তেজিত ভাবেই বললেন, "জান সুদীপ, বলরাম কি শয়তানী করেছে?" গুরুদেবকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখে সুদীপ দু'হাত দিয়ে বিছানার তোষকের দু-ধার ধরে উঠে বসতে চায়, কিন্তু গোটা পিঠটা ও কোমরের কাছ পর্য্যন্ত প্লাস্টার করা থাকায় সে উঠতে পারে না, গড়িয়ে বিছানায় পড়ে যায়। বিভূতিবাবু সুদীপের বিছানার ধারেই বসে বলতে থাকেন, "সিন্দুকপটির গোডাউনের সব মাল চুরি হয়ে গেছে," বলে বলরাম থানায় ডাইরী করেছে। যা মাল চুরি হয়েছে বলে ডাইরী করেছে তার আনুমানিক মূল্যও দিয়েছে, মূল্য দিয়েছে দেড় লক্ষ টাকা। আমি যতদূর শুনেছি মালগুলো বলরাম নিজে ভ্যান-গাড়ী করে তার ভবানীপুরের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে, আর তার সাক্ষী একমাত্র মধুসূদন। গুরুদেবের কথা শেষ হতে না হতেই মধুসূদন হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে এসে হাজির হ'ল। মধুসূদন প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলতে লাগল, "মামা, আপনি আর কিছু পাবেন না, এখনও দোকান ছেড়ে দিয়ে মালপত্র টাকাকড়ি ভাগ করে নিন, না হলে আর মাস কয়েক পরে আর কিছু থাকবে না, সব কালে খেয়ে নেবে।" এরপর মধুসূদন অত্যন্ত

ক্রোধান্বিতভাবে বলতে লাগল, "শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, দুটো কাল-কেউটে জুটেছে, এক ভববিলাস আর এক পুঁটিরাম, এরা দিন-রাত যুক্তি দিয়ে আমার মামার মাথায় পৃথিবীর সেরা শয়তানটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর আমার মামা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ সব ভুলে ওদের ফাঁদে পা দিয়ে এক পা এক পা করে নরকের গলির অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। সকালে নিজের চোখে আমি দেখেছি দোকানের মাচায় ও সিন্দুকপটির গুদামে যত বিলাতী তামা-পিতল-ব্রোঞ্জের জাল, পিতলের সীট জাল, জিঙ্কের সীট জাল ছিল সব নিয়ে গিয়ে ঝাঁকা-মুটে ভাড়া করে ভবানীপুরের বাড়ীর দোতলার ঘরে খাটের তলায় ঢোকালো আর বিকেলে থানায় গিয়ে মিথ্যা ডাইরী করে পুলিশ নিয়ে এল এন্‌কোয়ারী করাতে। এ-সব সাজানো চুরি, সব সাজানো চুরি, আপনাকে ফাঁকি দেবার জন্য।"

সুদীপ এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে সব শুনছিল, শুনতে-শুনতে ঘৃণায় রাগে ক্ষোভে তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠছিল, কিন্তু সে নিরুপায়, তাই তার অন্তরের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এল অজস্র ধারায় চোখের জলের মধ্যে। মুখ ঢেকে সুদীপ কাঁদছে আর পাশে বসে নীরব দুই দর্শক বিভূতিবাবু ও মধুসূদন। কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর সুদীপ গুরুদেবকে বলল, "গুরুদেব, আর নয়, এবার যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার অংশের যা পাওনা হয় বের করে দিন, আমি আর ঐ দোকানের পার্টনার থাকতে চাই না।" কথাগুলো বলতে বিপুল বেদনায় সুদীপের বুক ভেঙ্গে আসছিল, কিন্তু তবু এতদিনকার অনুচ্চারিত কথাগুলো তাকে উচ্চারণ করতেই হল। সুদীপ মনে মনে ভাবল এতদিনের কর্ম্মনিষ্ঠা ও সততার এই তো পরিণতি! এই তো পুরস্কার! আর একবার গুরুদেবকে হাত ধরে অনুরোধ করে মধুসূদনের দিকে চেয়ে সুদীপ বলল, "মধুসূদন তুই বাবা একবার নন্দী কোম্পানীর ছোটবাবুকে খবর দিতে পারিস। ছোটবাবু তো বলরামেরও বন্ধু, দেখি ছোটবাবুকে দিয়ে বলরামকে বলে যদি কিছু কাজ হয়।" সুদীপের কথা শেষ হতে না হতেই মধুসূদন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এক্ষুনি নন্দীবাবুর বাড়ী হয়ে তাঁকে খবর দিয়ে ভবানীপুরে ফিরব।" 'ভবানীপুরে ফিরব' বলেই সুদীপের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েই তার পায়ের কাছে হাত দুটো নিয়ে গিয়ে সুদীপের পা স্পর্শ করে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল মধুসূদন এবং বলতে লাগল, "আর ভবানীপুরে ফিরতে মন চায় না মামা, আর ও-বাড়ীর অন্ন মুখে তুলতে ইচ্ছা করে না। যেখানে এত পাপ সেখানে এক মুহূর্ত্তও থাকতে আমার মন চায় না, আজ এই গুরুদেব দাদুর সামনে আপনাকে কথা দিয়ে গেলাম। আপনি দোকান থেকে যে-মুহূর্ত্তে বেরিয়ে আসবেন সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমিও আর ও-মুখো হব না।

মধুসূদনের কথা শুনে রুদ্ধকণ্ঠে সুদীপ বলল, "না না তা করিস না মধুসূদন, তোর অত্যন্ত অভাবের সংসার, চাকরী ছেড়ে তুই খাবি কি, থাকবি কোথায়? উত্তেজনার মাথায় এসব করিস না বাবা, মাথা ঠাণ্ডা কর, যা এখন নন্দীবাবুকে একটিবার খবর দিয়ে যা।"

এরপর মধুসূদন আর কথা না বাড়িয়ে কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে সুদীপ ও বিভূতিবাবু দু'জনের দিকে চোখ বুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মধুসূদন বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে বিভূতিবাবুও সুদীপের নিকট বিদায় নিলেন।

অসুস্থ শরীরে নানা চিন্তায় বিনিদ্র রাত্রি যাপনে ক্লান্ত সুদীপ ভোরের দিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ স্ত্রী লতা এসে বলল, "ওগো শুনছ, নন্দীবাবু এসেছেন, নীচে থেকে ডাকছেন তোমার নাম ধরে।" লতা বলতে-বলতেই নীচে সদর দরজার কাছে নন্দীবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "সুদীপ, সুদীপ।" সুদীপ লতাকে বলল, "যাও যাও নন্দীবাবুকে উপরে আসতে বল।" বাইরের লোকের কাছে বের হতে লতা সচরাচর অভ্যস্ত নয়, তাই দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই দোতলা থেকে সিঁড়ির নীচের ধাপ পর্য্যন্ত নেমে হাত জোড় করে নমস্কার করে নন্দীবাবুকে ধীর কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলল, "আপনি উপরে আসুন।" নন্দীবাবুও প্রতি-নমস্কার করে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসে লতাকে অনুসরণ করে সুদীপের ঘরে পৌঁছলেন। একেবারে খাটের কাছে এসে সুদীপের ডান হাতখানা আবেগের সঙ্গে ধরে নিজের বুকের উপর দু-হাত দিয়ে চেপে ধরলে হাত জোড় করে নমস্কার করতে না পেরে সুদীপ মুখে বলল, "ছোটবাবু আমার প্রণাম নিন।" এরপর সামান্য কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর্ব্ব চলা অবস্থায় লতা একখানা চেয়ার নন্দীবাবুর দিকে এগিয়ে দিল। নন্দীবাবু তাতে উপবেশন করলেন। নন্দীবাবু বসার পর লতা একটা য়্যালুমিনিয়ামের মগে করে এক মগ গরম জল এনে সুদীপকে দিলে সুদীপ আধশোয়া অবস্থায় মুখহাত ধুয়ে ময়লাজল লতার হাতে ধরা একখানা এনামেল-করা গামলায় ফেলে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখহাত মুছে আবার নন্দীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে লতা নন্দীবাবু ও সুদীপের জন্য দু' কাপ চা ও দুটি প্লেটে খানকয়েক বিস্কুট এনে হাতে-হাতে ধরিয়ে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে সুদীপই বলরামের সমস্ত ব্যবহারের কথা নন্দীবাবুকে বিবৃত করল। নন্দীবাবু সব শুনে শেষে গম্ভীর মুখে শুধু মন্তব্য করলেন, "আহাম্মক"। নন্দীবাবু অনেকক্ষণ ধরেই সুদীপকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করছিলেন হাতমুখ ধোবার সময় এবং প্রত্যেকবার

নড়াচড়ার সময় সুদীপের চোখেমুখে এক করুণ যন্ত্রণাক্ত ভাব ফুটে উঠছিল। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে সুদীপের হাত তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে তার হাতের উপর নিজের হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন এবং সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে একবার প্রশ্ন করলেন, "সুদীপ, তোমার খুব কষ্ট, না ?" সুদীপ উপেন্দ্রবাবুর এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারল না, শুধু তাঁর কথার গভীর মর্ম্মার্থটুকু উপলব্ধি করে তাঁর মুখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আরও কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর নন্দীবাবু তাঁর হাতের তালুতে সুদীপের ডান হাতের তালুটা তুলে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে তাকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা সুদীপ, তুমি তো আমার ছোট ভাইয়ের মত, আজ যদি একটা কথা বলি বা একটা কিছু তোমায় দিতে চাই সে-কথা তুমি রাখবে তো বা সে জিনিষ তুমি নেবে তো ?" আজ এতদিন পরে নন্দীবাবু অসুস্থ শয্যাগত সুদীপকে এ-ভাবে কথা বলছেন শুনে সুদীপ কেমন একটু বিচলিত বোধ করে। সে ভাল করে উদ্‌গ্রীব চিত্তে উপেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কথাটার অর্থ বুঝতে চায় কিন্তু পারে না। একবার সে ভাবে সে অসুস্থ বলে সবাই তাকে যেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছে, নানা রকম কথা বলে তাকে তৃপ্ত রাখতে চাইছে, উপেন্দ্রবাবুও হয়ত সেই রকমই একটা কিছু বলতে চাইছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সুদীপের মনে হয়, নাঃ এ-সুর তো শুধুমাত্র মৌখিক সান্ত্বনার সুর নয়, এ-সুরে যেন আন্তরিক সহর্ম্মিতার বীণাধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে। হঠাৎ তার মনে হয় নন্দীবাবুর কণ্ঠের মধ্য থেকে যেন কোন দেবদূত দৈববাণী উচ্চারণ করতে উৎসুক। সফল-তাপস, মুনি-ঋষিগণ যেমন অবিচলিত চিত্তে দৈববাণী শ্রবণে উৎসুক থাকেন সুদীপ যেন সেই রকম ব্যগ্র ও উৎসুক চিত্তে নন্দীবাবুর দিকে চেয়ে জবাব দেয়, "আপনি বলুন ছোটবাবু, কিন্তু করার কিছু নাই, আপনার কাছ থেকে হাত পেতে ভিক্ষা নিতে আমার কোন দিনই কোন লজ্জা নাই, আপনি খুলে বলুন কি বলতে চান।" সুদীপের কথায় নন্দীবাবুর আগ্রহটা বেড়ে যায়, কিন্তু অসুস্থ শয্যাগত দেহে সুদীপ পাছে ভেবে বসে যে নন্দীবাবু দয়া করছেন তাই আবার তিনি বললেন, "আগে তুমি কথা দাও, আমি যা দিতে চাই সেটা নেবে এবং আমার দেওয়ার পর্ব্ব সমাধা না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা কাউকে বলবে না।" সুদীপ নন্দীবাবুর হস্ত স্পর্শ করেই বলল, "আপনি গুরুজন, এই আপনার অঙ্গ স্পর্শ করে বলছি কাউকে বলব না।" সুদীপের এই কথা দেওয়ার পর নন্দীবাবু ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করলেন! তিনি প্রথমেই বললেন, "জান তো দাদার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এখন নন্দী কোম্পানীর সম্পূর্ণ মালিক আমি। তোমাকে অনুরোধ—তুমি আমার নন্দী কোম্পানীতে পার্টনারশিপ নাও।" এতক্ষণ যাই-ই ভেবে থাকুক, এ-প্রস্তাবের

কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই সুদীপ অতিমাত্রায় চমকে উঠে প্রতিপ্রশ্ন করল, "কি বলছেন আপনি?" এবার নন্দীবাবুর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য, তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সুদীপ, আমি ঠিকই বলছি, অযোগ্য কতকগুলো মানুষের হাতে পড়ে আমার নন্দী কোম্পানী গত কয়েক বছরে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঐ ভাঙা তরণীর হাল তোমার মত যোগ্য মাঝির হাতে না পড়লে তার ভরাডুবি হবে, তাই আমি নন্দী কোম্পানীর অর্দ্ধেক অংশ তোমার হাতে অর্পণ করতে চাই।"

নন্দীবাবু সামান্য থেমে আবার বলতে লাগলেন, "তা ছাড়া আহাম্মকটা প্রায় প্রত্যেক দিনই টেলিফোন করে। সে যে ভিতরে-ভিতরে তোমার সর্ব্বনাশ করে চলেছে তার খবর আবার নিজে থেকেই আমায় ব্যাখ্যান করে বলে।" এর পরই বেশ একটু উত্তেজিত স্বরেই নন্দীবাবু বলে ওঠেন, "জান সুদীপ, ওটা কত বড় অমানুষ? তোমার অসুস্থতা নিয়েও ওটা হাসিতামাসা করে। আরে বাবা যার জোরে এত করলি সে যেই একটু বেকায়দায় পড়েছে অমনি তার সব সুযোগ নিতে হবে? এই কি বন্ধুর কর্ত্তব্য? এই কি মনুষ্যত্ব? ঈশ্বর কি মারা গেছেন? চন্দ্রসূর্য্য কি আজও উঠছে না? জান সুদীপ, আমি ঐ আহম্মকটাকে দেখিয়ে দিতে চাই যে, মানুষ আজও আছে, চন্দ্রসূর্য্য আজও আকাশে ওঠে, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বলে জিনিষ পৃথিবী থেকে আজও বিদায় নেয় নি। শোন সুদীপ, তোমাকে আমার দোকানের অর্দ্ধেক অংশের মালিকানা নিতেই হবে। কোন কিন্তু করলে চলবে না।" উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো একসঙ্গে বলে উপেন্দ্রবাবু এবার থামলেন। সুদীপ তার দু-হাত জোড়া করে উপেন্দ্রবাবুর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকাল এবং ধীরে ধীরে বলল, "আপনার অসীম দয়া ছোটবাবু, কিন্তু নন্দী কোম্পানীর অর্দ্ধেক অংশ খরিদ করবার মত পয়সা যে আমার নিকট নাই।" এ-কথার জবাবে নন্দীবাবু বললেন, "তার জন্য তোমার চিন্তা নেই, ও যে-ভাবে হোক হয়ে যাবেই, তুমি কেবল প্রস্তাবটা মনে রেখো এবং পাঁচ কান করো না।" এই বলে নন্দীবাবু কয়েক মিনিটের মধ্যে বিদায় নিলেন।

নন্দীবাবু চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে কাঁধে একখানি গামছা ফেলে হাতে একটি পিতলের কমণ্ডলু নিয়ে ভোলানাথ এসে সুদীপের ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই সুদীপ বুঝল যে, ভোলানাথ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে নূতন বাসা থেকে প্রসন্ন ঠাকুরের ঘাটে। বি. কে. পাল এভিনিউ থেকে গঙ্গাস্নানে যাবার আগে প্রত্যহ সকালে একবার করে সুদীপদার কাছে না এলে ভোলানাথের সারাদিনটাই যেন বৃথা যায়। তাই সে প্রত্যহ সকালে স্নানের পূর্ব্বে নিয়মিতভাবে ঘণ্টাখানেকের জন্য সুদীপের কাছে এসে বসে, নানা আলাপ-আলোচনা করে এবং তার শরীর

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়। সেদিন সকালে নন্দীবাবু চলে গেলে পর ভোলানাথ ঘরে ঢুকতেই সুদীপের হঠাৎ যেন মনে হল যদিও নন্দীবাবু বার-বার নিষেধ করেছেন, তবুও এই ভোলানাথকে যেন সব কিছু খুলে বলা যায়। ঠিক ঐ মুহূর্তে ভোলানাথকে শুধুমাত্র মাসতুতো ভাই-ই নয়, যেন তার অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলে মনে হল। তাকে পাশে ডেকে ধীরে-ধীরে সুদীপ নন্দীবাবুর প্রস্তাবটা খুলে বলতেই ভোলানাথ আনন্দে লাফিয়ে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ বলল, "তুমি রাজী হয়ে যাও দাদা। এক মুহূর্ত দেরী করো না, মানুষের মন, বলা যায় না, কখন কি মত বদলায়।" ভোলানাথ লাফিয়ে উঠে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ইতিবাচক মতামত দিলেও সুদীপ কিন্তু প্রায় নিস্পৃহই থাকে, উৎসাহের আতিশয্য সুদীপের কথাবার্তায় প্রকাশ পায় না দেখে ভোলানাথ সুদীপকে প্রশ্ন করল, "তুমি কি প্রস্তাবটায় রাজী হবে না ভাবছ? মনে হচ্ছে তোমার যেন খুব একটা আগ্রহ নেই।" এ-কথার জবাবে যা বলতে হবে তা বলতে যথেষ্ট সঙ্কোচ থাকায় কিছুটা কিন্তু-কিন্তু করেই সুদীপ বলল, "তুই তো সবই জানিস ভাই, আমার হাতে একটাও পয়সা নেই, অথচ এত বড় সুযোগ, কি করে যে কি করি?" সুদীপের এ-কথায় ভোলানাথ বলল, ঠিক আছে, যতটা পার তুমি ততটাই নাও, অর্দ্ধেকটাই নিতে হবে তার কি মানে আছে?" ভোলানাথকে বাধা দিয়ে এবার সুদীপ বলল, "সমান-সমান না হলে সমান সম্মান পাওয়া যায় না।" এ-কথার কি অর্থ তা বুঝে ভোলানাথ বলল, "তা হলে ভেবে দেখ কি করবে। আমি এখন যাই, আমার গঙ্গাস্নানে দেরী হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় না হয় আর একবার আসব।" এই বলে ভোলানাথ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ভোলানাথ চলে যাওয়ার পর সুদীপ বিছানায় পড়ে-পড়ে আপন মনে চিন্তা করতে থাকে কি ভাবে কি করা যায়, মনে মনে ভাবে এ-সময় হাজরা কোম্পানীর শেয়ারের দরুণ তার প্রাপ্য টাকা থেকে যদি অন্ততঃ হাজার পনর টাকা পাওয়া যেত তা হলে নন্দী কোম্পানীর অর্দ্ধেক অংশ কেনা যেত, কিন্তু বলরামকে সে ভালভাবেই জানে, তাই সে-আশা তাকে ত্যাগ করতেই হয়। কিন্তু বলরাম যদি হাজরা কোম্পানী থেকে তাকে হঠিয়েই দেয় আর এদিকে এ-সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে যায় তা হলে ভবিষ্যতে তার চলবেই বা কি করে? এত বড় সংসার, প্রদীপ-অধীপ তো কিছুই করছে না, বরং অধীপটা নানারকম নেশাভাঙ ধরেছে, বদ-বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে। অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে সুদীপের মাথাটা ভার হয়ে এল, সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল, তার আর্ত্তনাদ শুনে রান্নাঘর থেকে লতা দৌড়ে এসে তার মাথার কাছে দাঁড়াতেই সুদীপ বলল,

"লতা মাথাটা একটু টিপে দাও তো, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।" লতা কিছুক্ষণ সুদীপের মাথাটা ও রগগুলো টিপে দিতেই সুদীপ কিছুটা স্বস্তি বোধ করল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

সারাদিনের পর সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ ভোলানাথ এল এবং সুদীপকে বলল, "জান দাদা, একটা সুখবর আছে।" সুদীপ কোন কথা না বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই ভোলানাথ বলল, "আজ খবর পেলাম ডাঃ বি. সি. রায় অষ্ট্রীয়া থেকে ডাঃ ক্রাউজ নামে একজন নাম-করা অরথোপিডিক সার্জ্জনকে আনছেন এখানে লেকচার টুরে, শুধু লেকচারই নয়, উনি গোটা পঁচিশ অপারেশনও করবেন শুনছি। ভাবছি ডাঃ রায়কে ধরে তোমাকে পি. জি.-তে ভর্ত্তি করিয়ে একবার ডাঃ ক্রাউজকে দেখিয়ে নেব, তোমার আপত্তি নেই তো?" সুদীপ বলল, দেখ যদি পারিস তো য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে দেখিয়ে দে।" সুদীপের এ-কথার শেষে ভোলানাথ প্রশ্ন করল, "ওদিকের কি ঠিক করলে? নন্দীবাবুকে কি বলবে ভাবছ?" ভোলানাথের এ-প্রশ্নের জবাবে সুদীপ এ-বেলায় আর কিছু কিন্তু না রেখে সোজা-সুজি বলল, "ছাখ ভাই, আমার কাছে একেবারে কিছুই নাই, সব কুড়িয়ে-বাড়িয়ে হয়তো হাজার সাত-আট হবে, তাতে কি নন্দী কোম্পানীর অর্দ্ধেক অংশ হবে?" এ-কথায় ভোলানাথ বলল, "উপেন্দ্রবাবু কি বলেছেন? কত লাগবে কিছু বলেছেন?" সুদীপ বলল, "না, তা বলেন নি, তবে আমার আন্দাজ সাত-আট হাজার টাকায় নিশ্চয়ই অর্দ্ধেক অংশ হবে না।" সুদীপের কথাবার্ত্তা শুনে ভোলানাথের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল, সে বলল, "এক কাজ করলে হয় না দাদা? উপেন্দ্র-বাবু যদি তিন ভাগের এক ভাগ তোমায় দেন তা হলে নিতে পারবে তো?" সুদীপ বলল, "সবটাই তো নির্ভর করছে মোট মূল্যের উপর। উপেন্দ্রবাবু কতটা কি চান না জেনে কি করে আন্দাজে এ-সব বলি বল তো?" সুদীপের কথার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করে ভোলানাথ বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল সকালে আমি একবার উপেন্দ্রবাবুকে তোমার কাছে ধরে নিয়ে আসব, তুমি দেখ কথা বলে, উনি কি বলেন।" এরপর ভোলানাথ সুদীপের শরীর সম্পর্কে ও খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে সে-রাতের মত বিদায় নিল।

পরদিন সকালে ভোলানাথ নন্দীবাবুকে তার লালরঙের সানবিম্ ট্যালবট গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে একেবারে সুদীপের কাছে হাজির হল। অনেক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল যে, ছয় হাজার টাকায় এক তৃতীয়াংশ শেয়ার তিনি রেজিস্ট্রি করে দেবেন। কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় সুদীপ ভোলানাথকে একবার ঘরের বাইরে যেতে বললে ভোলানাথ মাঝের ঘরে চলে গেল। সুদীপ

নন্দীবাবুকে বলল, "আর একটা অনুরোধ আমার রাখবেন কি ?" সুদীপ বেশ কিন্তু-কিন্তু করেই বলল, "যদিও এ-কথা আমার তোলাই উচিত নয়, তবুও আপনাকে আমার অনুরোধ। সুদীপের এই কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখে উপেন্দ্রবাবু বেশ দরাজ গলাতেই বললেন, "আরে বাবা এই শর্ম্মা তোমার জন্য সব করতে পারে, তুমি বলেই দেখ না।" সুদীপ জানে উপেন্দ্রবাবু দিলদরিয়া ধরনের উচ্চ মনের মানুষ, অর্থের চেয়ে কথার মূল্য, বিত্তের চেয়ে চিত্তের মূল্য তাঁর নিকট অনেক বেশী, তাই সে ভয়ে-ভয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নন্দীবাবুকে বলল, "বলছিলাম কি, আমার তো এই শরীরের অবস্থা, কবে আছি কবে নাই তার ঠিক নাই। ভাল হয়ে কোনদিন দোকানে বেরুতে পারব কিনা তারও ঠিক নাই, তাই বলছিলাম কি"—সুদীপের এত ভণিতা দেখে নন্দীবাবু অধীর হয়ে বলে ওঠেন, "ওঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না, আরে বাবা খুলেই বল না কি বলতে চাও।" সুদীপ এতক্ষণে বলল, "বলছিলাম আর একজন এফিসিয়েণ্ট পার্টনার নিলে কেমন হয়।" এ-কথায় উপেন্দ্রবাবু প্রথমটা যেন থতমত খেয়ে যান, তারপর স্বগতোক্তির মত করে খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন, "আবার পার্টনার ?" সুদীপ বলল, "না, না, আপনার আপত্তি থাকলে আমি নিতে বলছি না, বলছিলাম, আমি তো রোগশয্যায়, আর আপনি বছরের মধ্যে তো সাত-আট মাস বেনারসে-গিরিডিতে থাকেন। একজন কেউ যোগ্য লোক না থাকলে দোকানটা দেখাশুনা কে করবে ?" সুদীপের কথাটা এতক্ষণে বুঝতে পেরে তিনি বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, দোকানে একজন কেউ বারমাস না বসলে তো দোকান চালানো দায় হবে, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার পছন্দ মতো আর একজন পার্টনার ঠিক কর, আমি তাকেও এক তৃতীয়াংশ শেয়ার দেব।" এ-কথায় যৎপরোনাস্তি খুশী হয়ে সুদীপ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর নিকট ভোলানাথের নাম প্রস্তাব করলে প্রথমটায় উপেন্দ্রবাবু বেশ দ্বিধাগ্রস্ত সুরেই বললেন, "ভোলানাথ ? ভোলানাথ তোমার মেজভাই প্রদীপকে, তোমার মামাতো ভাই বিজয়কে পার্টনার-শিপ থেকে হটিয়ে দিল। আবার ভোলানাথকে আমার দোকানের পার্টনারশিপ দিতে বলছ ? কথাটা খুব ভেবে বলছ তো ?" নন্দীবাবুর কথার যৌক্তিকতাটুকু মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে সুদীপ আবার বলল, "সে দায়িত্ব আমার, ওর জন্য আপনি ভাববেন না, ভোলানাথ যদি কোন গোলমাল করে তাহলে আমার অংশ আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে আপনাকে মেজর শেয়ারের মালিক করে দেব যাতে ও কোন ক্ষতি করতে না পারে। কি আমার উপর আপনার বিশ্বাস আছে তো ?" সুদীপের শেষের কথার জবাবে উপেন্দ্রবাবু যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন, "কি ? কি বললে, তোমার উপর বিশ্বাস ? তোমার উপর শুধু বিশ্বাসই নয়, তোমার

উপর আমার অগাধ বিশ্বাস, যে-বিশ্বাস আকাশের মত অচঞ্চল সাগরের মত গভীর ; আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই হবে।"

উপেন্দ্রবাবুর শেষের কটি কথায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে সুদীপ শয্যা থেকেই "ভোলানাথ, ভোলানাথ" বলে চিৎকার করে তাকে ডাকল। দাদার ডাক শুনে ভোলানাথ তাড়াতাড়ি এ-ঘরে এলে সুদীপ তাকে সব খুলে বলল। ভোলানাথ তখন তাড়াতাড়ি উঠে উপেন্দ্রবাবু ও দাদা সুদীপকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল এবং তখনকার মত উপেন্দ্রবাবুকে নিয়ে গাড়ী করে তাঁর বাড়ীতে পৌছে দিতে গেল।

দিন কয়েকের মধ্যেই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত কথামত নন্দী এণ্ড কোম্পানীর কাঠামো বদলে মালিকানা পরিবর্ত্তিত হয়ে তিন জনের নামে দলিল তৈরী হয়ে 'দত্ত, সেন এণ্ড কোম্পানী,' সলিসিটর্স মারফৎ রেজিষ্ট্রী হল। তিন জনের মধ্যে তুজনকে অর্থাৎ নবাগত পার্টনার সুদীপ ও ভোলানাথকে নিজেদের এক তৃতীয়াংশের মূল্য বাবদ ছয় হাজার করে মোট বার হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হ'ল। দোকানের অবশিষ্ট সামান্য মাল এবং ব্যাঙ্কের ঐ বার হাজার টাকা নিয়ে নূতন করে আবার নন্দী কোম্পানী শুরু হ'ল। কথা হল, আপাততঃ বেশ কিছুদিনের জন্য নন্দীবাবু নিজে বসবেন, তিনি বাইরে-টাইরে গেলে বসবে ভোলানাথ আর সুদীপের তরফে থাকবে তার ছোট ভাই অধীপ। মোটামুটি অধীপের বেতনও মাসিক একশ টাকা ঠিক হল।

এ-দিকের কাজ শেষ হতে না হতেই বাঘাসন থেকে সতীন্দ্রবাবু চিঠি লিখলেন, "কাছারী বাড়ীর দিকে আমাদের পুরাতন বাড়ীর নর্দ্দমা বন্ধ করে দিয়ে নিতাই জবরদস্তির সঙ্গে বলেছে—এদিকে নর্দ্দমা ছিল না, নর্দ্দমা ঘুরিয়ে নাও ইত্যাদি। ভালভাবে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে গ্রামস্থ পাঁচজনকে দিয়ে সালিশ করিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না, সম্ভবতঃ মামলা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই।" বাবার চিঠি পেয়ে সুদীপ সঙ্গে-সঙ্গে প্রদীপকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রয়োজন হলে মামলা করবার জন্য বাবাকে বলতে বলল। সুদীপের নির্দ্দেশমত কালনা কোর্টে মামলা দায়ের করা হলে শমন পেয়েই নিতাইয়ের তুই পুত্র সুনন্দ ও গদাধর গায়ের জোরে নর্দ্দমার মুখে মাটি ফেলে বন্ধ করে দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে পৌরুষ দেখাতে লাগল। বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় অসহায় হয়ে সুদীপ সব শুনে অধীপকে বলল, "তুই একবার বাড়ী যা, গিয়ে দেখ প্রদীপ আবার রাগারাগি করে যেন দাঙ্গা বাধিয়ে না বসে।" অধীপ এতদিন নীরবে সব শুনে যাচ্ছিল এবং রাগে তার সর্ব্বশরীর

ঝিঁ-ঝিঁ করছিল। দাদার নির্দ্দেশ পেয়ে শনিবারে আড়াইটায় তার দোকান বন্ধ হলে অধীপ বাঘাসন রওনা হ'ল। বাড়ী পৌছে দিদি কমলা ও বাবার মুখে সব শুনে অধীপ রাগে ফুলতে লাগল। ইতিমধ্যে আষাঢ়ের রাত্রিতে আকাশ কাল হয়ে মেঘ জমে প্রচণ্ড দাপটে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। ড্রেন বন্ধ, কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠোনে এক হাঁটু জল জমে গেল, অধীপ ও প্রদীপ দুই ভাই গরুর জল-তোলা ক্যানেস্তারা টিন দিয়ে জল ছেঁচে-ছেঁচে দক্ষিণের খিড়কীর পাড়ে ফেলতে লাগল। আকাশ হতে তখন অঝোর ধারায় বর্ষণ চলছে। ক্ষুদ্র দুই মানুষ বিরাট আকাশের পিছনের দেবতার সঙ্গে লড়াইয়ে পারবে কেন ? তাই একসময় ক্লান্ত হয়ে ভিজে কাপড়েই দু-ভাই নূতন দেড়তলা ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ল। বাড়ীর একটি মাত্র নর্দ্দমা, তাও বন্ধ, তাই হু-হু করে উঠোনের জল বেড়ে রান্নাঘরে ঢুকতে লাগল। এদিকে রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। দু'একটা বৃষ্টিভেজা কাক তখন এদিকে ওদিকে ডাকতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে একঝাঁক শালিখও ক্যাঁচরম্যাচর শুরু করেছে। আলো একটু ফুটতেই হঠাৎ অধীপ হাতে একটা কোদাল আর বাঁ-হাতে একগাছা পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে পশ্চিমের পাঁচিলটা টপকে ঝপ করে নিতাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। নিতাইয়ের বাড়ীতে তার দুই ছেলেই তখন জেগে উঠে ঘরের দাওয়ায় বসে আছে। ওভাবে অধীপকে তাদের বাড়ীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে তারা রে-রে করে তেড়ে এল। অধীপ কোন কথা না বলে ডান পায়ের নীচে মাটিতে লাঠিটা চেপে ধরে গায়ের জোরে কোদাল চালিয়ে ড্রেনের মুখে ডাঁই করা মাটিগুলো সরিয়ে দিতেই জল হু-হু করে ড্রেন দিয়ে কাছারি বাড়ী দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। ওদিকে সুনন্দ আর গদাধর দু-জনে তখন দু-গাছা লাঠি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে অধীপকে মারবে বলে। হৈ-হল্লা চ্যাচামেচি শুনে প্রদীপও একগাছা লাঠি বাগিয়ে ততক্ষণে নিতাইয়ের বাড়ীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু-পক্ষই মুখোমুখী, সুনন্দ ও গদাধরের আস্ফালন শুনে "শালারা মারবি ? আয় দেখি মা কত দুধ খাইয়েছে," বলে অধীপ কোদালটা উঁচিয়ে ধরে যেই তাদের দিকে ছুটে গেছে অমনি দুই ভাই লাঠি ফেলে মার দৌড়। তাদের দৌড় দেখে ঐখানে দাঁড়িয়েই অধীপ বলে উঠল, "এই শালারা, শুনে যা, এই ড্রেন আজ খুলে দিয়ে গেলাম, মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন ড্রেনের মুখে মাটি না পড়ে। যদি মাটি দিয়ে আবার ড্রেন বন্ধ করিস তো তোদের রক্তমাংস সব এক জায়গায় করব, বুঝলি।" এই বলে কোদাল হাতে করেই অধীপ ঐখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল এবং উঠোনের জলটা পুরো নেমে যাওয়ার পর সে আবার পাঁচিল টপকে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এল।

পরদিন সোমবার অধীপ কলকাতা যাওয়ার জন্য তৈরী হতেই সতীন্দ্রবাবু তার হাতে একটা হাত-চিঠি দিয়ে সেটা সুদীপকে দিতে বললেন। অধীপ চিঠিটা তার হাফ সার্টের পকেটে পুরে যাত্রা করল। কলকাতায় পৌঁছে বাসায় না গিয়ে অধীপ একেবারে দোকানে এল এবং সারাদিন কাজকর্মের পর সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে চিঠিখানা সুদীপের হাতে দিতেই সেটা পড়ে সুদীপ গুরুদেব অর্থাৎ বিভূতি-বাবুকে ডেকে আনতে বলল। পুনরায় বড়বাজারে গিয়ে অধীপ একটা রিক্সা ভাড়া করে বিভূতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এল। বিভূতিবাবু এলে সুদীপ বাবার লেখা পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে অনুরোধ করে বলল, "গুরুদেব, যা হোক করে আপনি বলরামের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিন। দেখছেন তো বাবা চিঠিতে লিখেছেন, মামা খবর দিয়েছেন বর্দ্ধমানে ছয় কাঠা জায়গার উপর দোতলা বাড়ী, মাত্র পনর হাজার টাকা দাম। বলরামের নিকট টাকাটা পেলে এ-সময় কত সুবিধা হ'ত, শুধুমাত্র কাছে টাকা না থাকার জন্য এ সুযোগ হয়ত হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।" বিভূতিবাবু মিনিটখানেক গম্ভীর মুখে কি যেন চিন্তা করে বললেন, "তুমি লোক পাঠিয়ে বাড়ী দেখে সব পাকাপাকি কর, টাকার যোগাড় হয়ে যাবে।" গুরুদেবের এ-কথার মর্ম্মার্থ না বুঝতে পেরে সুদীপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে তিনি বললেন, "আজই দুপুরে বলরামের সঙ্গে কথা বলেছি, ও বলেছে দু-তিন দিনের মধ্যেই হাজার বিশেক টাকা দেবে এবং মাস দুয়েকের মধ্যে আরও বিশ হাজার। তারপরে তোমায় দোকান ছেড়ে দিতে হবে।"

সুদীপ গুরুদেবের কথায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ক্ষোভজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল, "মাত্র চল্লিশ হাজার দেবে আমার অংশের জন্য? ঠিক মত হিসাব করলে যত কমই হোক আমি অন্ততঃ লাখ দুয়েক টাকা তো পাবই।" সুদীপের কথায় সায় দিয়ে গুরুদেব বললেন, "হিসাব আমি দেখেছি, হিসাব মত এক লাখ পয়ষট্টি হাজার টাকা পাও, কিন্তু বলরাম বলছে, "এর বেশী আমি এক পয়সাও দিতে পারব না, তাতে যদি সুদীপের না পোষায় তো সে যেন মামলা করে টাকা আদায় করে নেয়।" সুদীপ এ-কথায় উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, "কেন, গায়ের জোরে নাকি? দরকার হয় মামলাই করব, দেখি ও কত বেইমান হয়েছে!" সুদীপের উত্তেজনা দেখে বিভূতিবাবু তার হাতে ধরে তাকে নিরস্ত করে বললেন, "তুমি উত্তেজিত হয়ো না সুদীপ, যত লোকসানই হোক তুমি ঐ প্রস্তাবই মেনে নাও। আমি বলছি তোমার মঙ্গল হবে। তোমার ছেলে অনির্ব্বাণ খুব উন্নতি করবে; তা ছাড়া মেনে না নিয়ে মামলা করলেও কিছু তো দেবেই না, বরং উল্টো ফল হবে। তুমি সব দিক দিয়েই বঞ্চিত হবে। কারণ

তুমি তো জানই ফাঁকি দেবার জন্যই দোকান থেকে মাল সরিয়ে স্টক কমিয়ে ও থানায় ডাইরী করেই রেখেছে চুরি হয়ে গিয়েছে বলে। এখন বোঝা যাচ্ছে বলরাম বড় নোংরা মানুষ। আমার শিষ্য হয়ে ও আমারই আর এক শিষ্য অসহায় তোমাকে এভাবে বঞ্চিত করে পথে বসাবে এ-কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। যাই হোক, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি এই অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠে প্রচুর রোজগার করবে আর চোখের সামনে দেখবে বলরামের এই লালসায়, এই লোভে, তোমাকে এভাবে বঞ্চনা করার পরিণতিতে তার হাজরা এণ্ড কোম্পানী তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে।" ক্রোধান্বিত কণ্ঠ হতে নিঃসৃত গুরুদেবের কথাগুলো যেন বলরামের প্রতি অভিশাপের মতই শোনায়, তাই সুদীপ তাঁর হাত দুটো ধরে অনুনয় করে বলে, "না, না, গুরুদেব, আপনি এভাবে বলরামকে অভিশাপ দেবেন না, আমার যা হয়েছে তা তো হয়েইছে, আপনি আর ওকে ওভাবে বলবেন না।" সুদীপের অনুনয়েও গুরুদেবের ক্রোধ কিঞ্চিৎ-মাত্রও কমে না। তিনি বলতে থাকেন, "অর্থ মানুষের সকল অনর্থের মূল, অর্থের প্রাচুর্য্যে মানুষ লঘু-গুরু, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-কন্যা সব ভুলে যায়, শুধু নিজেকে ও দোসর হিসাবে অর্থকে চিনতে পারে, তা ছাড়া সব……" বলেই তিনি আরও উত্তেজিত স্বরে বলতে থাকেন, "জান সুদীপ, তুমি দোকানে অনুপস্থিত থাকা কালে এই কটা মাস বলরাম প্রতিটি লোকের সঙ্গে কি যাচ্ছেতাই না ব্যবহার করে চলেছে, আমাকে গুরুদেব বলা দূরে থাক, খাতাবাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে, এত অহংকার, এত দর্প! অনেক অপরাধের শাস্তি, অনেক পাপচিন্তার শাস্তিই হয়ত কোন মানুষ অপর মানুষকে দিতে পারে না, কিন্তু উপরে একজন আছেন যাঁর তুলাদণ্ড সব সময়েই কাজ করে চলেছে। আমি আজ বলে যাচ্ছি তুমি দেখে নিও, দশ-বছরের মধ্যে ঐ হাজরা এণ্ড কোম্পানীর শুধু নামটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।"

সুদীপ কোনদিনই গুরুদেবকে এত উত্তেজিত হতে দেখে নি, আজ তাঁকে উত্তেজিত অবস্থায় এত কথা বলতে শুনে সে আপন মনেই বুঝতে পারে যে বলরাম কত নীচে নেমেছে, কত খারাপ ব্যবহার করলে বিভূতিবাবুর মত এমন একজন শান্ত-সমাহিত-সৌম্য-নির্লোভ ব্রাহ্মণসন্তান এতখানি ক্রোধান্বিত হতে পারেন, এত বেশী উত্তেজিত হতে পারেন। হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সুদীপ তাঁকে বলল, "ক্ষমা করুন গুরুদেব, আমি বলরামের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আপনি ক্ষমা করুন।" কিন্তু সুদীপের এ-কথায় বিভূতিবাবুর উত্তেজনা আদৌ কমল না, তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "ক্ষমা? কিসের ক্ষমা? কোন অপরাধবোধের জন্য? কার অপরাধবোধের জন্য

কাকে ক্ষমা? দিনের পর দিন যে অপরাধের পর অপরাধ, অন্যায়ের পর অন্যায়, ত্রুটির পর ত্রুটি ঘটিয়ে চলেছে তাকে ক্ষমা! বন্ধুর চরম বিপদের দিনে সুযোগ বুঝে যে বন্ধুর বুকে ছুরিকাঘাত করে চলেছে তাকে ক্ষমা? ক্ষমার আধার দয়াময় ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন, আমি সামান্য মানুষ, তাকে ক্ষমা করব কোন অধিকারে? কোন সহৃদয়তায়? আপন দুর্ব্যবহারের কদর্য্যতায় আজ সে আমার মত মানুষের ক্ষমা পাবার যোগ্যতা হারিয়েছে। ক্ষমা আমি তাকে করতে পারি না সুদীপ, আর শুধু ক্ষমা কেন, তোমাকে যেটুকু ও দেবে সেটুকু আদায় হয়ে গেলেই একটি মূহূর্ত্ত আর ওখানে নয়।" গুরুদেবের এ-কথায় সুদীপ আর্ত্তস্বরে বলে উঠল, "গুরুদেব!" বিভূতিবাবু বললেন, "হ্যা সুদীপ, এই আমার শেষ কথা, তুমি দেখে নিও এই বিভূতি বাঁড়ুয্যের কথাও যা, কাজও তাই।"

বিভূতিবাবুর এতক্ষণের কথাবার্ত্তায় সুদীপ বেশ বুঝতে পেরেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কটূক্তি করে, অসম্মান করে বিভিন্ন তিক্ততার সৃষ্টি করে বলরাম সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিটিকেও কতখানি উত্তেজিত করে তুলেছে। তাই আর ও-সব প্রসঙ্গে না গিয়ে ধীরে-ধীরে বলল, "আপনি শুনেছেন বোধ হয় আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এখন নন্দী এণ্ড কোম্পানীর পার্টনার।" সুদীপের এ-কথায় বিভূতিবাবুর উত্তেজনাপূর্ণ মুখের রঙ মুহূর্ত্তে বদলে গেল, তিনি মৃদু হেসে বললেন, "বাজারে শুনছিলাম বটে কিন্তু বিশ্বাস করি নি। কথাটা জিজ্ঞাসা করব-করব করেও ভুলে গেছি। খুব ভাল হয়েছে, আমি আবার তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি তুমি অনেক উন্নতি করবে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রতিনিয়ত তোমার মাথায় বর্ষিত হোক।" এই বলে বিভূতিবাবু উঠতে যাবেন এমন সময় সুদীপ "লতা, লতা," বলে লতাকে ডেকে বিভূতিবাবুর জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলল। বিভূতিবাবু আপত্তি করে বলে উঠলেন, "আগে ঐ হনুমানটার হাত থেকে তোমার টাকাটা উদ্ধার করে আনি, তারপর মিষ্টিমুখ করব।" এই বলে তিনি বিদায় নিলেন আর সুদীপ বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বলরামের দুর্বিনীত নির্লজ্জ ব্যবহারের কথা ভাবতে লাগল। শুধু এ-ইই নয়, সুদীপ এরই মধ্যে মউজীরামের কাছে আরও শুনেছে যে, সিন্দুকপটির উপরে তিনতলায় একখানা ছোট ঘর নিয়ে বলরাম প্রত্যেকদিন বিকালে বেশ জমজমাট সুরার আসর বসাচ্ছে এবং সেই আসরের দোসর পুঁটিরাম ছাড়া আরও অনেকেই জুটেছে। সুদীপ ভাবতে থাকে ঘটনা যদি সত্যি হয় তা হলে বলরামের অধঃপতন অনিবার্য্য, কারণ সুদীপের অনুপস্থিতিতে বলরাম কাউকেই আর পরোয়া করছে না। বলরামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে সুদীপের আন্তরিক কষ্ট হয়, কারণ ঐ বলরামই গত কয়েকটা বছর তার সকল

লাভলোকসানের সাথী ছিল, আর আজ! আজ মাত্র কয়েকটা মাসের ব্যবধানে বলরাম সুদীপকে ভুলে কত নীচে নেমে গেছে। সুদীপ মনে-মনেই একবার উচ্চারণ করে, "কি আশ্চর্য পরিবর্তন!"

পরদিন সকালে গঙ্গাস্নানে যাবার সময় ভোলানাথ এসে খবর দিল আজই বিকালে ডাঃ ক্রাউজ আসছেন সুদীপকে দেখতে, সুতরাং সুদীপ যেন বিকেল ঠিক চারটেয় রেডি থাকে, প্রয়োজন হলে আজই তাকে গাড়ী করে আবার এক্স-রে করতে নিয়ে যেতে হতে পারে। এ-খবরটা জানিয়ে যাবার সময় ভোলানাথ বলল—সে নিজেই বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ গিয়ে ডাঃ ক্রাউজকে নিয়ে আসবে। ভোলানাথ চলে গেলে সুদীপের চিন্তা হতে লাগল কে জানে ডাঃ ক্রাউজ আবার কি বলবেন, হয়ত আবার অপারেশন করতে বলবেন। বহু কিছু চিন্তা করতে-করতে সুদীপ বেশ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। লতা ঘরে ঢুকে সুদীপকে বিষণ্ণ দেখে তার পায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "তোমার এত চিন্তার কি আছে? ঠাকুরপো তো বলেই গেল পৃথিবীর মধ্যে একজন নাম-করা ডাক্তার উনি। যদি আবার অপারেশন করতে হয় তাই করবেন, এতে ভয়ের বা চিন্তার কি আছে? সারাজীবন এই দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে কান্নাকাটি করে কি লাভ বল? তার থেকে অপারেশন করে যদি রোগ ভাল হয়ে যায় তো আর একবার অপারেশন করাও ভাল।" লতার কথায় সুদীপ কিছুটা চাঙ্গা হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "তোমাদের জন্যই তো আমার ভাবনা, তুমি, অনির্বাণ, তোমার মেয়ে লিপি, তোমাদের জন্যই আমার যত ভাবনা, যত চিন্তা। একবার পার পেয়ে গেছি, এবার অপারেশন করতে গিয়ে যদি খারাপ কিছু একটা হয়ে যায় তো তোমরা দাঁড়াবে কোথায়? হাতে তো একটিও পয়সা নেই, আর বলরাম যে তাড়াতাড়ি কিছু দেবে তারও ভরসা পাচ্ছি না। ওদিকে নন্দী কোম্পানীতে নূতন পার্টনার হয়েছি, অধীপ ওখানে বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও সে কিছুই শেখে নি, এই অবস্থায় অপারেশন করতে গিয়ে কিছু হলে তোমাদের যে অকূলে ভাসতে হবে।"

সুদীপের চিন্তাগ্রস্ত রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে লতার মনে খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু মনের ভিতরে যাই-ই হোক, বাইরে কাঠিন্য এনে সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে লাগল, "আমাদের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, আমাদের যা হোক করে চলে যাবে। কিন্তু ডাক্তার যদি বলেন তো অপারেশন তোমাকে করাতেই হবে, না হলে সারাজীবন চোখের সামনে তোমার এই যন্ত্রণা আমি বসে-বসে কেমন করে দেখব বল?" জোরের সঙ্গে শুরু করলেও শেষের দিকের কথাগুলোয় লতার কান্না জড়িয়ে যায় এবং তার ফর্সা টক্‌টকে গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

লতার কান্না দেখে সুদীপ বলল, "তুমি কাঁদছ কেন? অত বড় সার্জ্জন আমায় দেখবেন, দেখো, আমি ঠিক ভাল হয়ে যাব, কেঁদো না, চোখ মোছ।" সুদীপ বললেও লতার কান্না তক্ষুণি থামে না, বেশ কিছুক্ষণ তার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। তার কান্না দেখে সুদীপ বুঝতে পারে লতাও অন্তরের গভীরে তাকে কত ভালবাসে এবং মুখে জোর দেখালেও বুকে সে কতই না দুর্ব্বল। সে আবার লতাকে বলে, "তুমি কেঁদো না, চুপ কর, তোমার কান্না দেখলে যে আমার কষ্ট হয় তা কি তুমি বুঝতে পার না?" এবারে লতা চুপ করে এবং সুদীপের জন্য স্নানের জল আনতে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সুদীপকে স্নান-করানো-খাওয়ানোর শেষে লতা সংসারের টুকিটাকি কাজে মন দেবে এমন সময় নীচে "সুদীপবাবু, সুদীপবাবু", হাঁক শুনে দোতলার বারান্দা থেকে সে উঁকি মেরে দেখে যে, বাড়ীওয়ালার ছেলে কালীচরণ মল্লিক ডাকাডাকি করছেন। লতা তাড়াতাড়ি সুদীপকে খবর দিয়ে বলল, "বাড়ীওয়ালা বোধ হয় বাড়ীভাড়া নিতে এসেছেন।" লতার কথায় সুদীপ অবাক, কারণ সে বরাবর সারা বছরের ভাড়া বছরের প্রথম মাসেই মিটিয়ে দেয়, তাই লতাকে সে বলল, "না, ভাড়া নিতে নিশ্চয়ই ভদ্রলোক আসেন নি এসেছেন বোধ হয় অন্য কাজে, তুমি ওঁকে উপরে আসতে বল।" লতার অনুরোধে কালীবাবু উপরে এসে সুদীপের নিকট বসে তার কাণে-কাণে বললেন, "ও-মশায় এবার তো এ-বাসা ছেড়ে আপনাকে অন্যত্র বাসা দেখতে হয়; আমার কাছে যে আজ সকালে নালিশ এসেছে আমি নাকি দোতলায় টি. বি. রোগী পুষছি।" মল্লিকমশায়ের কথায় সুদীপের মুখটা মুহূর্ত্তে কাল হয়ে গেল, তার মুখের অবস্থা দেখে মল্লিকমশায়ের আর সুদীপকে কষ্ট দিতে মন চাইল না, তাই তিনি খোলাখুলিই ব্যাপারটা বললেন, "আরে মশাই, আপনাদের নীচের তলার ভাড়াটে বিহারীবাবু হঠাৎ সকাল বেলায় আমার কাছে হাজির, বলেন কিনা দোতলার ভাড়াটের থাইসিস্ হয়েছে, সুতরাং আপনাকে এক্ষুনি না তাড়ালে তিনি হয় বাসা ছেড়ে দেবেন, নয় তো ভাড়া দেবেন না। তা আমিও জিতেন মল্লিকের বাচ্চা, আমি মশায়, সঙ্গে-সঙ্গে বলে দিয়েছি—তা যান না, কোন্ চুলোয় যাবেন যান, আমি তা হলে ঐ ভাড়াটেকেই নীচের তলাটাও ভাড়া দিয়ে দিই আর আপনাদেরও রোগ বালাইয়ের ভয় থাকে না। ভাড়া যেন কত একেবারে সময়ে দিচ্ছেন। ছ-মাস হয়ে গেলে তবে দু-মাসের ঠেকান। তা ছাড়া আপনাদের ভাড়ার টাকার ভরসায় জিতেন মল্লিকের ছেলে কালী মল্লিকের অন্ততঃ পেট চলে না। যান যান মশাই, আপনার মত ভদ্দর লোক অনেক দেখেছি। একটা মানুষ বিপদে পড়েছে, তার শয্যাশায়ী অবস্থা, আর আপনি কিনা এসেছেন তাকে

বাড়ী থেকে তাড়াবার জন্য দরবার করতে। লজ্জাও লাগে না আপনার ? জানেন মশায়, আমার এই কথা শুনে বুড়ো তো পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটে' পালিয়ে এলেন।" কথাগুলো বলেই কালীবাবু একটু থেমে সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে কাণের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে আবার বললেন, "কি মশাই ঠিক করেছি তো ?" সুদীপ তাঁর কথায় হাত দুটো জোড়া ক'রে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "সবই আপনার দয়া কালীবাবু, আমার বিপদের সময় আপনারা আশ্রয় না দিলে কোথায় যাব বলুন ?" কালীবাবু সুদীপের জোড়া-করা হাত দুটো ধরে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "আরে মশায়, ও দয়ামায়া ছাড়ুন। এখন এক পেয়ালা চা খাওয়াবার ব্যবস্থাট্যাবস্থা দেখুন তো, কৈ বৌদি, এক কাপ চা ক'রে আনুন দেখি, খেয়ে তবে আমি যাব।" লতা এতক্ষণ সুদীপের পায়ের দিকের খাটের বাজুটা দু-হাতে চেপে ধরে বিহারীবাবুর নিষ্ঠুরতার কথা শুনছিল, চায়ের কথায় তার যেন ধ্যানভঙ্গ হল, সে তাড়াতাড়ি চা করতে চলে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে চা এলে চা খেয়েই কালীবাবু উঠে পড়লেন এবং যাবার সময় আবার বলে গেলেন, "আপনি মশায় কিছু ভাববেন না, কুকুর-বেড়ালে অনেক কিছুই বলে, ও-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না আব আপনিও মাথা ঘামিয়ে মন খারাপ করবেন না।"

মল্লিকমশায় চলে যাওয়ার পর সুদীপ লতাকে কাছে ডেকে তার হাত দুটো ধরে বলতে লাগল, "লতা, মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয়, এত নির্দ্দয় ব্যবহারও করতে পারে ? ঈশ্বর যাদের মানুষের অবয়ব দিয়েছেন তাদের চরিত্রে এত জঘন্যতা আসে কোথা থেকে বলতে পার ?" বলতে-বলতে সুদীপের চোখে জল এসে পড়ে, এ-জল কিসের—মল্লিকমশায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, না, বিহারীবাবুর প্রতি ঘৃণায়-দুঃখে তা লতা বুঝে উঠতে পারে না, তাই সে ধীরে-ধীরে বলল, "কি আর করবে বল, এখন সবই মুখ বুজে আমাদের সহ্য করতে হবে, কারণ এ-দুঃখ তো তাঁরই দেওয়া, এ-কষ্ট তো আমাদের জীবনে বরাদ্দই ছিল। নাও আর দুঃখ না করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, বিকেলে আবার ডাঃ ক্রাউজ আসবেন," এই বলে একটা চাদর সুদীপের পিঠ পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে সে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

বিকেল বেলা ঠিক চারটে বেজে দশ মিনিটে ভোলানাথ ডাঃ ক্রাউজকে নিয়ে হাজির হ'ল। ডাঃ ক্রাউজ আগেকার সব রিপোর্ট দেখে পেসেণ্টকে বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় এক্স-রে করতে নির্দ্দেশ দিলেন। ডাঃ ক্রাউজকে পৌঁছে দিয়ে ভোলানাথ সুদীপকে নিয়ে এক্স-রে করাতে গেল। পরদিন

বিকেলে এক্স-রে প্লেটগুলো নিয়ে আবার ডাঃ ক্রাউজের সঙ্গে দেখা করল। ডাঃ ক্রাউজ প্লেটগুলো অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে মন্তব্য করলেন যে, তিনি ইমেডিয়েট্‌লি পেসেণ্টকে অপারেশন টেবিলে তুলতে চান এবং ভোলানাথের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন যে, তারা এবং পেসেণ্ট এতে রাজী আছে কিনা। ভোলানাথ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "হ্যাঁ, তাদের মত আছে।" এরপর ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী পরদিন সকালে সুদীপকে পি. জি. হাসপাতালে এনে ভর্ত্তি করা হল। অপারেশনের আগের সমস্ত ব্যবস্থাপত্র ঠিক করে নিয়ে দু-দিন পরে সকাল আটটার পর সুদীপকে ও. টি.তে নেওয়া হল। বেলা যখন প্রায় পৌনে বারটা তখনও ডাক্তার ও. টি. থেকে বের হচ্ছে না দেখে বাইরে অপেক্ষমান লতা, ভোলানাথ, প্রদীপ ও অধীপ সবার মুখ যখন চিন্তায় ভয়ে প্রায় কাল হয়ে উঠেছে ; ঠিক তখন ডাঃ ক্রাউজ অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে দরজার সামনেই লাউঞ্জে দণ্ডায়মান লতা ও ভোলানাথকে দেখে তাদের দিকে এগিয়ে এসে ভোলানাথের হাতটা ধরে যা বললেন তার অর্থ হল "আমি খুবই দুঃখিত মিষ্টার সামন্ত, অপারেশন খুবই ভাল হয়েছে, পেসেণ্ট তার রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তার পা'দুটো হয়তো ইনভ্যালিড হয়ে যেতে পারে। রেগুলার ম্যাসেজ করালে এবং বিছানায় শুয়ে শুয়েই পায়ের একটু ব্যায়াম করলে বছর কয়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পেসেণ্ট আবার নিজের পায়ে চলতে পারবে। তোমরা চিন্তা করো না, নাউ হি ইজ আউট অফ অল ডেঞ্জার।" কথাগুলো বলে ভোলানাথের কাঁধটা ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে লতার দিকে ঘুরে ডাঃ বললেন, "ইয়েস মাই চাইল্ড, আই ডু ফিল ফর ইউ, গড উইল বি ইওর গাইড, আই শ্যাল প্রে ফর ইউ", বলে উপরের দিকে মুখ তুলে বুকে হাতটা ঠেকিয়ে তিনি বললেন, 'আ মেন'। লতা সাহেবের ইংরাজী বুঝল না বটে, তবে এটুকু বুঝল যে, সাহেব তাকে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাচ্ছেন। সাহেব হাত তুলে সবাইকে একেবারে বিশুদ্ধ বাঙালী প্রথায় নমস্কার করে চলে গেলেন। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলায় বাচ্চা ছেলের মত আধো-আধো ভঙ্গীতে বাংলায় নমস্কার বলার ধরন দেখে অত দুঃখ ও চিন্তার মধ্যেও সকলের একবার হাসি পেল। ডাঃ ক্রাউজ চলে যাওয়ার পর সুদীপের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত সকলে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। সুদীপের জ্ঞান ফিরল সন্ধ্যা প্রায় ছটার সময়। ওয়ার্ডে ডিউটিরতা সিষ্টারকে প্রশ্ন করে ভোলানাথ জানতে পারল যে, এর মধ্যেই ডাক্তার তিনবার সুদীপকে দেখে গেছেন এবং ডিউটিরত অন্য ডাক্তারকেও পোষ্ট-অপারেটিভ পেসেণ্ট্‌ সুদীপের উপর বিশেষ নজর রাখতে বলেছেন। সিষ্টারের নিকট এ-কথা

শুনে ভোলানাথ মনে মনে ভাবল, কি দারুণ কর্ত্তব্যজ্ঞান! আমাদের দেশের প্রতিটি ডাক্তার যদি এ-রকম হতেন তা-হলে কত মানুষ অকালে প্রাণ না হারিয়ে এই পৃথিবীর আলোবাতাস বুক ভরে নিয়ে হেসেখেলে বেড়াত।

পরদিন ড়াঃ ক্রাউজ এসে সুদীপকে ভাল করে দেখলেন স্টাচের জায়গায় কোন সোকেজ আছে কিনা। সোকেজ নাই দেখে নিশ্চিন্ত হলেন এবং ভোলানাথকে ডেকে যা বললেন তার অর্থ হল—তোমাদের এখানে ভাল অরথোপিডিক সার্জ্জন যিনি আছেন তাঁকে একবার আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য বলতে পার কারণ আমি ত এখানে তোমাদের দেশে আর মাত্র পনর দিন আছি অর্থাৎ আজ হল চার তারিখ, আমার যাবার দিন হল উনিশ তারিখ। যাবার আগে আমি একবার এখানকার সার্জ্জেনকে সব বুঝিয়ে বলে দিয়ে যেতাম। ডাঃ ক্রাউজের কথা শুনে ভোলানাথ ভাবছে দেখে তিনি বললেন, "পেসেণ্টের আগের রিপোর্ট থেকে জানলাম ডাঃ চন্দ্র ওকে দেখছিলেন, তুমি ঐ ডাঃ চন্দ্রকে একটা কল দাও, আমি একবার কথা বলব। ডাঃ ক্রাউজের কথামত ভোলানাথ ফোনে ডাঃ চন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতেই তিনি আসতে পারবেন না বলে জবাব দিলেন। টেলিফোন ছেড়ে ডাঃ ক্রাউজকে সে-কথা বলতেই তিনি বললেন, "তুমি তাঁর টেলিফোন নাম্বারটা আমায় দাও, আমি দেখছি।" ডাঃ ক্রাউজ টেলিফোন করে দু'চার কথা বলতেই ডাঃ চন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন এবং পরদিন বেলা দশটা নাগাদ পি. জি. তে আসবেন বলে কথা দিলেন। পরদিন যথাকালে ডাঃ চন্দ্র এলেন। ডাঃ ক্রাউজ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পেসেণ্টের কেবিনে ঢুকলেন। পেসেণ্টের কেবিনে তখন লতা ও ভোলানাথ বসেছিল। ডাক্তারবাবুদের দেখে তারা শশব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। বেডের কাছে গিয়ে পেসেণ্ট দেখে ডাঃ চন্দ্রের মুখটা বিরক্তিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি কেমন নির্বিকার এবং গম্ভীর হয়ে গেলেন দেখে ডাঃ ক্রাউজ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "ইজ দেয়ার এনিথিং রঙ?" ডাঃ চন্দ্র সবে বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছেন, তাই তাঁর বিলাতী কায়দা খোদ বিলাতী ডাক্তারের থেকেও বেশী। সেজন্য ডাঃ ক্রাউজেরও কথার জবাবে তিনি অসহিষ্ণু ভাবে চটপট উত্তর দিলেন, "নো, নো, নাথিং রঙ, বাট হোয়াট হ্যাভ আই টু ডু ইন দিস কেস?" এ-কথার পর ডাঃ ক্রাউজ তাকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর পেসেণ্টের ট্রিটমেণ্ট কিভাবে চলবে, কি করতে হবে ইত্যাদি। এর পর দুই ডাক্তারই বের হয়ে গেলেন এবং ভোলানাথ ও লতা আবার সুদীপের কাছে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ চন্দ্র আবার ঐ কেবিনে ফিরে এসে পেসেণ্টের দিকে চেয়ে বেশ রুক্ষ কঠোর স্বরেই প্রশ্ন করলেন, "সাহেব ডাক্তার দিয়ে অপারেশন

করালেন কেন? আমি কি ঐ অপারেশন করতে পারতাম না? আপনাদের কি মনে হয় ডাঃ ক্রাউজ আমার চেয়েও বড় ডাক্তার? ডাঃ চন্দ্রের এ-কথায় ভোলানাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল, একজন বিলেতফেরত ডাক্তারের নিকট আর একজন বিশ্ববিখ্যাত সার্জ্জন সম্বন্ধে এ-ধরনের কটাক্ষ শুনে ঘৃণায় শরীরটা তখন রি-রি করে উঠল, তাছাড়া আরও কারণ ছিল, কারণটা হল গতকাল যখন টেলিফোন করা সত্ত্বেও ডাঃ চন্দ্র আসতে চান নি তখন ডাঃ ক্রাউজের মুখে সে শুনেছিল যে, ডাঃ চন্দ্র বিলাতে পড়বার সময় ঐ ডাঃ ক্রাউজেরই ছাত্র ছিলেন আর সেই জন্যই ডাঃ ক্রাউজের ফোন পেয়ে তিনি পি. জি.তে আসতে রাজী হয়েছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে গিয়ে মুহূর্তে ডাঃ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাটা অশ্রদ্ধায় পরিণত হল। আরও কিছুক্ষণ ধরে ডাঃ ক্রাউজ সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করে এবং রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনের যে কোন জ্ঞানগম্যি নাই আর বিলাতফেরত চিকিৎসক ডাঃ চন্দ্র শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রই নয় বচনশাস্ত্রেও যে বিশেষ পারদর্শী এ-কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে ডাঃ চন্দ্র সুদীপের কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় এ-কথাটাও বলতে ভুললেন না যে, সপ্তাহে যে তিন দিন তিনি রোগী দেখতে আসবেন সেই তিন দিন আগে থাকতেই তাঁর ফিস্এর টাকাটা যেন রেডি করে রাখা হয় এবং চাইবার আগেই তাঁকে যথাসময়ে দিয়ে দেওয়া হয়।''

ডাক্তার চন্দ্র চলে যাওয়ার পর ভোলানাথ ও লতা সুদীপের দিকে চাইতেই সুদীপ ভোলানাথকে বলে উঠল, "আমার মনে হয় ডাঃ চন্দ্র নিশ্চয়ই ডাঃ ক্রাউজের নিকট কোন ভাবে ঋণী, তাই ডাক্তার ক্রাউজের উপর এত আক্রোশ।" তার কথায় ভোলানাথ বলল, ''হ্যাঁ উনি ডাঃ ক্রাউজেরই ছাত্র ছিলেন।" সুদীপ বলল, "বুঝেছি, সেইজন্যই এত ঝাল, সেই যে রবিঠাকুরের কণিকায় একটা ছোট্ট কবিতা আছে, 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে / ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।' সুদীপের কথা শুনে ভোলানাথ ও লতা মৃদু হেসে বলল, ''তোমাকে অসুস্থ শরীরে আর ও-সব নিয়ে ভাবতে হবে না, তুমি বিশ্রাম নাও।"

দিন সাতেক পরে ডাঃ ক্রাউজ সুদীপের অপারেশনের জায়গার ষ্টিচ কেটে দিয়ে একটা চিরকুট সুদীপের হাতে দিয়ে যা বললেন তার অর্থ হল, "মিঃ দত্ত, এই কাগজটা তোমার নিকট রেখে দাও, এতে আমার ঠিকানা আছে। যদি কোন প্রয়োজন হয় তুমি নিজে আমায় চিঠি লিখে জানিও, আমি তোমায় চিঠি লিখে য়্যাডভাইস দেব," বলেই সুদীপের ডান হাতের তালুটা নিজের দক্ষিণ হাতে তুলে নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করার ভঙ্গী করে যা বললেন তার অর্থ এই যে, জীবনে তিনি বহু দেশে বহু পেসেন্টের ছোট-বড় বহু ধরনের অপারেশন করেছেন, কিন্তু এত

ধৈর্য্যশীল কষ্টসহিষ্ণু পেসেণ্টের সংস্পর্শে খুব কমই এসেছেন। এর পরে তিনি সুদীপের নিকট সেদিনের মত বিদায় নিয়ে গেলেন। আরও দিন চারেক বাদে সুদীপকে হাসপাতাল থেকে ডিস্‌চার্জ্জ করে দিয়ে তাকে বলে দিলেন, "দেখ, আমায় ভুলো না যেন, যখনই দরকার পড়বে তখনই চিঠি লিখো, আমি সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দেব। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে তোমার নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ী যাওয়াটা দেখে যেতে পারলাম না। এণ্ড আই য়্যাম সরি ফর দ্যাট মাই ফ্রেণ্ড, নাউ গুড বাই, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, গুড বাই।"

পিতৃতুল্য বিদেশী চিকিৎসক ডাঃ ক্রাউজের শেষের কথাগুলোর মধ্যে যেন আত্মীয় জনের বিদায়বেলার ব্যথাসিক্ত কণ্ঠধ্বনি ফুটে উঠল। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সুদীপের মুখটাও মলিন হয়ে উঠল। সেও কোন রকমে বলল, "প্লিজ ডু নট ফরগেট মি, ডক্টর, ডু নট ফরগেট মি।" এরপর সুদীপকে ওয়ার্ড থেকে দুজন ওয়ার্ড-বয় স্ট্রেচারে করে নীচে নামিয়ে ভোলানাথের সানবিম ট্যালবট গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার, তাই সুদীপ বাড়ীতে এসেছে শুনে সুদীপের বন্ধুবান্ধবরা সকলেই প্রায় সুদীপকে দেখতে এল, এল না একমাত্র বলরাম। বলরামের বাড়ীর কাছেই পি. জি. হাসপাতাল, কিন্তু ভুলেও সে একদিনও হাসপাতালে যায় নি, আজও এল না। সুদীপের মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত বাড়ীতে ফেরার পর বলরাম নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু আজও সে এল না। সুদীপের মনে যত আশা যেভাবেই থেকে থাকুক মনুষ্যচরিত্রের সৃষ্টিকারী এবং পরিবর্ত্তনকারী বিধাতা আড়ালে নিঃশব্দে তখন হাসছেন, কারণ সুদীপ না জানলেও তিনি জানতেন বলরাম এতদিনে পুরোপুরিই তার নিজের মানবিক সত্ত্বাটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছে, তাই বলরামের আসার প্রশ্নই ওঠে না, শুধু আজকের জন্যই নয়, ভবিষ্যতের অন্য কোন দিনের জন্যও বলরাম আর সুদীপকে দেখতে আসবে না। বলরাম এল না, কিন্তু আরও দিন দুই কেটে যাবার পর গুরুদেব মারফৎ হাজার বিশেক টাকা সুদীপ পেল এবং সঙ্গে একটা দলিল। দলিলখানি পড়ে সুদীপ বুঝল দোকানের তার অংশ বিক্রয়ের জন্য বলরাম উকিলকে দিয়ে এই দলিল প্রস্তুত করিয়ে তার নিকট পাঠিয়েছে। দলিলখানি সুদীপ যখন পড়ছিল বিভূতিবাবু তখন বললেন, "এই কুড়ি হাজার দিয়ে বলেছে—দলিলে সই করলে তবে বাকী কুড়ি হাজার দেব।" গুরুদেবের এ-কথায় সুদীপ কি যেন বলতে চায়, কিন্তু তার বলার আগেই বিভূতিবাবু বলে উঠলেন, টাকাটা আগেই দেবার জন্য আমি বলেছিলাম, কিন্তু বলরাম বলেছে, "আগে সই, পরে বাকী টাকা, সুতরাং আর কি বলব বল।" আর কথা না বাড়িয়ে সুদীপ দলিলে সই করে গুরুদেবের হাতে

ফেরত দিয়ে নীবব হয়ে রইল, কেবল একটা অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস তার বুকের গভীর থেকে ধীরে-ধীরে নিক্রান্ত হল। কিছুক্ষণ বসে বিভূতিবাবুও চলে গেলেন।

হাজরা কোম্পানীর দরুন প্রথম কুড়ি হাজার টাকা হাতে পেয়ে সুদীপ প্রদীপকে বর্দ্ধমানে পাঠিয়ে সেই বাড়ীটা কেনার জন্য মামার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল এবং যথাসময়েই বাড়ীটা রেজিষ্ট্রিও হয়ে গেল। বাড়ী খরিদ করা হলেও ভাড়াটেদের হাত হতে তার দখল পেতে বেশ বেগ পেতে হল। অবশেষে বর্দ্ধমান জজ কোর্টের খ্যাতনামা উকিল মোহন সেনের দৌলতে ও কর্মদক্ষতার গুনে সুদীপ বাড়ীটার দখলও পেল।

এদিকে সুদীপকে আরও মাস ছয়-সাত বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে বলে ডাক্তার নির্দ্দেশ দেওয়ায় উপেন্দ্রবাবুর যোগাযোগে তার বাসায় একটা টেলিফোনের এবং ভোলানাথের চেষ্টায় ইলেকট্রিক লাইনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই সুদীপ সারাদিন দোকানের খোঁজখবর নিতে লাগল এবং যথাযথ নির্দ্দেশ দিতে লাগল এবং তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী নন্দী কোম্পানী ধীর সচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল। চিকিৎসক-নির্দ্ধারিত ছয় মাস কেটে যাওয়ার পর একদিন সোমবার সুদীপ রিক্সায় করে দোকানে যাবে বলে স্থির করল। সেদিন সকাল ন-টায় খাওয়া-দাওয়ার পর নন্দী কোম্পানীরই কর্মচারী অজিত সুদীপকে পাঁজা-কোলা করে বাসার দোতলা থেকে নামিয়ে গলির মোড়ে রিক্সায় এনে তুলল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ দোকানে এসে পৌছল। এই ভাবেই নিজের শারীরিক অক্ষমতার উপর আধিপত্য খাটিয়ে মনের জোরকে সম্বল করে সুদীপ তার নূতন দোকান নন্দী কোম্পানীতে এসে হাজির হল।

সুদীপ যেদিন দোকানে গিয়ে পৌছল সেদিন হাজরা কোম্পানী থেকে বলরাম, পুঁটিরাম, ভববিলাস সবাই তাকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল যেন কি এক আশ্চর্য্যজনক বস্তুই না তারা দেখছে। ঠিক সামনাসামনি দোকান, তাই সুদীপের নজরে কিছুই এড়াল না। কাছে না এসে, কোন কুশলবার্ত্তা বিনিময় না করে নিজের দোকান থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার মধ্যে কতটা অমানবিকতা থাকতে পারে বা কতটা উপেক্ষা থাকতে পারে সেটা সুদীপ বুঝল। তাই তার মনে-মনে সে শপথ করল যত কষ্টই হোক নিত্য নিয়মিত ভাবেই সে দোকানে বের হবে। এরপর সমস্ত রকমের শারীরিক কষ্টকে উপেক্ষা করে সুদীপ নিয়মিত ভাবে দোকানে বের হতে লাগল। মাস কয়েক দোকানে বের হাওয়ার পর একদিন তাগাদা দিতেই গুরুদেব এলেন। গুরুদেবকে তখন বাকী টাকাটার কথা খেয়াল করিয়ে দিতেই তিনি বললেন, "আমিও তো শুধু ঐ-টুকুর জন্যই এখনও

হাজরা কোম্পানীতে পড়ে আছি। তোমার টাকাটা উদ্ধার হলেই আমিও কলকাতা ছেড়ে একেবারে বামরিয়া, এখানে আর একদিনও নয়।" সুদীপ এবার বেশ চড়া গলাতেই বলল, "গুরুদেব, দলিলের সর্ত্ত অনুযায়ী টাকাটা দলিলে সই হওয়ার তিন মাসের মধ্যে দেওয়ার কথা ছিল, আপনার ও-শিষ্য কি সেটা ভুলে গেছে? আপনি দয়া করে ওকে বলে দেবেন যদি সাত দিনের মধ্যে আমার টাকা না দেয় তো এবার আমি কোর্টে কেস ফাইল করে দোকান য়্যাটাচ করব।" বিভূতিবাবু সুদীপের এরকম কণ্ঠস্বর শুনতে মোটেই অভ্যস্ত নন, তাই তিনিও সুদীপের এই কথায় কেমন যেন থতমত খেয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে সামনের হাজরা কোম্পানীতে গিয়ে বলরামকে সব বললেন। সে জানে সুদীপ কিরকম জেদী এবং স্পষ্টবাদী, সুতরাং কেসের কথা শুনে বলরাম সামান্য চিন্তান্বিত হল, কিন্তু মুখে সে-ভাব প্রকাশিত হতে না দিয়ে সামান্য মন্তব্য করল, "ওঃ ভারী আমার কেস করনেওলা এসেছেন রে, নিজে তো ঠ্যাং নিয়ে নড়তে পারেন না, উনি আবার কেস করে টাকা আদায় করবেন।" বলরাম মুখে যাই-ই বলুক, মনে-মনে তার ভয় হ'ল, কারণ সে ভালই জানে সুদীপের মাসতুতো ভাই ও পার্টনার ভোলানাথ দারুণ করিৎকর্মা লোক। তার বহু উকিল, ব্যারিস্টার, পুলিশ অফিসার, এমন কি চিফ-মিনিস্টারের সঙ্গে পর্য্যন্ত জানাশোনা আছে। সুতরাং যদি একবার সুদীপের পক্ষে লাগে তাহলে বলরামের দোকান চালানোই মুস্কিল হবে, তাই এ-বিষয়ে আর বেশী কথা না বাড়িয়ে দিনপনরর মাথায় টাকাটা দিয়ে দিল। অর্থাৎ উনিশশো পঞ্চান্ন খৃষ্টাব্দে দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তির মাত্র পঞ্চাশ হাজারে রফা করল। সুদীপ নীরবে সবই মেনে নিল এবং টাকাটা ছেলে অনির্বাণের নামে একাউন্ট খুলে ব্যাঙ্কে রেখে দিল।

ওদিকে নিতাই দত্তর সঙ্গে নর্দমা নিয়ে মামলাটা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। বছর দেড়েক পরে দোকানে বসেই সুদীপ একদিন খবর পেল যে, মামলাতে তাদেরই জয় হয়েছে, তাই সে তাড়াতাড়ি অধীপকে বাড়ী পাঠাল সতীন্দ্রবাবুকে খবরটা দেবার জন্য। তিনি খবরটা শুনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত তো হলেনই, প্রাণ খুলে সুদীপকে আশীর্বাদও করলেন, কারণ এই মামলা চলাকালীন অবস্থায় নিতাইয়ের দুই ছেলে রাস্তা-ঘাটে তাঁকে দেখলেই কত কটূক্তিই না করেছে, এমন কি, তারা গ্রামে সুদীপের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ পর্য্যন্ত রটিয়েছে। সুদীপ এতদিনে সে-সবের উপযুক্ত জবাবই দিয়েছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুদীপের শারীরিক সব অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে তিনি অধীপকে বললেন, "আমার ইচ্ছা সুদীপ একবার বাড়ী আসুক, সকলকে ডেকে বলি, দ্যাখ আমার সেই সুদীপ আজ কত বড় হয়েছে।" আবেগের

সঙ্গে বলা বাবার কথাগুলো অধীপও মনে-মনে চিন্তা করে দেখল এবং ভাবল সত্যিই তো দাদার একবার বাড়ী আসা উচিত, কারণ দাদার অসুখ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা রটিয়েছে; সুতরাং দাদাকে একবার বাড়ী আনতেই হবে। দাদাকে নিশ্চয়ই বাড়ী নিয়ে আসবে বলে বাবাকে শান্ত করে অধীপ আবার পরদিন কলকাতা রওনা হ'ল। কলকাতায় পৌছে দাদাকে সব বলতেই সুদীপ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, বাড়ী যাব। বহুদিন, ওঃ কতদিন আমি বাঘাসন যাই নি। মনে হচ্ছে যেন কত যুগ আমি আমার গ্রামে যাই নি।" সুদীপের মত আছে জেনে ভোলানাথ মন্তেশ্বর পর্য্যন্ত যাবার জন্যে একটা ভাড়াগাড়ীর ব্যবস্থা করে দিল এবং শিউজীর য়্যাম্বেসাডার গাড়ী করে সুদীপ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বর্ষার এক সকালে বাঘাসনের পথে মন্তেশ্বরে এসে পৌছল। বাবা বাড়ী আসবেন জেনে আনন্দে দিশাহারা অনির্বাণ সেই ভোরবেলা থেকেই পাল্কী নিয়ে মন্তেশ্বরে পাকা রাস্তায় এসে উপস্থিত ছিল। বেলা প্রায় নটায় একটা ফিকে সবুজ রঙের মোটর গাড়ীতে চড়ে বাবা, মা, ছোট কাকা ও দোকানের আর একজন কর্মচারী এসে সেখানে থামতেই অনির্বাণ ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে পৌছল এবং সকলকে প্রণাম করল। সুদীপ অনির্বাণকে বুকে টেনে নিয়ে তার মস্তকে চুম্বন করল। এরপর সুদীপকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে সকলে হেঁটে বাঘাসনের দিকে রওনা হ'ল আর অনির্বাণ পাল্কীর একদিকের দরজা ধরে বেহারাদের পায়ের দ্রুত তালের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বর্ষায় ভেজা আলের উপর দিয়ে কখনও বা জমির পায়ের পাতা-ডোবা জলের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলতে লাগল। খড়ি নদীতে পাল্কী নৌকায় চড়িয়ে পার করা হ'ল এবং যথাসময়ে পাল্কী এসে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে প্রবেশ করল। পাল্কীতে সুদীপ যাচ্ছে শুনে গোটা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল সুদীপকে দেখবার জন্যে। কোথাও না দাঁড়িয়ে পাল্কী সোজাসুজি গিয়ে থামল বাবা বাঘেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে। সুদীপ পাল্কীতে বসেই ঘাড় নীচু করে বাবা বাঘেশ্বরকে প্রণাম করে মন্দিরপ্রাঙ্গণের সিক্ত মাটি খুঁটে নিয়ে নিজের কপালে ঠেকাল এবং অনির্বাণের কপালে ঠেকিয়ে দিল। বাঘেশ্বরতলায় ঐ বৃষ্টির মধ্যেও বহু লোক সুদীপকে দেখবার জন্যে ও তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র দেখে সুদীপ প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সেখানে বসে রইল। সুদীপ এসেছে শুনে এর মধ্যে সতীন্দ্রবাবু ও কমলা প্রায় দৌড়ে বাঘেশ্বরতলায় গিয়ে হাজির হয়ে দেখল লোকের ভিড়ে সুদীপের পাল্কী প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। গ্রামেরই মেয়ে কমলা, তাই লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে কোন রকমে ঠেলে-ঠুলে পাল্কীর কাছে গিয়ে দাদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। সতীন্দ্রবাবু পাল্কীর কাছ পর্য্যন্ত না পৌছতে পেরে দূরে

দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন দেখে ও সুদীপের প্রতি সতীন্দ্রবাবুর স্নেহের কথা ভেবে ভাই-পো প্রহ্লাদ তাড়াতাড়ি সকলকে সরিয়ে কাকাকে পাল্কীর কাছ পর্য্যন্ত যাবার জন্যে রাস্তা করে দিল। দীর্ঘ কয়েক মাসের ব্যবধানে বাঘেশ্বরতলায় পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন হল এবং সে মিলনের আনন্দাশ্রুর সাক্ষ্য রইল বহু গ্রামবাসী। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বোন কমলা, ভাই প্রদীপ ও ভ্রাতৃবধূদের যত্ন ও বাবার কল্যাণ-দৃষ্টির সীমায় মাত্র দিন সাতেক বন্দী থেকে সুদীপ আবার কলকাতায় এসে পৌছল।

এদিকে দেখতে-দেখতে বছর তিনেক কেটে গেল। সুদীপের ব্যবহার ভাল এবং তাঁর একেবারে সামনা-সামনি দোকান, তাই সুদীপ নন্দী কোম্পানীতে বের হওয়ার পর হাজরা কোম্পানীর যত খরিদ্দার সবই একে-একে নন্দী কোম্পানীতে এসে ভীড় করতে লাগল। ফলে হাজরা কোম্পানীর কর্ম্মসাগরের জোয়ারে ধীরে-ধীরে ভাঁটার টান পড়তে লাগল, আর নন্দী কোম্পানীর কাজকর্ম্ম শতগুণ বেড়ে গেল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, বেলা প্রায় একটা নাগাদ সুদীপ ব্যস্তভাবে খরিদ্দারদের সঙ্গে কথা বলছে এমন সময় একটা বেয়ারা গোছের লোক একটুকরা পিতলের জালের নমুনা নিয়ে সুদীপের হাতে দিতেই সুদীপ ভাল করে নমুনাটা দেখে সেই বেয়ারাটিকে প্রশ্ন করল, "আপ ন্যাশন্যাল স্টারচসে আয়ে হ্যায়?" সে বলল, "জী হাঁ, লেকিন আপ্‌কো কেইসে মালুম হুয়া?" তার এ-প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সুদীপ তাকে প্রতিপ্রশ্ন করল, "ছোটাবাবু ক্যায়সা হ্যায়? উনকা তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় তো?" লোকটি আবার অবাক হয়ে সুদীপের দিকে চেয়ে, "জী আচ্ছা হ্যায়," বলে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে লোকটিকে অফিসের ফোন নম্বর জিজ্ঞাসা করে ফোন ঘোরাতেই ও-পাশ থেকে সেই পরিচিত ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। এ-স্বর সুদীপের অতি-পরিচিত তাই ছোটবাবুই ফোন ধরেছেন বুঝে সুদীপ বলল, "নমস্তে ছোটা-বাবু, বলিয়ে আপ ক্যায়সা হ্যায়?" সুদীপের স্বরটাও ছোটবাবুর নিকট পরিচিতই ঠেকে, কিন্তু তিনি তবুও কিন্তু-কিন্তু করে জবাব দেন, "মেরা তবিয়ৎ তো আচ্ছাই হ্যায়, লেকিন আপ······" এবার সুদীপ হিন্দী ছেড়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "আমি কে বুঝতে পারেন নি, এই তো? আচ্ছা, আমিই বলে দিচ্ছি। আমি সুদীপবাবু।" ছোটবাবু বিস্ময়ান্বিত হয়ে প্রশ্ন করেন "কোন সুদীপবাবু?" সুদীপ হাসতে-হাসতে বলল, "বছর দুয়েকের মধ্যে সব ভুলে গেলেন ছোটবাবু? আমি তার-জালিওয়ালা সুদীপবাবু।" তবুও ছোটবাবুর বিস্ময়ের ঘোর কাটল না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "ও হাজরা কোম্পানীর সুদীপবাবু?" এবার সুদীপ

বলল, "জী হ্যাঁ, এতক্ষণে ঠিক ধরেছেন।" সুদীপের এ-কথা শুনে ছোটবাবু বললেন, "লেকিন এ ক্যায়সে সম্ভব ভাই, হামকো তো বলরামবাবু বোলা করিব দেড় সাল আগে আপ কই বেমারীসে গুজর গিয়া। আপ সাচ বোলতা হ্যায় তো আপ সুদীপবাবু?" ছোটবাবুর এই কথা শুনে সুদীপ তো অবাক, কিন্তু তাঁকে এ-সম্বন্ধে কিছু না বলে, শুধু বলল, "ছোটবাবু, আমি হাজরা কোম্পানীর ঠিক সামনেই নন্দী কোম্পানীতে এখন রয়েছি, যদি দয়া করে আসেন তো একবার দেখা হয়, বহুদিন আপনাকে দেখি নি।" সুদীপের এই অনুরোধ শুনে ছোটবাবু "জরুর জরুর, ম্যায় আভি আ রাহা হ্যায়," বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

গিল্যাণ্ডার হাউস থেকে নন্দী কোম্পানী অর্থাৎ আট নম্বর নেতাজী সুভাষ রোড থেকে আটষট্টি নম্বর নেতাজী সুভাষ রোড সামান্য পথ, তাই টেলিফোন ছেড়ে ছোটবাবু অর্থাৎ প্রকাশচাঁদ জৈনের সুদীপের নিকট পৌছতে মাত্র মিনিট কয়েক সময় লাগল। তিনি নন্দী কোম্পানীতে ঢুকেই সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট সুদীপকে দেখে আনন্দে নীচু হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পাশে বসে অনেক গল্পগুজব করলেন। চা-সিগারেট খেয়ে পাঁচশ ফুট পঞ্চাশ মেস লাইট কোয়ালিটির পিতলের জালের অর্ডার দিয়ে বিদায় নিলেন। ছোটবাবু চলে যাবার পর সুদীপ একবার সামনা-সামনি বলরামের চেয়ারটার দিকে চেয়ে দেখল বলরাম মুখ নীচু করে কি যেন লিখছে। একবার সুদীপের মনে হল বলরামকে ডেকে বলে, "ওরে তুই যতই রটাস আমি মরে গেছি বলে, এই দেখ আমি মরি নি, আমি বেঁচে আছি, আর তোর সামনেই বসে আছি।" সুদীপ একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা পান মুখে দিয়ে ভাবতে লাগল একটা মানুষ কতখানি নীচ হতে পারে আর একটা মানুষ বোধ হয় তা কল্পনাতেও আনতে পারে না। এই ধরনের লোকের মনুষ্যদেহ নিয়ে মনুষ্যসমাজে না জন্মিয়ে অরণ্যের পশুদলের পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করাই বোধ হয় ভাল। এই সময় তার সেক্সপীয়ারের কয়েকটা লাইন মনে পড়ে যায়, "ব্লো ব্লো দাউ উইণ্টার উইণ্ড, দাউ আরট নট সো আনকাইণ্ড অ্যাজ ম্যানস ইন-গ্র্যাটিচিউড/দাই টুথ ইজ নট সো কিন, বিকজ দাউ আরট নট সিন, অল দো দাই ব্রেথ বি রুড।"

সুদীপ যখন বলরামের অকৃতজ্ঞতা অমানবিকতা ও অর্বাচীনতার কথা ভাবছিল ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাড়ীওয়ালা কালী মল্লিক এসে হাজির। কালী-বাবুকে দেখে সুদীপের তন্ময়তা কেটে গেল। সে তাড়াতাড়ি তাঁকে সানন্দ অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে অনুরোধ করল। কালীবাবু কিন্তু না বসে পরদিন সকাল নটা পর্য্যন্ত সুদীপ বাড়ীতে থাকবে কিনা জেনে নিয়ে চলে গেলেন। সুদীপ

জানে কালীবাবু ভীষণ খামখেয়ালী ও একগুঁয়ে। তিনি হঠাৎ দোকানে ধূমকেতুর মত উদয় হয়েই আবার অস্ত গেলেন কেন বুঝতে না পেরে সুদীপ কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় বাসা থেকে লতার ফোন এল। লতার মুখে শুনে সুদীপ বুঝল, কালীবাবু বাসায় গিয়ে সেখানে সুদীপকে না পেয়ে দোকান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছেন। যাই হোক, শান্তচিত্তেই দোকানের সব কাজকর্ম্ম সেরে সুদীপ সন্ধ্যায় বাসায় ফিরল।

পরদিন বেলা সাড়ে সাতটা নাগাদ কালীবাবু আবার বাসায় এসে হাজির। তিনি সুদীপের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "কি মশাই, হাজার ষাটেক টাকা আছে, ধার দিতে পারবেন?" সুদীপ তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে তিনি আবার বললেন, "কি মশায়, আছে, নাকি টি. বি. খাতে সব গলে গেছে?" বলেই তিনি হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তাঁর এই হাসি শুনে সুদীপের মেজাজটা ঈষৎ তিক্ত হয়ে উঠল, তাই সে মল্লিকমশায়কে বলল, "মল্লিকমশায় কি সকালবেলায় আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছেন?" কালীবাবু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব দিলেন, "আরে না মশায় না, ঠাট্টাতামাসা একেবারেই নয়। তা হলে শুনুন ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি, আমি এই বাড়ীটা বিক্রী করব। আপনার পাশের বাড়ীর লক্ষ্মী ঘোষ ষাট হাজার টাকা দাম দিয়েছে, আপনি যদি ঐ টাকা দিতে পারেন তো আপনাকেই আমি বাড়ীটা লেখাপড়া করে দেবো, পারবেন কি মাস তিনেকের মধ্যে হাজার ষাটেক টাকা যোগাড় করতে? শুনুন মশায়, আমি এই বাড়ী কোন মারোয়াড়ীর বাচ্চাকে বেচব না, আপনি যদি না নিতে পারেন তা হলে ঐ লক্ষ্মী ঘোষ মশায়কেই দেব। ভাল করে ভেবে দেখুন, যদি পারেন তাহলে দুর্গাপূজার পরেই রেজিষ্ট্রি করে দেব। কি পারবেন না টাকা যোগাড় করতে?" সুদীপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে আত্মগত ভাবেই উচ্চারণ করে—"ষাট হা...জা...র!" মল্লিকমশায় আবার ফিসফিস্ করে বললেন, "কেন মশায়, ষাট হাজার কি বেশী দাম হল নাকি?" আরে নিন-নিন, টাকার যোগাড় করুন, বাড়ীটা নিলে আপনার মত খোঁড়া লোকের পক্ষে ভালই হবে। কাছেই দোকান, সুতরাং কোনদিন কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া অন্য কেউ কিনলে কোন দিন কেসফেস করে আপনাকে উঠিয়ে দেবে। তখন এই পঙ্গু অবস্থায় যাবেন কোথায়? আর দোকানই বা চালাবেন কি করে?" সুদীপ এতক্ষণ শুধু টাকার কথাটাই ভাবছিল; অন্য কথা ভাবে নি, তাই কালীবাবু তার অক্ষমতার দিকটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেই সে ভাবল সত্যিই তো

অন্য লোকে কেউ কিনলে যে-কোনদিন উচ্ছেদের নোটিশ দিতে পারে। আর সত্যিই যদি দোকানের এত কাছের এই বাসা ছেড়ে দূরে অন্য কোথাও যেতে হয় তা হলে তার পক্ষে দোকানে গিয়ে কাজকর্ম চালানো তো খুবই মুস্কিল হবে, সুতরাং সুদীপ মল্লিকমশায়ের হাত দুটো ধরে তাঁকে অনুনয় করে বলল, "আপনি পঞ্চাশ করুন, তাহলে আমি এগোই!" মল্লিকমশায় এক কথার লোক, তাই বললেন "না মশাই, অত দরাদরি করলে চলবে না, আপনার খাতিরে এক হাজার টাকা কম করে আমি উনষাট করতে পারি।" যাই হোক, ঐ উনষাট হাজার দরেই বাড়ীটা ঠিক হয়ে গেল, কারণ সুদীপ বাড়ীটা কিনছে শুনে লক্ষ্মীবাবু আর দর দেন নি। লক্ষ্মীবাবু ও সুদীপের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কই ছিল, তাই লক্ষ্মীবাবুও মল্লিকমশায়কে বলে তাড়াতাড়ি রেজিষ্ট্রী করে দিতে বললেন। মাত্র চার মাস সময় হাতে নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নন্দী কোম্পানীর শেয়ারের টাকা তুলে ও লতার গহনা বন্ধক রেখে হাজার বাষট্টি টাকা যোগাড় করে সুদীপ বাড়ীটা কিনল। দলিল হল লতার নামে। বাড়ীটা যেদিন রেজিষ্ট্রী হল সেদিন অজিতকে সঙ্গে নিয়ে সুদীপ শিউজীর গাড়ী ভাড়া করে লতাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে মায়ের পূজা দিয়ে এল। ইতিমধ্যেই অনির্বাণ মালডাঙ্গা স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্সে ভর্ত্তি হয়েছে। সামনে তার পরীক্ষা। তাই সে ও ভোলানাথের ছেলে সুকান্ত প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়ছিল। বাড়ী ফিরে লতা তাদের পড়ার ঘরে ঢুকে কপালে পুষ্প ঠেকিয়ে প্রসাদ দিয়ে অনির্বাণকে বলল, "তোর বাবা এই বাড়ীটা কিনেছে, আজ রেজিষ্ট্রী হয়েছে, তাই কালীঘাটে পূজা দিয়ে এলাম।" মায়ের কথা শুনে অনির্বাণের ভীষণ আনন্দ হল এবং প্রসাদ খেতে খেতে দুই বন্ধুতে গল্প জুড়ে দিল। অধ্যাপক অমিয়বাবুকেও লতা প্রসাদ দিয়েছিল, তিনিও প্রসাদ খেতে খেতে ছাত্রদের আনন্দের অংশভাগী হলেন। পাশের ঘর থেকে সুদীপ তাদের গল্প শুনে অমিয়বাবুকে অনুরোধ করে সেদিনের মত তাদের ছুটি করিয়ে দিলেন।

বাড়ী রেজিষ্ট্রী হওয়ার দিনকয়েকের মধ্যেই বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটে কানাই ঘোষ, সত্যহরি ঘোষ, ও রামমোহন মুখার্জীমশায় দত্ত এণ্ড সেন, সলিসিটর্স মারফৎ নোটিশ পেয়ে সুদীপের সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। কিন্তু এল না একমাত্র নীচতলার বিহারীবাবু। নোটিশটা হাতে পেয়ে বিহারীবাবু ও তার মেয়ে প্রমদা উচ্চৈঃস্বরে নানা রকম কটূক্তি করতে লাগল এবং সে সমস্ত কটুকাটব্য ও অশালীন কথার কিছু কিছু সুদীপ ও লতার কানে এল, কিন্তু সুদীপ বা লতা কেউই তার প্রত্যুত্তর করল না, কারণ সুদীপ বুঝতে পারছিল যে, যে-বাড়ী থেকে

বিহারীবাবু যক্ষ্মা হয়েছে বলে তাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল আজ সুদীপ সেই বাড়ীরই মালিক, সুতরাং ব্যাপারটা ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালী সমাজের একজন অংশীদার অত্যন্ত জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিহারীবাবুর গায়ে ত লাগতেই পারে; তাই সে বিহারীবাবুর গালিগালাজ শুনে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আপন মনে একবার হেসে নিল। কিছুদিন পর হতে দেখা গেল সব ভাড়াটের কাছ হতে ভাড়ার টাকা কিন্তু যথারীতি সুদীপের হাতে আসছে অর্থাৎ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক সুদীপকে বাড়ীওয়ালা বলে বিহারীবাবুকেও মানতেই হচ্ছে।

নন্দী কোম্পানী বহু দিনের পুরাতন দোকান, সুতরাং বাজারে খুব একটা সুনাম না থাকলেও দুর্নাম ছিল না, ছিল একটা নাম। কিন্তু সুদীপের মত যোগ্য লোকের পরিচালনায় ঐ নন্দী কোম্পানী বছর পাঁচেকের মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করল এবং শুধু পশ্চিম বাংলাতেই নয়, পশ্চিম বঙ্গের বাইরে অনেক প্রদেশ থেকেও বহু এনকোয়ারী ও অর্ডারপত্র আসতে লাগল। রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থলে নন্দী কোম্পানীর একটি বড় গোডাউনও ছিল, তাই কাজকর্মের বিশেষ সুবিধাও ছিল। দেখতে-দেখতে সুদীপ আরও একখানি গোডাউন নিল এবং কাজকর্মের পরিধিও বেশ বর্দ্ধিত হল।

অনির্বাণ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়েছে এবং ভোলানাথের নির্দ্দেশ মত বর্দ্ধমানের শক্তিগড়ের নিকট সরকারী শিল্প বিভাগের জায়গা ভাড়া করে পি. এম. ইণ্ডাষ্ট্রীজ নামে কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বড়শুল চলে গেছে। পি. এম. ইণ্ডাষ্ট্রীজের চার পার্টনার—ভোলানাথ, শিবনাথ, অনির্বাণ ও ভোলানাথ-শিবনাথের ছোট ভগ্নীপতি নিরাপদ। প্রত্যেকে আট হাজার করে দিয়ে মোট বত্রিশ হাজার টাকা মূলধনে উনিশশো একষট্টি সালের শেষের দিকে মেসিনপত্র কিনে ঐ কারখানার পত্তন করল। পত্তনের সময় বহু আয়াসসাধ্য কাজও অনির্বাণ সমাধা করল এবং যথানির্দ্ধারিত দিনে কারখানার উদ্বোধন হল। কারখানায় কাঁটাতার ও বিভিন্ন ধরনের তারের দড়ি প্রস্তুত হতে লাগল। ইতিমধ্যে লাগল ভারতের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ, ফলে যেখানে যত কাঁটাতার প্রস্তুতকারী কারখানা ছিল তাদের প্রস্তুত পুরো কাঁটাতার বিশেষ নির্দ্দেশ-নামা বলে ভারত সরকার ক্রয় করতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টা কারখানা চলতে লাগল এবং সঙ্গে-সঙ্গে রাত্রিতে লরী বোঝাই করে কারখানায় প্রস্তুত মাল কলকাতায় চলে আসতে লাগল। অনির্বাণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে লাগল বটে, কিন্তু ভোলানাথের ভাই শিবনাথ প্রায় প্রথম থেকেই কারণে-অকারণে তার দুর্নাম করতে লাগল। মাসকয়েক কাটবার পর কারখানার নামে আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কণ্ট্রোল থেকে মোটা অঙ্কের আমদানী লাইসেন্স মঞ্জুর হ'ল।

ঐ লাইসেন্সে আমদানীকৃত মাল স্থানীয় বাজারে অন্ততঃ চারগুণ দামে বিক্রীত হয়ে প্রচুর আয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল, তা দেখে বৎসরান্তে যাতে অনির্বাণকে বিপুল পরিমাণ লাভের অংশ না দিতে হয় সেই উদ্দেশ্যে শিবনাথ তাকে তাড়াবার জন্য নানা অছিলা খুঁজতে লাগল। অবশেষে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে অনির্বাণকে কারখানা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করল। অনির্বাণ স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক চিত্ত, তাই নিজের মর্য্যাদা থাকতে-থাকতে পুনরায় কলকাতায় বাবার নিকট ফিরে এল।

কলকাতায় ফিরে বাবার উৎসাহে ও নিজের মনের জোরে অন্য একজন পার্টনার নিয়ে অনির্বাণ তার-জাল তৈয়ারীর একটি পুরাতন কারখানা কিনে তাকে ঠিকঠাক করে চালাতে লাগল। মাস কয়েকের মধ্যেই তার নূতন কারখানারও নাম বাজারে বেশ ছড়িয়ে পড়ল এবং ঐ নাম শেষ পর্য্যন্ত শিবনাথের কানেও পৌছল। এ জগতে কিছু মানুষ থাকে যারা কারোরই ভাল দেখতে পারে না, নিজের অর্থ-প্রতিপত্তি যথেষ্ট থাকলেও অপরের ক্ষতি করাই এদের কাজ এবং এই কাজ করেই এরা নিজেদিগকে সম্ভবতঃ চরিতার্থ মনে করে। শিবনাথও ঠিক এই ধরনের মানুষ। অনির্বাণ বড়শুল থেকে চলে এসে আবার কারখানা করেছে এবং ঐ কারখানারও আমদানী লাইসেন্স মঞ্জুর হয়েছে শুনে শিবনাথ ভিতরে-ভিতরে জ্বলে উঠল এবং একদিন টেলিফোনে সুদীপকে বলল, "পি. এম. ইণ্ডাষ্ট্রীজের পার্টনারশিপ থেকে অনির্বাণকে রিটায়ার করতে হবে এবং দু-একদিনের মধ্যেই কাগজপত্রে সই করে দিতে হবে।" সুদীপ বলল, "ঠিক আছে, হিসাবনিকাশ করে টাকাকড়ি দিয়ে দিলেই অনির্বাণ সই করে দিয়ে আসবে।" সুদীপের একথা শুনে শিবনাথ রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, "সম্পত্তিটা কি অনির্বাণের বাপের সম্পত্তি যে, তাকে হিসাব দেখাতে হবে? সিধে কথায় যদি সই করে পার্টনারশিপ ছেড়ে না দাও তা হলে আমিও নন্দী কোম্পানীতে তালা ঝোলাব।" এই বলে ঝড়াস করে টেলিফোনটা সুদীপের মুখের উপরেই ছেড়ে দিল। শিবনাথের এই আচম্বিত ব্যবহার কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও সুদীপ হতোদ্যম হল না, কারণ ঠিক এই ধরনের ব্যবহারই সে মাত্র কয়েক বছর আগে বলরামের নিকট পেয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সুদীপ বর্দ্ধমানে ভোলানাথকে ফোন করতেই তার তৃতীয়া স্ত্রী জবাব দিল, "একটা মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ভোলানাথ ডাঃ শৈলেন মুখার্জীর নার্সিং হোমে শয্যাশায়ী।" এক লহমায় সুদীপ ব্যাপারটা বুঝে নিল। সুদীপ বুঝল যে ভোলানাথের শয্যাশায়ী অবস্থা ও সেহেতু কলকাতায় তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিনা হিসাবে শিবনাথ অনির্বাণের পার্টনারশিপটুকু লিখিয়ে নিতে ও নিঝ্ঞ্ঝাট

হতে চায়, কারণ আর্থিক দিক দিয়ে স্বার্থপর হলেও ভোলানাথ থাকলে অনির্বাণকে একেবারে ফাঁকি দেওয়া যাবে না, সেজন্য তার অনুপস্থিতিতে অনির্বাণের অংশটুকু লিখিয়ে নেওয়ার জন্য এত তাড়াতাড়ি। কিন্তু তাড়াতাড়িটা যে আসলে কিসের জন্য তা এতদিনের অভিজ্ঞ ঘা-খাওয়া মানুষ সুদীপ তখনও বুঝতে পারে নি। যদি কেউ শয়তানী করব বলে মনে-মনে শপথ নিয়ে থাকে তো সে কতদূর পর্য্যন্ত তার কার্য্যাবলী প্রসারিত করতে পারে সাধারণ মানুষের তা বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভোলানাথ ও শিবনাথের কলকাতায় এসে পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার পিছনে যে সুদীপের দান ও উদারতা কতটা তা আর কেউ না জানুক সুদীপ নিজে তো তা ভালই জানে, তাই সে ভাবল মুখে শিবনাথ যাই-ই বলুক অনির্বাণকে নিশ্চয়ই একেবারে বঞ্চিত করবে না।

যাই হোক, সুদীপ তার নিজের ধারণা নিয়েই থাকল এবং যথারীতি নন্দী কোম্পানীর কাজকর্ম সেরে রাত্রে বাড়ী ফিরল। এমনিতেই তার মনটা খারাপ, তাই রাত্রের খাওয়া-দাওয়া ভালভাবে হল না। প্রায় রাত্রি এগারটায় সুদীপ পিঠে বালিশ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একমনে সিগারেট খেয়ে চলেছে, এমন সময় টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। টেলিফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে শিবনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কে সুদীপবাবু নাকি?" একে এত রাত্রে টেলিফোন, তার উপর আবার 'সুদীপবাবু' বলে সম্বোধন। শিবনাথের আওয়াজেই সুদীপ বোঝে তাকে কিছু অশ্রাব্য ভাষা শুনতে হবে, কারণ যে শিবনাথ তাকে দাদা বলেই সম্বোধন করতে অভ্যস্ত সে যখন সুদীপবাবু বলে সম্বোধন করছে তখন সে যে বিশেষ একটা মেজাজ নিয়েই কথা বলতে শুরু করেছে এটা বুঝতে সুদীপের মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হয় না। ওদিকে শিবনাথ তখন বলে চলেছে, "শোন সুদীপবাবু, আমি আজই ডিড করিয়ে রেখেছি, আগামীকাল সকাল এগারটায় তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিও, ওটা সই করে দিয়ে যাবে, আর সই করবার আগে আবার যদি দাদাকে বর্দ্ধমানে ফোন কর তা হলে পরশু থেকেই নন্দী কোম্পনীতেও ইঞ্জাংশন দিয়ে তোমার ঢোকা বন্ধ করে দেব।" শিবনাথের কথা শেষ হতেই সুদীপ শুরু করতে যায়, "হ্যারে শিবু..." কিন্তু ঐটুকুই। তারপরই আবার শিবনাথ বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে, "ব্যস; ব্যস, আর নয়, যা বললাম তার বেশী একটাও কথা নয়," বলেই লাইনটা সুদীপের মুখের উপর ঝনাৎ করে কেটে দিল। লাইনটা কেটে যেতেই সুদীপ আবার ঘুরিয়ে শিবনাথকে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু দু-একবার রিং হতেই ওদিকে লাইনটা তুলেই আবার কেটে দিল। দু-তিনবার এই রকম হওয়ার পর আবার রিং করতেই সুদীপ এনগেজড্ টোন পেল এবং বুঝল শিবনাথ

এবার টেলিফোনটা নামিয়েই রেখেছে অর্থাৎ ইচ্ছা করেই তার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করে চলেছে। এরপর সুদীপ নিজের হাতের টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে আর একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট খেতে-খেতে শিবনাথের এই ব্যবহার সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে তার এই মুহূর্ত্তে কত কথাই মনে পড়তে লাগল। বিগত দিনের কথা চিন্তা করতে গিয়ে সুদীপের মনে হল এই কি সেই শিবনাথ, যাকে আদর করে কাঁধে নিয়ে দিনের পর দিন গোটা নবস্থা গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছে সে। পিতৃহারা দুই ভাই ভোলানাথ ও শিবনাথের জন্য সুদীপ কতই না করেছে। আর আজ সেই শিবনাথ মুখের উপর এমন অপমানকর কথাবার্ত্তা বলতে এতটুকু লজ্জা পেল না। তার সামান্যও বাধোবাধো ঠেকল না। সুদীপ ভাবল হয়ত এই-ই নিয়ম, অর্থ যখন মানুষের মনুষ্যত্বের উপর প্রভুত্ব করে তখন রক্তের সম্পর্কও সম্ভবত লীন হয়ে যায়। অর্থ যাদের নিকট শ্রেয় কোনরকম আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক তাদের নিকট প্রেয় হতে পারে না। শিবনাথ যে-দোকানের জোরে পয়সা রোজগার করে সেই অর্থের বলে বলীয়ান্ হয়ে সুদীপকে আজ অপমান করল, সেই দোকানটুকুও সুদীপেরই করে দেওয়া। অতীত জীবনের আরও বহু কথা মনে পড়ে সুদীপের দু-চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। শিবনাথের টেলিফোন আসার আগে থেকেই কর্ম্মক্লান্ত শরীর নিয়ে লতা চুপ করে ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে এক জায়গায় বসেছিল। সুদীপকে নীরবে অশ্রুপাত করতে দেখে লতা উঠে এসে তার আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে বলল, "মাসতুতো ভাইদের জন্য অনেক করেছ তাই তারা প্রতিদান দিচ্ছে, কেঁদে আর কি করবে বল, কেঁদো না, কাঁদলে তোমার শরীর খারাপ হবে, নাও এখন একটু শুয়ে বিশ্রাম নাও।" লতার কথায় সুদীপ হাতের সিগারেটটা ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে বুক পর্য্যন্ত একটা চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু দু-চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারল না। শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল এই তো সেদিন উপেন্দ্রবাবু নন্দী কোম্পানীর পার্টনার নেবার সময় শুধু সুদীপকেই নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সুদীপই তাঁকে অনুরোধ করেছিল ভোলানাথকেও পার্টনার করে নেবার জন্য। সেদিন যদি সুদীপ ভোলানাথকে পার্টনারশিপ না দিত তা হলে আজকে শিবনাথ কেমন করে হুমকি ছাড়তো? সুদীপ অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে থাকে স্নেহ-পরবশ হয়ে অতীতে যে ভুল সে করেছে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত তার পাওনাই ছিল আর সেই প্রায়শ্চিত্তই এবার শুরু হয়েছে। এই প্রায়শ্চিত্তের জন্য এখন নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ব্যতীত তার করার কিছুই নাই। নানা কথা ভাবতে-ভাবতে সুদীপ মনস্থির করে ফেলল যে, শিবনাথ যা বলেছে কোন প্রতিবাদ না করে

সে তাই করবে এবং চুপচাপ দেখবে ভোলানাথ বা শিবনাথের মনুষ্যত্ব কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

পূর্ব্বরাত্রের চিন্তামত পরদিন সকাল ঠিক এগারটায় সুদীপ অনির্বাণকে পাঠিয়ে দিল শিবনাথকৃত দলিলে সই করে দেবার জন্য। নিতান্ত অনিচ্ছায় বাবার কথা রাখবার জন্য অনির্বাণ দলিলে সই করতে গেল এবং সই করে যথাসময়ে নন্দী কোম্পানীতে ফিরে এল। অনির্বাণ ফিরে আসার ঘণ্টা দুয়েক পরে বেলা প্রায় একটা নাগাদ সুদীপ মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে একটা পান মুখে পুরে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় শিবনাথের টেলিফোন। টেলিফোন তুলে সুদীপ, 'হ্যালো' করতেই শিবনাথ গতরাত্রের মত মেজাজ নিয়েই বলতে লাগল, "ছেলের হয়ে গতকাল পি. এম. ইণ্ডাষ্ট্রীজের হিসাব চাওয়া হয়েছিল না? এবার আমি হিসাব চাইছি নন্দী কোম্পানীর। আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে ছাপান্ন সালে নন্দী কোম্পানীতে দাদার পার্টনারশিপে ঢোকার সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত হিসাব নিখুঁতভাবে আমার চাই-ই।" মাত্র দু-ঘণ্টা আগে পি. এম. ইণ্ডাষ্ট্রীজের দলিলে সই হয়ে গিয়েছে এবং পি. এম. ইণ্ডাষ্ট্রীজের দরুন পাওনা টাকা না দিলেও আর করার কিছু নেই, তাই মওকা বুঝেই যে শিবনাথ, নন্দী কোম্পানীর উপরও প্রভুত্ব করতে চাইছে এটা বুঝেই সুদীপ একটু কড়া সুরে জবাব দিল "তোরা কি পেয়েছিস আমাকে? যখন যা বলবি তক্ষুনি তাই করতে হবে? শোন শিবু, হিসাব দরকার হয়ত খাতাপত্র সবই দোকানে আছে এসে দেখে নিস্, আমি বসে-বসে খাতার পাতা উল্টে উল্টে হিসাব করতে পারব না।" কথাগুলো বলার সময় সুদীপ বেশ চড়া গলাতেই বলেছিল। সচরাচর সুদীপের নিকট এরকম চড়া সুরে কথা শুনতে শিবনাথ কোনদিনই অভ্যস্ত নয়, তাই এ-ভাবে সুদীপ কথা বলছে শুনে সে মিনিটখানেক চিন্তা করে নেয়। তারপর বলে, "ঠিক আছে তুমি হিসাব দিতে না চাও তো দিও না, কিন্তু আমিও শিবনাথ সামন্ত, হিসাব কি করে নিতে হয় তাও আমি জানি।" "সুদীপ আগের মতই উত্তপ্ত সুরে এ-কথার জবাবে বলল, "হ্যাঁ জানবিই তো, তোর পকেটে এখন অঢেল পয়সা, আর কলকাতায় উকিল ব্যারিষ্টারদের বাড়ীর ও কোর্ট-কাছারির দরজাও খোলা, সুতরাং হিসাব নেওয়ার ব্যবস্থাটা তুই জানবি না তো জানবে কে?" বলে সুদীপ শিবনাথের মুখের উপর টেলিফোনটা ছেড়ে দিল। টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে সুদীপ ভাবতে থাকে পি. এম. ইণ্ডাষ্ট্রীজের পার্টনারশিপটা এককথায় ছেড়ে দিয়ে এবং দলিলে সই করে দিয়ে খুব ভুল হয়েছে। দলিলটা সই হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শিবনাথ তাই নন্দী কোম্পানী নিয়ে ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছে। সুদীপ মনে-মনে বুঝল সবই, কিন্তু বুঝল

না শুধু এটাই যে, অর্থ মানুষকে কতটা অকৃতজ্ঞ করে দিতে পারে। শিবনাথের মুখের উপর ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ভাবল যে, শিবনাথ তো আর নন্দী কোম্পানীর পার্টনার নয়, পার্টনার হল ভোলানাথ, ভোলানাথ হয়ত এতটা অকৃতজ্ঞ হবে না। হায়রে মানুষ! যে যাকে ভালবাসে বা স্নেহ করে বা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে তার কৃতঘ্নতার কথা বা তার মনের কলুষের কথা বা তার অকারণ অশ্রদ্ধার কথা পূর্বাহ্নে ভাবতে পারে না। এ-সব কথা পূর্ব্বাহ্নে ভেবে রাখতে পারলে অনেক সময়ই অনেক স্নেহপ্রবণ হৃদয় অশ্রুপ্লাবনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত। এতটা পরিণত বয়সেও সুদীপ আবার ভুল করল তাই অনেক আশায় বুক বেঁধে তার ঐ অসহায় পঙ্গু দেহটা নিয়ে পরদিন সকালে অজিতের কোলে ঝুলতে-ঝুলতে যখন বর্দ্ধমানে ডাঃ শৈলেন মুখার্জীর নার্সিং হোমে গিয়ে ভোলানাথের বেডের ধারে হাজির হল তখন ভোলানাথের নিকট সহানুভূতি পাওয়া তো দূরে থাকুক, সামান্য শিষ্ট-বাক্য বিনিময় করতেও ভোলানাথকে কুণ্ঠিত দেখে সুদীপ সত্যিই আশ্চর্য্যান্বিত হল এবং প্রায় হতবাক হয়ে গেল। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে এসেছে সুতরাং কোন বিষয়েই ভোলানাথ কিছু উচ্চবাচ্য করে না দেখে সুদীপই শিবনাথ তাকে যা-যা বলেছে সবটুকু বিবৃত করল। গম্ভীর ও ঈষৎ তিক্ত মুখে ভোলানাথ সব শুনল এবং বলল, "শিবনাথ তো ঠিকই বলেছে, দরকার হলে হিসাব নিতে হবে বৈকি?" ভোলানাথের এইটুকু কথাই যথেষ্ট। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুদীপ বুঝে নিল শিবনাথ কিসের জোরে বা কার প্ররোচনায় তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে। ভোলানাথকে আর কিছু না বলে সুদীপ আবার কলকাতার দিকে রওনা হল। ট্রেনে বসে সুদীপ আপন মনে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগল, এই-ই মানুষ? সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী অর্থের প্রয়োজনে অসামান্য ও চিরন্তন মনুষ্যত্বের কথা ভুলে যায়। ভাবতে লাগল ভোলানাথের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে পি. জি. হাসপাতালে ভর্ত্তি করার সময়, ডাক্তার দেখানোর সময়, পি. জি. হাস-পাতালে থাকার সময় ভোলানাথ তার জন্য কতই না করেছে অথচ সেই ভোলানাথ? সুদীপ আর ভাবতে পারে না ভোলানাথের নিকট যেটুকু বিচার বা সৌজন্য আশা করেছিল সেটুকু এখন ধূলিসাৎ, সুতরাং সে মনে-মনে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব কিছুর জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তাই হাওড়া ষ্টেশন থেকে রিক্সায় চড়ে দোকানে না গিয়ে সোজা বাড়ীতে চলে এল।

পরদিন দোকানে গিয়ে সুদীপ শুনল গতকাল সে যখন বর্দ্ধমান গিয়েছিল তখনই শিবনাথ 'নন্দী কোম্পানী'তে একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট পাঠিয়ে দিয়েছিল হিসাব দেখবার জন্য। গতকাল তিনি পুরাতন খাতা সব দেখেছেন এবং আজও তিনি

আসবেন। অধীপের নিকট এ-খবর শুনে সুদীপ কোন মন্তব্য না করে দোকানের সেলস্-এর কাজে মনোনিবেশ করল। বেলা প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ শিবনাথ প্রেরিত য়্যাকাউন্ট্যাণ্ট ভদ্রলোক এলে সুদীপ তাঁকে যথারীতি আপ্যায়ন করে বসতে বলে তাঁর সঙ্গে দু-চারটে শিষ্ট বাক্য বিনিময় করল এবং তাঁর কাজে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে লাগল। মাসখানেক ধরে প্রত্যহ খাতাপত্র দেখা ও হিসাব-নিকাশ করা চলতে থাকল। অবশেষে একদিন য়্যাকাউন্ট্যাণ্ট ভদ্রলোক সুদীপকে বললেন, "আমার কাজ শেষ, আপনার কাছে গত মাসখানেক ধরে যা ব্যবহার বা যা সহযোগিতা পেয়েছি তা ভোলবার নয়, আপনার নামে শিবনাথবাবুর মুখে অন্যরকম কথা শুনেছিলাম, কিন্তু এই কয়দিনের পরিচয়ে ও ব্যবহারে দেখলাম শিবনাথবাবু আপনার সম্পর্কে যা-যা বলেছেন তার সব কিছুই ভুল সব কিছুই মিথ্যা, সব কিছুই বানানো।" কথা কয়টি বলেই মিনিটখানেক নীরব থেকে মুখটা একটু গম্ভীর করে তিনি আবার বললেন, "আসলে কি জানেন, বাইরে থেকে লোকের মুখের কথার উপর নির্ভর করে একজন মানুষকে চেনা যায় না। একজন মানুষকে চিনতে গেলে জানতে গেলে তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে হয়। এখানে হিসাব-নিকাশ করতে এসে গত মাসখানেক ধরে প্রায় প্রত্যহ আপনাকে দেখেছি, দেখছি। দেখছি আপনার সব রকম শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও কি দারুণ মনের জোর আপনার। আপনাকে দেখে এটা বুঝেছি যে, যে-কোনও ব্যক্তির দেহের জোরের চেয়ে মনের জোরটাই সে ব্যক্তিকে সাফল্যের পথে তিলে-তিলে এগিয়ে দেয়। দেখুন দাদা আমি সামান্য বেতনভুক কর্ম্মচারী, যার বেতন খাই তারই গুণ গাওয়া আমার উচিত, কিন্তু আপনার অধ্যবসায়, পঙ্গু অসহায় অবস্থাতেও আপনার কর্ম্মতৎপরতা, সৌজন্যবোধ, ধৈর্য্য, সহনশীলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভাবতেই পারছি না যে, এ-রকম অসহায় অবস্থায় থেকেও সৎভাবে মানুষ এতখানি উন্নতিও করতে পারে। আচ্ছা দাদা, আমি এখন চলি," বলে সুদীপকে নমস্কার করে ফাইলপত্র বগলে করে ভদ্রলোক চলে যান আর সুদীপ তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে কি বিচিত্র দুনিয়া! ভদ্রলোকের নিকট সাত-পাঁচ যা-তা বলে তাঁর মনটা বিষিয়ে রেখেছিল, কিন্তু সুদীপের ব্যবহার ও সহমর্ম্মিতা ভদ্রলোকের সমস্ত ধারণাই পাল্টে দিয়েছে, তাই ভদ্রলোক ঐ ভাবে বলে গেলেন। হিসাব-নিকাশের সময় নিজে কোন সময়েই যে ধৈর্য্যহারা হয় নাই তার জন্য সুদীপ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।

এদিকে হিসাব শিবনাথের হাতে পৌঁছবার পর শিবনাথ দেখে সব মিলিয়ে নন্দীবাবুর পাওনা প্রায় পঞ্চাশ এবং দাদা ভোলানাথের পাওনা প্রায় সত্তর হাজার।

শিবনাথ মনে মনে ভাবে এক লক্ষ বিশহাজার টাকা সুদীপের পক্ষে এক্ষুণি দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই দোকান তাকে ছাড়তেই হবে। এরপর শিবনাথ হিসাব নিয়ে উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং কাগজপত্র দেখিয়ে তাঁকে বলে, "হিসাব মত আপনার পাওনা পঞ্চাশ। যদি দাদার নামে আপনার অংশ লিখে দেন তাহলে আপনাকে সত্তর দিতে পারি। ভেবে দেখুন কি করবেন।" শিবনাথের এ-কথায় উপেন্দ্রবাবু একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন ও বলেন, "তোমাদের অনেক টাকা হয়েছে জানি, কিন্তু আমার টাকার লোভ থাকলে তো অনেক আগেই যখন পার্টনারশিপ দিয়েছিলাম তখনই তোমার দাদার নিকট পঞ্চাশ হাজার দাবী করতে পারতাম, অন্য কোনও কথা থাকে তো বল।" উপেন্দ্রবাবুর এ-কথা শুনে শিবনাথ বুঝতে পারে টাকার লোভ দেখিয়ে এখানে কাজ হবে না, তাই সে আবার বলে. "দেখুন নন্দীবাবু, আমি আপনার ভালর জন্যেই বলছি ; প্রথমতঃ পঞ্চাশের জায়গায় আপনি আরও বিশ হাজার বেশী পাচ্ছেন, দ্বিতীয়তঃ, আপনাকে কোন ঝঞ্ঝাটে পড়তে হচ্ছে না, আর যদি আপনি আপনার অংশ সুদীপ-বাবুকে লিখে দেবেন ভেবে থাকেন তা হলে এটা জেনে রাখুন আপনি এক পয়সা তো পাবেনই না, বরং এমন কেসে ঝোলাব যে, রোজ কোর্টে হাজিরা দিতে হবে, এই বুড়ো বয়সে পারবেন তো রোজ কোর্টে গিয়ে প্রেজেণ্ট স্যার করতে?" শিবনাথ যখন মুখে এক বিচিত্র হাসির রেখা টেনে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলো উপেন্দ্রবাবুকে বলছিল তখন উপেন্দ্রবাবুর মনে হচ্ছিল তার গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেন, কিন্তু শিবনাথ পাজী-বদমাস-নোংরা লোক জেনেও চুপ করে বসে তার কথা হজম করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। তিনি চোখে অপরিসীম ঘৃণা নিয়ে অপলকে শিবনাথের দিকে চেয়ে থাকেন। উপেন্দ্রবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে শিবনাথ অধীর হয়ে বেশ ধমকের সুরে আবার প্রশ্ন করে, "কি মশায়, শুনতে পাচ্ছেন না নাকি?" শিবনাথের ধমক খেয়ে হঠাৎ যেন উপেন্দ্রবাবুর চেতনা ফেরে, তিনি বলেন, "দু-একদিন ভেবে দেখি, পরে বলব।" শিবনাথ এবার উঠতে-উঠতে আবার বলে, "দু-দিন নয়, শুধু মাত্র আজকের দিনটি আপনাকে সময় দিলাম, আজ বুধবার, আপনার অংশ যদি দাদার নামে ট্রান্সফার করে দেন তো আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা বারটা নাগাদ আমার দোকানে গিয়ে দেখা করবেন, আর যদি না যান তাহলে সোম-মঙ্গলবার করে কোর্টের ইঞ্জাংশন অর্ডার পাবেন।" এই কথা বলে শিবনাথ আর দাঁড়ায় না, সেখান থেকে চলে গিয়ে বাইরে তার গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দেয়।

শিবনাথ চলে যাওয়ার পর উপেন্দ্রবাবু সারাদিন ভেবে ঠিক করতে পারেন না কি করবেন। তাঁর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। একবার তাঁর মনে হয় ফোন করে

সুদীপকে সব বলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার ভাবেন শিবনাথ তো সুদীপেরই মাসতুতো ভাই, হয়ত সুদীপ সবই জানে, হয়ত জেনে-শুনেই সুদীপ এটা ঘটতে দিচ্ছে, কি জানি তাকে বললে কোন সুরাহা হবে কিনা। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ বলরামের কথা মনে হতেই উপেন্দ্রবাবু সন্ধ্যা নাগাদ একটা ট্যাক্সি করে সোজা ভবানীপুরে বলরামের বাসায় হাজির হন এবং তাকে সব খুলে বলেন। সব শুনে বলরাম গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার বুড়ো বয়সে এত ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার দরকারটা কি? পাওনার চেয়েও বেশী টাকা দিচ্ছে যখন, আপনি শিবনাথ যেমন বলছে তেমনি করে দিন, তাছাড়া আপনার ছেলে নেই, পুলে নেই, টাকাটা নিয়ে যে-কোন ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো আরামে কাটান। কি দরকার ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়ে? শিবনাথ যা বলেছে আপনি তাই করুন।" সারাদিন ধরে উপেন্দ্রবাবু নানারকম চিন্তার দোলায় দুলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, মাঝে-মাঝে সুদীপের কথা ভেবে তাঁর বড্ড কষ্ট হচ্ছিল, কারণ এতদিন মনে-মনে তিনি ভেবেই রেখেছিলেন যে, রিটায়ারমেন্টের সময় তাঁর অংশটুকু তিনি সুদীপকেই দিয়ে যাবেন, কিন্তু একদিকে শিবনাথের ব্ল্যাকমেলিং ও বলরামের যুক্তি অন্যদিকে সুদীপের মুখখানা, এই দুইয়ের টানা-পোড়েনে পড়ে তিনি আবার বলরামকে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে তুমি বলছ ভোলানাথকেই অংশটা লিখে দেব? উপেন্দ্রবাবুর এই শেষ প্রশ্নটা বলরামের নিকট মনে হল যেন কোন মুমূর্ষু মানুষের ওষ্ঠ সঞ্চালন, তাই সে বেশ জোরের সঙ্গেই আবার বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শিবনাথকে সব লিখে দিন।" "তবে তাই হোক" বলে উপেন্দ্রবাবু প্রায় টলতে-টলতে বলরামের বাড়ী থেকে বের হয়ে এলেন আর তাঁর গমন-পথের দিকে চেয়ে বলরাম ভাবতে লাগল, একদিন সুদীপের উপর খুব পীরিত দেখিয়েছিলে, না? হয়েছে, এবার ওষুধ ধরেছে। বলরাম ঘর থেকে উঠে দোতলায় রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে দেখতে থাকে কেমন ক্লান্ত ও ধীর পদক্ষেপে উপেন্দ্রবাবু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তাঁর চলাটা যেন কেমন ছন্দহীন। সে মনে-মনে একটু হেসে নেয়, কারণ এতদিনে তার মনোবাসনা কিছুটা পূর্ণ হতে চলেছে। সুদীপ হাজরা কোম্পানী থেকে চলে যাওয়ার পর হাজরা কোম্পানীর অবস্থা প্রায় ফুটো নৌকার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই সুদীপকে কোণঠাসা করবার এত বড় মওকা পেয়ে বলরাম সঙ্গে-সঙ্গে তা লুফে নিয়ে উপেন্দ্রবাবুকে কুমতলব দিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় উপেন্দ্রবাবুকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বলরাম এটা বুঝেছে

আপাততঃ উপেন্দ্রবাবুর যেন কোন ব্যক্তিত্বই নাই, তিনি যেন একটি পুতুল মাত্র, শুধু পুতুলের দেহে থাকে কিছুটা খড় ও মাটি, আর উপেন্দ্রবাবুর দেহে আছে রক্ত ও মাংস। উপেন্দ্রবাবু অদৃশ্য হয়ে যাবার পর বলরাম ঘরে এসে আপন মনে খুব একচোট হেসে নেয়, এ-হাসি অদ্ভুত এক তৃপ্তির হাসি। পরম শত্রুর চরম ক্ষতি হলে এ-জগতের কিছু মনুষ্যরূপী শয়তান যে ধরনের হাসি হেসে থাকে এ হ'ল সেই ধরনের সর্ববিধ্বংসী হাসি। সুদীপের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতির কথা ভেবে বলরাম যখন তার ভবানীপুরের বাড়ীর দোতলার মোজায়েক-করা ঘরের খাটের উপর বসে হাসছিল ঠিক সেই সময় কিন্তু সবার দৃষ্টির অগোচরে আর একজন হাসছিলেন, তিনি হলেন পরম করুণাময় সর্ব সমস্যার সমাধানকারী সর্বনিয়ন্তা বিধাতা।...তাঁর ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

বলরামের বাড়ী থেকে ফিরে উপেন্দ্রবাবু সেই রাত্রেই শিবনাথকে ফোন করে সেল-ডিড তৈরী করতে বলে দিলেন এবং যথারীতি কয়েক দিনের মধ্যেই সেলডিড তৈরী হয়ে সই হয়ে গেল। টাকা দেবার সময় শিবনাথ তার কথামত সত্তর হাজার টাকা দিতে এলে উপেন্দ্রবাবু বললেন, "দেখ শিবনাথ, তোমরা আজকে টাকা পয়সা দেখছ নতুন, আমি কিন্তু জন্ম থেকে টাকার গদীতেই শুয়ে এসেছি; সুতরাং বিশ হাজার টাকার লোভ আর আমায় দেখিও না; ও-টাকাটা বৌমাকে মিষ্টি খেতে দিও, আমাকে শুধু আমার পাওনা পঞ্চাশ হাজার দাও।" এরপর আর উচ্চবাচ্য না করে শিবনাথ পঞ্চাশ হাজার তাঁকে দিল এবং উপেন্দ্রবাবু টাকা নিয়ে চলে গেলেন। উপেন্দ্রবাবু চলে যাবার পর শিবনাথ আবার সুদীপকে নিয়ে পড়ল। সুদীপকে ফোনে সে বলল, "উপেন্দ্রবাবু তাঁর অংশ দাদাকে বিক্রয় করে গেছেন, এখন দাদা তো নন্দী কোম্পানীর দুই তৃতীয়াংশের মালিক; সুতরাং তুমি ভেবে দেখ কি করবে? দোকান রাখবে, না ছেড়ে দেবে?" সুদীপ বলল, "দোকান ছেড়ে দিলে আমি খাব কি? যাবই বা কোথায়? তোরা দু-ভাই মিলে কি আমায় খোঁড়া অবস্থায় পথে দাঁড় করাবি? তোদের মনুষ্যত্ব বলতে কি কিছুই নাই?" সুদীপের এ-ধরনের কথা শুনে শিবনাথ গরম তেলে বেগুন পড়লে তেলটা যেমন চিড়বিড়িয়ে ওঠে ঠিক তেমনি করে চিড়বিড়িয়ে উঠল ও বলল, "ও-সব বাজে বুকনি থামাও, কাজের কথা বল, তুমি কি করতে চাও বল। দোকান যদি নিতে চাও সাতদিনের মধ্যে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা যোগাড় কর, আর না পারলে তোমার অংশটাও দাদার নামে লিখে দাও।" যদিও উপেন্দ্রবাবুকে দিতে পঞ্চাশ হাজারই লেগেছে, তবুও সেটাকে সত্তর হাজার ও দাদার য়্যাকাউণ্টে সত্তর হাজার এই করে মোট এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বলল শিবনাথ। টাকার অঙ্কটা মোটা

করে সুদীপকে শোনানোর পিছনে একমাত্র যুক্তি হল এত টাকা শুনলে স্বভাবতঃই সুদীপ দোকান কিনতে সাহস করবে না, কারণ এত টাকা সাতদিনের মধ্যে সুদীপ পাবে কোথায় ? পিছনে যুক্তি যাই-ই থাকুক, শিবনাথের কথা শুনে সুদীপ বলল, "কিন্তু হিসাব মত তো উপেন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ হাজার পাওনা ছিল, সেটা হঠাৎ বেড়ে সত্তর হাজার হল কি করে ?" মুহূর্তের মধ্যে কি ভেবে নিয়ে শিবনাথ বলল, "উপেন্দ্রবাবু সত্তর হাজারের কমে তাঁর অংশ দেন নি, দরকার হয় তুমি টাকার রসিদ দেখতে পার।" এ-কথা শুনে সুদীপ বলল, "আচ্ছা দিন দুয়েক ভেবে দেখি, তারপর বলব।"

সুদীপ টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার পর শিবনাথ ভেবে দেখল যদি সত্যিই সুদীপ উপেন্দ্রবাবুর টাকার রসিদ দেখতে চায় তাহলে তো পঞ্চাশ হাজার দেখবে তাই সে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অন্য একটা রসিদ তৈরী করে আগের পঞ্চাশ হাজারের রসিদটা দেখে দেখে উপেন্দ্রবাবুর সইয়ের মত করে নিজের হাতে একটা জাল সই করে রাখল। সইটা করতে-করতে তার আরও বুদ্ধি খেলে গেল যে, এই রসিদটাই দাদা ভোলানাথকে দেখালেও তো হয়, তাহলে বিশ হাজার টাকা তার নিজের পকেটে চলে আসে। যে চিন্তা সেই কাজ। সঙ্গে-সঙ্গে খাতায় ভোলানাথের নামে সত্তর হাজার টাকা খরচা দেখিয়ে দিয়ে বিশ হাজার টাকা পকেটস্থ করল এবং আসল রসিদটা সরিয়ে ফেলল।

দিনচারেক পরেও অনেক ভেবে দেখে সুদীপ যখন কোন কূল কিনারা করতে পারছিল না, চিন্তান্বিত মুখে দোকানে বসেছিল তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ওয়্যার-ক্র্যাফটস্ লিমিটেডের ডাইরেক্টর কান্তিভাই। বড়বাজারে তার-জালের ব্যবসায়ীদের নিকট তাঁর সর্বজনীন পরিচয় হল 'কাকুভাই'। কাকুভাই সদাশিব মানুষ, যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি মধুর ব্যবহার। দোকানে ঢুকতেই সুদীপকে মুখ ভার করে বসে থাকতে দেখে কাকুভাই বললেন, "সুদীপ ভাইয়ের মনটা আজকে কুছ খারাপ আছে কি ? এতো চিন্তা কি করছে ? এঁ্যা ? বোল-বোল, এতোটা চিন্তা কিস্ লিয়ে ?" কাকুভাই বরাবরই এমনি ভাঙ্গা হিন্দী ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলেন, তাই তাঁর কথা শুনে সুদীপের শত চিন্তার মধ্যেও মনটা মুহূর্তে হাল্কা হয়ে গেল, সে বলল, "কাকুভাই, বড় বিপদে পড়েছি। এই দেখাই বোধ হয় এই দোকানে আপনার সঙ্গে শেষ দেখা।" সুদীপের কথার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে কাকুভাই বললেন, "বেপারটা কি ? ঠিকসে বোল, আমি কুছ বুঝতে পারছি না।" সুদীপ এবার সব কথা খুলে বলতে কাকুভাই প্রশ্ন করলেন, "এক লাখ চল্লিশ হাজারের মধ্যে তুমার পাশে কত আছে ?" সুদীপ বলল, "লাখখানেক হবে।"

কাকুভাই শুনে বললেন, "ঠিক হ্যায়, বাকী হামি দিবে তুমি দোকান লিয়ে লেও।" সুদীপ তবু কিন্তু কিন্তু করছে দেখে তিনি আবার বললেন, "এতনা চিন্তাকা কেয়া হ্যায়। এ-টাকার জন্য হামি কোন ইণ্ট্যারেষ্ট লিবে না, তুমার যখন সুবিধা হোবে তুমি ধীরে-ধীরে শোধ করে দিবে, হামি তাগাদা ভি করবে না।" কাকু-ভাইয়ের কথা শুনে সুদীপ যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না, কারণ বিভিন্ন ধরনের মানুষের চরিত্র দেখে-দেখে সুদীপের আর কাউকে বিশ্বাস হয় না। সুদূর নবস্থা গ্রাম থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করে হাত ধরে তুলে কলকাতায় এনে যাদেরকে একদিন ব্যবসায় নামিয়েছিল, মাসতুতো ভাই হয়ে তারাই যখন তার শেষ বয়সে এত বড় একটা আঘাত দিতে পারল তখন আর কোন মানুষকেই তার বিশ্বাস হয় না। তাই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাকুভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "ঠিক আছে, টাকা আমি আপনার কাছেই নেব, কিন্তু তার পরিবর্তে কিছু গহনা আপনার নিকট জমা রাখব এবং কিছু সুদও আপনাকে নিতে হবে।" আজ প্রায় আট-ন বছর ধরে কাকুভাই সুদীপকে তাঁর কারখানা 'ওয়্যার ক্র্যাফ্‌টসের মেসিনের তৈয়ারী তার-জাল সাপ্লাই করে আসছেন, এই সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ের সূত্রে সুদীপকে যতটুকু জানবার সুযোগ হয়েছে তা থেকে তিনি বেশ বুঝতে পারেন খালি হাতে টাকা নিতে সুদীপের আত্মসম্মানে লাগছে, তাই তিনি বললেন, "আচ্ছা, তুমি যখন বলছে তখন ব্যাজ কুছ হামি লিবে, লেকিন ও জেবর-এবর লাগবে না। দেখ সুদীপ হামি তোমাকে বিশোয়াস করে আর ভাইকে মাফিক প্যার ভি করে, জিদ্দি না হোকে কাম সালটা লে। তুম হামার সামনে শিবনাথ বাবুকো টেলিফোন কর, বোল এ-দোকান লিতে তুমি রেডি আছো আর আজ শুক্রবার, সামনের সোমবারই যেন রেজিষ্ট্রী হয়ে যায়।" এক্ষুনি শিবনাথকে টেলিফোন করবার ইচ্ছা না থাকলেও কাকুভাইয়ের পীড়াপীড়িতে সুদীপ টেলিফোন তুলে শিবনাথের সঙ্গে কথা বলল এবং সোমবার কি মঙ্গলবার যাতে দোকান রেজিষ্ট্রী হয়ে যায় তার জন্য অনুরোধ করল। শিবনাথ গুম হয়ে সব শুনে বলল, "টাকার জোগাড় হয়েছে?" সুদীপ বলল, "হ্যাঁ।" শিবনাথ তখন বলল, "সোমবার রেজিষ্ট্রেশান করতে হলে শনিবার অর্থাৎ আগামীকাল সকালের মধ্যেই পুরো এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা যেন আমার হাতে পৌঁছায়।" শিবনাথের একথা বলার একটা বিশেষ অর্থ ছিল, কারণ তার ধারণা ছিল সুদীপ টেনেটুনে বড় জোর হাজার পঞ্চাশেক টাকা হয়তো যোগাড় করতে পারবে, বাকীটার জন্য দোকান কেনা তার সম্ভব হবে না, বাধ্য হয়েই দোকান তাকে ছেড়ে দিতে হবে, তাই টাকার যোগাড় হয়ে গেছে শুনে শিবনাথ একটু অবাক হয়ে গেল এবং টেলিফোনটা ধরে চুপ করে সব শুনে শনিবারেই টাকা

দিতে হবে বলে সুদীপকে চাপ দিল। শিবনাথের সঙ্গে কথা শেষ হতেই কাকুভাই একবার হাতের ঘড়িটার দিকে দেখে বলল, "আভি হামারা সাথ চল্, আমি তুমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছে, তুমি কাল সকালেই শিবনাথকে টাকা দিয়ে দিবে, আর হ্যাঁ ও বেটা বহুৎ খচ্চার আছে, টাকা দিয়ে সাথে-সাথে রসিদ ভি লিয়ে লিবে, কাকুভাইয়ের কথায় সুদীপ ক্যাশ বন্ধ করে একটা রিক্সায় উঠে তাঁর বাসা তিন নম্বর বৌ-স্ট্রীটে চলে গেল এবং সেখান থেকে আবার দু-জনে ঐ রিক্সায় চড়েই কারফর্মা লেনের বাড়ীতে ফিরবার সময় সে কাকুভাইকে পরদিন সকালে শিবনাথকে টাকা দেবার সময় তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল। কাকুভাই রাজী হয়ে গেলেন এবং রিক্সা থেকে নেমে বাড়ীতে গিয়ে সামান্য মিষ্টিমুখ করে চা খেয়ে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

পরদিন সকালে বেলা প্রায় এগারটায় কাকুভাই ও সুদীপ শিবনাথ সামন্ত এণ্ড কোম্পানীর দু-নম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের দোকানে গেল টাকাটা দেবার জন্য। সুদীপ বাইরে রিক্সায় বসে রইল আর পুরো টাকাটা নিয়ে কাকুভাই শিবনাথের নিকট গিয়ে বলল, "লিন্ মোশায় আপনার টাকাটা লিয়ে লিয়ে একটা রসিদ দিয়ে দিন।" হঠাৎ কান্তিভাইকে টাকাটা দিতে দেখে শিবনাথ একটু চিন্তান্বিত ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "কত শেয়ার নিচ্ছেন কান্তিভাই।" শিবনাথের কথায় কাকুভাই বিরক্তি বোধ করে বললেন, "আগে তুমি সুদীপবাবুকে তো সব লিখে দাও, তবে তো হামি লিবে, এখনও তো তুমিই লিখে দিলে না, তো হামি লিবে কেমন করে।" দোকানের সামনে রিক্সায় বসে সুদীপ হঠাৎ "শিবু, শিবু" বলে ডাকতেই শিবনাথ উঠে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করল, "কিছু বলছ?" উত্তরে সুদীপ একবার উপেন্দ্রবাবুর দেওয়া টাকার রসিদটা দেখতে চাইলে শিবনাথ বেশ বিরক্তির সঙ্গে রসিদটা এনে সুদীপের হাতে দিল। রসিদটা বেশ ভাল করে দেখে সুদীপ প্রশ্ন করল, "এটা উপেন্দ্রবাবুর দেওয়া রসিদ?" শিবনাথ বলল, "কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? উপেন্দ্রবাবুর অত বড় একটা সই রয়েছে, সেটা কি নজরে পড়ছে না?" সুদীপ আর একবার ভাল করে রসিদটা দেখে বলল, "হ্যাঁ সবই বিশ্বাস হচ্ছে, একমাত্র সইটা ছাড়া, কারণ আমি সেই ছোটবেলা থেকে উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ঘর করেছি তো, তাই তাঁর হাতের লেখাটা আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে, যাই হোক, তর্ক করে লাভ নাই। তুই টাকা পেয়েছিস তো?" শিবনাথ উত্তর দিল, "হ্যাঁ টাকা পেয়েছি আর জামাইবাবুকে রসিদ লিখে দিতে বলেছি। শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে তাহলে মাড়োয়ারী পার্টনার নিতে হল! আমাকে হিসাব দিতে চাইছিলে না, এবার থেকে কি করবে?" এই কথা বলে শিবনাথ

সুদীপের মুখের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসতে লাগল। শিবনাথের সঙ্গে সুদীপের কথোপকথনের সময় কাকুভাই শিবনাথের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শিবনাথের এ-কথায় কাকুভাই বেশ ঘৃণা মিশ্রিত সুরে বলে উঠলেন, "দেখ শিবনাথ, এত কথা কেন বোলছিস! মাড়োয়ারী পার্টনার হোক আর যেই-ই হোক, তুমার তাতে কি আছে! তুমি তো ভাইয়ের বুকে ছুরি মেরে টাকা লিয়ে লিলে, তাছাড়া হামি মাড়োয়ারী হই বা গুজরাটী হই, মাড়োয়ারী গুজরাটী কইভি তোমাদের সম্পত্তি কেড়ে লিয়ে পার্টনার বনছে না, মালিক বনছে না, নিজের দেশে ভাত জুটে না বলে তুমার বাংলাদেশে হামরা আসছি, হামরা বহুৎ কষ্ট করে টাকা রোজগার করছি, আর তোমরা বাঙালীবাবুরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কোরে, ভাইয়ে-ভাইয়ে লড়াই কোরে, বাপ-বেটায় লড়াই কোরে সব নষ্ট কোরে ফেলছ আর দোষ দিবার বেলায় কেবল মাড়োয়ারী মাড়োয়ারী করছ।" কাকুভাই আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই শিবনাথ বলে উঠল, "মাড়োয়ারীরা যে-রকম জোচ্চুরি করে টাকা রোজগার করে, যে-রকম মিথ্যা কথা বলে সে-রকম বাঙালীরা পারে না, তাই তারা সব হারাতে বসেছে।" শিবনাথের এ-কথায় কাকুভাই সশব্দে একটু হেসে নিয়ে বললেন, "দেখ শিবনাথ, লোককে চোর বললে মিথ্যাবাদী বললে সে চোরও বনিয়ে যায় না মিথ্যাবাদীও বনিয়ে যায় না। তাছাড়া কি জানিস্ জোচ্চুরি করতে গেলে, মিথ্যা কথা বোলে কাম ম্যানেজ করতে হোলেও একটা ক্যাপাসিটি থাকা দরকার, তাহলে স্বীকার কর, সেই ক্যাপাসিটি, সেই ম্যানেজ করার ক্ষমতা বাঙালীদের নেই, মাড়োয়ারীদের আছে। তাহলে দাঁড়াল মাড়োয়ারীদের কিছু না কিছু আছে মাথায়, আর তুমাদের নেই; তুমাদের আছে শুধু ঝগড়া করার ক্ষমতা, আছে প্রেষ্টিজ জ্ঞান। আসলে কি জানিস শিবনাথ, আসলে হল কি জানিস আসলে হল তোদের কমিউনিটি ব্যাকিং নাই। তোরা বাঙালীরা একজন আর একজনকে ভীষণ হিংসা করিস, একজন বাঙালী, তোর পরিচিত, বড় হয়ে যাচ্ছে দেখলে আর একজন বাঙালী তোরা জ্বলতে থাকিস। তোদের রাতে ঘুম হয় না। ঐ যে বড় হয়ে যাচ্ছে তার কি কোরে সর্বনাশ করবে চিন্তা করে। কি করলে নিজের ভাল হোবে, কি করলে হামিও উহার মত বড় হবো চিন্তা না করে, পরিশ্রম না করে কেবল অপরের ক্ষতির চিন্তা করলে কি কেউ নিজে বড় হতে পারে। এই দেখ্ না, তুই চারখানা মেসিন বসিয়ে বছরে পঞ্চাশ টনের ক্যাপাসিটির কারখানার দরুন আড়াইশো টনের ইম্পোর্ট লাইসেন্স যোগাড় করে তারগুলো আনিয়ে বাইরে বাজারে ব্ল্যাক কোরে

দিচ্ছিস, আর বোস ইণ্ডাষ্ট্রীজ যাতে বেশী মাল না পায় তার জন্য নরেন্দ্র সরকারকে তেল দিচ্ছিস তার ক্ষতি করবার জন্য ; তোর দাদা সুদীপবাবুকে আজই টাকা দেবার জন্য চাপ দিয়েছিস, তোর কি টাকার অভাব আছে ? কেন এক বছর পরে টাকাটা নিলে কি ক্ষতি হতো বোল, তোদের কমিউনিটি ব্যাকিং নাই বলেই না এগুলো তুই করতে পারছিস। আর মাড়োয়ারীরা কি করে জানিস ? মাড়োয়ারীদের নিজেরটা হয়ে গেলেই হল, অপরের ক্ষতি করবার চেষ্টা তারা করে না, তোদের মত নিজেরটাও হতে হবে আবার অপরেরটাও ক্ষতি করে দিতে হবে এরকম তারা করে না। তাছাড়া তোদের বাঙালা দেশে ব্যবসা করতে এসে তারা তোদের বাঙালী অফিসার ভাইদেরই ফেভার পাচ্ছে, আর তোরা পাচ্ছিস না, তার কারণও হোলো তোরা এক একজন মানুষ নিজেকে অনেক উঁচু ভাবিস, এমন কি, ধর যে-অফিসারের কাছে তুই কোটার জন্য গেছিস তাকে রিকোয়েষ্ট করে একবার যেই কোটা পেয়ে কিছু টাকা রোজগার করলি পরের বারে গিয়ে নিজেকে সেই অফিসারের থেকেও উঁচু মানুষ বলে ভাবতে থাকলি, তার সঙ্গে রাফসাফ কথা বললি, ফলে তোর আর কোটা বাড়ল না। আসলে যে তোর থেকেও উঁচু তাকেও তুই নীচু ভাবলি এবং সেই রকম ব্যবহার করলি, ফলে তোর কারখানার কোটা বাড়ল না, তার ফলে তোর রোজগার বাড়ল না। একজন আরেক জনকে ছোট ভাবা এই রোগটা তোদের যতদিন না যাবে ততদিন তুমার বাঙালী জাতি কোন উন্নতি করতে পারবে না। তোরা সব সময় মাড়োয়ারী মাড়োয়ারী করে চিৎকার করিস কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখিস, শুধু মাড়োয়ারীই কেন, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ভাটিয়া, সিন্ধি কেউই তোদের কারও কিছু কেড়ে নেয় নি বা নিচ্ছে না তারা আপন হিম্মতের জোরে সব কিছু করছে আর তোরা সবাই ইন্টেলেকচুয়াল না হয়েও প্রত্যেকে নিজেকে মহা ইন্টেলেকচুয়াল ভাবিস। বলতে পারিস তোর ঘরে বিবেকানন্দের কখানা নেতাজীর কখানা ছবি আছে ? দেখে আয় গিয়ে সাউথে সেখানে লোকে বিবেকানন্দকে দেবতা বলে পূজা করে, তোরা মেড়ো, পাইয়া খোট্টা বলে ঘৃণা করিস, পাঞ্জাবীরা তোদের একজন বাঙালীকেই দেবতার মত শ্রদ্ধা করে, তামিলরা তোদেরই একজন বাঙালীর ছেলেকে গুরুজ্ঞানে পুজো করে। আসলে কি জানিস শ্রদ্ধা জানালে তবে শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। আজকের দুনিয়া অনেক গতিশীল। তোরা চিরকাল বিহারীদের 'এড়িয়াল' বলে তাদের টিকি ধরে তামাসা করিস, ওড়িয়াদের 'ব্যাটা উড়ে, বলে মজা করবি আবার তাদের কাছে ভালবাসা আশা করবি ! শ্রদ্ধা আশা করবি ! তা কক্ষুনো হোয় না। আজকের

দুনিয়ায় একটা অশিক্ষিত সামান্য মজদুরও কোন্‌টা ইজ্জৎ দিয়ে কথা বলা আর কোন্‌টায় বেইজ্জৎ তা বোঝে আর বোঝে বলেই তোরা আজ কোথাও সম্মান পাস না; সহযোগিতা পাস না। ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকেই তোদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে দেখবি তোরা বাঙালীরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়বি; নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবি আর তখন তোরা এতদিন যাদের 'মেড়ো' বলে, 'পাইয়া' বলে, 'খোট্টা' বলে, 'উড়ে' বলে ঠাট্টা কোরে এসেছিস, অসম্মান কোরে এসেছিস তারা কেউই তোদের বাঁচাতে আসবে না, দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে।" কাকুভাই এক নিঃশ্বাসে যখন কথাগুলো শিবনাথকে বলেছিলেন সুদীপ স্থাণুর মত রিক্সায় বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছিল, তার মনে হচ্ছিল, একি? এগুলো যে তারও অন্তরের কথা। এই সমস্ত কথা নিয়ে কতদিন হীরেনদার ও তার আলোচনা হয়েছে। আজ হীরেনদা নেই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই ধরনের আলোচনার সমস্ত বৃত্তান্ত এই মুহূর্তে সুদ্রীপের মনে পড়ে গেল, তার অন্তরের কথা কাকুভাইকে এ-ভাবে আবেগের সঙ্গে বলতে শুনে সুদীপের অন্তর কাকুভাইকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠল। কাকুভাই জাতিতে গুজরাটী ও প্রচুর পড়াশুনা করা লোক সুতরাং শিবনাথ তাঁর মত জ্ঞানবান লোকের নিকট ঐভাবে কথা বলায় কাকুভাই যে ভিতরে-ভিতরে ভীষণ চটেছেন তা বুঝে সুদীপ তাড়াতাড়ি তাঁকে বলল, "কাকুভাই আপনি বেনাবনে মুক্তো ছড়াচ্ছেন, নিন রিক্সায় উঠে আসুন।" এর পর রিক্সায় উঠে কাকুভাই শিবনাথকে বললেন, "দেখ্‌, শিবনাথ, হামি এখন যাচ্ছি, তুমার হাতে টাকাটা দিয়ে গেলাম, সোমবার কি মঙ্গলবারের মধ্যে যেন সুদীপবাবুর নামে দলিল রেজিষ্ট্রী হোয়, কোন রকম ঝামেলা করলে যে নরেন্দ্র সরকারকে তেল দিয়ে তুমি আড়াইশো টনের কোটা করিয়েছ সেই নরেন্দ্র সরকারকে দিয়েই আবার পঞ্চাশ টন করিয়ে দেব, হামী গুজরাটির বাচ্চা আছি, তোমার মত বাঙালীর হিম্মৎ দেখা যাবে, তুমি কত বড় খচ্চরটা হয়েছ যে, মেড়ো খোট্টা বলে সবাইকে অসম্মান করবে সেটা দেখা যাবে।" এরপর আর কথা না বাড়িয়ে সুদীপের সঙ্গে রিক্সায় উঠে দুজনে এসে নন্দী কোম্পানীতে পৌছলেন। সুদীপ দোকানের কর্মচারী রামপ্রসাদকে দিয়ে দুটো ডাব আনিয়ে কাকুভাইকে একটা দিয়ে নিজে একটা নিল এবং বলল, "আজ আপনার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা করছে, খুব ভাল বলেছেন আপনি।" সুদীপের মনোভাবটা বুঝতে পেরে কাকুভাই একটু হাসলেন এবং বললেন, "তোমার মাসীর লেড়কা বুঝতে পারে নাই যে, হামি তোমার সঙ্গে যাবো, তাই ওর রাগ হয়েছে, কারণ ও জানে ডাইরেক্টর অফ

ইণ্ডাষ্ট্রীজে এবং আয়রন ষ্টীল কণ্ট্রোলে আমার কি রকম খাতির। আমার আজ বিশ বছরের কারখানা, সতেরখানা মেসিন। আমার কোটা চারশ' টনের, আর ও তিন বছর কারখানা করেই চারখানা কাঁটাতার আর দুখানা ষ্ট্র্যাণ্ড ওয়ারের মেসিন নিয়ে কোটা করতে চায় হাজার টনের। যেহেতু আমার কোটা বেশী, তাই ওর আমার উপর রাগ আছে সেইজন্য মেড়ো-মেড়ো করে বলার জন্য ওটাকে ঝেড়ে দিলাম আর সত্যিই বলছি দেখো, ও যদি আবার তোমার সঙ্গে দোকান নিয়ে কোন ঝামেলা পাকায় তো ওর কোটা কমিয়ে আমি পঞ্চাশ টন করে দেবো, মেড়ো বলে ঠাট্টা করা ওর বার করব। শোন সুদীপ ভাই, ও-বেটা খচ্চারটা যদি এই দুদিনের মধ্যে কোনরকম বদমাসী বুদ্ধি আঁটে তো তুমি আমায় বলবে, আমি ওকে বাড়ীতে বসে টাইট দিয়ে দেব। এই বলে কাকুভাই তাঁর লায়ন্স রেঞ্জের অফিসের দিকে চলে গেলেন।

আজ শনিবার, কারখানার কর্মীদের সাপ্তাহিক বেতনের দিন। তাই অনির্বাণ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গিয়েছিল। কাকুভাই চলে যাওয়ার মিনিট পাচেকের মধ্যেই সে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরল এবং কাগজপত্র গোছগাছ করে টাকাকড়ি ব্যাগে ভরে নিয়ে যেই দোকান থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় সৌম্যদর্শন প্রশান্ত-বদন এক ভদ্রলোককে দোকানে উঠতে দেখে খরিদ্দার ভেবে অনির্বাণ প্রশ্ন করল, "কি চাই? আসুন।" ভদ্রলোক কোন জবাব না দিয়ে একবার শুধু অনির্বাণের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সুদীপকে নমস্কার করে সামনের বেঞ্চে বসলেন এবং সুদীপকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি বর্দ্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর থেকে আসছি। আমার নাম অনিল রায়, শুধু এইটুকু শুনেই সুদীপ অনির্বাণকে লক্ষ্য করে বলল, "তুই কারখানায় যা, আমি দেখছি, ওনার সঙ্গে কথা বলছি।" অনির্বাণ বের হয়ে গেলে সুদীপ অনিলবাবুর উদ্দেশে বলল, "আপনার পোষ্টকার্ড আগেই পেয়েছি, আপনি সেই বিয়ের ব্যাপারে এসেছেন তো?" অনিলবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ছোট মেয়ে এবছরে বি, এ, পরীক্ষা দিচ্ছে, তারই বিবাহের জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।" সুদীপ প্রশ্ন করল, "আপনার কন্যা দেখতে কেমন?" সুদীপের কথায় অনিলবাবু সার্টের বুক পকেট থেকে একখানি হাফ সাইজের ফটো বের করে সুদীপের হাতে দিলে সুদীপ তা দেখতে দেখতে বলল, "বাঃ সুন্দর, কিন্তু অনিলবাবু, আমার যে এখন একটা বিরাট অসুবিধা রয়েছে। আমার এই দোকান নিয়ে পার্টনারদের সঙ্গে একটু ঝঞ্ঝাট চলছে, দোকানের ঝামেলাটা না মিটিয়ে তো আমি ছেলের বিয়ে দিতে পারছি না। জানেন তো আমার ঐ একটিই ছেলে, ছেলের বিয়ে আমি খুব ধুমধাম করে দিতে চাই, তাই আপাততঃ এ প্রস্তাবে সায়

দিতে পারছি না। আপনি সপ্তাহ দুয়েক পরে যদি মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে এসে দেখাতে পারেন তো খুব ভাল হয়। আমি খোঁড়া মানুষ ভাই, আমার পক্ষে বর্দ্ধমান গিয়ে মেয়ে দেখা একটু কষ্টকর, তাই এই অনুরোধ।" সুদীপের কথায় অনিলবাবু খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন এবং সামনের এক শনিবার বাদ দিয়ে পরের শনিবার মেয়ে দেখার দিন ধার্য্য করা হলে সুদীপ অনিলবাবুকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় দিল।

অনিলবাবু যাওয়ার পর সুদীপ যথারীতি বেলা তিনটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ীতে এল। বাড়ীতে আসার সময় রিক্সা দাঁড় করিয়ে কালাকার ষ্ট্রীটে তেওয়ারী ব্রাদার্সের মিষ্টির দোকান হতে অমৃতি ও কিছু বাদাম-বরফি কিনে নিল। কদিন ধরে মনটা ভীষণ খারাপ ছিল, তাই মেয়ে লিপির জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাওয়া হয় নি। আজ শিবনাথকে টাকাটা দেওয়ার পর থেকেই মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, তাই মেয়েটার মুখটা মনে করে মিষ্টিগুলো কিনে নিয়ে বাড়ীতে এসে পৌছেই শুনল যে, শিবনাথ ইতিমধ্যে দু-বার ফোন করেছিল। মিষ্টির প্যাকেট দুটো লতার হাতে দিয়ে একেবারে টেলিফোনের নিকট একটা চেয়ারে বসে টেলিফোন করতেই ওপাশ থেকে শিবনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "হ্যালো, কে? দাদা? আমি শিবু বলছি।" সুদীপ প্রশ্ন করল, "তুই এর আগে দু-বার ফোন করেছিলি?" শিবনাথ উত্তরে বলল, "হ্যাঁ দাদা, শোন, তোমার ষ্ট্যাম্প পেপার টেপার সব কেনা হয়েছে তো?" উত্তরে সুদীপ বলল, "হ্যা সব কেনা হয়ে গেছে।" শিবনাথ বলল, "কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে দাদা, ভোলানাথের সঙ্গে কথা হল দাদা বলেছেন উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীটের গোডাউনের তিনটে দরজার মধ্যে দুটো দরজার সীমানা বরাবর জায়গা আমাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, আমরা অফিস করব," শিবনাথ ফোন করেছে শুনেই সুদীপ বুঝতে পেরেছিল যে, সে যাই হোক একটা প্যাঁচ কষেছে, এখন ফোনে সেইটাই শোনাবে। তাই সে বলল, "দাদাকে ফোনটা একবার দে।" শিবনাথ বলল, "দাদা ট্রাঙ্ককল করে বর্দ্ধমান থেকে এ-কথা বলেছে।" এরপর তার স্বভাবসিদ্ধ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলার ভঙ্গীতে বলল, "দাদার সঙ্গে কথা বলেই বা কি হবে, আমি যা করব তাই হবে, ওটা আমার চাই-ই, না হলে সোমবার দলিল রেজিষ্ট্রী হবে না।" তার এই অভদ্র ভঙ্গীতে কথা বলায় সুদীপও খানিকটা তেতে গিয়ে বলল, "তুই ভেবেছিস কি? টাকাটা হাতে পেয়েই এখন প্যাঁচ কষছিস? গোডাউন দেবার কথা তো কোন সময়েই হয়নি। দোকান গোডাউন স্টক ব্যাঙ্ক সব নিয়েই তো ঐ হিসাবটা তোর য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট করেছিল এখন আবার নতুন চাল চালছিস কেন?" শিবনাথ সুদীপের এ-কথায়

উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমার কথাও যা, কাজও তাই। গোডাউনের দুটো দরজা যদি না ছাড় তো দোকান রেজিষ্ট্রী করতে তোমার নাকে মাছি বসাব।" সুদীপ মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, তাই-ই যদি তোরা নিস তো অন্ততঃ হাজার-ত্রিশ টাকা বাদ দে, সেই-ই টাকায় আমি একটা গোডাউন দেখে নিই, গোডাউন না থাকলে গোডাউনের মালগুলো রাখব কোথায় আর কাজই বা করব কি করে? শিবনাথ বলল ঠিক আছে তুমিই তাহলে আরও ত্রিশ হাজার দাও না, দিয়ে ওটা নিয়ে নাও না।" সুদীপ বলল, ওটাতো আমার হকের পাওনা, কারণ হিসাবটা করবার সময় সব কিছুর মূল্য ধরেই তো করা হয়েছে; সুতরাং আমায় টাকা দিতে হবে কেন? বরং নিলে টাকাটা তোদেরই দেওয়া উচিত।" সুদীপের এসব কথা শুনে শিবনাথ দারুণ গরম হয়ে উঠল এবং পূর্বাপর চিন্তা না করে বলল, "বেশী লেকচার মেরো না সুদীপবাবু, আমার দাদা ভোলানাথ না থাকলে তো জীবনে বেঁচে পি. জি. হাসপাতাল থেকে ফিরতে হত না, ছেলে-বৌকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হত, শুনে রাখ ঐ গোডাউন আমার চাই-ই।" বলে সে টেলিফোনটা ছেড়ে দিল। শিবনাথের শেষের কথা কটি বিষাক্ত তীরের মত সুদীপের বুকে বিঁধল। টেলিফোন-ধরা অবস্থাতেই তার দু-চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। লতা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ করে ক্রন্দন-কম্পিত স্বরে সুদীপ বলল, "জান লতা শিবু আজ কি বলল? বলল—ভোলানাথ না থাকলে আমি নাকি এতদিনে মরে যেতাম আর তোমাকে ও অনিকে রাস্তায় দাঁড়াতে হত। ছিঃ ছিঃ লতা আমি এই ভাইদের জন্য কতই না করেছি। ঐ শিবনাথের যখন বার বছর বয়স তখন বেলকাঁটা ফুটে পা থেকে টিউবারক্যুলেটিক ইনফেকশন হয়ে সেপটিক হয়ে গিয়েছিল তখন বর্দ্ধমানে শৈলেনবাবুর নার্সিংহোমে শুয়ে-শুয়ে যন্ত্রণায় ও ছটফট করত আর আমি সারা রাত জেগে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতাম। তারপর অপারেশন হলে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন পড়লে আমার রক্ত পর্য্যন্ত ওর জন্য দিয়েছি। সেই শিবনাথ আজ এত বড় কথা বলতে পারল! হা ঈশ্বর, তুমি কি সত্যিই নেই?" বলে সুদীপ নিজের কপালে একবার করাঘাত করল। সে আবার বলল, "তুমি দেখে নিও লতা, আমি যদি বেঁচে নাও থাকি আর আমি যদি সত্যিকার ওদের উপকার করে থাকি, ওদের ভালবেসে থাকি তাহলে আজ আমি অভিশাপ দিচ্ছি আগামী দশটা বছরের মধ্যেই ওরা দুই ভাইয়ে লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন করে তিলে তিলে আমায় ওরা অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারছে ঠিক তেমনি করে পার্টনারশিপ নিয়ে সম্পত্তি নিয়ে, গাড়ী-বাড়ী নিয়ে অশান্তির আগুনে ওরা জ্বলে পুড়ে মরবে।"

সুদীপের পাশে দাঁড়িয়ে লতাও নীরবে অশ্রুপাত করে চলে। সত্যিই ভোলানাথ-শিবনাথ কি করে এমন অমানুষ হতে পারে তা লতা ভাবতেই পারে না। ভোলানাথ ফলমূল খেতে ভালবাসে বলে সুদীপের খাটের তলায় আমের সময় আম, লিচুর সময় লিচু, সবেদার সময় সবেদা, লেবুর সময় লেবু এনে সুদীপ জমা করে রাখে, কারণ সে জানে যে ভোলানাথ এসেই বলবে, "বৌদি আম কাট কিংবা লিচু ছাড়াও।" সেই ভোলানাথ! ভাইকে দিয়ে এমন খেলা খেলবে, এ-যে তারা ভাবতেও পারছে না। এক মানুষের ভালবাসা বা স্নেহের পরিমাণ নিক্তিতে মেপে অন্য মানুষ তো নিজেকে সংযত করে চলে না, তাই সংসারের বহু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, বহু অশান্তির বৃক্ষ শাখা বিস্তার করে। স্নেহের মূল্য, ভালবাসার মূল্য সবাই যদি সমান শ্রদ্ধা দিয়ে বা সম্মান দিয়ে পূরণ করে দিতে পারত তা হলে সংসারের বহু অনর্থের সমাধান আপনা-আপনিই হয়ে যেত, কিন্তু তা যখন হবার নয় তখন এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করবে ততদিন তাকে ঘিরে থাকবে বহু রকমের ক্লেশ, বহু ধরনের কলুষ, বহুবিধ তিক্ততা ও বিবিধ হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা। সংসারের অত্যন্ত দীনহীন অবস্থা থেকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে, অনাহারের জ্বালা অবদমন করে, অপরের অপমান পরিপাক করে কণ্টক—গুল্মাবৃত পথ দিয়ে হেঁটে অবশেষে যারা সহজ-সচ্ছন্দ-সরল কাঁচামাটির পথে এসে দাঁড়িয়েছে তারা পারে না মানুষকে এভাবে চট করে অপমান করতে, কারণ তারা নিজের জীবন দিয়ে মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারে অপর মানুষের দুঃখ, অপর মানুষের ব্যথা, তার অন্তরের ক্লেশ। সুদীপ সেটা জানে, তাই তার অত বড় অপমানের আঘাতে নিজের অন্তরটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেও মুখের উপর শিবনাথকে বলতে পারল না—তোর বাবার সেবা করতে গিয়েই আমায় পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে, বলতে পারল না যে, তুই যখন শৈলেন মুখুজ্যের নার্সিং হোমে ছিলি তখন টি. বি. হয়েছে ভেবে তোর কোন আত্মীয়-স্বজন তোর কাছে ঘেঁষত না। তখন আমি ছাড়া তোদের গতি ছিল না।" কিন্তু শিবনাথ জ্ঞান হয়ে থেকে দেখছে যে, ধন-মান-ঐশ্বর্য্যে তাদের সংসার পরিপূর্ণ, ভাল জামা-কাপড় পরবার জন্য তাকে কোন লড়াই করতে হয় নি, তাই কোন কথা বললে কাকে কতটা অপমান বাজে সে-জ্ঞান তার হবে কেমন করে? শিবনাথের আদৌ সে জ্ঞান নেই, তাছাড়া অশিক্ষা ও বয়স অনুপাতে প্রচুর পয়সা হাতে পড়লে যা হয় তার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে সুদীপ ও লতা অতীত দিনের কথাগুলো ভাবছিল এমন সময় আবার শিবনাথের টেলিফোন এল এবং টেলিফোনটা তুলে কোনরকমে

'হ্যালো' করলে ওদিক থেকে শিবনাথ বলল, "আমি লোক পাঠিয়েছি, তার হাতে স্ট্যাম্প পেপারগুলো দিয়ে দিও, আমার উকিলকে দিয়ে ডিড ড্রাফট করিয়ে সোমবার রেজিষ্ট্রি করিয়ে দেব, আর গোডাউনটা যেমন বলেছি ঐ রকমই হবে।" শিবনাথের গলা শুনেই সুদীপের ইচ্ছা করছিল টেলিফোনটা ছেড়ে দেয়, কিন্তু সেটাও অভদ্রতা হবে ভেবে কোনও রকমে কাঁপা হাতে টেলিফোনটা ধরে সামান্য একটা "আচ্ছা" বলে রিসিভার-আর্মটা নামিয়ে রাখল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবনাথের ভাইপো ভোলানাথের ছেলে সুকান্ত এসে পৌছুলে তার হাতে ষ্ট্যাম্প পেপারগুলো দিয়ে দিল। ষ্ট্যাম্প পেপারগুলো দিয়ে সুকান্ত চলে গেলে সুদীপ লতাকে বলল, "এক বালতি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস, আমি স্নান করব।" এর পর জামা-পাজামা খুলে একখানা গামছা পরে চেয়ারে বসে বসেই সুদীপ স্নান সেরে গা-হাত মুছলো। স্নানের পরে পূর্বদিকের জানালার দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষন এ-ভাবে বসে থাকার পর "সুদীপ' সুদীপ', ডাক শুনে বুঝল তার বাল্যবন্ধু গ্রামেরই ব্যোমকেশ এসে হাজির হয়েছে, সঙ্গে লতার জ্যাঠতুতো ভাই বিষ্ণুচরণ। সুদীপ বুঝতে পারল ওরা তাসখেলার জন্য এসেছে। শনিবার বিকেলে ও রবিবার প্রায় সারাদিনই সুদীপের বাড়াতে তাসের আড্ডা বসে। অসমর্থ পায়ে তার কোথাও বাইরে বেড়িয়ে বেড়াবার বা সিনেমা থিয়েটার দেখতে যাবার উপায় নাই বলে সপ্তাহান্তে বাড়ীতে এই তাসের আড্ডা। সুদীপকে ভালবাসে বলে ব্যোম ও বিষ্ণু নিয়মিতভাবে আসে এবং সুদীপ ও ব্যোম একদিকে আর বিষ্ণু ও অদীপ কিংবা বিষ্ণু ও অজিত আর একদিকে এই জুটিতে তাস খেলা চলে। আজ তাই ওরা এসেছে দেখে সুদীপ আগ্রহের সঙ্গে ওদের বসতে বলে লতাকে ডেকে বলল, "তাসটা দিয়ে যাও, আর অজিতকে ডেকে দাও।" কিছুক্ষণের মধ্যে তাস হাতে অজিত এসে ঘরে ঢুকলে তাস খেলা শুরু হয়ে গেল। আরও কিছুক্ষন পরে লতা চারটি প্লেটে সামান্য মুড়ি, খানচারেক করে বেগুনি, অমৃতি ও সন্দেশ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে দেখে তাসের খেলা দারুণ জমে উঠেছে আর ভুল খেলার জন্য ব্যোমকেশ সুদীপের কাছে গালাগালি খেয়ে মরছে। সব দেখেশুনে লতা ভাবে ভালই হয়েছে, তাসে বসে তবু সুদীপ কিছুক্ষণ সব ভুলে থাকতে পারবে। সে তাসের অতিথিদের মনে-মনে ধন্যবাদই জানায় এবং খাবারের প্লেটগুলো হাতে-হাতে ধরিয়ে দিয়ে পাশে একটা টেবিলে চার গ্লাস জল রেখে বের হয়ে যায়।

মানুষ যেমন তাস-লুডো খেলে, দান অনুযায়ী হারে-জেতে, ভাল খেলোয়াড়েরও ভাগ্যের দোষে যেমন অনেক সময়েই হার হয়, ব্রহ্মাণ্ডের মহাকালও তেমনি মানুষের জন্য দান ঠিক করে রাখেন আর মানুষ চলার পথে যে যেমন দান সময়ের হাত

থেকে তুলে নেয় তার জীবন তেমনি চলে, কারও বা গড়িয়ে-গড়িয়ে, আবার কারও বা রমরম করে। অনেকের সারা জীবনেও হয়ত ভাল দান অর্থাৎ ভাল সুযোগ আসে না, তাই সারা জীবন 'হায় ভগবান হা ঈশ্বর' করেই তাদের কাটাতে হয়, আবার কেউ কেউ স্বাভাবিক সুযোগ ছাড়াও অন্ধকার পথে চোরা পথে অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে নেয় আর এই সুযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক সময়েই অনেক অন্যায় কাজ করতে হয়, অধর্ম করতে হয়, কিন্তু তবু তারা অপরকে বঞ্চিত করেও অস্বাভাবিক সেই সুযোগকে গায়ের জোরে অধিকার করে নেয়, কব্জা করে নেয়, ফলে পৃথিবীতে সাধারণজনের নিকট হয়ত সাময়িক বুদ্ধিমত্তা বা চালাকির জন্য প্রশংসা পেয়ে থাকে, কিন্তু আখেরে তাদের জমার খাতাটি থাকে শূন্য। অপর পক্ষে যে সে-সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় বা অন্যায়ের জোরে সুযোগ গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ হয় তার জীবন হয়ত মৃদুছন্দে চলে, দুঃখদৈন্যের মধ্য দিয়ে কাটে, কিন্তু তবু তার নৈতিক বল সব সময়েই থাকে অনেক উচ্চে আর এই পৃথিবীর মহাধর্মাধিকরণের এজলাসে তাঁর নামের পাশে থাকে লাল তারা চিহ্ন। জীবৎকালে হয়ত সাধারণ মানুষ তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে লোকটা অকর্মার ঢেঁকি, কিন্তু মৃত্যুর পর আলোর দেশে তার নাম লেখা হয় উজ্জ্বল অক্ষরে আর বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষেরা তখন তার উদ্দেশে ইঙ্গিত করে বলে যে, লোকটা সত্যিই সৎ ছিল।

সুদীপ ও শিবনাথের ক্ষেত্রে তাই। শিবনাথ গায়ের জোরে উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীটের গোডাউনটা অধিকার করে নিয়ে দলিল সই করে দিয়ে সুদীপকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করলেও নৈতিক দিক থেকে সুদীপকে একটুও ছোট করতে পারল না, কারণ আশৈশব সুদীপ ছিল খাঁটি হীরের টুকরো, তাই গোডাউনের সামান্যতম অংশ পেয়ে আর দোকানটুকু পেয়েই খুশী। মাসতুতো ভাই শিবনাথ যে তার এতবড় অনিষ্টটা করল তার জন্য যেটুকু ক্ষোভ সুদীপের মনের কোণে সঞ্চিত হয়েছিল সেটুকু কয়েকদিনের মধ্যেই ভুলে গেল। দোকান রেজিষ্ট্রী হয়ে যাওয়ার পর সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় দোকানে বসে সুদীপের হঠাৎ কুসুমদিদির কথা মনে পড়ল। তার মনে পড়ল প্রায় বিশ বছর আগে একদিন কুসুমদিদিই তার মঙ্গল কামনা করে বলেছিলেন—কলকাতায় তোমার সম্পত্তি হবে, নিজস্ব দোকান হবে। এই পরিণত বয়সের পরিণত বুদ্ধিতে কুসুমদিদির কথা খেয়াল হতে সুদীপ বুঝতে পারে কুসুমদিদি সেদিন আন্তরিক ভাবে ভালবেসেই তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তাই সে বড়বাজারে যে-দোকানে একদিন মাসে দশ টাকা বেতনে চাকরী করেছিল সেই নন্দী কোম্পানীর মালিক আজ সে, যে-বাড়ীতে মাসে আঠাশ টাকা ভাড়ায় ভাড়াটে হয়ে এসেছিল সেই বাড়ীর মালিক। কুসুমের কথা মনে

পড়ে যেতেই হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে সুদীপ রামকে বলল, "সাড়ে সাতটা বাজে, তুই দোকান বন্ধ করে চাবিটা নিয়ে বাড়ীতে চল, আমি একটু অন্য জায়গায় যাচ্ছি।"

দোকান থেকে বের হয়ে রিক্সা ভাড়া করে অজিতকে সঙ্গে নিয়ে সুদীপ সোজা চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে কুসুমের বাসার নিকট এসে দাঁড়িয়ে অজিতকে খোঁজ করতে পাঠাল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই অজিত ফিরে এসে খবর দিল—"তিনি এখানে নেই, বছর পনর আগে বেনারসে গিয়ে বাসা নিয়েছিলেন এবং একদিন সেখানেই দেহ রেখেছেন।" কথাটা অজিতের মুখ থেকে শুনে সুদীপের মনটা ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে উঠল, তার বুক ঠেলে কান্না উঠতে চাইল কিন্তু নিরুপায় সুদীপের অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকল না। বিগত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে নিজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, মাঝে মধ্যে নন্দীবাবুর মারফত কুসুমের খোঁজ নেওয়া ছাড়া তার সঙ্গে সুদীপ দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে নি, আজ আনন্দের দিনে যে কুসুমদিদিকে তার আনন্দের অংশভাগী করবে বলে খোঁড়া পায়ে রিক্সায় চড়ে এখান পর্য্যন্ত এসেছিল সেই কুসুমদিদিই এখন পৃথিবীর মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অমৃতলোকে বিচরণ করছেন। সুদীপ মনে মনে সেই অমৃতলোক-বাসিনীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

দোকানের মালিকানা নিজস্ব হওয়ার পর সুদীপ বর্দ্ধমানের অনিল রায় মশায়কে পূর্বনির্দ্ধারিত কথা মত তাঁর মেয়েকে দেখাবার জন্য অনুরোধ করে পত্র লেখে এবং যথাসময়ে তিনি কনিষ্ঠা কন্যা নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এক আত্মীয়ার বাড়ীতে হাজির হন। কন্যা দেখে সুদীপ ও লতার পছন্দ হয় এবং সুদীপ তার বাবা সতীন্দ্রবাবুকে পত্র মারফত সব জানিয়ে তাঁর মতামত চেয়ে পাঠায়। তাঁকে বর্দ্ধমানে গিয়ে একবার কন্যা দেখবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি সুদীপের মতামতই তাঁর মতামত বলে পত্রের উত্তরে জানান। কন্যা পছন্দ হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই আশীর্বাদের দিনও নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। অনিলবাবু, তাঁর বড়দা তারাশঙ্করবাবু, দুই ভাই সুনীল ও রাজকুমার সকলে এসে পাত্র অনির্বাণকে আশীর্বাদ করে যান। তারপর সুদীপ লতা ও অধীপকে সঙ্গে নিয়ে নমিতাকে আশীর্বাদ করতে বর্দ্ধমান যায়। বর্দ্ধমানে গিয়ে সুদীপ ভোলানাথকে সঙ্গে নেয় এবং সকলে মিলে অনিলবাবুর বাজেপ্রতাপপুরের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। পঞ্জিকানির্দ্দেশিত সময়ের সঙ্গে ঘড়িতে সময় মিলিয়ে নিয়ে সর্বপ্রথম আশীর্বাদ করে সুদীপ। পায়ের অসুবিধা থাকায় সুদীপ একখানি চেয়ারে বসেছিল এবং নমিতা সামনের একখানি আসনে। সুদীপ ঐ চেয়ারে-বসা অবস্থাতেই নীচু হয়ে

তাম্রপাত্র থেকে ধানদূর্বা তুলতে চান দেখে নমিতা তাড়াতাড়ি তাম্রপাত্রখানি তাঁর হাতের কাছে তুলে ধরল। সুদীপের অসুবিধার কথা ভেবে নমিতা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাম্রপাত্র তুলে ধরায় সুদীপ বুঝতে পারে তার ভাবী পুত্রবধূ বুদ্ধিমতী এবং সেবাপরায়ণা। মুহূর্তের মধ্যে নমিতা তার অন্তরে আরেকটি কন্যার স্থান করে নিল। সুদীপের আশীর্বাদ শেষে লতা, ভোলানাথ ও অধীপ সকলে পর পর কন্যাকে আশীর্বাদ করল। এরপর মিষ্টিমুখ ও দ্বিপ্রাহরিক ভূরিভোজনান্তে বিকালের দিকে সকলে কলকাতায় ফিরবার আগে বিবাহের দিন স্থির হল ফাল্গুন মাসে। আশীর্বাদ হল চব্বিশে জ্যৈষ্ঠ আর বিবাহ হবে ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ প্রায় আট-মাস বাদে। অনিলবাবুর বড় ভাই সুদীপকে বিবাহের সময়টা এগিয়ে দিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে করতে অনুরোধ করলে সুদীপ হাসতে-হাসতে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "ভয় নাই বেয়াইমশায়, আমিও দুই কন্যার পিতা, আপনাদের অন্তরের কথা আমারও জানা। সুতরাং যে অবস্থাই আসুক আমার কথার কোন নড়চড় হবে না।" এর পর রসিকতা করে আরও বলল, "তা ছাড়া জানেন তো আমি বড়বাজারের ব্যবসাদার, যে-মাল একবার বিক্রী করি সে-মাল আর ফেরত নিই না, ছেলেকে যখন একবার আপনাদের কাছে বিক্রী করে গেলাম তখন সে-ছেলেকে আর কোথাও বিক্রী করব না।" সুদীপের এই হাস্যোচ্ছল রসিকতায় সকলেই হো-হো করে হেসে ওঠে। এরপর সুদীপ, লতা, অধীপ ও ভোলানাথ বিদায় নিল।

সুদীপ জানে মর্য্যাদার আসন না পেলে মানুষের কর্ম্মের মধ্যে কোন উৎসাহ থাকে না, তাই বয়সে কম হলেও কর্মীকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। তা ছাড়া অনির্বাণ ছেলে হিসাবেও খারাপ নয়, লেখাপড়াতে সে সুদীপের বংশে প্রথম গ্র্যাজুয়েট, ব্যবহারে নম্র, স্পষ্টবাদী এবং কর্মতৎপরও বটে, তাই নন্দী এণ্ড কোম্পানীর প্রোপ্রাইটর হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই সুদীপ অনির্বাণকেও নন্দী এণ্ড কোম্পানীর পার্টনার করে নিল। তাকে চেকে সই করবার অধিকার দিল এবং সেলসট্যাক্স ও ইনকামট্যাক্সের জন্য সমস্ত খাতাপত্র অর্থাৎ বিল বুক, লেজার বুক, ক্যাশ রেজিষ্টার, জার্ণাল সেলস্-ট্যাক্স রেজিষ্টার ইত্যাদি সব কিছুই কেমন করে লিখতে হয় তা হাতে ধরে শেখাল এবং এ বিষয়ে দোকানের একাউন্ট্যান্ট অনিল নাথ মশায়কে নির্দেশ দিল অনির্বাণকে সঙ্গে নিয়ে সব কাজ শেখাবার জন্য।

অনির্বাণ অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধৈর্য্যশীল ছেলে, তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সব বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করল। কারখানার কাজকর্ম তদারকি ক'রে যেটুকু সময় হাতে পায় সেটুকু সময় সে দোকানের কাজের তদারকি করে। আসলে তার বাবার নির্দ্দেশে অনির্বাণও অক্লান্তভাবে খাটে। সে জানে পার্টনারদের টাকা

মেটাতে গিয়ে বাবাকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে, তাই না খাটলে এই পাল-ছেঁড়া তরীকে স্রোতের উজানে ঠেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া জ্ঞান হওয়া অবধি সে দেখে এসেছে তার বাবা ঐ অক্ষম পঙ্গু অসহায় অবস্থাতেও লোকের কোলে চেপে রিক্সায় চড়ে নিত্য কিভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করে দোকানটাকে দাঁড় করিয়েছিলেন। এখন দোকান নিজেদের, এর মরণ-বাঁচন সম্পূর্ণ নিজেদেরই হাতে, তাই যতক্ষণ দোকানে থাকে ততক্ষণ জাল ধরা, মাপা, কাটা, গোডাউনে গিয়ে মাল ডেলিভারী দেওয়া, মুটের মাথায় মাল তুলে দেওয়া এমন কি প্রয়োজন বোধে নিজের শারীরিক শক্তির মধ্যে হলে ঘাড়ে করে মাল বয়ে নিয়ে আসা, দিয়ে আসা, কোন কাজেই সে পিছ-পা নয়। তাকে দেখে আশপাশের দোকানদাররা যারা তার পরিচয় জানে না তারা সবাই ভাবে এও এক কর্মচারী।

কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে প্রচার হয়ে গেল নন্দী কোম্পানীর মালিক এখন সুদীপ দত্ত। খুব ছোটবেলা থেকে যারা ঐ বাজারে বসে দেখছে, যারা তার কর্মকুশলতা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতো, তারা অনেকেই টেলিফোনে বা সামনে এসে সুদীপকে অভিনন্দন জানাল, আবার বলরাম ও ভব বিলাস পালের মত পরশ্রীকাতর অনেকেই তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিল। কিন্তু কয়েকজন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হলে সুদীপের কিছু আসে-যায় না, কারণ সে জানে যে, তার মত মানুষের পৃথিবীতে জন্মানোর অর্থ ই হল লড়াই করে বাঁচা। আদি-কাল হতেই জীবজগতের একপক্ষ লড়াই করে বাঁচতে চায় আর একপক্ষ পিছন থেকে তাদের পা ধরে টেনে ফেলে দিতে চায়। সুদীপের মত ধৈর্য্যশীল, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, বিচক্ষণ, উদারহৃদয়, স্থিতপ্রজ্ঞ ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষের তাতে কিছু আসে যায় না। এরা পৃথিবীতে চিরকাল শুধু গড়ে যেতেই আসে আর এদের সংস্পর্শে এসে অনেকের কলুষিত চরিত্রও পরিশোধিত হয়ে যায়। কঠোর পরিশ্রম করেই সুদীপ মাস-চারেকের মধ্যে কাকুভাইয়ের টাকা শোধ করে দিল এবং শান্ত মনে দোকান চালাতে লাগল। সম্পূর্ণ নিজের মতে চলতে পারায় মাস ছয়েকের মধ্যেই দোকানের চেহারাটা বদলে গেল। অভিজ্ঞ, সংযত, পরিশ্রমী, গঠনশীল মানুষের হাতের ছোঁয়ায় যে-কোন প্রতিষ্ঠানই দিনে-দিনে এইরকম খ্যাত হয়ে ওঠে। সুদীপের খ্যাতি এত বিস্তৃতি লাভ করল যে বাজারের অনেকেই এখন নিজেদের সামান্য বা বৃহৎ অনেক সমস্যার সমাধানের জন্য সুদীপের মতামত চাইতে আসে। সুদীপের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যত বর্ধিত হয় বলরাম ও তার বন্ধুরা তত মরীয়া হয়ে ওঠে বিভিন্ন ভাবে তার ক্ষতি করবার জন্যে, কিন্তু মূর্খরা বোঝে না যে, যার চরিত্রকে কোন কলুষতাই কোনদিন স্পর্শ করে নাই তার

সহায়ক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তাই শত্রুদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সুদীপের শ্রীবৃদ্ধিই হতে থাকে।

দেখতে-দেখতে ফাল্গুন মাসের একুশ তারিখ এসে যায়। ঐ দিন অর্থাৎ তেরশ' বাহাত্তর সালের একুশে ফাল্গুন অনির্বাণের শুভবিবাহের দিনটি এসে হাজির হয়। যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আছে একমাত্র পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে সুদীপ তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই অনির্বাণের বিবাহকার্য্য সমাধা করল। বিবাহ ঘটিত সকল উৎসব সমাধা হওয়ার পূর্বেই লোকপরম্পরায় সুদীপ শুনতে পেল যে, অধীপ তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে নেশায় মশগুল হয়ে বৈবাহিকদের বাড়ীতে গিয়ে লোকজনকে দেখে-শুনে ঠিকমত না খাওয়ানোর ফলে কিছু-কিছু লোক বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে আছে, তাই সুদীপ তার নিজের বাড়ীতে অষ্টদিবস ব্যাপী দীন-দুঃখী দরিদ্র-ধনী সকলকেই ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করল এবং সকলের সাধুবাদ ও আন্তরিক আশীর্বাদ কুড়িয়ে কলকাতায় ফিরে সে অধীপের জন্য একটু চিন্তান্বিত হল, কারণ সে ভাবল এই বয়স থেকেই যদি অধীপ নেশাভাঙ্গ করতে থাকে, তো ভবিষ্যতে সে বংশের কলঙ্কস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। এই প্রসঙ্গে চিন্তা করতে গিয়ে তার খেয়াল হল অধীপ যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ত অর্থাৎ যখন তার মাত্র এগার বছর বয়স তখনই তার প্যান্টের পকেট থেকে বিড়ি বের হয়েছিল সে জন্যে সুদীপ অধীপকে যথেষ্ট শাসন পর্য্যন্ত করেছিল। সেই অধীপ বয়সকালে যে বিড়ি ছেড়ে গাঁজা ও মদ ধরবে তা সুদীপ ভাবতেই পারে নি। তাই ভাইয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাকে ডেকে একদিন বলল, "অধীপ তুই যথেষ্ট বড় হয়েছিস, লেখাপড়াও খানিকটা শিখেছিস, নিজের ভালমন্দ বোঝবার যথেষ্ট বয়স তোর হয়েছে। ওসব বাজে ব্যাপার করে নিজের জীবনটা ও শরীরটা নষ্ট করিস না। অনির্বাণের বিয়ের দিনে তুই তোর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বরযাত্রী হয়ে যাবার সময় যা করেছিস তা শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছে। ভবিষ্যতে আর যেন এ-রকমটা না হয়।" সুদীপের কথার কোন জবাবই অধীপ দিতে পারে না, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনে সেখান থেকে চলে যায়। বড়দার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে ছোটবেলা থেকেই সে ভয় ও শ্রদ্ধা করে এসেছে। অধীপ সেখান থেকে চলে গেলেও সুদীপ তার সম্বন্ধেই ভাবতে থাকে। সুদীপ জানে খারাপ নেশায় একবার কাউকে ধরলে সে-নেশার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তাছাড়া মদের নেশার মত বদ নেশা পৃথিবীতে আর দুটি নাই। সুদীপ

অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, মদের নেশায় পড়ে কত ভাল ভাল লোকের পতন সে নিজের চোখে দেখেছে, তাই ছোট ভাই অধীপের জন্য ভিতরে ভিতরে তার চিন্তা হল।

একদিন দুপুরে সুদীপ দোকানে বসে আছে এমন সময় বলরামের ভাই ঘনশ্যাম এসে হাজির। সে সুদীপকে বলল, "দাদা তো দোকানটাকে প্রায় নষ্ট করে দিচ্ছে। আমার লভ্যাংশের টাকাকড়িরও হিসাবনিকাশ করছে না। কিছু বললেই বলছে. দোকানে এখন লোকসান হচ্ছে। কি করি বলতো সুদীপদা ?" ঘনশ্যামের কথায় সুদীপ তার দিকে চেয়ে বলল, "ভাই.এটা তোমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে আমার মতামত দেওয়ার কিছুই নাই।" সুদীপ এড়িয়ে যেতে চায় দেখে ঘনশ্যাম আবার বলল, "তুমি থাকতে ঐ দোকানে কত রোজগার হয়েছে, ভবানীপুরে বিরাট একখানা তিনতলা বাড়ী হয়েছে, দেশে জমিজায়গা হয়েছে আর আজ দশ বছর যেই তুমি দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছ অমনি সব লোকসান! আসলে আমার মনে হয় দাদা সব সরাচ্ছে, নিজের ছেলের জন্য কাজ গুছিয়ে রাখছে।" ঘনশ্যামের একথাতেও সুদীপ কোন কথা বলতে চায় না দেখে ঘনশ্যাম উঠে .পড়ল এবং যাবার সময় আপন মনেই গজগজ করতে থাকল, "আমিও দেখে নেব, আমারও নাম ঘনশ্যাম হাজরা, সুতরাং আমার দাদা কত বড় শয়তান হয়েছে তা আমি দেখে নেব।" নিজের মনে গজগজ করতে-করতে ঘনশ্যাম নেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নারকেলডাঙ্গার এক জাল কারখানার মালিক সুধীর সাঁতরা এসে হাজির হল এবং বিষণ্ণকণ্ঠে সুদীপকে বলল, "জানেন দাদা, আমার ভাই রাগ করে আমার সঙ্গে পৃথক হয়ে আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের কারখানা মাত্র পনর হাজার টাকায় রসিকলাল জৈনের হাতে তুলে দিল। আমার হাজার নিষেধ শুনল না।" সুদীপ সুধীরের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'এ তো বাঙালীর চরিত্রেই রয়েছে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। এর আর তুমি কি করবে। কেউ যদি নিজের ক্ষতিটাও নিজে না বোঝে তার করার কি আছে বল। তা ছাড়া তুমি পৃথক হওয়ার আগে বললে পারতে, তোমার ভাই প্রবীরকে একবার বুঝিয়ে বলতাম।" এরপর আরও কিছু টুকিটাকি কথাবার্ত্তার পর সুধীর চলে গেলে সুদীপ নিজের কাজে মন দিল।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সাধুরাম ও নিধিরাম মণ্ডল দুই ভাই সুদীপের বাড়ীতে হাজির। তাদের সমস্যাও সুধীর সাঁতরার মতই। তবে সুধীর এসেছিল ভাইকে আলাদা করে দেওয়ার পর, আর এরা দুই ভাইয়ে এসেছে

পৃথক হওয়ার আগেই, তাই সুধীরের ভাইয়ের মতই নিধিরামের চিন্তাধারা অর্থাৎ-নগদ টাকার লোভে অবাঙালীর হাতে কারখানাটা তুলে দেবার আগেই সাধুরাম-জোর করে তাকে ধরে নিয়ে এসেছে সুদীপের নিকট সালিশীর জন্য। অনেক কথাবার্ত্তার পর সবশেষে ঠিক হল সাধুরাম-নিধিরাম দুজনে বাড়ীতে পৃথক হলেও কারখানাটা পার্টনারশিপেই চালাবে এবং লভ্যাংশ সমানভাবে ভাগ করে নেবে। আগে চেকে সই করবার অধিকার শুধু সাধুরামের ছিল, এবার থেকে নিধিরামও সে অধিকার পাবে। কারখানার কাজকর্ম্ম দেখবে সাধুরাম আর বাজারের কাজকর্ম্ম দেখবে নিধিরাম। সুদীপ এইভাবে ফয়সালা করে দেওয়ায় দুই ভাইয়ে খুশী মনে বাড়ী ফিরে গেল এবং দুই ভাইয়ের সংসারের খাওয়া-দাওয়া সব পৃথক-পৃথক হওয়ায় বৌয়ে-বৌয়ে নিত্যনৈমিত্তিক দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে বরং শান্তির পরিবেশ ফিরে এল আর দুই ভাইয়ে শান্তিতে কারবার দেখাশোনা করে ক্রমশঃ উন্নতি করতে লাগল।

আজকাল দোকানের কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করার পরেও সুদীপকে নিত্য একটা-না-একটা ঝগড়া-ঝাঁটির সালিশীও করে দিতে হয়, এ ছাড়া সামনে উনিশশো ছেষট্টির এপ্রিল মাসে লিপিকার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। লিপি পড়া-শুনায় মোটামুটি ভালই, সে যাতে ভালভাবে পাশ করে তাই সুদীপ প্রত্যহ দোকান থেকে ফিরে স্নান-টান করে লিপিকে পড়াতে বসে, তার সময়ের কোন হিসাব থাকে না। কোনদিন রাত্রি বারটা, কোনদিন রাত্রি একটাও হয়ে যায়। বাড়ীর সকলেই তার এই পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণকে স্বস্তির সঙ্গে অনুমোদন করতে পারে না। তাই পত্নী লতা ও পুত্র অনির্বাণ বার বার সুদীপকে নিষেধ করে, কিন্তু কে শোনে কার কথা, জীবনে কর্ম্মই যাদের নেশা তারা কি পারে চুপচাপ বসে থাকতে আবার সামনে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম জমা থাকে? তাই সুদীপও পারে না চুপচাপ থাকতে। লিপিকে পড়াতে তার যেন কোন ক্লান্তি আসে না। এক রাত্রে লিপিকে পড়াতে-পড়াতে একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ সিগারেটে টান দেবার পর হঠাৎ সুদীপের মনে হয় বুকের বাঁ দিকটা কেমন যেন চিনচিন করে উঠল, আস্তে-আস্তে ব্যথাটা বাড়তে লাগল এবং একটা অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি যেন বুক থেকে বাম বাহু দিয়ে উঠে নামতে-নামতে একেবারে বামহাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নেমে এল; কি রকম যেন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণাময় অবস্থা। সেদিন সুদীপ আর পড়াতে পারল না। লতাকে ডেকে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু পরদিন সকালে লিপিকে পড়াতে বসে, আবার সেই রকম যন্ত্রণা। সেদিন দোকানে গিয়েও যন্ত্রণাটা আবার হল। অনির্বাণ বার বার বলল, "ডাক্তার ডাকি"; কিন্তু সুদীপ হাত নেড়ে তাকে নিষেধ

করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রণা চলে যেতে সুদীপ নিজের কাজে মন দিল। সুদীপ এমনিই, জীবনের কোন যন্ত্রণাই তাকে যেন পরাস্ত করতে পারবে না, এমনিই তার মনের জোর। এদিকে দেখতে-দেখতে লিপির পরীক্ষাও হয়ে গেল। লিপির পরীক্ষা হয়ে যেতেই অনির্বাণ মা লতাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের বাড়ীর ডাক্তার কমলেন্দুবাবুকে নিয়ে এল। তিনি সুদীপকে পরীক্ষা করে বললেন, "ও কিছু নয়, ভিতরে-ভিতরে অম্ল জমেছে তাই ও-রকম হচ্ছে, বুকে চাপ দিচ্ছে।" বলে হজমের ওষুধ টাকাজাইম খেতে বললেন। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর সুদীপ হাসিমুখেই সকলকে বলল, "তোমরা সবাই কেবল ডাক্তার-ডাক্তার করছিলে, দেখলে তো আমার কিছুই হয় নি।" সুদীপ ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নিলেও তা কিন্তু অতটা হাল্কা ছিল না, মাঝে-মাঝেই সুদীপের ঐ যন্ত্রণাটা হতে লাগল। একদিন দোকানে আবার ঐ রকম যন্ত্রণা হতে অনির্ব্বাণ বাবাকে বলল, "আপনি দু-চারদিন বাড়ীতে বিশ্রাম করুন না, দোকানে আমি তো রয়েছি।" সুদীপ তার কথা শুনে বলল, "তা হলেই হয়েছে, তুই চালাবি দোকান! আর আমি বিশ্রাম নেব বিছানায় শুয়ে! মরতে যদি হয়, এই দোকানে চেয়ারে বসেই মরব, বিছানায় শুয়ে আর তোদের সেবাযত্ন নেব না।" অনির্বাণ জানতো বাবা কি রকম জেদী মানুষ, তাই অন্তরের মধ্যে স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত হলেও বাবা যে বাইরে তার প্রকাশ ঘটাবেন না এটা বাবার ঐ "তুই চালাবি দোকান" শুনেই বুঝতে পারল। তা ছাড়া সেবাযত্ন, সে তো যে কটা মাস প্লাষ্টার করা অবস্থায় নিরুপায় হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল সেই কটা মাস। এ ছাড়া সুদীপ কাউকে কোনদিন বিরক্ত করে নাই।

লিপির পরীক্ষার পর এদিকে দেখতে-দেখতে তিন মাস কেটে গেল, এল তিরিশে জুলাই। ঐ দিন লিপির পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল, মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য লিপি ফার্ষ্ট ডিভিশন পেল না, তাই নিয়ে সুদীপের দুঃখের শেষ রইল না, আর লিপিও খুব কষ্ট পেল। যাই হোক, মেয়ে পাশ করেছে, তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে সুদীপ কিছুটা খুশী। রেজাল্ট জানার পর থেকে মিষ্টি আনিয়ে কাছের বন্ধু-বান্ধব সকলকে ডেকে-ডেকে মিষ্টি খাওয়াতে লাগল এবং দূরের বন্ধু ডাঃ দাশগুপ্তকে, কাকুভাইকে, মাসতুতো ভাই ভোলানাথকে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানাল মিষ্টিমুখ করে যাবার জন্য। বিকালের মধ্যে সকলেই এলেন। এলেন না কেবল ডাঃ দাশগুপ্ত, কারণ হাসপাতালে ঐ দিনে তাঁর অপারেশন ডেট ছিল। যাই হোক, পরের দিন অর্থাৎ রবিবার আসবেন বলে কথা দিলেন।

সকাল বেলায় রেজাল্ট বেরিয়েছে, তাই সারাদিনই প্রায় সুদীপ ও লতার এবং বাড়ীর সকলের মধ্যে খুশী-খুশী ভাব। বিকেলে বন্ধুবান্ধবরা সকলে চলে গেলে সুদীপ ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দু-পাশে একদিকের রেলিং আর একদিকের দেওয়াল ধরে-ধরে ছাদে উঠল এবং লতাও তার সঙ্গে ছাদে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাবার ডাক শুনে অনির্ব্বাণ ও নমিতা ছাদে গিয়ে হাজির হল। সুদীপ অনির্ব্বাণকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তোর রেকর্ড প্লেয়ারটা এনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজা, আমি শুনব।" অনির্বাণ বাবার হুকুম মত রেকর্ড-প্লেয়ার আনতে গেলে নমিতাকে উদ্দেশ করে বলল, "যাও না মা, বেড়াতে যাবার ইচ্ছা করে তো অনির্বাণকে বলগে যাও কোথাও ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।" শ্বশুরের কথায় নমিতার চোখ দুটো আনন্দে চিক্ চিক্ করে উঠল, সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল, নামতে-নামতেই অনির্ব্বাণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল এবং বলল, "য়্যাই আমি বেড়াতে যাচ্ছি।" বলেই আর সেখানে না দাঁড়িয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে দোতলার মাঝের ঘরে ঢুকল। নমিতার কথা কিছু না বুঝতে পেরে অনির্বাণ তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল এবং সে সিঁড়ির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলে রেকর্ড-প্লেয়ার আর রেকর্ড হাতে ছাদে উঠে এল। ছাদে উঠে প্লেয়ারটা খুলতেই সুদীপ বেছে-বেছে একখানা লং প্লেয়িং রেকর্ড তার হাতে ধরিয়ে দিতেই অনির্বাণ প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতগায়ক সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পী পঙ্কজ মল্লিকের সেই রেকর্ডখানি লাগিয়ে সুইচ টিপে দিল। রেকর্ড ঘুরতে শুরু করলে অনির্ব্বাণ স্টাইলাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে স্টাইলাস আর্মটা তুলে রেকর্ডের উপর ধীরে-ধীরে নামিয়ে দিতেই সুললিত পৌরুষদৃপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে বেজে উঠল, "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।" রেকর্ড বাজতে শুরু করলে অনির্বাণ নীচে চলে গেল আর সুদীপ তৃপ্তিতে একবার "আঃ" করে লতার দিকে চেয়ে বলল, "ওঃ কতদিন আমি গান শুনি নি, কতদিন, কতদিন।" প্রথম গানের পর "আমার ভাঙ্গাপথের রাঙাধুলায়"; "তোমার বীণায় গান ছিল"; "জয় করে' তবু ভয় কেন তোর"; "আমি শ্রাবণ আকাশে ওই", "ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী" ইত্যাদি গান পর পর বাজতে থাকল। ছ-খানা গানের শেষে রেকর্ডটা সুদীপ উল্টে দিতেই আবার "যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি," "চরণ ধরিতে দিও গো আমারে" ইত্যাদি গানগুলি বাজতে থাকল। সুদীপ ও লতা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গানগুলি শুনতে লাগল। গান শুনে আকৃষ্ট হয়ে তিনতলার ভাড়াটিয়া সত্যহরি বাবুর স্ত্রীও এসে লতার পাশে বসল। গান শুনতে-শুনতে তার ভাষা শুনে তন্ময় চিত্তে সুদীপের একবার যেন মনে হল যেমন সঙ্গীতরচয়িতা তেমনি

কণ্ঠ-শিল্পী, দু-জনেই যেন দুটি হীরকখণ্ড। বহুদিন পরে সুদীপের অন্তরটা আজ অমৃত প্রবাহে ভরে গেল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ গান "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার", যখন বাজছিল তখন হঠাৎ লিপি এসে প্রশ্ন করল, "বাবুমণি, দাদা-বৌদি জিজ্ঞাসা করছে তারা বাইরে বেড়াতে যাবে কিনা।" লিপি সুদীপকে খুব ছোটবেলা থেকেই বাবুমণি বলে ডাকে। সেটা তার বাবুমণিরই শেখানো আদরের ডাক। লিপির কথার জবাবে সুদীপ বলল, "তোর দাদাকে উপরে পাঠিয়ে দে।" লিপির কথায় বাবার ডাকে অনির্বাণ উপরে এলে সুদীপ তাকে বলল, "বৌমাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়, দেখিস রাত করিস না যেন, তাড়াতাড়ি ফিরিস।"

সুদীপ স্বভাবগম্ভীর মানুষ, তাই অনির্বাণ ও নমিতা বাবার ভয়ে বেড়াতে যাবার কথা ভাবতেই পারত না। আজ বাবা নিজে থেকে বেড়াতে যাবার অনুমতি দিয়েছেন বলে অনুমতি পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ীর বের হয়ে খোলা আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসের স্পর্শ লাগিয়ে কলকাতার পথে তারা হারিয়ে গেল। অনির্বাণ ও বধূমাতা চলে যাওয়ার পর সুদীপ লতাকে বলল, "দেখ লতা, জীবনের অনেক কাজই হল, শুধু একটাই বাকী থেকে গেল,—মেয়েটার বিয়ে। লিপির বিয়েটা যদি দিয়ে যেতে পারতাম,"—বলতে-বলতে সুদীপের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। লতা সেই মুখের দিকে চেয়ে বলল, "এত চিন্তা করছ কেন? লিপি এই তো সবে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করল, অন্ততঃ বি. এ. টা পাশ করুক, তারপর যা হয় করো।" সুদীপ বলল, "কি জানি, লিপির ভাগ্যে কি আছে। কয়েক দিন থেকে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে লিপির বিয়ে হয়ত আমি দিয়ে যেতে পারব না।" সুদীপের এ-কথায় লতা ডান হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি তার মুখটা চাপা দিয়ে বলে উঠল, "ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলতে নেই। তুমি অমন ভাবে বললে আমার কষ্ট হয় বোঝো না?" লতার এ-কথা শুনে সুদীপ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে লতার ডান হাতখানা নিজের হাতের উপর তুলে নিয়ে ধীরে-ধীরে বলল, "সারাজীবন তোমাদের কত কষ্ট দিলাম, দৈন্যের দায়ে মাকে, সুরমাকে, কমলাকে কত কষ্টই না করতে হয়েছে আর বাড়ীতে বৌ হয়ে আসার কিছুদিন পর হতেই তোমাকে এই পঙ্গু স্বামীর সেবা করে দিন কাটাতে হচ্ছে। এমনই অভিশপ্ত আমার জীবন যে, তোমাদের কাউকেই অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যেও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি দিতে পারলাম না।" বলতে-বলতে সুদীপের কণ্ঠস্বরে অশ্রুর স্পর্শ লাগে, লতা তাড়াতাড়ি সুদীপের হাতটা ধরে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বলল, "সেবা তো নারীরই ধর্ম, বিশেষতঃ স্বামীর সেবা তো দেবসেবারই সমান। সুতরাং তাতে আমার কষ্ট হবে কেন? তুমি ওসব নিয়ে এত ভাবছ কেন? ওসব কথা

এখন থাক, তুমি একটু চুপ করে শান্তিতে বসে অন্য গল্প কর।” সুদীপ বলল “না লতা, আজ আর অন্য গল্প নয়। তোমাকে বলতে আর বেশীদিন সময় পাব না, তাই আজই সব বলে যাচ্ছি, শোন, দোকান কেনার সময় কাকুভাইয়ের নিকট চল্লিশ হাজার টাকা দেনা করেছিলাম। সে টাকা শোধ করে দিয়েছি। আমার বন্ধু শিবচাঁদবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য তিরিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছি আর কতকগুলো স্টেনলেশ স্টীল জালের জন্য পুনমচাঁদ জৈনকে আগাম কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া আছে। অনির্বাণ ছোট ছেলে, হঠাৎ আমার কিছু হয়ে গেলে অনি কি করবে না-করবে জানি না। তাই তোমাকে এ-কথাগুলো বলে গেলাম। দেখো হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়ে যায় তো কেউ যেন অনিকে ঠকিয়ে না নিয়ে যায়।” সুদীপের কথাগুলো শুনতে-শুনতে লতার চোখ দিয়ে বড় বড় বিন্দুতে জল ঝরে পড়ে। কারণ এই বাংলাদেশে স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁরই মুখ থেকে শুনে কঠিন হয়ে থাকতে পারে এমন মেয়ে বোধ হয় একটিও নেই। বাঙালী নারীর স্বভাবই এই, বিধাতা তাদের এমনি করেই গড়েছেন। দুঃখ-দৈন্যে পূর্ণ সংসারের কর্ম্মের যাবতীয় জঞ্জাল ঘেঁটে, সন্তানসন্ততি মানুষ করে, পাড়া-পড়শীর কটু-কাটব্য শুনে, পায়ে-পায়ে দুস্তর বাধা ঠেলে, শ্বশুর-শাশুড়ীর কঠিন শাসন মেনে, এমন কি, স্বামীর হাতের নিপীড়নের যন্ত্রণা সহ্য করেও এরা হাসিমুখে সংসারের জোয়ালটা নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে চলে। যে-স্বামী তাকে সারাজীবন দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিল সেই স্বামীরই যদি কেউ অকল্যাণ কামনা করে তো এরা এমনি করেই কাঁদে, এমনি করেই এদের নয়ন-সরসীর দুকূল প্লাবিত হয়ে ওঠে। সুদীপ নিজের শারীরিক ত্রুটির জন্য লতার কাছ হতে শুধু সেবাই নিয়েছে; লতাকে কিছুই দেয় নি বা দিতে পারে নি এ-কথা কোনদিন লতার মনের কোণেও আসে নি। লতা শুধু এই ভেবেই সান্ত্বনা পেয়েছে যে, এমন স্বামী ক'জন মেয়ে পায়। পৌরুষদৃপ্ত, সহনশীল, গরীব-দরদী, স্নেহপ্রবণ, গুরুজনদের প্রতি সদা শ্রদ্ধাশীল অথচ অন্ধকুসংস্কারমুক্ত মনের এমন মানুষ সংসারে কজন মেলে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুদীপ আবার বলল, “অধীপকেও নন্দী কোম্পানীর পার্টনার করে দিয়ে যেতাম, কিন্তু সে যে-পথে চলেছে তাতে তার নামে দোকানের অংশ লিখে দেওয়াও যা আর দোকানটাকে নষ্ট করতে দেওয়াও তাই। তা ছাড়া অধীপ খুব ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর, তাই ভবিষ্যতে কোনও রকমে এতটুকু স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অনির্বাণকে ভালবেসে ও মিলেমিশে চলতে পারবে না। আমার মনে হয়, এখনও আমায় কিছুটা ভয় করে বলে অধীপ সংসারে এমন কিছু অঘটন ঘটাতে পারে নি, না হলে ওর স্ত্রী যে ধরনের মেয়ে তাতে আমার অবর্ত্তমানে একটি বছরও ও অন্য

কারও সঙ্গে মিলেমিশে ঘর করবে বলে মনে হয় না।" সুদীপের একথায় লতা বলল, "ছাড় ওসব কথা, যখন যা হবার হবে, তা নিয়ে তোমায় এখন থেকে ভেবে এত উতলা হতে হবে না। চল এখন নীচে চল, সন্ধ্যা হয়ে এল।" লতার কথায় সুদীপ লতার হাত ধরে তার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে উঠে অত্যন্ত সাবধানে নীচতলায় নামল। লতা ও সুদীপ নামতেই ওপাশের বড় ঘর থেকে লিপি ও তার বন্ধু 'গোল' ছুটে এল। গোল হ'ল অঞ্জনা বাগচীকে দেওয়া লিপির আদরের নাম; ওরা দুই বন্ধু দুজনকে গোল বলে সম্বোধন করে। অঞ্জনা লিপিকে ও তার জ্যাঠা-মশায় জ্যাঠাইমাকে মিষ্টি দিতে এসেছিল, কারণ সেও লিপির সঙ্গে একই সঙ্গে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে। এরপর সুদীপ কন্যা লিপি ও তার বন্ধু অঞ্জনার সঙ্গে ভবিষ্যতের পড়াশুনা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল। লতা ঘরের আলমারীতে রাখা ঠাকুরের ছবির নিকট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূপ-ধূনা-প্রদীপ জেলে সন্ধ্যাকালীন নিত্যকর্ম্ম সেরে শঙ্খধ্বনি করে গলায় আঁচল জড়িয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করল।

পরদিন রবিবার। সকালে পূবের জানালার নিকট বসে সুদীপ একমনে যুগান্তর কাগজখানা দেখছিল এমন সময় সুদীপের বাম বাহুতে ও বুকের বাঁ দিকটায় একবার যন্ত্রণা হল। চেয়ারে বসে-বসে মুখটা নীচু করে সুদীপ যন্ত্রণাটা সহ্য করল। বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ ডাক্তার কমলেন্দু দাশগুপ্ত এলেন। লিপির জন্য ডাক্তারবাবু এক সেট্ ফাউন্টেন পেন ও ডট পেন এনেছিলেন, সেটা লিপিকে ডেকে তার হাতে দিলে লিপি ডাক্তারবাবু প্রণাম করে মায়ের কাছ থেকে ডাক্তারবাবুর জন্য মিষ্টি নিয়ে এল। মিষ্টিমুখ করে ডাক্তার সুদীপের প্রেসার মেপে এবং ভালভাবে তাকে পরীক্ষা করে একটা প্রেস্ক্রিপশান করে দিয়ে দু'একটা টুকরো গল্প করে বিদায় নিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে সুদীপ একটু বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর প্রায় সন্ধ্যার মুখে সে লতার ও নমিতার কাঁধে হাত রেখে পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল। কি জানি সুদীপের মনে কি হয়েছে এই দু-দিন বিকেলের দিকে ছাদে উঠতে চাইছে, হয়ত তার দু-চোখের সামনের খোলা আকাশের নীলটাকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করবার জন্য, হয়ত প্রবহমান খানিকটা উন্মুক্ত বায়ু বুকে ভরে নেবার জন্য। এই দুদিন ঘরে থাকতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, তাই বিকেলের দিকে ছাদে উঠে বুক ভরে একটু শ্বাস নিতে চাইছে। ছাদে উঠে বসার সময় নিজেরই বুকের বাঁ দিকটা চেপে ধরে সুদীপ; তার যেন মনে হয় কতকগুলো পোকা যেন একসঙ্গে তার বুকের বাঁ দিকে কামড়ে দিয়েছে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সুদীপের মুখটা বিবর্ণ

হয়ে ওঠে। লতা একবার বলে, "তোমার এত কষ্ট হচ্ছে অথচ আরও কষ্ট করে কেন ছাদে এলে?" লতার কথায় সুদীপ উত্তর দেয় না, চুপ করে যায়। যন্ত্রণার মাত্রাটা একটু কম হলে সে নমিতাকে বলে, "যাও মা, অনিকে বল, কাছে পিঠে কোথাও তোমায় একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।" নমিতা শ্বশুরের কথায় সেখান থেকে ওঠে না, কারণ তাঁর কষ্ট দেখে আজ কোথাও যেতে নমিতার ইচ্ছা করে না। সুদীপ পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে সব বুঝতে পারে, কিন্তু সুদীপের স্নেহশীল পিতৃ-অন্তরের তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নমিতাকে উঠতে হয়। দোতলায় নেমে কিছুটা গড়িমসি করেই অনির্বাণ ও নমিতা বাইরে বের হয়। বাইরে বের হয়ে একটা ট্যাক্সী নিয়ে ধর্ম্মতলায় পৌছতে-না-পৌছতে প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে। আকাশের দিকে চেয়ে অনির্বাণ বেশ বুঝতে পারে একে শ্রাবণ মাস, তার উপরে মেঘের যা ঘোলাটে ভাব তাতে এই বৃষ্টি দু-তিন ঘণ্টার আগে থামবে বলে মনে হয় না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কলকাতার বহু রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে যাবে, গাড়ী ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে যাবে। এ-কথা মনে হতেই ঐ বৃষ্টির মধ্যেই আবার একটা ট্যাক্সী ধরে বাড়ী ফিরবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ট্যাক্সীই কি সহজে পাওয়া যায়। তার মত অনেক লোকই তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সীর জন্য ছটফট করছে। অনির্বাণ ও নমিতাও চঞ্চল হয়ে পড়ে। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির দাপট একটু কমলে একটা ট্যাক্সীকে মিটারের অঙ্কের চেয়ে দু-টাকা বেশী দেবার স্বীকৃতি দিয়ে ট্যাক্সী পায় এবং তাতে চড়ে বসে। ট্যাক্সীতে চড়ে বসতেই আবার প্রচণ্ড দাপটে বৃষ্টি শুরু হয়। রাস্তাঘাট সব ঝাপসা হয়ে আসে। ট্যাক্সীর ড্রাইভার খুব ধীরে-ধীরে গাড়ীটা চালিয়ে রাজভবনের নিকট এসে থেমে যায় এবং বলে "বৃষ্টিটা একটু থামুক, না হলে রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না।" অনির্বাণও তার অসুবিধার কথাটা বোঝে, কারণ গাড়ীর হেড লাইটের আলোতে রাস্তার প্রায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তাই সে আর ট্যাক্সী ড্রাইভারকে কিছু বলে না। ঐ গাড়ীর মধ্যে সমস্ত কাঁচ তুলে দিয়ে দু-জনে ঘামতে থাকে। বাইরে তখন অবিরল ধারায় বর্ষণ চলেছে। মনে হচ্ছে সমস্ত আকাশটা বুঝি ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। কোন দেবতাই বুঝি আর এ-বৃষ্টি থামাতে পারবে না। আরও ঘণ্টাখানেক পরে অবশেষে বৃষ্টি কমলে অনির্বাণ ও নমিতা ভিজে জুবজুবে হয়ে বাড়ী ফিরে এল। গলির মোড়ের বড় রাস্তা থেকে বাড়ীর দরজা সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতে গিয়েই তাদের ঐ অবস্থা। বাড়ীতে এসে বাবাকে লুকিয়ে জামাকাপড় ছাড়বে বলে দুজনে পা টিপে-টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে, কিন্তু কথায় বলে না, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে দেখে

লতা ও সুদীপ বড় ঘরের দরজার নিকট সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অনির্বাণ ও নমিতা সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাবা ও মাকে এক সঙ্গে সামনে দেখেই ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় এবং মাথা নীচু করে ফেলে। তাদের ভয় দেখে সুদীপ ও লতা দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সুদীপ বলল, "ছিঃ ছিঃ ভিজে একেবারে উবুড়ি-চুবুড়ি হয়ে গেছিস তোরা, যা যা শিগ্‌গীর কাপড় জামা বদলাগে যা, না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।" এর পর লতাকে সুদীপ বলল, "ওদের জামাকাপড় বদলানো হলে সবাইকে এক সঙ্গে খেতে দাও, আজ সবাই মিলে এক সঙ্গে খাব।" সুদীপের কথা শুনে লতা একবার তার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে রাত্রি সাড়ে নটা, সুতরাং খাবার সময় হয়েছে বুঝে সে সকলের জন্য খাবার সাজাতে রান্নাঘরে ঢুকে যায়। নমিতাও মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এসে পড়ে এবং সকলের জন্য জল-জায়গা করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলের খাবারের থালাগুলো একে-একে ধরে দিয়ে লতা দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুদীপ লতাকে বলল, "তোমারটাও নিয়ে এস, আজ আগে পিছে নয়, আজ সবাই এক সঙ্গে খাব।" লতা একবার অনুযোগের ভঙ্গীতে বলল, "আমি শুদ্ধু বসলে কারও কিছু লাগলে দেবে কে?" সুদীপ বলল, "হাঁড়িকুড়ি, তরীতরকারী, দুধের কড়াই সব এখানে নিয়ে এস, যার যেটা দরকার লাগবে চামচে করে তুলে-তুলে তাকে সেটা দিয়ে দেবে।" আজকে হঠাৎ সুদীপের কেন এরকম খেয়াল হল তা কেউই বুঝতে পারছিল না, তাই সবাই ব্যাপারটায় বেশ মজাই অনুভব করছিল। এমন কি, সুদীপ নিজেও জানত না হঠাৎ এমন অদ্ভুত খেয়াল তার হতে গেল কেন? কেউ না জানলেও সবার দৃষ্টির অন্তরালে অন্তরীক্ষ থেকে একজন সবই জানছিলেন এবং হয়ত তাঁরই অনুচ্চারিত নিঃশব্দ নির্দ্দেশেই সুদীপের আজকের এই খেয়ালের জন্ম। কিন্তু একি শুধুই খেয়াল, নাকি এর মধ্যে কোন নিষ্ঠুর অবশ্যম্ভাবী সত্যও বিধাতা পুরুষ লুকিয়ে রেখেছিলেন?

নানা রকম গল্পগুজবের সাথে খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত্রি প্রায় সওয়া দশটা বাজল, তারপর সুদীপ ধীরে-ধীরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং বাসনপত্র গোছগাছ করে ঘরদোর গুছিয়ে শুতে-শুতে লতা ও নমিতার রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজল। কাজকর্ম্ম সেরে লতা শুতে এলে সুদীপ তাকে একটা সিগারেট দিতে বলল। লতা আলমারী থেকে সিগারেটের একটা নতুন প্যাকেট দিলে তা থেকে একটা সিগারেট বের করে সুদীপ আধ-শোয়া অবস্থায় একটা সিগারেট ধরাল, কিন্তু সিগারেটে গোটা তিনেক টান দেওয়ার পর হঠাৎ তার বুকে-হাতে আবার যন্ত্রণা শুরু হল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই যন্ত্রণাটা তীব্রতর হয়ে উঠল

দেখে লতা মাঝের ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে অনির্বাণকে ওঠাল। সেই মাত্র মিনিট কয়েক আগে নমিতা ঘরে ঢুকেছে ; তখনও তারা দুজনের কেউই ঘুমায় নি, তাই মায়ের ডাক শোনার সঙ্গে-সঙ্গে অনির্বাণ দরজা খুলে হুড়মুড় করে বের হল এবং নমিতাও তার পশ্চাতে উঠে এল। অনির্বাণকে সামনে দেখেই লতা বলল, "তোর বাবার শরীরটা খুব খারাপ, ডাক্তার দাশগুপ্তকে ফোন করে এক্ষুণি একবার আসতে বল।" মায়ের কথা শুনে অনির্বাণ তাড়াতাড়ি অজিতকে পাশের ঘর থেকে উঠিয়ে পাড়ার স্থানীয় ডাক্তার অনিলবরণ ঘোষকে ডাকতে পাঠিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্তকে টেলিফোন করল। ডাক্তার দাশগুপ্ত থাকেন যাদবপুরে তাঁর আসতে দেরী হতে পারে ভেবেই সে ডাক্তার ঘোষকে ডাকতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অজিত ফিরে এসে বলল, "ডাক্তারবাবু এলেন না; তিনি বলেছেন তোমাদের হাউস-ফিজিসিয়ানকে ডেকে দেখাও গে। আমি তোমাদের বাঁধা ডাক্তার নই যে, যখন ডাকবে তখনই যেতে হবে।" ডাক্তারের বলা কথাগুলো অজিতের মুখ থেকে শুনে অনির্বাণের মনটা ঘৃণায় রি-রি করে উঠল, সে তখন একটা ট্যাক্সী নিয়ে চট্ করে যাদবপুর গিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্তকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। তখন রাত্রি প্রায় পৌনে বারটা, পাথুরিয়াঘাট থেকে যাদবপুর রাস্তাও অনেকখানি, ডাক্তার নিয়ে আসতে রাত্রি প্রায় দেড়টা বেজে গেল। ডাক্তার এসে দেখেশুনে সুদীপের আহারাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে অম্লের জন্য ঔষধ দিলেন এবং বেশ কিছু-ক্ষণ অপেক্ষা করে রোগী একটু শান্ত হয়েছে দেখে সকালে অন্য একজন বড় ডাক্তার নিয়ে আসবেন বলে চলে গেলেন। ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর যন্ত্রণা কখনও একটু কম কখনও বেশী এইভাবে চলতে থাকল। যন্ত্রণার মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপ কখনও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলে, কখনও বুকে, আবার কখনও পিঠে হাত বুলোতে বলে। এইভাবে বেশ কয়েকঘণ্টা কাটার পর সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ ডাক্তার দাশগুপ্ত শ্রীকুমার রায় নামক একজন অরথোপিডিক সার্জনকে নিয়ে এলেন। তিনি কিন্তু সুদীপের যন্ত্রণার হাব-ভাব বুঝেই বললেন, "ইট্‌স এ কেস অফ মাইয়ো কার্ডিয়াল ইনফ্যার্কশন, ইমিডিয়েটলি ইউ স্যড় কল এ কার্ডিওলজিষ্ট এণ্ড মেক য়্যান ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ।" এরপর ডাক্তার রায়ের নির্দেশে ও তাঁরই অনুরোধক্রমে কার্ডিয়াক সার্জন ডাক্তার সুনীল কুণ্ডু তাঁর ট্রানজিষ্টারাইজড ই. সি. জি. মেসিন নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হলেন এবং সুদীপকে ভালভাবে পরীক্ষা করে তার বুকের ই. সি. জি. করে গ্রাফ দেখে ডাক্তার দাশগুপ্তকে পাশের ঘরে ডেকে বললেন, "ইট্‌স্ এ ক্লিয়ার কেস অফ য়্যাকিউট মাইয়ো কার্ডিয়াক ইনফ্যার্কশন, বাট ইট ইজ টু লেট। আপনি আরও আগে ডাকলেন না কেন, অন্ততঃ আরও

চব্বিশ ঘণ্টা আগে এ কেস পেলে হয়ত কিছুটা আশা করা যেত।" ডাক্তার পাশের ঘরে যেতেই সুদীপ অনির্বাণকে ডেকে বলল, "আজ ইনকাম ট্যাক্সের কেস আছে, তুই দোকানে গেলি না, কেসটা হবে কি করে?" অনির্বাণ বলল, "উকিল-বাবুকে অন্য ডেট নিতে জানিয়ে দিয়েছি, আপনাকে ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। আপনি বিশ্রাম নিন, কেসে পরে যা হয় হবে, ভাববেন না বাবা।" যাই হোক ডাক্তার কুণ্ডুর নির্দ্দেশ মত ওষুধ, ইন্‌জেকসন এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হ'ল। ডাক্তার দাশগুপ্ত সুদীপের বিছানার পাশে বসে সব সময় তার উপর ওয়াচ রাখতে লাগলেন এবং মাঝে-মাঝে প্রয়োজন মত ডাক্তার কুণ্ডুর সঙ্গে ফোনে পরামর্শ করে ওষুধ-ইনজেকসন যথাসময়ে দিতে থাকলেন। বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ ডাক্তার কুণ্ডু পুনরায় এলেন এবং রোগীকে দেখে তার ই. সি. জি. করলেন। গ্রাফ দেখে বললেন, "গ্রাজুয়ালী হি ইজ রিকভারিং, চিন্তা অনেকটা কেটে গেল।" ডাক্তার কুণ্ডুর কথা শুনে ডাক্তার দাশগুপ্ত এবং অনির্বাণ কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল, কিন্তু লতা ও নমিতা সেই অক্সিজেন দেবার সময় থেকে কান্না শুরু করেছে; তারা কিছুতেই চোখের জলকে বশ মানাতে পারছে না। এর মধ্যে খবর পেয়ে বড় জামাই বিমল এবং মেয়ে ছবিও এসে গেছে। বাবার অবস্থা দেখে ছবির বড়-বড় দুটি চোখের কোল বেয়েও টপ্‌টপ্‌ করে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে, জামাইও অকস্মাৎ এই অবস্থা দেখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

সময়ের গতিতে সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যা নামল ধরণীর বুকে কালো ছায়া ফেলে। ডাক্তার দাশগুপ্ত অনির্ব্বাণকে বললেন, "বাবা অনি, রাত্রে সুদীপের কাছে থাকবার জন্য তুমি অন্য একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করো, আমি আর পারছি না। গতকাল সারারাত আজ সারাদিন, যদি ক্লান্ত হয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে মুস্কিল হবে। তুমি একজন ইয়ং ডাক্তার দেখ যিনি সারারাত জেগে থাকতে পারবেন। আমি তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাব। আজ রাতটা সুদীপকে খুব সাবধানে রাখতে হবে।" ডাক্তারবাবুর কথা শুনে অনির্ব্বাণ অজিতকে নির্দ্দেশ দিলে সে মেয়ো হাসপাতালের আর. এস. ডাক্তার অমল ঘোষের কাছে গেল। তিনি ভারতী মেডিক্যালের ডাক্তার নীলাঙ্কশশী রায়কে অনুরোধ করলেন। ডাক্তার রায় সবকিছু শুনে সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর শ্যালক ডাক্তার হিমাদ্রি চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তার চৌধুরী এসে পৌছানোর পর ডাক্তার দাশগুপ্ত সমস্ত ওষুধ ইনজেক্‌সন ইত্যাদি কিভাবে দিতে হবে এবং কখন দিতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে রাত্রি প্রায় সাড়ে নটার সময় বিদায় নিলেন এবং যাবার পূর্বে তিনি সুদীপকে আর একবার ভালভাবে পরীক্ষা করলেন এবং ডাক্তার কুণ্ডুকে ফোনে অনুরোধ করলেন রাত্রে আর একবার পেশেণ্টকে দেখে যাবার জন্য।

ডাক্তার দাশগুপ্ত চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে সংবাদ পেয়ে ভোলানাথ, শিবনাথ, ভোলানাথের ছোট বোন পার্বতী ও ভগ্নীপতি নিরাপদ এসে সুদীপের শয্যাপার্শ্বে হাজির হ'ল। ভোলানাথ 'দাদা, 'দাদা', বলে ডাকতেই সুদীপ সাড়া দিয়ে বলল, "এতক্ষণে মনে পড়ল ভাই। এসেছিস খুব ভাল করেছিস, দেখাটা হয়ে গেল।" শিবনাথকে ডেকে বলল, "তোর এই দাদাটার উপর আর রাগ নেই তো?" পার্বতী এবং তার স্বামী নিরাপদকে ডেকে দুহাতে দুজনের হাত চেপে ধরে বলল, "আমাকে তোরা কথা দে, আমার লিপিকে তোদের পুত্রবধূ করে নিয়ে যাবি।" নিরাপদ সরল প্রকৃতির মানুষ, তাই সে এ-অবস্থায় চুপ করে না থেকে সঙ্গে-সঙ্গেই বলল, "কথা দিলাম দাদা, তুমি শান্ত হও।" পার্বতী চিরকালই অন্য-রকম, তাই সে মুখে কিছু না বলে চুপ করে থাকল। সুদীপ লতার দিকে চেয়ে, বলল, "একটা কাজই বাকী ছিল, তারও ব্যবস্থা করে দিলাম। তোমার আর কিসের চিন্তা?" সুদীপ এত কথা বলছে দেখে ডাক্তার চৌধুরী ঘরে ঢুকে তাঁকে কথা বলতে নিষেধ করে শুয়ে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন। বিছানায় শুতে কষ্ট হচ্ছিল বলে সেই দুপুর থেকেই সুদীপকে একবার জামাই বিমল ও একবার পুত্রবধূ নমিতা বালিশ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বুকে করে ধরে রেখেছিল। ডাক্তারের নির্দ্দেশে শোবার চেষ্টা করতেই সুদীপ যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে বিমল আবার সুদীপকে বুকে করে তুলে ধরল। যন্ত্রণাটা বেড়েছে দেখে ডাক্তার চৌধুরী সুদীপের বাম হাতের শিরায় একটা ইনজেকসন দিতে গেল, সূচ হাতে ফোটাতেই সুদীপ ডান হাত দিয়ে ডাক্তারের হাতটা ঠেলে সূচ বের করে দিয়ে একবার চোখদুটো মেলে চারদিকে তাকিয়ে সকলকে দেখে নিয়ে বলল, "ডক্টর, লেট মি পাশ অ্যাওয়ে ইন পীস, আর সূচ বিঁধিও না ব্রাদার, ইউ আর ট্রাইং ইন ভেন, আমাকে শান্তিতে যেতে দাও।" এরপর দুটো হাত তুলে দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পটরাখা আলমারীটার দিকে চেয়ে নমস্কার করল এবং হাত-দুটো যথাস্থানে নামাবার পূর্বেই চোখ দুটো উল্টে যাবার মত হয়ে দু'তিনবার হিক্কা উঠে তার নড়াচড়া স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখের সামনে সজ্ঞানে সুদীপের ফিজিক্যাল ডেথ হতে দেখে ডাক্তার চৌধুরী ম্যাসাজ করে অচল হার্টকে সচল করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুদীপের শরীরটা আস্তে-আস্তে শীতল হয়ে এল। পরম প্রশান্তিতে সুদীপ ঘুমিয়ে রইল।

এর মধ্যে ডাক্তার কুণ্ডু এসে হাজির হয়েছেন, তাঁর ই, সি, জি, মেসিনটা নিয়ে। বাড়ীতে ঢুকে কান্নাকাটির আওয়াজ শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মেসিনের আর প্রয়োজন নাই। তাও তিনি ধীরে-ধীরে সুদীপের কাছে গিয়ে পায়ে একবার

হাত বুলিয়ে দেখলেন—যেন ছোট ভাইটি তার শ্রদ্ধার পরশ দিয়ে বড় ভাইয়ের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করছে। ধীরে-ধীরে গোটা বাড়ীটার এবং আশপাশের অনেক বন্ধু বান্ধব এসে জুটল, সকলেই চোখ মুছতে লাগল। রাত্রি দশটা সতের মিনিটে সুদীপের প্রাণবায়ু তার দেহ ছেড়ে চলে গেলেও তার দেহটা নিয়ে যাবার জন্য শ্মশানবন্ধুরা যখন ঘরে ঢুকল তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা। শ্মশানযাত্রীরা যখন সুদীপের মরদেহটা পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত খাটিয়ায় চাপিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বিশ্বের কোথায় কি পরিবর্ত্তন ঘটল জানি না, কিন্তু এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনে জরাজর্জর বৃদ্ধ সতীন্দ্রবাবুর বুকের পঞ্জরাস্থি খসে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল এবং লতা, অনির্বাণ ও লিপির জীবনে যে একটা অনির্দিষ্ট অকল্যাণ তার কাল ছায়া বিস্তার করে এল তা বলে না দিলেও বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা নাই।

লতা, লিপি ও অনির্বাণের জীবনে ভবিষ্যতে যাই-ই ঘটুক, মৃত সুদীপের দেহপার্শ্বে উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের মনে হতে লাগল সুদীপের মত সার্থক জীবনই যেন প্রতিটি মানুষের কাম্য হয়। সমস্ত দুঃখযন্ত্রণাকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে নিজের পায়ের তলার মাটি যে নিজে প্রস্তুত করে নেয় সেই-ই তো মানুষ। যে-দোকানে কর্মচারী ছিল সেই দোকানের মালিক হয়েছে, যে-বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হয়ে এসেছিল সেই বাড়ী কিনে নিয়েছে। কত দৈন্যের মাঝখান থেকে, দুঃখময় অন্ধকারের জগৎ থেকে সততার সঙ্গে সংগ্রাম করে একটু সাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছে, শেষ সময়ে একটু আনন্দের মুখ দেখেছে, একটা আলোর জগতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কত বঞ্চনার ব্যথা বুকের গভীরে নির্বাসিত করে আজীবন শুধু হেসেছে। অবশেষে শেষ বিদায়ের কালেও সজ্ঞানে সর্ব্ব-মঙ্গলময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তবে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে। সত্যিই এ এক অপূর্ব্ব জীবন, এ এক সার্থক জীবন। সকলেই মনে-মনে সুদীপের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করল এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাল, "হে ঈশ্বর, আমাদেরও এমনই সার্থক, সুন্দর ও সংগ্রামী জীবন দিও।"

———